সুবোধ ঘোষ

পিতামহ ৺কালীচরণ ঘোষের বিশ্বাসপূত জীবনের অনেক কথা স্মরণ ক'রে তাঁরই নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।

-লেখক

নবলার ধারণা,	জীবন যেন রঙীন সুখের ছুটন্ত স্বপ্ন।
দেবী রায় বলে,	এই জীবন একটা স্পোর্ট, ইয়ে জিন্দগী হ্যায় খেল।
পাঁচু মুস্তফী বলে,	মানুষের জীবনই যে একটা জুয়া, শুধু হার-জিতের খেলা।
বিশ্বনাথ বলে,	জীবনটাই হলো টু-পাইস।
নন্দা দেবীর মতে,	জীবন হলো সোনার গয়না, ডিজাইন বদলানোই সুখ।
অনুপম বলে,	মানুষের জীবনই যে একটা ইঞ্জিন, কয়লা ফুরোলে তবে বিশ্রাম।
পাঠকজী বলেন,	জীবন হলো সন্তোখ!
রাধেশবাবুর মতে,	জীবন হলো খাটুনি, এবং কারে ডরি যতদিন দেহে আছে বল?
মৃগেনবাবু মনে করেন,	জীবন হলো টাকা,আরও টাকা।
মিত্রাদেবীর ধারণা,	ভালয় ভালয় সংসারের মায়া থেকে আলগা হয়ে যাওয়াই হলো জীবন।
স্বরূপার ধারণা,	এই জীবন বোধ হয় একটা অফুরান প্রতীক্ষা।
কুশলের মনের প্রশ্ন,	জীবন কি এক পরম আকস্মিকের কতগুলি অনিয়মের খেলা?
বিজয়বাবুর বিশ্বাস,	বিশ্বাসই জীবন

যার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কুশল, ঘুম ভাঙবার পরে তারই কথা সবার আগে মনে পড়ে। শুধু তারই কথা, অন্য কারও কথা নয়, অন্য কোন বিষয়ের কথাও নয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে সে-ই ছিল এতক্ষণ। এখন ঘুম ছেড়ে গেলেই বা কি? স্বপ্নটা যেন ছাড়তে চায় না।

বিছানায় শুয়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে শিয়রের দিকের জানালাটা খুলে দেয় কুশল। এক ঝলক ভোরের আলো ঘরের ভিতর এসে লুটিয়ে পড়ে। পুবের আকাশটাকেও এখান থেকে শুয়ে শুয়েই দেখা যায়, সত্যিই যেন আলোর পারাবার। সারা রাত্রি ধরে বৃষ্টি হয়েছে, ভাদ্রের আকাশভরা জমাট মেঘ রাতের অন্ধকারের মধ্যে গ'লে গ'লে কখন সারা হয়ে গিয়েছে, কোন খবর রাখে না কুশল, এমনই এক স্বপ্নের গভীরে তার একটি রাত্রির ঘুমভরা লক্ষ মুহূর্ত পার হয়ে গিয়েছে।

জানালার পাশে কামরাঙা গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ফোঁটা ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ছে এখনও। জলে ভেজা পাতার ঝোপের মধ্যে একটা পাখির বাসা একেবারে চুপসে গিয়েছে। বাসার বাইরে গাছের ডালের উপর শান্তভাবে বসে আছে এক নীলকণ্ঠ, পাশে তার সঙ্গিনী। নতুন রোদের আলো আর উত্তাপকে যেন দু'জনে মিলে পরম সমাদরে গায়ে মাখছে।

পুবের আকাশের দিকে নিবিড় দৃষ্টি নিয়ে তাকাবার মত মন নয় কুশলের, কারণ সে তো আর সবুজ কামরাঙা গাছের রঙীন নীলকণ্ঠ নয়। পুবের আকাশটাকে আলোর পারাবার ব'লে মনে হবে, এমন মোহ তার নেই। সে হলো নতুন এক শিক্ষিত অভিরুচির মানুষ। যাঁরা খোঁজ খবর জানেন, তাঁরাই সাক্ষী দেবেন, কুশল খুবই বেশি শিক্ষিত। তার জীবনের লক্ষ্য অতি স্পষ্ট; গতিও সোজা। পৃথিবী আছে একদিকে, থাকুক, কুশলের জীবনে তার জন্য কোন কৌতূহল উদ্বেগ বা চিন্তা নেই। কুশল আছে আর এক দিকে, তার নিজের স্বপ্ন নিয়ে, এবং এই স্বপ্ন ছাড়া আর কোন দিকে তাকিয়ে দেখবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই। তাই আজকের ভোরে পুবের আকাশ রঙে আর আলোকে যতই নয়নরম্য হয়ে উঠুক না কেন, কুশলকে ক্ষণিকের জন্যও আনমনা করে দিতে পারে না। কুশল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিচলিত ও ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এককথায় বলা যায়, জীবনে সুখী হতে চায় কুশল। কা'কে সুখ বলে, তা'ও সে জানে। বেশি দিন নয়, আজ এক বছর হলো সে জানতে পেরেছে। জানা মাত্র

আর কোন দ্বিধাও সে করেনি, সকল চিন্তা ও সকল আগ্রহ নিয়ে সেই সুখধন্য জীবনের পরম লগ্নটির প্রতীক্ষায় সে রয়েছে।

এই প্রতীক্ষায় তীব্রতা আছে, কিন্তু বেদনা নেই। কারণ কুশল জানে, যা'কে পেলে তার জীবন সুখে ভরে উঠবে সে'ও যে তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে। দুজনের আগ্রহে আশ্বাসে ও শপথে দুজনেই তাদের ভবিষ্যৎ একেবারে সুস্পষ্ট ক'রে বুঝে নিয়েছে। আজকের স্বপ্নকে কালই সত্য ক'রে তুলতে কোন বাধা নেই। এর বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আপত্তি করার মত কেউ নেই, আপত্তি করার কোন যুক্তিও নেই। কারও আপত্তির জন্য নয়, ওরা দুজনে ইচ্ছা করেই নিজেদের ইচ্ছামত একটি শুভ সময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সেই শুভ মুহূর্ত যে আসন্ন তা'ও কুশল জানে, আর কুশলের সে'ও জানে। কুশলের একটা বড় রকমের সার্ভিস একরকম ঠিকই হয়ে আছে। শুধু কাজে লেগে পড়বার তারিখটি জানিয়ে চূড়ান্ত অর্ডার আর চিঠি আসতে যতটুকু দেরি। আর নবলার কথা? তার বি-এ পরীক্ষার ফল বের হতে যত দিন বাকি। তাই আরও কিছুদিন অথবা কয়েকটা মাস অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে ব'লে ওরা দুজনেই মনে করে—কুশল আর নবলা। এমনিতেই ওদের দুজনের রূপে আর গুণে যে ঐশ্বর্য আছে, তাই যথেষ্ট। তবু আরও কটা দিন অপেক্ষা করলে দোষ কি? আরও গর্ব ও আরও গৌরবের আস্পদ হয়ে, পরস্পরের কাছে আরও বরণীয় ও লোভনীয় হয়ে একদিন এক উৎসবের বাসরে চিরকালের মত দুজনে মিলিত হবে।

কুশলের ইচ্ছা ছিল, নবলার সঙ্গে বিয়ে হবার আগেই নতুন বাড়িটা তৈরি হয়ে যাক। বাড়ির জন্য জমি কবে থেকেই কেনা হয়ে আছে। বাড়ির নক্সাও তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু, শুধু এই পর্যন্তই। এর পরেও দ্বিধা করছেন কুশলের বাবা বিজয়বাবু। তাঁর আচরণে নতুন বাড়ি করবার কোন স্পৃহা দেখা যায় না। অথচ বাড়ি করবার মত টাকা যা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি, দুগুণ তিনগুণ অথবা চারগুণ টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে আছে। একটা গাড়ি কেনার জন্যও কয়েকবার প্রস্তাব তুলেছিল কুশল, কিন্তু বিজয়বাবু একেবারেই সাড়া দেননি। বাবার এই ঔদাসীন্য সহ্য করতে কষ্ট হয় কুশলের।

ঘড়ির কাঁটা সময়ের হিসাব জানিয়ে দিচ্ছে, সাতটা বেজে দশ। ব্যস্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় কুশল, বিজয়বাবু গীতা পড়ছেন। এই দৃশ্যটাও কুশলের কাছে সত্যিই কষ্টকর। ছোট একটি পশমি আসনের উপর

বসে, চোখের সামনে গীতাখানা খুলে ধরে রেখেছেন বিজয়বাবু। চোখের পাতা নড়ছে ব'লে মনে হয় না, তাঁর সমস্ত চৈতন্য যেন এক ভাবগভীর অতলতায় ডুব দিয়ে রয়েছে। পুব আকাশের আলো এই বৃদ্ধের প্রশান্ত মূর্তিকেও যেন আভাময় ক'রে তুলেছে। কুশলের মনে হয়, বুড়ো ভদ্রলোক কিছুক্ষণের মত অকারণে একটা পাথরের মূর্তি ধারণ করেছেন, প্রাণহীন ও নিঃস্পন্দ। জীবনে সুখী হবার আগ্রহ যাদের ফুরিয়ে গিয়েছে, সুখী হতে জানে না, তারাই এরকম ভয়ংকরভাবে গীতা পড়ে।

কুশলও শিক্ষিত মানুষ, গীতা সে-ও পড়েছে। পড়ে দেখেছে, বইখানা দর্শন হিসাবে ভালই। জানবার মত তত্ত্ব এর মধ্যে অনেক কিছু আছে। কিন্তু এই জানার কাজটুকু ছাড়া আর বেশি কিছু করতে গেলেই সেটা বাতিক হয়ে দাঁড়ায়, জীবন হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। বিজয়বাবু তাঁর জীবনকে প্রায় সেই দশায় এনে ফেলেছেন। জীবনের সকল উদ্যম ক্ষান্ত করে দিয়েছেন, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন, নিজেকে ক্ষুদ্র ক'রে রেখেছেন।

হলোই বা বার্ধক্য, শরীরের দিক দিয়ে। পঙ্গু বিকল বা অক্ষম হয়ে যাননি তিনি, এবং ইচ্ছা করলেই এবং এমন গীতাবাতিক না হয়ে একটু মনের জোর রাখলেই এখনও ঢের ঢের অর্থ উপার্জন করতে পারেন। তিনি নামকরা এঞ্জিনিয়ার, সে নামের জোর এখনও আছে। এবং এখনও তিনি টেণ্ডার দাখিল করলে যে-কোন ব্রিজ বিল্ডিং বা রোড তৈরির কনট্রাক্ট তাঁরই পক্ষে মঞ্জুর হয়ে যাবে, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তবু জীবনের সকল প্রয়াসের জাল যেন তিনি গুটিয়ে ফেলেছেন। অথচ এইরকমই পরিণত বয়সে এই শহরে মাঙ্গিরাম, চৌধুরী, সোরাবজি এবং আরও কত ভদ্রলোক নতুন নতুন কারবার আর কারখানা খুলছেন। বিজয়বাবু ঠিক তার বিপরীত, জীবনে যেন আর রোজগারের কোন প্রয়োজন নেই। যা ছিল এবং যা আছে তা সবই এক ব্যাঙ্কের কাছে রেখে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন। জীবনে আরও ঐশ্বর্য এবং আরও বিত্ত লাভের মত প্রতিভা তাঁর আছে, কিন্তু আগ্রহ নেই এবং এইরকম ভয়ংকরভাবে গীতা পড়ে পড়ে সুখী হবার মত শক্তিটুকুকেও একেবারে ক্ষয় ক'রে দিচ্ছেন।

পিতার সম্বন্ধে কুশলের এই ধারণাটা নতুন নয়। অনেকদিন থেকেই হয়েছে। প্রথম প্রথম এর জন্য দুঃখ হতো কুশলের, কিন্তু আজকাল ক্ষোভ হয়। আজকের এই ভাদ্রের মেঘমুক্ত প্রভাতবেলায় পৃথিবী যতই স্বচ্ছ হয়ে উঠুক না কেন, বিজয়বাবুর ঐ নিঃস্পন্দ ও কঠিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে কুশলের মন প্রতিদিনের মত ক্ষোভে ও আক্ষেপে অস্বচ্ছ হয়েই থাকে।

এখনই বের হতে হবে কুশলকে, ব্যস্তভাবে হাত-মুখ ধুয়ে সাজ-প্রসাধনও সেরে ফেলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর একবার অস্থির হয়ে ওঠে কুশল। এখনও কেউ চা দিয়ে গেল না। মনটা তিক্ত হয়ে ওঠে। তবু সব অস্থিরতা সংযত ক'রে বাইরের ঘরে গিয়ে একটা সোফার উপর চুপ ক'রে বসে থাকে।

কখন্ যে চা আসবে, তাও সঠিক অনুমান করতে পারে না কুশল। কারণ, মা নিজের হাতে চা তৈরি ক'রে নিজেই এসে দিয়ে যাবেন, এই হলো রীতি। একটা চাকর ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঝি চাকর ঠাকুর মালী কিছুই নেই। যদিও ডজনখানেক চাকর-বাকর, আর বয়-খানসামা রাখবার মত অর্থ ও বিত্ত এই সংসারের আছে। অর্থের অভাব নেই, অভাব হলো রুচির। কখন্ কোন্ ভোরে মা নিজেই এঘর থেকে ওঘর ঘুরে ঘুরে, খুট খাট আর ঠুক ঠাক ক'রে সব কাজগুলিকে যেন নিজের হাতেই জাগিয়ে আর বাজিয়ে চলেছেন। আশ্চর্য, মা'ও একদিনের জন্য কখনও আপত্তি করেন না। মা'রও তো বয়স হয়েছে। তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ সারতে পারবেন কেন? তবু এত পরিশ্রমের বিরুদ্ধে তাঁর কোন প্রতিবাদ নেই। যে চা পাঁচ মিনিটে তৈরি হতে পারে, তার জন্য লাগবে আধঘণ্টা। বেশিও হতে পারে। মিছামিছি, অকারণে, শুধু সুখে থাকবার রীতিনীতি জানেন না বলেই সব সাধ্য ও সঙ্গতি সত্ত্বেও একটা কেরানি-বাড়ির জীবন নিয়ে পড়ে রয়েছেন বিজয়বাবু আর মিত্রা দেবী—কুশলের বাবা ও মা।

আরও অনেক কিছু চুপ ক'রে সহ্য ক'রে আসছে কুশল। তার শিক্ষিত মনের রুচিতে আঘাত লাগে, তবু খুব বেশি মুখ খুলে মা মিত্রা দেবীর বাতিকগুলির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে না কুশল। শীত বর্ষার বালাই নেই, কখন্ কোন্ ভোরে উঠে গোঁসাই পাড়ার কাছে তুলসী সরোবর নামে একটা পানাভরা পুকুরে স্নান করতে যান মিত্রা দেবী। জায়গাটা কম দূরে নয়, আধ মাইলেরও বেশি হবে। তার পর ফিরে আসতেও কত ভক্তির উপদ্রব। পথে একটা পঞ্চবটী আছে, সেখানে কিছুক্ষণ কাটাবেন গাছের গায়ে জল ঢালতে। পুরনো পার্কের পাশে ঝাউয়ের ভিড়ের গা ঘেঁষে নতুন একটা মন্দির হয়েছে—অম্বিকা মন্দির। তারই শ্বেত পাথরের সোপানে একবার কপাল ছুঁইয়ে আসতে কোন দিন তাঁর ভুল হয় না। বাড়ি ফিরে এসেও বাতিকের শেষ হয় না। সারা বাগান ঘুরে ফুল তোলেন, তারপর গিয়ে ঢোকেন তাঁর পুজোর ঘরে, যেখানে ছোট একটি রুপোর বেদীর উপর রাখা আছে তামার পাতে লেখা নারায়ণ স্তোত্র। এক ঘণ্টার আগে ঐ তামার নারায়ণের সান্নিধ্য ছেড়ে বাইরে আসতে পারেন না মিত্রা দেবী।

এমন মানুষের পক্ষে চা তৈরি করতে বেলা আটটা বাজবে, তাতে আ .
কি আছে ?

বেলা আটটাও হয়ে গেল, তারপর আরও আধ ঘণ্টা পরে মিত্রা দেবী এসে চা খাবার দিয়ে গেলেন। কোথায় বেরুচ্ছিস, কখন্ ফিরবি ? দু'চারটে কথাও জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রতিদিনই একথা জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন, এমনি শান্ত ও স্নিগ্ধ স্বরে। কুশলও প্রতিদিন উত্তর দেয় দু'চারটে কথায়, নম্র সুরে। আজ কেন জানি এই চিরাচরিত নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হ'য়ে গেল। মা'র প্রশ্নের উত্তর দিল না কুশল। কয়েকটি মুহূর্ত মিত্রা দেবী শুধু তাকিয়ে রইলেন কুশলের মুখের দিকে, তারপর চলে গেলেন, কারণ তাঁর এখন অন্য কাজ এবং অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

চা-খাবার খাওয়া তখনও শেষ হয়নি কুশলের। কিন্তু খেতে আর মন চাইছিল না। মা'র ঐ শান্তস্বরের প্রশ্ন, নির্বিকার দৃষ্টি, আর ধীরে ধীরে চলে যাওয়া—এর চেয়ে বড় কঠোরতার দৃশ্য জীবনে আর দেখেছে বলে স্মরণ হয় না কুশলের। ছেলের একটা নিরুত্তর অভিমানের সমাদর পর্যন্ত নেই যে মায়ের আচরণে, তাঁকে শ্রদ্ধা করতে কুণ্ঠা আসে। তাঁর সত্তায় স্নেহ নামে কোন পদার্থ আছে কি না, এমনও সন্দেহ হয়।

ছেলেবয়সের কথা ছেড়ে দিলে বলা যায়, কলেজ ছাড়বার পর থেকে এভাবে তার মনের বিদ্রোহ কোনদিন কুশল প্রকাশ ক'রে ফেলেনি। বরং নিজেরই সুবিনত বাধ্যতার স্বরূপ দেখে নিজেই বিস্মিত হয়েছে। নিজেকে প্রশ্ন ক'রেও বুঝতে পারে না কুশল, তার সুশিক্ষিত মন আর রুচি বাড়ির এই নীরব-কঠোর শাসন চুপ ক'রে মেনে নেয় কেন ?

এতদিনে বোধ হয় আর সহ্য করার মত শক্তি ফুরিয়ে আসছে কুশলের। তাই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আজ মিত্রা দেবীকে সে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, খাবার না খেয়েই থালা সরিয়ে রেখে, উঠে দাঁড়ায় কুশল। প্রতিবাদ যখন প্রকাশ হয়েই পড়েছে, ভাল করেই হোক। আকাঙ্ক্ষা নেই, তৃষ্ণা নেই, এমনই একটা স্থবির ও স্তব্ধ বাড়ি, তবু কেন যে 'আনন্দ সদন' নাম দেওয়া হয়েছে কে জানে ? ফটকের থামের গায়ে ঐ মিথ্যা কথাটাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে ইচ্ছে করে কুশলের।

খাবার না খেয়ে চলে যাবার জন্য ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যায় কুশল। কিন্তু আশ্চর্য, স্থবিরতার আধার এই অচঞ্চল বাড়িটাকে প্রাণহীন জেনেও দারুণ ঘৃণায় একেবারে তুচ্ছ ক'রে চলে যেতে সে পারে না। ফটকের থামের গায়ে লেখা নামটি

চূর্ণ ক'রে দেবার ইচ্ছা দূরে থাকুক, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কুশল, আবার বাইরের ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।

ক্ষোভ যতই তীব্র হোক, এভাবে বিদ্রোহ প্রকাশ করার দুঃসাহস মন্দীভূত হয়ে আসে। কারণ, যা কিছুই যত বড় ঘৃণা দিয়ে তুচ্ছ করতে শিখুক না কেন কুশল, অন্তত আনন্দ সদনের ইঁট-পাথরগুলিকে তুচ্ছ করার মত শিক্ষা সে পায়নি। তুচ্ছ করা দূরে থাক, যদি মমতা বলে কিছু থাকে, তবে এই সুন্দর দোতলা দালানটার জন্যই আছে। ঐ বাগানটার জন্য আর ক্রস রোডের ধারে নতুন কেনা জমিটার জন্যও আছে।

পার্ক রোডের উপর রত্না ব্যাঙ্কে বিজয়বাবুর যেটুকু পুঁজি পড়ে আছে, তারই পাশ-বইটি রয়েছে দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায়, একটা বর্মা সেগুনের টেবিলের দেরাজে। বলতে গেলে কাঠের একটা আসবাব মাত্র, তবু এই দেরাজটির উপর একরকমের শ্রদ্ধাই আছে কুশলের। বিজয়বাবুর হাতের একটি ক্ষুদ্র স্বাক্ষরকে আজও শ্রদ্ধা করে আর ভয়ও করে কুশল। কুশলের অদৃষ্টকে ভ'রে দিতে পারে আবার একেবারে শূন্য ক'রেও দিতে পারে এই স্বাক্ষর। আনন্দ-সদনের নাম-ফলকটি কেন, এই সদনই বিজয়বাবুর একটা দানধর্মের বাতিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এতবড় কালেজি বিদ্যা শিক্ষা ক'রেও পিতার স্বত্ব আর স্বাক্ষরকে আজও তুচ্ছ করার সাহস শিক্ষা করেনি কুশল।

বিত্তবান পিতার একমাত্র ছেলে, জীবনে কোন দুঃখ পায়নি। ভয় পায় দুঃখকে, ঘৃণা করে নিঃস্বতাকে। ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ও পদকে আকীর্ণ এত বড় শিক্ষিত জীবনকে সার্থক করার জন্য সহস্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাত্র প্রস্তুত হয়েছে কুশল। এই তো তার জীবনের আরম্ভ। সবার মধ্যে অসাধারণ হয়ে উঠতে হবে তাকে। অথচ, আনন্দ সদনের নানারকম বাতিক আর ঔদাসীন্য তার মনুষ্যত্বকে চেপে রাখতে চাইছে। বুঝতে পারে কুশল। কিন্তু উপায় নেই, আজই এই মুহূর্তে বিদ্রোহ করা উচিত নয়। শুধু আজ কেন, আরও কিছুকাল উচিত নয়। থাকুন বিজয়বাবু আর মিত্রা দেবী তাঁদের নিরাভরণ ও রুচিহীন জীবনের বাতিক নিয়ে, কুশল থাকতে চায় তার স্বপ্ন নিয়ে। এই দু'য়ের মধ্যে আপাতত সংঘাত বাধিয়ে কোন লাভ নেই।

ফিরে গিয়ে আবার বাইরের ঘরে প্রবেশ করে কুশল। খাবার খায়, খাওয়া শেষ হলে ঘড়ির দিকে তাকায়। বেলা ন'টা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যেন একটা দুঃসহ আক্ষেপ বুকের ভিতর কেঁপে ওঠে। বেদনায় মলিন হয়ে ওঠে মুখটা, যেন কোথাও একটা দুর্ঘটনা হয়ে গিয়েছে এবং তার জন্য কুশলই দায়ী। আর মুহূর্তও বিলম্ব না ক'রে

আনন্দ সদনের ফটক পার হয়ে পথে এসে দাঁড়ায়। চলতে থাকে। যেন আরতির সময় পার হয়ে গিয়েছে, তবু আরাধ্যের কাছে ভক্ত চলেছে, অপরাধীর মত, মনে অনুতাপের জ্বালা।

শহরটির নাম মহারাজপুর, কোন কালে সত্যিই কোন মহারাজা এখানে ছিলেন বোধ হয়, তার ইতিহাস আজ আর কেউ জানে না। কোম্পানির যুগে এখানে ছিল একটা বাজার আর ছিল একটা পল্টনের শিবির, তারই স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখা যায় শহরের প্রায় উপকণ্ঠে ধানক্ষেতের ওপারে একটা পাহাড়ের মাথায়, জরাজীর্ণ একটা ফৌজি সিগন্যালের গম্বুজ। আজও লোকে বলে পাহারাওয়ালার পাহাড়। কোন শ্রী বা শোভা নেই এই পাহাড়টার, কতগুলি এলোমেলো কাঁটার ঝোপে গা ছেয়ে রয়েছে। শহুরে কুকুরের তাড়া খেয়ে শিয়ালের দল পালিয়ে গিয়ে ঐ ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়, এই মাত্র। এই সঙ্গছাড়া একলা-গোছের পাহাড়টার দিকে না তাকিয়ে আর একটু দূরে তাকালেই গিরি ও অরণ্যের শোভাময় মেখলা দেখা যায়। ধূসর পাহাড় আর সবুজ শালবন, তুইই যেন দিগ্বলয়ের নীলিমার ছোঁয়ায় মেঘশ্যাম রূপ ধারণ করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলো ধুলপাহাড়ের বিস্তার, সুন্দর ছন্দে তরঙ্গিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তের কোলে মিলিয়ে গিয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় অস্তমিত সূর্যের চিতানল নিভে যাবার আগে ধুলপাহাড়ের বুকে যেন একটা সিঁদুরের নদী কিছুক্ষণের জন্য ঢেউ ছড়াতে থাকে।

চারদিকে যতই বন আর পাহাড় থাকুক না কেন, মহারাজপুর কিন্তু আধুনিক শহর, জেলার সদর। ইংরাজের আমলেই মাত্র এক'শো বছরের মধ্যে মহারাজপুরের এই বিরাট পরিণাম সম্ভব হয়েছে। শহরের ভিতরে কোথাও দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে মহারাজপুরের কোন অতীত ছিল বলে বিশ্বাস হয় না। চওড়া ম্যাকাডাম সড়ক, পিচঢালা এভেন্যু, বিদ্যুতের বাতি, কলের জল, আর ক্লাব কাফে পার্ক মার্কেট নিয়ে সেকালের বুনো মহারাজপুর আজ একেবারে নতুন হয়ে গিয়েছে। শহরের এই এলাকার নাম তাই নিউ মহারাজপুর।

এর পাশেই আছে মহারাজপুর সিটি, আড়ত বাজার আর বসতি, যেখানে ড্রেন আর রাজপথের সৌন্দর্যে কোন পার্থক্য নেই; যেখানে ডাস্টবিনের গা ঘেঁষে ক্লান্ত কুকুর আর ক্ষুধার্ত ভিখারি একই ভঙ্গীতে ঘুমোয়। মহারাজপুর শহর এই দ্বি-স্বরূপে মূর্ত হয়ে আছেন। বার ও বিলিয়ার্ড সমন্বিত ডবল নাচঘর নিয়ে নিউ মহারাজপুরের স্টেশন ক্লাবটা মহারাজপুর সিটির হাসপাতালের চেয়ে সৌষ্ঠবে ও

আয়তনে অনেক বড়। দুই মহারাজপুরকে একসূত্রে গ্রথিত ক'রে রেখেছে ক্রস রোড, দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন মাইল, আদালত থেকে শুরু ক'রে ঘড়িঘর পর্যন্ত।

বাংলা দেশের শহর নয় মহারাজপুর, তবু বাংলা দেশ এখান থেকে দূরে নয়। ঘড়িঘরের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, গেরুয়া রঙের দামোদর কোমল পলি নুড়ি আর জলের ধারা নিয়ে শালবনের জগৎ থেকে ছাড়া পেয়ে সমতল ক্ষেত আর মাঠের বুকে এঁকে বেঁকে যেন পূর্ব দিগন্তের টানে দূরে চলে গিয়েছে। এক এক সময় মনে হয়, বাংলার ভূমি যেন তার ধানক্ষেতের আঁচলটা পশ্চিমে ছড়িয়ে দিয়েছে, এ জায়গাটা তারই একটা প্রান্ত, ছোট পাহাড় আর ছোট বনের শোভা দিয়ে কাজ করা! সব চেয়ে নিকটে দামোদরের উপর যে পুলটা দেখা যায়, সেটা যেন দু'হাত দিয়ে দু'দিক থেকে ছুটে-আসা দু'টি সড়কের হাত ধরে রেখেছে। একটা সড়ক এসেছে ঝালদার দিক থেকে, গালাকুঠি থেকে বড় বড় মালবোঝাই ট্রাক প্রায়ই এপথে দৌড়ে এসে সিটির দিকে চলে যায়। আর একটা সড়ক গিয়েছে পশ্চিম মুখো হ'য়ে শালজঙ্গলের ভিড় ভেদ ক'রে বোকারো কলিয়ারির দিকে। কাছাকাছি অনেকগুলি ছোট ছোট ফ্ল্যাগ স্টেশন দেখা যায়, লাইনের উপর খোলা ওয়াগনে সিমেণ্টপাথর বোঝাই করা হয়, কারণ মহারাজপুরের চারদিকেই এখানে ওখানে অনেকগুলি সিমেণ্টের ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে।

মহারাজপুরের সবই আধুনিক, সবচেয়ে পুরনো যা কিছু আছে তার সবই গোঁসাই পাড়ায় গেলেই দেখতে পাওয়া যায়, নিউ মহারাজপুর আর পুরনো সিটির মাঝামাঝি। গোঁসাইপাড়া যেন বাংলা দেশেরই একটা জনপদ। সবচেয়ে পুরনো মঠ আর মন্দিরগুলি এখানেই। সবচেয়ে পুরনো হাই স্কুল আর প্রথম মেয়ে স্কুলটাও এখানে। হরিসভার প্রাঙ্গণে প্রতি সন্ধ্যায় মৃদঙ্গের রব আজও শুনতে পাওয়া যায়, আর প্রতি বিয়ের লগ্নে উলুউলু। গোঁসাইপাড়ার মাঝখান দিয়ে যে পথটা চলে গিয়েছে, তারই ধুলোর সঙ্গে একটা বড় রকমের কিংবদন্তীর গৌরব মিশে আছে। মহাপ্রভু কাশী গিয়েছিলেন এই পথে। সেই পথের প্রেমেই হয়তো দূর অতীতে ভক্তের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এইখানে! এর চেয়ে দূরতর অতীতের কোন নিদর্শন নেই মহারাজপুর শহরে।

ক্রশ রোড ধরে ভাদ্রের রোদে পথ হেঁটে চলতে থাকে কুশল। রোদের তাপে জ্বালা তেমন নেই। তার উপর, শিলোড়া ঘাটের দিক থেকে মহুয়া আর পিয়াল বনের বাতাস মাঝে মাঝে বেশ উতলা হয়ে ছুটে আসছে, যার জন্য গায়ে জ্বালা থাকলেও জুড়িয়ে যায়। সব চেয়ে জুড়িয়ে যায় মন। কিন্তু পিয়াল বনের হাওয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার মত কোন অসার কাব্য নেই কুশলের মনে। সে হলো নতুন

অভিরুচির মানুষ। ঐ যে সেণ্ট ডেনিস কলেজ, প্রাসাদের মত যার কলেবর, সেখান থেকেই বিদ্যালাভ করেছে কুশল। তারপর—বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাসে এম-এ, কৃতিত্বে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রথম হয়ে প্রায় ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করেছে। তার পরেও দু'বছর ধরে পুরাতত্ত্বের গবেষণা। পুরনো গ্রীসের হেলেনিক গৌরব আর ডরিক স্থাপত্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিলাতি পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে সম্পাদকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্রও পেয়েছে।

কোন সন্দেহ নেই, এই ডিগ্রি-ডিপ্লোমা ও প্রশংসাপত্র নিয়েই গড়ে উঠেছে কুশলের মনুষ্যত্ব, বড় রকমের চাকরি লাভের পূর্ণ যোগ্যতা। তবু যুদ্ধের পাঁচটা বছর চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকতে হয়েছে কুশলকে, কারণ পুরাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সুযোগ বা সময় এই কয়েকটা বছর কারও ছিল না, না গভর্নমেণ্টের, না দেশের কোন কৃষ্টিপ্রেমিক সমিতির।

যুদ্ধ নেই, দেশও স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। মহারাজপুরের আদালত ঘরের মাথায় ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে। ক্রস রোড ধ'রে যেতে যেতে দেখা যায়, সবুজ লনের উপর দিয়ে লাল সুড়কি বিছানো একটা সরু রাস্তা বাংলোর মত দেখতে একটা সুশ্রী কংক্রিটের বাড়ির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটাই হলো সরকারি পুরাতত্ত্বের সার্ভে অফিস। আশে পাশে আরও ছোট বড় কতগুলি বাড়ি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাড়িটাই হলো মিউজিয়ম।

সার্ভে অফিসের বাংলোটার দিকে একবার না তাকিয়ে উপেক্ষাভরে চলে যেতে পারে না কুশল। লাল সুড়কি ছড়ানো ঐ পথটাই তো তার সুখস্বপ্নের নীড়ে পৌঁছবার একটা পথ। সার্ভে অফিসের কাজ এতদিন বন্ধ ছিল, আবার কাজ আরম্ভ হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, যোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাই। ঐ পদের প্রার্থিরূপে দরখাস্ত করেছে কুশল। শোনা গিয়েছে দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। পাটনা আর দিল্লী গিয়ে খোঁজ নিয়ে কুশল নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছে, তার চেয়ে যোগ্যতর কোন প্রার্থীর দরখাস্ত পড়েনি। উপরতলার দপ্তর থেকে একটি চিঠিতে প্রাথমিক আশ্বাসও পেয়ে গিয়েছে কুশল, এই পদে তাকেই নিয়োগ করা হবে। একটা চরম ইণ্টারভিউ আর কাজে জয়েন করার সঠিক তারিখটা জানিয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ, বাকি আছে শুধু এইটুকু। এইটুকু পূর্ণ হলেই মহারাজপুরের পুরাতত্ত্বের সার্ভে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হবে কুশল। মাইনে সাড়ে সাতশো থেকে আরম্ভ। ক্ষমতা অনেক; এক'শো কুলি, আর বিশজনের উপর সার্ভেয়ার ওভারসিয়ার কেরানি পিয়ন ও দারোয়ান তারই হুকুমে ওঠা বসা করবে।

সার্ভে অফিস ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে যায় কুশল। এ জায়গটা শহরের উপকণ্ঠ। শিলোড়া ঘাটকে আরও কাছাকাছি দেখা যায়। যাত্রিবাহী একটা মোটর বাস চলে যাচ্ছে শিলোড়া ঘাটের চড়াই ধরে রাঁচির দিকে। ঘাটের গা ঘেঁষে সমতল মাঠের মত একটা জায়গায় সারিবদ্ধ স্তম্ভের মত বড় বড় শিলাখণ্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট বৃত্তের আকারে। দিনের বেলায় সেখানে গরু চরে, রাত্রে ভূতের ভয়ে কেউ যায় না। শিলোড়া ঘাটের ঢালু এখান থেকেই আরও নিম্নমুখী হয়ে একটা আমলকির জঙ্গলকে যেন একেবারে গড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে দামোদরের খাত পর্যন্ত। এই আমলকির জঙ্গলটাই আজ পঞ্চাশ বছর হলো হরভবন আখ্যা পেয়েছে। কে এই নাম দিল তা কেউ জানে না। জেলা গেজেটিয়ারে শুধু এর উল্লেখ আছে। আর, আমলকি বনে শুধু স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় একটি প্রাচীন হর্ম্যের ধ্বংসস্তূপ। জার্মান ইণ্ডোলজিস্ট বলেছেন—ওটা প্রাচীন ভারতের একটা নাট্যশালা। দু'বার সার্ভে ক'রে আর তিনবার খনন কার্য চালিয়ে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ আর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যে আমলকির জঙ্গলে সমাধিস্থ হয়ে আছে এক প্রাচীন নগরের অস্থি আর কঙ্কাল।

যুদ্ধের আগে হরভবনের স্তূপ খননের কাজ চালাবার আর মিউজিয়াম রাখবার জন্য খরচের টাকাটা দিতেন গ্রেট মগধ সোসাইটি, এবং সোসাইটিকে টাকা দিতেন লালা দয়ারাম। লালা দয়ারাম দয়া করলে চলতো সোসাইটির কাজ; সোসাইটি দয়া করলে চলতো সার্ভে অফিসের কাজ, সরকারি নিয়ন্ত্রণে। কাজ হয়েছেও কিছু। হরভবনের পুরাতত্ত্বের উপর মাঝে মাঝে কয়েক শত শাবল আর গাঁইতার ঠোকাঠুকি চলেছে। তাম্রলেখ, শিলাশাসন, ভাঙা ভাঙা মূর্তির হাত-পা ধড় আর মাথা, পুঁতির মালা, পোড়া মাটির পাত্র, পাথরের ছোট ছোট বেদী, স্তম্ভের ভগ্নাংশ—হরভবনের জংলি স্তূপ থেকে উদ্ধারিত হয়ে মিউজিয়ামের ভিতরে একটা শখের আবর্জনার স্তূপের মত জমা হয়ে আছে।

যুদ্ধের সময় টাকা দিতে পারেননি লালা দয়ারাম, কারণ যুদ্ধফণ্ডে সাহায্য করতে অনেক টাকা বের হ'য়ে যেত। এখন যুদ্ধ-টুদ্ধ নেই, দেশও স্বাধীন হয়েছে, তবু গ্রেট মগধ সোসাইটি প্রায় অচল হয়ে উঠেছে, কারণ লালা দয়ারাম আর দয়া করেন না। ইনকম ট্যাক্সের হিসাব নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর মন কষাকষি খুবই জোরে চলছে। হাত গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি, গ্রেট মগধের কৃষ্টি উদ্ধার করার জন্য বৃথা আর দান করতে তিনি নারাজ।

সম্প্রতি শোনা গিয়েছে, সার্ভে অফিস আবার খুলবে। টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন সরকার। নতুন বাজেটে কালচার উন্নয়নের খাতে কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা

হয়েছে। সেই জন্যই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাওয়া হয়েছে। ঐ পদের প্রার্থী কুশলের দরখাস্তও প্রায় এক রকমের মঞ্জুর হয়েই আছে।

শিলোড়া ঘাটের শিলাবৃত্তে হয়তো প্রস্তরযুগের মানুষের সুখদুঃখের নিঃশ্বাস আজও অশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হরভবনের জঙ্গলে কাঁকর বালু আর নুড়ির নীচে ভারতের কোন্ বৈভবের কোন্ মূর্তি আত্মগোপন ক'রে আছে কে জানে? তাই এখানে দাঁড়িয়ে মহারাজপুরের অতীতকে আর অস্বীকার করা যায় না, বরং বিস্ময় রূপে তাকে অনুভব করা যায়।

এই বিস্ময় কুশলও যদি অনুভব করতে পারতো, তবে কিছুক্ষণের জন্য হরভবনের ধ্বংসীভূত গরিমার দিকে তাকিয়ে থাকতো নিশ্চয়। কিন্তু সে হলো এক নতুন অভিরুচির মানুষ, সেণ্ট ডেনিসে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অনুভবের পরীক্ষা সে দেয়নি। সে পড়েছে পাশ করার জন্য, পাশ করেছে বড় চাকরি করার জন্য। বড় চাকরি করবে সকলের মাঝখানে অসাধারণ হয়ে যাবার জন্য। অসাধারণ হ'তে হবে নবলার মত মেয়েকে জীবনে সঙ্গিনীরূপে লাভ করার জন্য। নবলাকে চাই জীবনে সুখী হবার জন্য। জীবনে এই সোজাপথ বেছে নিয়েছে কুশল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে একটু ব্যস্ত হয়ে পথ চলতে থাকে কুশল। দেরি হয়ে গিয়েছে; ভয় হয় এই বিলম্ব হয়তো তার সুখস্বপ্নের সেই শরীরিণীকে একটু বিষণ্ণ ক'রে রেখেছে। চলতে চলতে নিউ মহারাজপুরের সীমা পার হয়ে গোঁসাই-পাড়ার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছয় কুশল।

কয়েকটা শিরীষ আর বকুলের আড়ালে ময়লা চেহারার একটা পুরনো বাড়ি, টালির চালে শেওলা জমেছে, বাড়ির সামনে কুয়ো, কুয়োর চারদিকে জল আর কাদা। এই বাড়িটা আজ এক বছর হলো কুশলের কাছে খুবই পরিচিত। নবলাদের বাড়ি।

এই বাড়ির ফটক নেই, তাই ফটকের গায়ে গাল-ভরা কোন নামের গৌরব চিহ্নিত নেই। কিন্তু কুশল জানে, আনন্দ সদনে আর এই বাড়িতে অনেক পার্থক্য। বাইরে থেকে দেখে কিছুই যদিও বোঝা যায় না, কিন্তু মাত্র বছরখানেক আগে এই বাড়ির ভিতরে প্রথম ঢুকে এক দিনেই কুশল বুঝতে পেরেছিল যে, এই বাড়িতেই আনন্দ আছে, সুখী হবার চেষ্টা আছে, সুখী হতে এরা জানে। যেমন নবলার বাবা মৃগেন বাবু তেমনি নবলার মা নন্দা দেবী! এই বাড়ির মানুষগুলির মুখে আর মনে সত্যিকারের জীবনের ছাপ দেখতে পায় কুশল। অথচ মৃগেনবাবু ধনী মানুষ নন,

পার্ক রোডের রত্না ব্যাঙ্কে সেক্রেটারির কাজ করেন। কতই বা মাইনে? দু'শোর বেশি নয়। তবু এই বাড়িতে ঝি একজন, ঠাকুর একজন, আর চাকর দু'জন। ঘরভরা আসবাব, বারান্দার দেয়ালে দু'টো আয়না আর একটি ঘড়ি। বারান্দার মেজের সমস্তটাই কার্পেটে ঢাকা, একদিকে একটা পিয়ানো। একটা চাকরকে তো সারাদিন ঘর থেকে বাজার আর বাজার থেকে ঘর দৌড়তেই কেটে যায়। জিনিষ পত্র কেনা হচ্ছেই, নগদে অথবা ধারে! ধারের পরিমাণই বেশি, ধার করার সাহস আছে মৃগেন বাবুর। পাওনাদারেরা অনেকে মাঝে মাঝে টাকা আদায়ের জন্য আদালতে নালিশ করে। এসব মামলাকেও উপেক্ষা করার মত শক্তি আছে মৃগেন বাবুর। বয়সও কম হয়নি মৃগেনবাবুর, প্রৌঢ়ত্বের সীমা প্রায় পার ক'রে এনেছেন। তবু তাঁর উৎসাহ আর মনের জোর একটুও স্তিমিত হয়নি। মনের মত কারবার ধরবার নানারকম পরিকল্পনা তাঁর আছে। রাত জেগে এখনও এক একটা কারবারের মেমোরেণ্ডাম লেখেন, প্রসপেক্টাস আর শেয়ারের ফর্ম ছাপিয়ে আলমারি ভর্তি করেন। কিছু কিছু শেয়ার বিক্রিও হয় বোধহয়, কিন্তু ঠিক কাজের মত ক্যাপিটাল ওঠে না। কারবার আর চালু হয় না।

নাই বা হলো, আর একটা কারবারের পরিকল্পনা করেন মৃগেন বাবু। তেমনি রাত জেগে মেমোরেণ্ডাম লেখেন; কাগজে কলমে যতটা উদ্যোগ করার প্রয়োজন, সবই করেন। কিন্তু ক্যাপিটালের অভাবে কিছুই হয় না। জীবনে সুখী হবার জন্য এই বার বার ব্যর্থ সংগ্রামেও তিনি হতাশ হয়ে বা অপ্রতিভ হয়ে পড়েননি। বিশ্বাস তাঁর আছে, সংকল্প তাঁর আছে, একদিন না একদিন তিনি সফল হবেন। তাই সকল আগ্রহ নিয়ে তিনি এই পরিণত বয়সেও এক পরম ক্যাপিটালের সন্ধানে নিজেকে সর্বদা অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছেন।

নবলার মা নন্দা দেবীও স্বামীর আদর্শে বাধা দেন না। বাধা দেওয়া দূরে থাক, তিনি এদিক দিয়ে আদর্শ সহধর্মিণী। তাঁকে পায়ে হেঁটে বেড়াতে খুব কমই দেখা গিয়েছে। পার্কে যেতে হলে রিক্সা, আর তার চেয়ে একটু দূরে মার্কেটে যেতে হলে ট্যাক্সি। বিস্ময়কর মৃগেন বাবুরও ব্যক্তিত্ব। মৃগেন বাবুর একটি সহাস্য অনুরোধের যাদুতে রিক্সাওয়ালা আর ট্যাক্সিওয়ালা তাদের পাওনা নগদ আদায় না ক'রেই চলে যায়, আসছে মাসে শোধ পাবার আশায়। গোঁসাইপাড়া থেকে এক স্যাকরা আসে রোজই, ঠাকুর চাকরের মতই নিয়মিত। স্যাকরার কাছে নন্দা দেবীর একটা না একটা কাজ আছেই আছে। প্রায় প্রতি মাসেই পুরনো গহনা ভেঙ্গে ডিজাইন পাল্টাতে হয়। নতুন ডিজাইন ক'মাসের মধ্যে পুরনো মনে হয়, তখন ভাঙ্গতে হয়

আবার। তা ছাড়া আরও খুচরো কাজ কত কি থাকে! হয় গলার হারটাকে নতুন ক'রে পালিশ দিতে হয়, নয় আংটির পাথর বদলাতে হয়। এইভাবেই, অভাব সত্ত্বেও জীবনকে কুণ্ঠিত ক'রে রাখতে পারেননি, না মৃগেন বাবু না নন্দা দেবী! বড় বড় শখ দিয়ে জীবনকে মনের মত ক'রে সাজিয়ে উপভোগ করার মত আকাঙ্ক্ষা এই বাড়িতে জীবন্ত হয়ে আছে—খাওয়া-দাওয়ায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, ঘরভরা আসবাবের প্রাচুর্যে, আর মানুষগুলির হাসি ও মুখরতায়। কারণ নিজের উপর মমতা আছে এঁদের। আরও বড় সুখের জন্য আরও এগিয়ে যাবার আশা রাখেন।

মৃগেন বাবু ও নন্দা দেবী—নিজেদের উপর মমতা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন প্রাণীর উপর মমতা বোধ করার সুযোগ তাঁরা পাননি, সময়ও হয় না। নিজের অসুখ হলে মৃগেনবাবু দু'একটা আক্ষেপ ক'রে থাকেন। মেয়ে নবলার অসুখ হলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, আর স্ত্রী নন্দার সামান্য অসুখ হলে রাত্রে ঘুমোতেই পারেন না। নিজেই থার্মোমিটার আর পাখা হাতে নিয়ে রোগকাতর স্ত্রী ও মেয়ের মাথার কাছে রাত জেগে বসে থাকেন মৃগেনবাবু।

নন্দাদেবী কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মুখভার করেন। দৈনিক মাত্র দশটা টাকা দিলে চব্বিশ ঘণ্টার নার্স পাওয়া যায়। নিজের স্ত্রী ও মেয়ের প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই সামান্য টাকা খরচ করবার সামর্থ্য নেই যে মানুষের, সে মানুষ কেমন বাপ আর কেমন স্বামী?

আবার সত্যিই একদিন উৎসব জাগে এই বাড়ির কার্পেটঢাকা বারান্দায়। শিরীষের নতুন পাতার বাতাসে নয়, যেদিন অসুখ থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠে পিয়ানোতে হাত দেয় নবলা, অথবা বাইরে বেড়াতে বের হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নন্দাদেবী। মৃগেনবাবুর মুখে গল্পের ফোয়ারা ছোটে, নন্দা দেবী আবার স্যাকরার সঙ্গে কথা বলেন। সিটির সবচেয়ে ভাল বস্ত্রালয় থেকে নতুন শাড়ির প্রায় একটা বোঝা আর সিনেমার টিকেট নিয়ে আসে চাকর বনমালী। সন্ধ্যা হলেই ট্যাক্সি ডাকা হয়, বাপ-মা-মেয়ে ছবি দেখতে চলে যায়।

আজও একটা উৎসব গোছের ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে। বি-এ পাশ করেছে নবলা, খবর এসেছে। এই সুখবর আর সুদিনটাকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য একটা অনুষ্ঠানের কল্পনাও করা হয়েছে। এ বাড়ির বাপ-মা-মেয়ে, আর কুশল, সবাই মিলে মোতিয়া নদীর ঝরনার কাছে গিয়ে চা খাবে। সকাল নটার সময়েই রওনা হবার কথা ছিল, ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ন'টাও বেজে গেল, দশটাও বাজে, কুশল এখনও এল না। অথচ নবলা কাল সন্ধ্যাতেই বলে দিয়েছিল কুশলকে—সকাল নটার মধ্যেই এস, একটা সুখবর আসবার কথা আছে।

মৃগেন বাবু আর নন্দা দেবী একটু চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন, নবলা বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

শিরীষ গাছের ছায়া পার হয়ে কুশল এসে বারান্দায় উঠতেই আবার বাপ-মা-মেয়ের মুখে একটা সহাস্য কলরব জেগে ওঠে। আর দেরি করার কোন দরকার নেই। খাবার ভরা তিনটে টিফিন কেরিয়ার আর চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে সবাই ট্যাক্সিতে উঠে বসে। ভাদ্রের বাতাস চমকে দিয়ে ট্যাক্সির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়। দেখে মনে হয়, মোতিয়া নদীর ঝরনার দিকে নয়, পৃথিবীর সকল দুঃখের অস্তিত্বকে মিথ্যা ক'রে দিয়ে চারটি মানুষের প্রাণ এক অবিরল সুখের ঝরনার সন্ধানে চলে গেল।

মোতিয়া নদীর ছোট জলধারা একটা কালো রঙের বিশ হাত উঁচু পাষাণস্তবকের উপর দিয়ে গড়িয়ে এইখানে ঝরে পড়ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঝরনার ভিতরে যেন একটা কালো হাতি লুকিয়ে স্নান করছে। জলপ্রপাতের শেষ যেখানে, সেখানে বড় দহের মত হয়ে গিয়েছে, জলের ধারা সশব্দে আছাড় খেয়ে যেন ক্ষণিকের বেদনায় পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা হয়ে ফুটে উঠছে। তার পরেই আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে সলজ্জ আনন্দের কল্লোলে রঙীন নুড়ির উপর দিয়ে আবার সঞ্চারিত হয়ে, কাশবনের ভিতরে লুকিয়ে পড়ছে।

জল-প্রপাতের কাছাকাছি আর একটা বেদীর মত মসৃণ পাথরের উপর বসে থাকেন মৃগেনবাবু আর নন্দা দেবী। নন্দা দেবী তৈরি করেন চা, আর নানা রকম গল্প তৈরি করেন মৃগেন বাবু। মাঝে মাঝে দু'জনের সম্মিলিত হাস্যনাদে কাশবনের ভিতর থেকে তিতিরের ঝাঁক ভয় পেয়ে উড়ে পালিয়ে যেতে থাকে!

নবলা আর কুশল বসে আছে আর একটু দূরে, একটা পিয়ালের ছায়ার নীচে। নবলার মনের ভিতরে যে উৎসব জেগেছে তারই মাধুরী ওর সুন্দর মুখের উপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এই সেই মেয়ে, কুশল যাকে ভালবাসে। একবছর ধরে যে মেয়ে কুশলের ঘুমে আর জাগরণে স্বপ্ন হয়ে আছে।

সম্মুখে মোতিয়া নদীর ঝরনা, দূরে ঘন কাশবন, শ্বেতমেঘের কয়েকটা স্তবক যেন আকাশ থেকে মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে। ছায়াময় পিয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে কুশলের সঙ্গে মনের কথা মন খুলে বলতে পারে নবলা। ভালবাসার সাথীকে মনের কথা বলবার মত জায়গা এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে?

ফিকে বেগুনি রঙের ভয়েলের শাড়ি থেকে চোর-কাঁটা তুলতে তুলতে নবলা বলে —একটা সুখবর তো এসেই গেল, আর একটার কতদূর?

কুশল—আমার কাজে জয়েন করার তারিখটা ?

নবলা—হ্যাঁ।

কুশল—বোধ হয় আর বেশি দেরি নেই। যাই হোক, একটা রিমাইণ্ডার দেব ভাবছি।

নবলা—সার্ভে অফিসের বাংলোটা দেখতে বেশ ভালই।

কুশল হেসে আপত্তি জানায়—সরকারি বাংলো ভাল হলে আমার কি ? আমার রুচিমত যতদিন আমার নিজের বাড়ি না হচ্ছে ততদিন কিছুই ভাল লাগছে না।

নবলা একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠে—সত্যিই, তোমাদের নতুন বাড়িটার তৈরি আরম্ভ হতে এত দেরি হচ্ছে কেন বলতো ?

কুশল আশ্বাস দেয়—প্ল্যান হয়ে গেছে।

নবলা—তাহ'লে এবার আরম্ভ হয়ে যাবে কি বল ?

কুশল—হ্যাঁ, আমার তো তাই ইচ্ছে।

নবলা—এর মধ্যে অনিচ্ছা আবার কারও আছে নাকি ?

কুশল —আছে।

নবলা—কার ?

কুশল—বাবার।

হাসতে গিয়েও হঠাৎ থেমে যায় নবলা। তারপর একটু অনুযোগের স্বরেই বলে—তুমিও যেন কি রকম ! আজ পর্যন্ত কথাটা নিজের বাপ-মার কাছে মুখ খুলে বলতে পারলে না।

কুশল বিব্রত হয়—কি বলতে পারলাম না ?

নবলা—বলতে পারলে না যে, তোমার জীবন গীতার জীবন নয় ? তোমার জীবনে সবই এখনো বাকি পড়ে আছে। তোমাকে যে বিলাত যেতে হবে, দশ জনের মধ্যে নগণ্য হয়ে তুমি থাকতে পার না, একথা মন খুলে বলে দিতে দোষ কি ?

কুশল কথা দেয়—এবার বলতেই হবে, চুপ ক'রে থেকে লাভ নেই।

নবলা—আসল কথাটা বলেছ ?

কুশল—কোন্ কথা ?

নবলা—আমাদের বিয়ের কথা।

কুশল—না।

নবলা—আর দেরি করো না, আজই বলে দিও।

কুশল—কেন বল তো ?

নবলা—আমি বলছি, বলে দিও, তাতেই কাজ হবে।

কুশল—তোমার এ বিশ্বাস কেমন করে হলো ?

নবলা—হ্যাঁ, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমাকে বিয়ে করছো জানলে তোমার বাবা চুপ করে থাকবেন না, নতুন বাড়িটা তুলতে কোন দ্বিধাও তাঁর হবে না। আমার মন বলছে, তিনি রাজি হবেন।

নবলার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবতে থাকে কুশল, কোন উত্তর খুঁজে পায় না। রূপে আর গুণে ঐ অসাধারণী যার পুত্রবধূ হবে, সামর্থ্য থাকতে তিনি একটা নতুন বাড়ি উপহার দিতে কার্পণ্য করবেন, বাবাকে এতটা অমানুষ না ভাবতে পারলেই ভাল লাগতো কুশলের। কিন্তু নবলার মত এত বড় একটা বিশ্বাস পোষণ করার যুক্তি খুঁজে পায় না কুশল। মৃগেনবাবু আর নন্দা দেবীর মত বাপ-মা সবারই হয় না। সন্তানের জন্য এতটা মমতা সমাদর আর স্নেহের উদ্বেগ মহারাজপুরের কোন বাপ-মা'র আছে কি না বলা যায় না। তবে আনন্দ সদনের বাপ-মা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই বলা যায়—নেই! মৃগেন বাবু আর নন্দা দেবী মেয়েকে সুখী করার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছেন। গত মাসেই নবলার একটা শখের দাবি পূর্ণ করতে তের'শো টাকা দিয়ে নতুন পিয়ানোটা কিনে ফেলেছেন, পুরনো একটা পিয়ানো থাকা সত্ত্বেও। ধার করেই কিনেছেন। তাই নবলার পক্ষে যা বিশ্বাস করা সহজ, কুশলের পক্ষে তা বিশ্বাস করা একটুও সহজ নয়। যাঁরা সকাল সন্ধ্যা গীতা পাঠ ক'রে সংসার থেকে সকল মায়া প্রত্যাহারের অদ্ভুত এক ব্রত চর্চা করছেন, তাঁরা যে এঁদেরই ঠিক বিপরীত।

কুশলকে নিরুত্তর দেখে নবলা প্রশ্ন করে—কি ভাবছো ? আমার কথাটা অবিশ্বাস করছো বোধ হয় ?

কুশল অপ্রস্তুত হয়ে বলে—না, বিশ্বাসই করছি। আজই সব কথা বলবো, তোমার নাম করেই বলবো।

মাত্র আজ সকালে নবলার বি-এ পাশ করার খবর এসেছে, এই সেণ্ট ডেনিসেই চার বছর শিক্ষা সাধনার পর। কিন্তু তার নামেরই যে এরকম একটা সর্ববিজয়িনী শক্তি আছে, কোথা থেকে এত বড় বিশ্বাস শিক্ষা করলো নবলা ? নবলা কি মনে করে, তাকে প্রসন্ন করার জন্য এই পৃথিবীর সকল প্রাণী ব্যস্ত হয়ে রয়েছে ? তার ঐ সুন্দর চেহারার উপাসনা করছে জগতের সকল চক্ষু ? পিয়ালের ছায়া, কাশবন

আর মোতিয়া নদীর ঝরনা কি আজ ধন্য হয়ে গিয়েছে, নবলা এসেছে বলে ? নবলা কি মনে করে তা সে-ই জানে ! কিন্তু যদি কেউ একথা বলে তবে খুব সহজে সেকথা বিশ্বাস করবে নবলা, কোন প্রতিবাদ করবে না, বরং আরও বেশি ক'রে শুনতে চাইবে। তাই ভাল লাগে, কুশল যখন এই ধরনের কথাগুলি বলে। কুশলের চোখের মত পৃথিবীটাও নবলার মুখের দিকে অপলক ভাবে আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে, একথা বিশ্বাস করতে ভালই লাগে নবলার।

নন্দা দেবী ডাক দিলেন—এস তোমরা, চা হয়ে গেছে।

নবলা আর কুশল উঠে দাঁড়ায়। মনের কথা বলার পালা এবার ক্ষান্ত করতে হবে। একটু মৃদুস্বরে নবলা বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

কুশল—বল।

নবলার গ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে সুছাঁদ খোঁপাটাও কেঁপে ওঠে, ভুরু দুটো আরও কমনীয় হয়, চোখের পাতায় মিষ্টি হাসির ছায়া গভীর হয়ে ওঠে।—বিয়ের পর তুমি আমাকে কি উপহার দেবে বল।

কুশল—কি চাও বল ?

নবলা—আমি বলবো না, তুমি বল।

কুশল—হয় তোমাকে নিজেই সঙ্গে ক'রে বিলেত নিয়ে যাব, নয় তোমাকেই বিলেতে বেড়িয়ে আসতে পাঠাবো। আমার সার্ভিসের প্রথম বছরের সব মাইনে তোমার।

দুজনেই হঠাৎ বড় জোরে শব্দ ক'রে হেসে ফেলে। মৃগেন বাবু আর নন্দা দেবী মুখ ফিরিয়ে তাকান। নন্দা দেবী আর একবার ডাকেন—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

চায়ের আসরে যাবার আগে কুশল তার প্রশ্নটিও ক'রে ফেলে।—বিয়ের পর তুমি আমাকে কি উপহার দেবে বল ?

নবলা—একদিন শুধু তুমি আর আমি এই মোতিয়া নদীর ঝরনার কাছে বেড়াতে আসবো, আর কেউ নয়। তার পর এই পিয়ালের ছায়াতেই আমি তোমার······।

কুশলের একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে, নিঃশ্বাস ছড়িয়ে, দুটি নরম ও রঙীন ঠোঁটে শিহর জাগিয়ে উপহারের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দেয় নবলা। ক্ষণিকের মত মুগ্ধ আর আত্মহারা হয়ে নবলার একটা হাত নিবিড় আগ্রহে চেপে ধরে কুশল। এক বছরের স্বপ্ন সত্যিই স্বপ্নমাত্র নয়, একেবারে বাস্তব সজীব ও রূপময়, তার হাত ধরা যায়।

কিন্তু আর দেরি করা যায় না। মনের কথার আসর ছেড়ে চায়ের আসরে এসে বসলো কুশল আর নবলা।

আনন্দ সদনের ফটক পার হয়ে আবার যখন নিজের ঘরে ঢুকলো কুশল, তখন বেলা দুটোরও বেশি, আকাশে মেঘ ছড়িয়েছে। কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠ দম্পতি তখন বাসার ভিতর ঢুকে শুধু মুখ বাড়িয়ে ঝড়ের সংকেত বুঝবার চেষ্টা করছে।

রূপকথায় বলে, মনের মত আকাশ খুঁজছে নীলকণ্ঠ। যতদিন না সে আকাশ পাওয়া যায়, ততদিন এই নীলকণ্ঠই মাছরাঙার মত যত ডোবা আর ঝিলের কাছে কাছে উড়ে বেড়ায়, আর ফিরে এসে অলসভাবে প'ড়ে থাকে তার খড়কুটোর নীড়ে। যে দিন মহাপুণ্যের লগ্নে আকাশ জাগে, সেদিন তার কণ্ঠে জাগে নীল, মাছরাঙা-জীবন ঘুচে যায়। পাখা মেলে দিয়ে অবাধ আনন্দে নীলকণ্ঠ উড়ে যায় আকাশলোকের উর্ধ্বস্তরে। শৈশবের শোনা সেই রূপকথা আজ একেবারে ভুলে গিয়েছে কুশল, কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠের দিকে তাকিয়ে দেখবার মত কিছু নেই।

কুশলের মনের মধ্যে এখন কোন ঝড়ও নেই, সব সংশয় শান্ত হয়ে গিয়েছে। পিয়ালের ছায়াতল থেকে প্রাণভরা আশার ভাষা শুনে ফিরে এসেছে। আজ আর কোন দ্বিধা না রেখে স্পষ্ট ক'রে আসল কথা শুনিয়ে দিয়ে আনন্দ-সদনের বধিরতা ভাঙতে হবে। এই সংকল্প নিয়ে বাড়িতে ঢোকে কুশল।

স্নান সেরে নিয়ে নিজের ঘরে অপেক্ষা করে কুশল, মা হয়তো খেতে ডাকবেন, নয়তো খাবার দিয়ে যাবেন। কিন্তু সেরকম কোন সাড়ার চিহ্ন দেখা গেল না। ঘর থেকে বের হয়ে ভিতর বারান্দায় এসে কুশল দেখতে পায়, মা বসে আছেন মেজের উপর আসন পেতে, চশমা চোখে দিয়ে কি একটা বই পড়ছেন। আর বাবা পায়চারি করছেন।

কুশল ডাকে—চল, খেতে দেবে।

মিত্রা দেবী বই বন্ধ ক'রে নির্বিকারভাবে তাকান—একটু দেরি হবে।

কুশল—কেন ?

মিত্রাদেবী—রান্না চড়াতে হবে।

বিস্মিত হয় কুশল—তার মানে ?

মিত্রাদেবী—কখন্ ফিরবি তা তো বলে যা'নি।

মিত্রাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কুশল, বোধ হয় ঘৃণা চাপতে গিয়ে। কি অদ্ভুত আইন দিয়ে বাঁধা আর কত ক্ষুদ্র ক'রে মাপা এদের হৃদয়বৃত্তি! সেই সকাল বেলায় মা'র প্রশ্নের উত্তর দেয়নি বলে মা এইভাবে তার প্রতিশোধ নিলেন। আর বাবাও নির্বিকারভাবে যেন এই প্রতিশোধ সমর্থন করছেন।

কুশল বলে—না, রান্না চড়াতে হবে না।

কুশলের দৃষ্টিতে রূঢ়তা ছিল, আর কথার সুরে তিক্ততা। মিত্রাদেবী উত্তর দিলেন না। বিজয়বাবু হঠাৎ পায়চারি বন্ধ ক'রে কুশলের দিকে তাকালেন, যেন কিছু বলবার জন্য।

কুশলের কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভীরু হয়ে পড়ে—যা ইচ্ছা তাই কর, আমি কিছু বলতে চাই না।

মিত্রাদবী রান্না চড়াতে চলে যান, বিজয়বাবু আবার পায়চারি আরম্ভ করেন, কুশল গিয়ে তার নিজের ঘরে ঢোকে। কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠ আর একবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়, ঝড়টা এসেও এল না।

বিকাল পর্যন্ত কোন ঝড়ের চিহ্ন দেখা গেল না। খাওয়া দাওয়া সারা ক'রে বেশ শান্ত নীরবতার মধ্যেই অপরাহ্ণ বেলাটা নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে পার ক'রে দিল কুশল। দৃশ্যান্তর দেখা গেল সন্ধ্যাবেলায়।

বারান্দার উপর একটা বেতের চেয়ারে বসেছিলেন বিজয়বাবু। বারান্দার কোণে একটা পিতলের আধারে ধূপ পুড়ছিল। বিজয়বাবুর সম্মুখে স্থির হয়ে একটা বেতের মোড়ার উপর ব'সে কথা বলে কুশল। যতদূর সম্ভব অকপটভাবে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করে। বলতে দ্বিধা করে না কুশল, জীবনকে সে ক্ষুদ্র করে রাখতে চায় না, দশজনের মত নগণ্য হয়ে থাকতে পারবে না। তাকে বিলাত যেতে হবে, বিলাতি ডিগ্রি পেতে হবে। তার আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, জীবনে সে সুখী হতে চায়, সম্মান চায়। বিজয়বাবুর গাম্ভীর্যের সামনে কোনদিন মুখ খুলে যেকথা বলতে পারেনি কুশল, আজ অনায়াসে তা'ও বলতে পারে। মৃগেনবাবু ও নন্দা দেবীর মত সুরুচিসম্পন্ন মানুষের কথা, তার একবছরের দেখা স্বপ্ন, সুশিক্ষিতা নবলার কথা, সবই আজ অসংকোচে বলতে পারে কুশল। কথা শেষ করে কুশল—আমি তাকে কথা দিয়েছি, সেও আমাকে কথা দিয়েছে। এখন বিয়ের দিনটা সুস্থির ক'রে ফেলাই উচিত বলে আমি মনে করি।

ধীরভাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে সব কথা শুনলেন বিজয়বাবু। তারপর বললেন—ভাল কথা।

একটু ভেবে নিয়ে বিজয়বাবু আর একবার বলেন—তুমি যখন ভাল বুঝেছো, তখন তোমার পক্ষে ভালই হবে।

কুশল—আর একটা কথা ছিল।

বিজয়বাবু—বল।

কুশল—যে নতুন বাড়ির প্ল্যান হয়ে পড়ে আছে সেটার কাজ এবার আরম্ভ ক'রে দিলেই ভাল হয়।

বিজয়বাবু বিস্মিতভাবে কুশলের মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করেন। তারপর তেমনি সুগম্ভীর কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করেন—কেন?

কুশল—আমাদের প্রেস্টিজের জন্য, যাকে বাড়িতে আনছি তার প্রেস্টিজের জন্য।

বিজয়বাবু খুবই শান্ত অথচ সুস্পষ্ট স্বরে সংক্ষেপে শুধু বলেন—আগে বিয়ে হোক, তারপর।

আর কিছু বলে না কুশল। বিজয়বাবুর কথাগুলি নির্বোধের আঘাতের মত। এত বড় বর্ণনার সব আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেল। আগে বিয়ে, তারপর বাড়ি। আনন্দ-সদনের হৃদয়বৃত্তির এত বড় জঘন্য কৃপণতার সর্ত নিয়ে কেমন ক'রে নবলার কাছে মুখ দেখাবে কুশল?

ঝড়ের সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যখন কথা বললেন মিত্রাদেবী।—বাড়ি হতে পারে কিন্তু বিয়ে হতে পারে না।

কুশল—কেন, কি অপরাধ দেখলে?

মিত্রাদেবী—নন্দার মেয়ের সঙ্গে তুই মিশতে গেলি কেন?

কুশল—মেশবার যোগ্য ব'লে।

মিত্রাদেবী—তবে কেন স্বরূপার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করলি?

প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে কুশল—স্বরূপা? স্বরূপার কথা এর মধ্যে আসে কি ক'রে?

মিত্রাদেবীর গলার স্বরেও উত্তেজনা দেখা দেয়—এর মধ্যে নয়, পরেও নয়, সবার আগেই স্বরূপার কথা।

কুশল—মিথ্যা কথা।

মিত্রাদেবী—আজ দশ বছর ধরে স্বরূপা এ বাড়িতে আসা যাওয়া করছে, তাকে তুমি চেন না?

কুশল—চিনি, সাবানওয়ালার মেয়ে।

মিত্রাদেবীর গলার স্বর কাঁপতে থাকে—কেন যে আসে তা তুমি জান না?

কুশল—জানি, তোমাদের কাছে টাকা ধার চাইতে।

মিত্রা দেবী—ধার শোধ দিতেও। কিন্তু বাড়ি আর গাড়ি ভিক্ষে করতে নয়।

বিজয়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। শান্ত স্বরে হাত তুলে ইঙ্গিত করেন—থাম। এতটা মাত্রা ছাড়িয়ে উত্তেজিত হতে আর এরকম শাণিত ভাষায় প্রত্যাঘাত দিয়ে মিত্রা দেবীকে কথা বলতে কখনও তিনি দেখেননি, শোনেনওনি। মনে হয়, মিত্রাদেবীরও যেন একটা স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, তারই বেদনায় তাঁর এতদিনের সুকঠিন ও শান্ত ধীরতার বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে। বিজয়বাবুর কথায় থামতে চেষ্টা করেও থামতে পারছিলেন না মিত্রাদেবী। কিন্তু হঠাৎ থামতে হলো। শুধু মিত্রাদেবী নয়, বারান্দার শেষপ্রান্তের আলোকের কাছে এক তরুণীমূর্তির দিকে তাকিয়ে আনন্দ সদনের বাপ-মা-ছেলে তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

স্বরূপা এসেছে, রোজ যেমন আসে তেমনি। কুশল বারান্দা থেকে নেমে আঙিনার আধো-অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাগানের ঘন অন্ধকারের দিকে চলে যায়। তারপর ঘুরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে কপাট লাগিয়ে দেয়।

মিত্রাদেবী ডাকেন—স্বরূপা, এদিকে এস।

স্বরূপাকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠে দোতলার একটা ঘরে গিয়ে ঢোকেন মিত্রা দেবী। আর, ধূপের হালকা ধোঁয়ার মধ্যে বারান্দার উপর নিঃশব্দে পায়চারি আরম্ভ করেন বিজয়বাবু। মনের ভিতর বড় অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। ঝড়টা যদিও থামলো কিন্তু তার আঘাতটা বোধ হয় থামলো না। স্বরূপার কথাই বার বার মনে পড়ছিল তাঁর।

কথাটা সত্য; স্বরূপা হলো সাবানওয়ালার মেয়ে। আজ দশ বছর ধরে এই বাড়িতে আসা যাওয়া করে, একথাও সত্য! টাকা ধার নিতে আর শোধ দিতে আসে স্বরূপা, সবই সত্য।

আনন্দ-সদনের ফটক থেকে পর পর তিনটে ল্যাম্প-পোস্ট পার হয়ে গিয়ে ডান দিকে যে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে, তারই দু'পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট জীর্ণ মূর্তির বাড়ি। প্রায় সবই খাপরার চালা। মাটির দেয়ালের বাড়িও মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই অঞ্চলের নাম ফুলবাড়ি। নিউ মহারাজপুরে যতগুলি কষ্টের সংসার আছে, তার প্রায় সবই বোধহয় একসঙ্গে গিয়ে মেলা জমিয়েছে এই ফুলবাড়ি অঞ্চলে।

রাস্তার প্রথম বাড়িটার দেয়াল ঘেঁষে একটা রক্তকরবী আছে। তা ছাড়া সারা

ফুলবাড়ি অঞ্চলে আর কোন ফুল-ফোটানো গাছ বা লতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই প্রথম বাড়িটারই মানুষ হলেন রাধেশবাবু, যিনি সাবানের কারবার করেন।

গায়ের রক্ত জল ক'রে খাটবার বিজ্ঞান ও পদ্ধতি শিখতে পারা যায় রাধেশবাবুকে দেখে। যেন শুধু দিবারাত্রি খাটুনির জন্যই এই পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব। নিজের হাতেই সাবান তৈরি করেন, সপ্তাহের ছ'টা দিন। সপ্তাহে একটি দিন শুধু বের হন রিক্সার উপর তিনটে প্যাকিং বাক্সে সাবান ভর্তি ক'রে নিয়ে। মহারাজপুরের মার্কেট আর সিটির দোকানে দোকানে ঘুরে ধারে-নগদে সাবান বেচে ঘরে ফিরে আসেন।

ভোর হবার অনেক আগেই প্রায় রাত থাকতে ঘুম ছেড়ে ওঠেন রাধেশবাবু, প্রদীপ জ্বালিয়ে গোয়াল ঘরে ঢোকেন। গোয়াল পরিষ্কার করার পর দুধ দোহানো শেষ হয়। তারপর উঠানের উপর বড় বড় দুটো উনুনে কড়া চাপিয়ে সাবানের তেল জ্বাল দিতে আরম্ভ করেন। এরই মধ্যে এক ফাঁকে দুটো বালতি হাতে নিয়ে কুয়োতলায় দিকে দৌড়ে যান। ঝটপট দু' বালতি জল ভরে নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে আসেন। তারপর সাবানের ছাঁচগুলি সাজাতে থাকেন। একবার উঠে গিয়ে ঘুমন্ত ছেলেপুলেদের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। এর ওর মাথায় হাত দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করেন—সবারই শরীর ভাল আছে কি না। সেখানে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে লক্ষ্য করেন, রাস্তার উপর একটা মেটে ঘরের ভিতরটা আগুনের আভায় লালচে হয়ে উঠেছে, মুড়ি ভাজছে শাস্তি মুড়িওয়ালি। ডালা হাতে নিয়ে তখুনি বের হয়ে যান রাধেশবাবু, টাটকা ভাজা গরম মুড়ি কিনে নিয়ে আসেন। ছোট ছোট ডালায় মুড়ি আর গুড় সাজিয়ে রেখে দেন, ছেলেপুলেরা জেগে উঠলেই যেন ওদের খাবার পেতে দেরি না হয়।

এই ছেলেপুলেদের একটিও রাধেশবাবুর নয়। দুটি ছেলে হলো ছোট বউয়ের। ছোট বউ হলো পিসতুতো ভাই সুধাকরের স্ত্রী, বিধবা। আর একটি মেয়ে হলো করুণা ভাগ্নির। করুণা ভাগ্নিরও সিঁথিতে সিঁদুর নেই, দু'বছর হলো বিধবা হয়েছে। আপন বলতে রাধেশবাবুর একটি মেয়ে মাত্র আছে, তারই নাম স্বরূপা।

রাধেশবাবুকে ভাল করেই জানেন বিজয়বাবু। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা, ইঞ্জিনিয়ার বিজয়বাবুর কনট্রাক্টের কারবার যখন পুরোদমে চলছে, তখন এই রাধেশবাবুই ছিলেন তাঁর ইঁট-বাবু। বিজয়বাবু একদিন স্বেচ্ছায় তাঁর কারবারের ইতি ক'রে দিলেন, সেদিন ইঁট-বাবুরও কাজ গেল। তারপর থেকে সাবান, তবু তাঁর কর্মশক্তি আজও ইঁটের মতই কঠিন, একটুও নরম হয়নি।

বড় বেশি খাটুনির জীবন। পাড়ার মধ্যে যাঁরা পাশ-করা বিদ্যার জোরে

কেরানিগিরি করেন, তাঁদের অনেকে মাঝে মাঝে মন্তব্য করেন—অশিক্ষিত হওয়ার শাস্তি! কেউ বা আখ্যা দিয়েছেন, খাটুনির দৈত্য রাধেশ। কিন্তু দুপুরের রোদে সাবান বেচে ঘর্মাক্ত মূর্তি নিয়ে যখন ঘরে ঢোকেন রাধেশ বাবু, আর হেসে হেসে পকেট থেকে বের করেন ছোট বউয়ের জন্য এক ডজন ছুঁচ, করুণা ভাগ্নির জন্য লেস বোনার স্থতো, আর বটা-কালু-ঝুনুর জন্য চকোলেট, তখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলবে যে তাঁর জীবন হলো শাস্তির জীবন? পক্ষিমাতার মত তাঁর মন যেন দুই ডানা দিয়ে এক ঘর অসহায় প্রাণকে সর্বদা সকল আপদ থেকে আড়াল ক'রে একেবারে বুকের কাছে ধরে রেখেছে। এবং তাইতেই ধন্য হয়ে যাচ্ছেন।

নিজের অশিক্ষার জন্য কোন দুঃখ নেই রাধেশবাবুর মনে। স্বরূপাকে অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ করাতে পারলেন না, টাকার অভাবে, এই যা দুঃখ। মাঝে মাঝে আক্ষেপ ক'রে স্বরূপার কাছে যেন অপরাধ স্বীকার করেন রাধেশবাবু—দুধটা বিক্রি ক'রে দিলে অবিশ্যি তোর পড়ার খরচটা উঠতো। কিন্তু কি করবো বল? বাড়িতে তিনটে বাচ্চা থাকতে ঐ সামান্য দুধটুকু আর বেচে দিতে ইচ্ছে করে না।

কথা প্রসঙ্গে স্বরূপা মাঝে মাঝে রাধেশবাবুর এই সব কাহিনী মিত্রা দেবীর কাছে বলে। মিত্রা দেবী মন্তব্য করেন—ঠাকুর যেন আমাকে জন্মে জন্মে এমন অশিক্ষিত করেন।

বিজয়বাবুকেও দেখা যায়, বিজয়া দশমীর দিনে সারা শহরের মধ্যে বেছে বেছে একমাত্র স্বরূপাদের বাড়িতেই যান, আর রাধেশবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে আসেন।

কারবারের সমস্ত দেনা পাওনা ও খরচের হিসাবপত্র স্বরূপাই রাখে, কারণ ম্যাট্রিক পাশ না করুক লেখাপড়া সে জানে। মিত্রা মাসির কাছেই অনেক বই পড়তে হয়েছে স্বরূপাকে, যার মধ্যে বিশ্বাসে মহীয়ান যত মানুষের কথা আছে, ভক্তি ও ভক্তের কাহিনী আছে; আর মানুষের মধ্যেই দেবতা থাকেন, এমন একটা কথাও আছে, ম্যাট্রিক পাশ করতে একেবারেই কাজে লাগে না যেসব কথা আর যেসব বই।

আর একটা ভাবনার কথাও মাঝে মাঝে রাধেশবাবু প্রকাশ করেন—তোর বিয়েটার জন্যে ভাবতে হচ্ছে স্বরূপা।

তারপরেই যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে, এবং একটু উৎফুল্ল হয়ে হাসিমুখে বলেন—তবে একটা ভাল ব্যাঙ্ক সহায় আছে, তাই ঠিক দুর্ভাবনাটা আর হয় না।

স্বরূপা অনুযোগ করে—তুমি দয়া ক'রে এসব ভাবনা টাবনা ছেড়ে দাও তো বাবা। আমি বিয়ে করবো না।

রাধেশবাবু হাসতে থাকেন। স্বরূপা যেন জেদ ক'রেই বলে—আর তোমার খাটুনিও কমাও।

রাধেশবাবু প্রতিবাদ করেন—না না, সেটা কি ক'রে হয়? আর তাতে লাভই বা কি?

খাটুনি কমান না রাধেশবাবু, অগত্যা খাটুনির ভাগ নিতে হয় স্বরূপাকেও। রাধেশবাবু শেষ রাত্রে উঠে খুটখাট আরম্ভ করলেই স্বরূপাও জেগে ওঠে। প্রায় ধমকের সুরেই বলে—শুয়ে থাক বাবা, এখন উঠতে পারবে না। স্বরূপা নিজের হাতেই গোয়ালঘর পরিষ্কার করে, সাবানের তেল জ্বাল দেবার উনন ধরিয়ে রাখে।

বাইরে থেকে ঘরে ফিরে রাধেশবাবু কচিৎ কোন দিন একেবারে ক্লান্ত হয়ে দাওয়ার তক্তপোষের উপর চুপ ক'রে বসে থাকেন। রক্ত করবীটার দিকে তাকিয়ে থাকলেও দৃষ্টিটা তাঁর বড় উদাস মনে হয়। স্বরূপা পাখা হাতে নিয়ে কাছে এসে রাধেশবাবুর মুখের দিকে অপলক ভাবে চেয়ে থাকে। স্বরূপার মনে হয়, একটা মা-মরা ছেলে কোথা থেকে এসে চুপ ক'রে বসে আছে, একেবারে অসহায়, দেখবার কেউ নেই, আঁচল দিয়ে নিজের হাতে মুখ মুছে দিতে ইচ্ছা করে।

মিত্রা দেবীর কাছে এই গল্পও করেছে স্বরূপা। মিত্রা দেবী বড় খুশি হয়ে হাসতে থাকেন—এসব শিখলে কেমন ক'রে স্বরূপা, অ্যাঁ? তোমার দেখছি সব শেখার সার শেখা হয়ে গিয়েছে।

মিত্রা দেবী আরও অনেক কিছু শিখিয়েছেন স্বরূপাকে। গোঁসাইপাড়ায় কীর্তন শুনতে যখন যান, তখন স্বরূপাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সংসারের রীতি-নীতিকে তাঁর কোথায় ভাল আর কোথায় মন্দ লাগে, বিজয়বাবু ছাড়া একমাত্র স্বরূপার কাছেই তিনি বর্ণনা করেন। বলতে কুণ্ঠিত হন না মিত্রা দেবী, সংসার থেকে তিনি নিজেকে আলগা ক'রে নিতে চান, কারণ সময় হয়ে গিয়েছে, আর কোন মায়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চান না। যতদিন না নরায়ণ নিজের কাছে ডেকে নিচ্ছেন, ততদিন সংসারে শুধু কর্তব্য ক'রে যাবেন দু দিনের পরবাসীর মত। ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে, তাই মিত্রা দেবী মনে করেন, ছেলের প্রতি আর তাঁর আর কোন দায়িত্ব নেই। আপন-ছেলে আপন-ছেলে ক'রে এই বয়সে দশ রকমের উদ্বেগ দিয়ে মনটাকে আর অশান্ত ক'রে রাখতে পারবেন না। শুধু ছেলের আবদার সইতে সইতে এই জীবনের অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে, আর পারেন না। এখন যত বেশি পর ক'রে দিতে পারা যায় ততই ভাল, নিজেরও এবং ছেলেরও।

মিত্রা দেবী যেন ছুটি নেবার আগে স্বরূপার কাছেই সব দায় সঁপে দিচ্ছেন।

স্বরূপার কাছে মিত্রা দেবী কেন যে এত কথা বলেন, এবং তার অন্য কোন বিশেষ অর্থ আছে কি না, বুঝতে পারে না স্বরূপা।

আজ দশ বছর ধরে স্বরূপা এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে। প্রথম যেদিন এসেছিল, তখন রাধেশবাবু ছিলেন ইটবাবু, স্বরূপার মা মারা গিয়েছিলেন সেদিন। আজ এই ভাদ্রের সন্ধ্যায় দোতলার যেখানে বসে স্বরূপার সঙ্গে কথা বলছেন মিত্রাদেবী, ঠিক সেইখানেই ফ্রক-পরা একটি মেয়ে কান্না-ভরা মুখ নিয়ে তাঁরই সান্ত্বনায় আর অনুরোধে চুপ ক'রে ভাত খেয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকেই, নানা কাজের দায়ে আসা-যাওয়ার বাঁধনে এই বাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে বড় হয়ে উঠেছে স্বরূপা। রাধেশবাবু প্রথম যেদিন সাবানের কারবার খুললেন, সেদিন বাপের চিঠি নিয়ে স্বরূপাই এসেছিল বিজয়বাবুর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে। এই ঋণ প্রথম শোধ দিতে স্বরূপাই এসেছিল টাকা নিয়ে। এইভাবেই এসে এসে দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে কবে যে সেই মেয়েটিই আনন্দ-সদন নামে এক পরের বাড়ির অন্তরের গভীরে প্রবেশ ক'রে ফেলেছে, তার খবর হিসাব ক'রে কেউ রাখেনি। মিত্রা দেবীর শরীর অসুস্থ হ'লে স্বরূপা যখন একা একা এই বাড়ির রান্নাঘরের হাতাখুন্তি বাজিয়ে কাজ করে, তখন তাকে পরের বাড়ির মেয়ে বলে বুঝতে পারবে, এমন সাধ্য কারও নেই।

স্বরূপা যে চিরকালের মত এই বাড়িরই মেয়ে হয়ে গিয়েছে, এই বিশ্বাসটা সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন মিত্রা দেবী। এই বিশ্বাসটা মিথ্যা ক'রে দেবার জন্য কখনও কোন বাধা দেখা দেবে, এমন সন্দেহও হয়নি। সন্দেহটা শুরু হয়েছে আজ এক বছর হলো। কুশলের আচরণ দেখে বার বার সন্দেহ করতে হচ্ছে, এই বাড়ির সকল সাধ রুচি ও ইচ্ছাকে অশ্রদ্ধা ক'রে কুশলের মনটা কোথায় যেন পালিয়ে গিয়েছে। আজকের সন্ধ্যার ঝড়ে সব রহস্য ছিন্ন হয়ে সন্দেহটাই সত্য বলে ধরা পড়ে গিয়েছে। একেবারে আলগা হয়ে যাবার আগে যে স্বপ্ন দিয়ে এই পুরনো সংসারকে নতুন ক'রে সাজিয়ে দিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন মিত্রাদেবী, সে স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিয়েছে কুশল।

স্বরূপার উপর কুশলের কোন টান নেই, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না মিত্রা দেবীর। এতদিন ধরে চেনা, এত গল্প, এত দেখাশোনার পর এই মেয়ের উপর কোন ভদ্রলোকের ছেলের টান হয় না, একি সত্য হতে পারে? নন্দার মেয়ে নবলাকে তিনিও দেখেছেন, দেখতে সুন্দর ঠিকই। কিন্তু স্বরূপাও তো অসুন্দর নয়; বয়সেও নবলারই সমান। এই তো সামনে বসে রয়েছে স্বরূপা। একটা সাধারণ ছাপা শাড়ি প'রে এসেছে, কাণে মায়ের-দেওয়া সেই কবেকার দু'টি দুল আর হাতে দু'গাছা সরু চুড়ি ছাড়া আর কোন

অলংকারের চিহ্ন নেই। কিন্তু তবু কি ওকে রিক্ত দেখায়? মিত্রা দেবীর দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে, কি সুন্দর ছুটি চক্ষু।

কুশল যাই বলুক, স্বরূপার মন কি বলে? এই প্রশ্নের উত্তর আজ চরমভাবে জেনে নিতে চান মিত্রা দেবী। এতদিন ধরে দেখেও স্বরূপাকে বুঝতে তাঁর চোখের ভুল হবে, এ'ও কি সত্য?

অনেকক্ষণ ধরে চুপ ক'রে থেকে তাঁর মনের উত্তেজনাও শান্ত হয়ে যায়। তবু বুঝতে পারেন মিত্রাদেবী, প্রশ্ন করতে গলার স্বরটা বেদনায় কেঁপে উঠতে চাইছে। প্রশ্ন করলেন মিত্রা দেবী—তুমি এখানে কেন আস স্বরূপা?

এত অস্বাভাবিক আর অবাস্তব প্রশ্নের সম্মুখে জীবনে কোনদিন দাঁড়ায়নি স্বরূপা। দশ বছরের ইতিহাসের অর্থ বোধহয় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে আকস্মিক কোন নিষ্ঠুর বিপর্যয়ে, নইলে মিত্রা মাসিমার মুখে আজ এরকম প্রশ্ন কেন?

নিজেকে শান্ত ক'রে রাখে স্বরূপা, মিত্রা মাসির প্রশ্নের উত্তর দেয়।—আপনারা আসতে দেন, তাই।

মিত্রা দেবী—আর কোন কারণ নেই?

উত্তর দিতে পারে না স্বরূপা, চোখ নামিয়ে মেজের দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবী যদি আজও এর কারণ এতদিন না জেনে থাকে, তবে আর কোন দিন জানতে পারবে না।

মিত্রা দেবী—বল স্বরূপা, এতদিন দেখে তোমাকে বুঝতে আমারও ভুল হয়েছে ব'লে মনে হয় না, বল।

স্বরূপা—আপনার ভুল হয়নি মাসিমা।

মিত্রা দেবী—সত্যি বলছো?

স্বরূপা—হ্যাঁ।

মিত্রা দেবী—তুমি জান, নন্দার মেয়ে নবলার সঙ্গে কুশলের মেলামেশা আছে?

স্বরূপা—জানি।

মিত্রা দেবী—তবে? তবু তোমার মন খারাপ হয় না?

স্বরূপা—না।

মিত্রা দেবী—কেন?

স্বরূপা—জানি না, বলতে পারছি না মাসিমা।

মিত্রা দেবী—কুশলকে দেখতে ইচ্ছে করে, তাই না?

স্বরূপা—হ্যাঁ।

মিত্রা দেবী—কেন বল তো ?

এর চেয়ে কঠিন প্রশ্ন কোনদিন শোনেনি স্বরূপা। যা ব'লে শেষ করা যায় না, এক কথায় বা দু'চার কথায় তার পরিচয় দেবার মত বিদ্যাবুদ্ধি নেই তার। তবু বলতে হবে, মিত্রা মাসি আজ না শুনে ছাড়বেন না।

মাথা হেঁট করে স্বরূপা। বলতে গিয়ে চোখের তারা দুটো চিক চিক করে।—মনে হয়, কুশলদা একা পড়ে আছেন, তাঁকে দেখবার কেউ নেই। তাই দেখতে আসি।

মিত্রা দেবী—বুঝেছি। কুশলকে কখনও এসব কথা বলেছ ?

স্বরূপা—না।

একবার দেয়ালের ঘড়ির দিকে, আর একবার বাইরের আকাশের দিকে তাকালেন মিত্রা দেবী।—এবার আমার একটা কথা শোন স্বরূপা।

—বলুন।

—এখন বাড়ি যাও, আর···আর কখনও এখানে এস না।

এই নির্দেশের নিষ্ঠুরতাকে একটু যেন সংশোধন ক'রে নিয়ে ধরা-গলায় মিত্রা দেবী বলেন—আমি না ডাকলে এস না।

স্বরূপা ওঠে, সিঁড়ি ধরে ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে একতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। মিত্রা দেবী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন।

বারান্দার প্রান্তে পিতলের আধারে ধূপ তার শেষ-পোড়া পুড়ে নিচ্ছে। হল ঘরটা অন্ধকারে ভরা। দু'পা এগিয়ে যেতেই আর্তস্বরে ডেকে ওঠে স্বরূপা—মাসিমা।

মিত্রা দেবী এসে হাত ধরেন—কি ?

স্বরূপার দু'চোখ থেকে ঝর ঝর ক'রে জল ঝরে পড়ছিল। স্বরূপা বলে—আমার বড় ভয় করছে মাসিমা, হলঘরটা আমাকে পার ক'রে দিন, বড় অন্ধকার।

—চল। মিত্রা দেবী বেশ শক্ত ক'রে স্বরূপার হাত ধরে একেবারে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

খুবই সাবধান হয়ে গিয়েছে কুশল। তার স্বপ্নের জীবনকে সোনার সিংহাসন থেকে নামিয়ে ক্লেদকুণ্ডের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। নিস্তব্ধ আনন্দ সদনের একটি কক্ষে কপাট বন্ধ ক'রে লুকিয়ে থাকে কুশল, যেন আত্মরক্ষার জন্য। দিন রাত্রি প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে এক একবার পোস্ট অফিসে ঘুরে আসে, চাকরির চূড়ান্ত চিঠিটা যদি এসে থাকে।

রিমাইণ্ডারের একটা উত্তরও এর মধ্যে এসে যায়, তার মধ্যে ভরসার কথাটাই স্পষ্ট হয়ে আছে—খুব শীঘ্রই কাজে জয়েন করার দিনটি জানিয়ে দেওয়া হবে।

এখন এই প্রতীক্ষিত সুখবরটিই একমাত্র ভরসা, নবলার কাছে গিয়ে মুখ দেখাবার একমাত্র ছাড়পত্র। বাবার কৃপণতা, মা'য়ের পাগলামি, আর স্বরূপার বেহায়াপনা—সব মিলে একটা কুৎসিত চক্রান্ত কুশলের সম্মান ও মনুষ্যত্বের পথ রোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এই চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নবলার কাছে পৌঁছবার জন্য এক সুলগ্নের প্রতীক্ষায় এক একটা দুঃসহ দিন আর রাত্রিকে কোনমতে সহ্য করতে থাকে কুশল।

দুঃসহ বটে, তবু এই সবই সহ্য করা যায়, কিন্তু সহ্য করা যায় না স্বরূপাকে, ক্ষমা করা যায় না ওর নিঃশব্দ অভিসন্ধিকে। ভাবতে আশ্চর্যও লাগে কুশলের, তার জীবনের সংকল্প ও সিদ্ধির পথে স্বরূপার মত একটা মেয়েও আবার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়! স্বরূপা কেন এই বাড়িতে আসে তার রহস্য মা জানেন, বাবাও জানেন, সবাই জেনে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে বসে আছেন। আড়ালে আড়ালে স্বরূপা তার দুঃসাহসকে সবার কাছে কত সহজ ও স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ক'রে তুলেছে, অথচ কুশল তার কিছুই খোঁজ রাখে না।

নবলার কথা যে স্বরূপা শোনেনি তা' তো নয়। কুশল নিজের মুখেই কতবার তাকে বলেছে। শুনে চুপ করে গিয়েছে স্বরূপা, অন্য দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়েছে। তখন বুঝতে পারেনি কুশল, আজ বুঝতে পারে, কি প্রতিজ্ঞা লুকিয়ে ছিল স্বরূপার সেই আনমনা ঔদাসীন্যের ভিতর।

স্বরূপার অধিকারকে তো কেউ অস্বীকার করেনি। গরীবের মেয়ে স্বরূপার বিয়েতে কুশল টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। কুশলের বিয়েতে স্বরূপা ভাল ক'রে সাজবে, খাটবে, ফুর্তি করবে, আর হাসবে। এই কথাই তো স্বরূপাকে বলেছে কুশল। শুনে হেসেছে স্বরূপা। তখন বুঝতে পারেনি কুশল, আজ বুঝতে পারে, কি মতলব লুকিয়ে ছিল সেই কপট হাসির আড়ালে!

দশ বছর ধ'রে স্বরূপা এই বাড়িতে আসছে, শত উপকার পেয়েছে। এই বাড়ির দরকারে কাজ ক'রে দিয়ে গিয়েছে। সবাই তাকে ভাল বলেছে, কুশলও ভাল বলেছে, তার কৃতজ্ঞতায় কেউ সন্দেহ করেনি। এই বাড়িরই মেয়ে হয়ে গিয়েছে সে। ওর বিয়ে হয়ে গেলেই বা কি, আর না হলেই বা কি? যেখানেই থাক, ডাক দিলে সে তো আসবেই। মিত্রাদেবীকে কীর্তন শোনাতে নিয়ে যাবে, বিজয়বাবুকে বাতাস করবে, আর কুশলকে খাবার জল দিয়ে যাবে। এই বাড়ির উপকারে বাঁধা মানুষ

স্বরূপা, তার উপর এই বাড়ির কারও কোন দাবিকে সে না বলতে পারবে না। ধমক দিলেও সে চুপ ক'রে থাকবে। প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা সে। কিন্তু তার বেশি তো কিছুই নয়।

—কিন্তু আমার জীবনের স্বপ্নে সম্মানে আকাঙ্ক্ষায় ও আদর্শে তুমি কোথায়? কিছুই নও, সে যোগ্যতা তোমার নেই। তবু আমাকে, অন্য মেয়ের ভালবাসার মানুষকে, তুমি নির্বোধের মত আর হিংসুকের মত ছোট ক'রে রাখবার চেষ্টা করছো কেন?

প্রশ্নগুলিও যেন নিঃশব্দে কুশলের মনের ভিতরে কাঁটার খোঁচা দিয়ে অস্বস্তি ছড়াতে থাকে। ইচ্ছা করে, এই মুহূর্তে একবার সেই নকল নিরীহতার মূর্তিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে আর চাবুক হাতে নিয়ে প্রশ্ন করতে—বিজয় ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে বাড়ি আর টাকার উপর যদি এত লোভ ছিল, তবে এত অশিক্ষিত হয়ে রইলে কেন? সেণ্ট ডেনিসে পড়লে না কেন? নবলার মত রঙীন স্বপ্নে ভরা একটি মন আর ঝরনার মত হাসি পেলে না কেন?

প্রশ্ন, না আক্ষেপ? চিন্তাগুলি যেন অন্য একটা সমস্যার ভিতরে গিয়ে ঢুকছে। চিন্তাগুলিকে এখানেই থামিয়ে বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয় কুশল।

বাইরের পৃথিবীতে বহু ঘটনা ঘটে যায়। সকাল বেলার চায়ের মত খবরের কাগজের সেই ঘটনাগুলিকে শুধু কয়েকটা চুমুকে পড়ে শেষ ক'রে দেওয়া ছাড়া সেগুলির আর কোন সার্থকতা আছে ব'লে মনে করে না কুশল। সকাল বেলার সময়টা কাটানো যায়, এইটুকুই যা লাভ। শুধু খবরের কাগজে কেন, মহারাজপুরের মত সহরের রাজপথেও কতগুলি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কখনও একটা শোভাযাত্রা যায় স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি তুলে, কখনও আর একটা শোভাযাত্রা যায় ভারতের স্বাধীনতাকে ধিক্কার দিয়ে। হিন্দু ও মুসলমানে একটা দাঙ্গা বাঁধবার উপক্রম হয়েছিল ক'দিন আগে, লাঠি ও ছুরির উৎসবে রক্তাক্ত হয়ে উঠবার জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়েছিল সহরটা। কিন্তু তার জন্য কোন উদ্বেগ বোধ করেনি কুশল, বরং বিরক্ত বোধ করেছিল, পোস্ট অফিসে ক'টা দিন যেতে পারেনি তাই।

পথে বের হয়েও দেখতে পায় কুশল, গোঁসাইপাড়ার অলিগলি ভরে গিয়েছে নতুন ধরনের এক যাযাবর সমাজের ভিড়ে, খবরের কাগজে তাদের বলে উদ্বাস্তু। বাংলা দেশ থেকে চৌদ্দপুরুষের ভিটা দীঘি ক্ষেত আর পুকুর, দেউল আর দোলমঞ্চ ছেড়ে তারা এসে ঢুকেছে এক একটা গলিতে; ছোট ছোট ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নোংরা কুঠুরির ভিতর। দুঃখকে ঘৃণা করে কুশল, দুঃখীকেও সইতে পারে না। পৃথিবী দেশ বা গোঁসাইপাড়ার

কোন্ এক ভূতপূর্ব ঘটনার কথা নিয়ে এই ভয়ংকর বর্তমানের সামনে নির্বিকার প্রসন্নতা নিয়ে গল্প করছে দুটি মানুষ। কোন্ যুগের মানুষ এরা? এবং সত্যিই মানুষ তো? এক লক্ষ চার হাজার টাকার একটা নিটোল ব্যালান্স আজ শুধু বর্মা সেগুনের দেরাজে একটা খাতার মধ্যে অঙ্ক মাত্র হয়ে পড়ে আছে, একেবারে অনর্থক হয়ে। তবু হতভম্ব হয় না, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকায় না, আর্তনাদ ক'রে ওঠে না, এমনি বোধশক্তিহীন দুটি জড় ও স্থাবর মনুষ্যত্ব। মৃত্যুর উপাসনা করতে করতে ওরা কবেই মরে গিয়েছে বোধ হয়, কাজেই সর্বনাশের আঘাতেও আর নতুন ক'রে অস্থির হতে পারে না। আগুনের আঁচ লাগলেও যাদের গায়ে জ্বালা লাগে না, তাদের প্রাণ আছে ব'লে স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু জ্বালা লেগেছে কুশলের, এবং সহ্য করতেও কষ্ট হচ্ছে, কারণ তার প্রাণ আছে, আর সে প্রাণকে সুখী ও সুন্দর করার জন্য তার বিরাট ভবিষ্যৎ আশা করে রয়েছে। মুখ কালো ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল, যেন তার মনের ভিতর চাপা যত ঘৃণা অভিযোগ আর বিদ্রোহের প্রদাহে তার সমস্ত সত্তা অঙ্গার হ'য়ে যাচ্ছে!

বিজবাবু হঠাৎ গল্পের মধ্যে আনমনা হয়ে পড়েন, তারপর কুশলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হন। প্রশান্ত দৃষ্টিটা একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

—তোমার কি খুব দুঃখ হচ্ছে কুশল?

বিজয়বাবুর কথায় অদ্ভুত একটা সান্ত্বনার আভাস ছিল। কুশল উত্তর দেয় না। বিজয় বাবুর কণ্ঠস্বর আরও গভীর মমতায় আর্দ্র হয়ে ওঠে—এ'তে বিচলিত হবার কি আছে কুশল? টাকা তো আর সুখের গ্যারেন্টি নয়, আর সুখও জীবনের বড় কথা নয়। তা ছাড়া, দুঃখকেও যে জীবনে খুব দরকার।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন বিজয়বাবু। ধীরে ধীরে সেই অভ্যস্ত ছন্দে বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি আরম্ভ করলেন। গায়ে সাদা মলমলের একটি উড়ুনি, মাথায় সাদা চুল, পায়ে বাঘ ছালের চটি। বিজয়বাবুর মুখটা যেন একটু বেশি রকমের লালচে হ'য়ে ওঠে।

—টাকা আমি জীবনে অনেক রোজগার করেছি কুশল, অনেক পরিশ্রমে। টাকার ওপর আমারও অনেক মায়া ছিল, এবং দিনের পর দিন টাকা জমিয়েও যাচ্ছিলাম। কিন্তু একদিন মনে হলো, ভুল হচ্ছে, বোঝা ভারি হচ্ছে, শেষ দিনে শুধু টাকার জোরেই আনন্দ ক'রে বিদায় নেওয়া যাবে না।

চোখ বন্ধ ক'রে বসেছিলেন মিত্রা দেবী, যেন তার চেতনায় একটা আবেশ এসেছে। এরকম আবেশ তাঁর হয়। বারান্দার উপর সাদা উড়ুনি গায়ে দিয়ে যেন একটা অপার্থিব আবির্ভাব মূর্তি ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবুর ঐ ধরনের কথাগুলিকে নিতান্ত কথা বলে তাঁর মনে হয় না; মনে হয়, অদৃশ্যলোক থেকে কতগুলি মন্ত্রের গুঞ্জরণ এসে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

কুশল জানে, মিত্রা দেবীর এই ধরনের একটা হিষ্টিরিয়া আছে, কিছুক্ষণ যার প্রভাব থাকে, তারপর কেটে যায়। এর জন্য আদৌ বিচলিত হয় না কুশল। বিজয়বাবু যেভাবে যেসব কথা বলছেন, তা'ও একটা পুরাতন হিষ্টিরিয়ার ইতিহাস ব'লে মনে হয় কুশলের। তা ছাড়া আর কি ?

—সেই দিন থেকে শুধুই একটি চিন্তাই করছি, খালি হব কবে ?

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন বিজয়বাবু, বাইরের কালো আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন, যেন ঐ অনন্ত তিমিরের ওপারে কাউকে তিনি প্রশ্নটা করেছেন।

কুশল বলে—কিন্তু যেটুকু ছিল, শেষ পর্যন্ত তাই যদি তুলে নিয়ে একটা ভাল কাজে খরচ করতেন, তবে এভাবে ঠকতে হতো না।

কুশলের কথায় একটু চমকে উঠে তাকালেন বিজয়বাবু, যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলেন। বেতের চেয়ারের উপরে ক্লান্তভাবে বসলেন। মিত্রাদেবীও চোখ খুললেন।

কিছুটা সময় নিস্তব্ধতার মধ্যে পার হয়ে গেল। বিজয়বাবু এবার একটু স্পষ্ট ক'রে বাস্তব জগতের সঙ্গেই আলাপ আরম্ভ করলেন।

—ভাল কাজের জন্যই তো টাকাটা রেখেছিলাম। যদি তুমি···ধর একটা মিউজিয়াম বা লাইব্রেরি করতে বা ঐ হরভবনের ইতিহাস সম্পর্কে একটা রিসার্চ করতে, তবে ঐ টাকা খরচ করতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে বাড়ি বা গাড়ির জন্য টাকা অপব্যয় করতে আমি রাজি ছিলাম না।

কুশলের দৃষ্টি ক্রুর হয়ে ওঠে। বাড়ি বা গাড়ি সম্পর্কে বিজয়বাবুর এই কুসংস্কারের গর্বটাকে সম্ভ্রম করতে কোনকালেই পারেনি, আজ তো আরও পারে না। কেমন করেই বা পারবে ? সোজা কথায় বলা যায়, কুশলের জীবনের স্বপ্নকে ধুলো করে দেবার জন্যই বিজয়বাবু যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে এক লক্ষ চার হাজার টাকাকে ধুলো ক'রে দিয়েছেন। এই নিঃস্ব বাতিকগ্রস্ত ও জীবন্মৃত বৃদ্ধের এমন তাত্ত্বিক উপদেশ আজ আর চুপ ক'রে সহ্য করার কোন অর্থ হয় না।

কুশল বলে—আজ বুঝলেন তো, নতুন বাড়ি করলে বা গাড়ি কিনলে টাকাটার অপব্যয় হতো না। কিছুটা তবু বাঁচতো।

কুশলের কথায় অসম্ভ্রম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মিত্রা দেবীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। বিজয়বাবু তবু শান্তস্বরেই প্রত্যুত্তর দেন।—কিসে কি বাঁচে, তা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না কুশল। যিনি দেন তিনি নেন এবং তাঁর দেওয়া-নেওয়া ভালর জন্যই, এই বিশ্বাসটাই আমাদের লাভ। তা ছাড়া ভাবনা ক'রে আর কোন লাভ নেই।

কুশল হাসে। বিজয়বাবু আর মিত্রাদেবী দু'জনেই কৌতূহলী হয়ে কুশলের মুখের দিকে তাকান।

কুশল বলে—কথামালার সেই গল্পটার কথাই আমার মনে পড়ছে। এক কৃপণের মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন, ভোগে লাগলো না, চুরিও গেল, অথচ এই বিশ্বাসটাই রয়ে গেল যে···।

বিজয়বাবুর চোখ দুটো যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, হাত তুলে ইঙ্গিত করেন—থাম, নিজের ঘরে যাও।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কবাট বন্ধ করে কুশল। নিজের মনের জ্বালার মধ্যেও একটা পরিতৃপ্তি সে আজ লাভ করেছে। আনন্দসদনের বাতিকগুলিকে স্পষ্ট ক'রে মুখের উপরেই ঘৃণা জানাতে পেরেছে। দেখতে পেয়েছে কুশল, চোখ দুটোও জ্বলে উঠেছিল বিজয়বাবুর, না জ্বলে আর থাকবে কতক্ষণ? টাকার শোক তত্ত্বকথার আবরণ দিয়ে ঢেকে আজও ভণ্ডামি করতে চেয়েছিলেন তিনি, কুশলের স্পষ্ট ঘৃণার আঘাতে বিজয়বাবুর সে ভণ্ডামি ভেঙ্গে গিয়েছে। চোখ দুটো জ্বলতে বাধ্য হয়েছে।

রাত হয়েছে, আরও রাত হলো। সামনের বাড়িতে রেডিয়োর রাতের ঠুংরি শেষ হলো। আনন্দ-সদনে কোথাও কোন সাড়া ছিল না; শুধু শোনা যায় কামরাঙ্গা গাছের নীলকণ্ঠ মাঝে মাঝে ভাঙা ঘুমে কিচ মিচ করে, কুশল ঘুমোয় না একেবারে।

গেটের কাছে পথের উপর হঠাৎ একটা হল্লা শোনা যায়। জনকয়েক লোক ব্যস্তভাবে হাঁকাহাঁকি ক'রে যেন কারও ঘুম ভাঙাতে চাইছে। ঘর ছেড়ে বাইরে আসে কুশল।

পথের উপর একটা রিক্সা, তার মধ্যে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে আছেন, কপালে একটা ক্ষত, ছোট একটা কাঁচা রক্তের ধারা তখনও ঝরে পড়ছে। কুলি ছাড়া রিক্সার সঙ্গে দু'জন লোকও আছে, কনেস্টবলও।

মাথা-ফাটা লোকটাকে হঠাৎ দেখে মাতাল ব'লে মনে হ'লেও, মাতাল নয় বলেই বোঝা যায়। কারণ কনেস্টবল আর সকলে বেশ সম্ভ্রম আর সমবেদনার সুরে ডাকাডাকি করছিল—ও মশাই, ও মশাই, একটু চেষ্টা করে উঠে বসুন। বলুন, কোন্ দিকে আপনার বাড়ি! বলুন, বলুন।

সংজ্ঞাহীনের মত দেখতে লোকটা উঠে বসে এবং ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে। ভাঙা গলায় উত্তর দেয়—এই আর একটু দূরে, ফুল বাড়ির রাস্তায়।

এইবার স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় কুশল, রাধেশবাবু বসে আছেন রিক্সার উপর।

রিক্সা চলে যায়। কুশল কনেস্টবলকে প্রশ্ন করে – কি হয়েছে?

কনেস্টবল—হবে আর কি, কপাল ভেঙেছে! রত্না ব্যাঙ্কের সিঁড়িতে মাথা ঠুকে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল।

অনেকগুলি দিন কেটে গেল। মহারাজপুরের আকাশের রূপ বদলেছে। হেমন্তের কুয়াশা নিবিড় অনুরাগের মত দামোদরের বুকে লুটিয়ে থাকে, সহজে সরতে চায় না। এই লুটিয়ে-পড়া অনুরাগের খেলা আরম্ভ হয় সন্ধ্যাতারা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শেষ হয় শুকতারা নিভে যাবারও অনেক পরে, সূর্য যখন প্রায় ঘড়িঘরের মাথার কাছাকাছি এসে সত্যি সত্যি রৌদ্রময় হয়ে ওঠে।

ক্রস রোড ধরে প্রায় প্রতিদিনই এদিক ওদিক ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায় কুশল, যদিও কুয়াশার খেলা দেখবার সময় তার নেই এবং আগ্রহও নেই। আগ্রহ শুধু একটি পথে এগিয়ে যাবার জন্য, যে-পথের প্রান্তে শিরীষ-বকুলের আড়ালে একটি কক্ষের অন্তরে তার স্বপ্নের অধীশ্বরী বসে আছে। কিন্তু তবু এগিয়ে যেতে পারে না কুশল, কারণ আজ আর সে লাখ-টাকা-ওয়ালার ছেলে নয়, তার মনুষ্যত্বের ত্রিশ বছরের পরিচয়টা আজ ভয়ংকর ভাবে পালটে গিয়েছে। লোকে যদি আজ বলে, কুশল হলো এক নিঃস্ব পাগলের ছেলে, তাহ'লে দোষের কিছু হবে না। এই পরিচয় নিয়ে এই পথে ছুটাছুটি করা যায়, কিন্তু এগিয়ে যাওয়া যায় না। চাকরির চিঠিটাও এখনও এসে পৌছয়নি; যতদিন না আসে, ততদিন নবলার প্রেমের নেপথ্যে তাকে এইভাবেই ছটফট ক'রে আর ছুটাছুটি ক'রে কাটাতে হবে।

ঘরের জীবনও সেই রকম। কুশল জানে, এটা তার সাময়িক নির্বাসন। আর কয়েকটা দিন মাত্র, তার পরেই আনন্দ-সদনের এই কক্ষে তার কপাট-বন্ধ জীবনের অপমান সইতে হবে না। চলে যাবার জন্যই সব সহ্য ক'রে একটা মুক্তিক্ষণের প্রতীক্ষায়

রয়েছে কুশল। খবরটা এলেই আর একটি দিনও দেরি না ক'রে শার্ভে অফিসের বাংলোতে চলে যেতে হবে।

সবই হবে, নিজের গৌরবে গরীয়ান হয়ে আবার নবলার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তবু এই অনিশ্চয়ের ক'টা দিন ক্রসরোডের পথে ঘুরে বেড়াতে যেএত শান্তি ছিল, কে জানতো? লাল ভেলভেটের স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে নবলা এখন কোন্ সবুজ লনে ঘুরে বেড়ায়, একটা খোঁজ নেবারও উপায় নেই।

সেদিন পোস্ট অফিস হয়ে ক্রস রোডে পৌছতেই হঠাৎ মনে হয় কুশলের, উপায় আছে। সুখবর নয়, সুখের খবরও নয়, একটা দুঃখের খবর মনে পড়ে কুশলের, যেটা এই ক'দিনের মনের জ্বালার জন্য একেবারেই ভুলে গিয়েছিল কুশল। রম্ভা ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করেছে, মৃগেনবাবুরও যে চাকরি গিয়েছে। চাকরি না-থাকার অগৌরব এবং বেদনা নিজের মন দিয়েই অনুভব করার শক্তি আছে কুশলের। মৃগেনবাবু নন্দা দেবী আর নবলা, এই পারিবারিক নীড়ের বাইরে কুশল নামে তাদের একটিমাত্র যে প্রিয়জন আছে, তার কাছেই সবচেয়ে আগে সান্ত্বনা ও সমবেদনা আশা করে তারা। কিন্তু কুশল তার কর্তব্য ভয়ানকভাবে ভুলে গিয়েছিল। অদৃষ্টের বিপাকে সে আজ নিঃস্বের পুত্র, কিন্তু নবলাও যে চাকরি হারানো বেকার বাপের মেয়ে। দু'জনের মধ্যে আজ ছোট-বড় গৌরব বা অগৌরবের ভেদ নেই।

হন হন ক'রে একটানা হেঁটে নবলাদের বাড়ির কাছে যখন পৌছয় কুশল, তখন একটা দৃশ্য দেখে তার অন্তরাত্মা নিঃশব্দে আর্তনাদ ক'রে ওঠে। দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে নবলাদের বাড়ির সামনে শিরীষ গাছের কাছে। একটা ট্রাক ইতিমধ্যেই বোঝাই করা হয়েছে। কুলির দল বাড়ির ভিতর থেকে জিনিষপত্র ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসে জমা করছে খোলা মাঠটার উপর, কাজ তদারক করছে চাকর বনমালী।

চলে যাচ্ছে নবলারা, কুশলের স্বপ্নের পৃথিবী যেন তার অস্তিত্ব সরিয়ে ফেলছে। রম্ভা ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল কুশল, কিন্তু নবলাদের এই অন্তর্ধানের দৃশ্য দেখে মনে মনে যেন চূর্ণ হয়ে যায়।

প্রায় দৌড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত নবলাদের বাড়িতে ঢোকে কুশল। বারান্দায় কার্পেট ছিল না, আয়নাগুলিও না। সোফা চেয়ার কিছুই নেই, শুধু পিয়ানোটা এক পাশে একা দাঁড়িয়ে আছে।

—নবলা! মাঝের ঘরের দরজার পর্দাটা সরিয়ে ডাক দিল কুশল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরের দৃষ্টিটাও চোখে পড়ে যায়।

একটা বড় টেবিলের তিন দিকে বসে আছেন তিনজন—বাপ মা ও মেয়ে। টেবিলের উপর খাবারের স্তূপ। তিনজনেরই সুসজ্জিত বেশ। ছোট একটা উৎসবের দৃশ্য।

কুশলকে দেখে নন্দা দেবী একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি খবর কুশল? এতদিন পরে কি মনে ক'রে?

মৃগেনবাবুও আহ্বান জানালেন—ভিতরে এস।

অপ্রস্তুত হয় কুশল। টেবিলের একটা দিকের চেয়ার খালি ছিল, কুশল বসে। কিন্তু কি বলবে খুঁজে পায় না। এদের খবর নিতে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছে কুশল, কিন্তু এরা তারই খবর জানতে চায়।

ছুরি দিয়ে ফল কেটে কেটে প্লেটের উপর সাজিয়ে রাখছিলেন মৃগেনবাবু। কুশল সংকোচ সত্ত্বেও প্রশ্ন করে—আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?

মৃগেনবাবু কারও দিকে না তাকিয়ে প্রসন্নভাবে ডাক দেন—নবলা।

নবলা—কি?

মৃগেনবাবু—কুশলকে উত্তর দাও।

বাপ-মা-মেয়ে তিনজনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে। মৃগেনবাবু তেমনি আগ্রহের সঙ্গে ফল কাটতে থাকেন। নন্দা দেবী একটা কেকের প্যাকেট খোলেন আর নবলা টি-পট তুলে কাপে চা ঢালতে থাকে।

কুশল বলে—আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না।

আর একবার হাসির ঝড় ওঠে। কুশলের দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে নবলা বলে—চলে যাচ্ছি না। এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়িতে যাচ্ছি।

কুশল—কোন্ বাড়ি?

নবলা—হ্যাপি ডুক, সেই যে মোতিয়া নদীর ঝরনা দেখতে যাবার পথে যে বাড়িটার সামনে ট্যাক্সিটা একবার থামলো, আর আমি ফুল তুলে নিয়ে এলাম।

কুশল—হ্যাঁ, চিনেছি। বাড়িটা কাদের?

আবার হাসির ঝড়। মৃগেনবাবু বলেন—নাঃ, বেচারাকে তোমরা বড় অপ্রস্তুত করছো।

হাসি থামিয়ে নবলা বলে—মা'র বাড়ি।

কুশল নন্দা দেবীকে যেন অভিনন্দন জানাবার জন্য প্রশ্ন করে—সত্যি আপনার বাড়ি?

নবলাই উত্তর দেয়। —হ্যাঁ, একটা সুখবর তুমি শোননি! দাদুর সব সম্পত্তি আর টাকা মা পেয়েছেন, তাই দিয়ে ঐ বাড়িটা কেনা হয়েছে।

মৃগেনবাবু—আমার কোন গতি হলো না কুশল। এই বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে ছিলাম, এবার থেকে নন্দালয়ে ভাড়াটে হয়েই থাকবো।

হাসির ঝড় থামতে একটু দেরি হয়। কুশলের মুখটা ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল। এই সুখের হাসির উচ্ছ্বসিত ঝড় যতই বড় হয়ে উঠছে, কুশলের সুখের আশার দীপশিখাটি যেন আঘাত লেগে ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে। এরা একটু দুঃখিত, একটু হতাশ, একটু ব্যথিত না হ'লে কুশল যে আজ এদের মধ্যে একেবারে বিসদৃশ হয়ে যায়।

মৃগেন বাবু শুনে একটু ব্যথিত হবেন, বোধ হয় এই আশা ক'রেই কুশল বলে—রত্না ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করেছে, আপনারও বেশ একটা ক্ষতি করে দিয়ে গেল।

মৃগেনবাবু—বুঝলাম না কুশল।

কুশল—আপনার চাকরিটা গেল।

মৃগেনবাবু—আমি তো আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

কুশল—নিজে থেকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন?

মৃগেনবাবু—হ্যাঁ।

কুশল—কেন?

মৃগেনবাবু—ওসব প্রশ্ন আর করো না কুশল, চাকরিতে ঘেন্না ধরে গেছে। জীবনে আর ওসব ঘেন্নার মধ্যে যাচ্ছি না।

মৃগেনবাবু ফল কাটা বন্ধ ক'রে চায়ের পেয়ালা কাছে টেনে নেন।

কুশলের চা খাওয়া শেষ হয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—আমি চলি এবার।

নন্দা দেবী বলেন—সে কি? শুধু চা খেয়ে চলে যাচ্ছ? খাবার খেলে না?

কুশল হাসি মুখেই বলে—না, থাক।

মৃগেনবাবু কতকটা বিদায় দেবার ভঙ্গীতে ব'লে ফেলেন—তোমাদের কাছ থেকে একটু দূরেই চলে যাচ্ছি কুশল, তবু আসা-যাওয়ার চেষ্টা রেখ।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে কুশল যদিও তার পুরনো অভ্যাস মত একবার দাঁড়ায়, তবু মনে হয়, নবলা এখন আর বাইরে আসবে না। কিন্তু ভুল সন্দেহ করছিল কুশল, নবলাও তার পুরনো অভ্যাস মত বাইরে এসে দাঁড়ালো।

কুশল হাসিমুখেই বলে—সত্যিই দূরে চলে যাচ্ছ নবলা?

নবলা—এইটুকু দূরকে দূর মনে করছো ?

কুশল – হ্যাঁ নবলা।

নবলা অনুযোগের সুরে বলে—এ তোমার দুর্ব্বলতা।

কুশল হাসতে পারে না।—সত্যিই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি নবলা, ভয় হচ্ছে। রত্না ব্যাঙ্ক বসে গিয়ে আমাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে, যা ছিল সব গেছে।

নবলা—কত ছিল তোমাদের ?

কুশল—এক লক্ষ, চার হাজার। তাই লজ্জাও হচ্ছে, আবার ভয়ও করছে নবলা।

নবলা—তুমি ভয় করলে আমি সাহস করবো কেমন ক'রে ?

পিয়ানোর উপর এক হাতের ভর রেখে কিছুক্ষণের মত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে নবলা। শিরীষের পাতাগুলি হলদে হয়ে গিয়েছে, ঝরে পড়তে আর বেশি দেরি নেই, বোধ হয় সেইদিকেই ওর চোখ দু'টো অপলক হয়ে রয়েছে।

কুশলও অপলক ভাবে তাকিয়ে থাকে নবলার মুখের দিকে। বিষাদের ছায়া পড়েছে নবলার মুখের উপর, কিসের জন্য কে জানে ? এরকম ভাবে অন্যমনস্ক হতে নবলাকে কখনও দেখেনি কুশল। তবু নবলার হাসিমুখের চেয়ে এই বিষণ্ণ মুখ বরং বেশি সুন্দর বলে মনে হয়।

কুশল—কি ভাবছো নবলা ?

নবলা—তোমার খবর এল ?

কুশল—এখনও আসেনি।

নবলা—আসবে তো ?

বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে কুশলের।—আসতে বাধ্য, আসবেই, একটু দেরি হচ্ছে এই যা। না এসে উপায় কি ?

নবলা—তাই বল। এইটুকু যেন মনে থাকে।

খুশির উচ্ছ্বাসে একটু চঞ্চল হয়ে নবলা বলে—এইভাবে স্পষ্ট ক'রে বললেই শুনতে আমার ভাল লাগে কুশল।

নবলার খোঁপা থেকে ক্রিমের সুগন্ধ বাতাসে ভুরভুর করে, চিবুকে ছোট ছোট ঘামের বিন্দু হীরার কুচির মত চিকমিক করে। রঙীন মোমের মত মসৃণ দুটি বাহুতে যেন অদ্ভুত এক রক্তাভ কোমলতার মায়া লতিয়ে রয়েছে ; সুন্দর-গড়ন গলায় সরু হারের লকেটে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জ্বলে। কুশল অবাক হয়ে দেখতে থাকে। এই মেয়েকে হাজার নিঃশ্বাসের বেদনা দিয়ে ধরা যায় না, শত করুণ কথার আবেদন দিয়ে আপন করা যায় না। এই সুখ আর গর্বের অসাধারণ রূপকে শুধু সুখ

আর গর্বের উপহার দিয়েই বুকের উপর নিতে পারা যায়। এবং যে পারবে সে-ই পৃথিবীর মধ্যে না হোক, অন্তত মহারাজপুরের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সুখী ও অসাধারণ হয়ে যাবে, তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে ?

এইবার নবলাই জিজ্ঞাসা করে—কি ভাবছো ?

কুশল—কিছু না, চলি এবার।

নবলা—দূর হলেও হ্যাপি মুকে যেতে ভুলো না।

কুশল যেন ভয়ে ভয়ে হাসে—ভুলতে পারি না নবলা।

নবলাও হেসে হেসে বিদায় দেয় কুশলকে—এবার সুখবরটা একেবারে সঙ্গে নিয়েই আসবে, কেমন ?

যেতে যেতেই একবার থামে কুশল। হাসতে হাসতে যেন একটা বৃথা ঠাট্টার সুরে বলে—আর যদি খারাপ খবর থাকে, তা'হলে ?

শিরীষ গাছের হলদে পাতার দিকে আবার দৃষ্টিটা চলে যায় নবলার। কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে থাকে। মুখটা ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে যেন ভয়ার্ত স্বরে নবলা বলে—তা'হলেও এস।

কামরাঙ্গা গাছে নীলকণ্ঠ দম্পতি নিছক ঘুমের বিলাসে ডুবে আছে। ঝিলের জল বেশ স্বচ্ছ হয়েছে, আকাশও স্বচ্ছ, তবু ওদের পাখা একেবারে অলস হয়ে আছে, ছটফটানি বন্ধ।

সুখবরের জন্য আর বেশি ছটফট করতে হয়নি কুশলকে। নয়াদিল্লী থেকে একটা বড় রকমের চিঠি এসে গিয়েছে। চিঠি লিখছেন সোসাইটি, অনুমোদন করেছেন সরকারী পুরাতত্ত্ব সার্ভের প্রধান দপ্তর।

চিঠির বক্তব্য হলো—মহারাজপুর সার্ভে অফিসে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ সম্বন্ধে কতগুলি বিশেষ কারণে পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে হয়েছে। আরও বেশি মাইনে দিয়ে আরও বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগের নীতি গৃহীত হয়েছে এবং লোক নিয়াগ করাও হয়ে গিয়েছে।···সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে সাহায্য করার জন্য সুপারভাইজর নামে একটি নতুন পদও সৃষ্টি করা হয়েছে, মাইনে আরম্ভ পঁচাশি টাকা। আপনি যদি এই পদের প্রার্থী হন, তবে আপনার দাবিই সবচেয়ে আগে বিবেচিত হবে।

স্বপ্নের পৃথিবীটা যেন সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। কিছুক্ষণ প্রায় সংজ্ঞাহীনের মত বিছানার উপর পড়ে থাকে কুশল। আকস্মিকের একটি আঘাতে কুশলের

চিরকালের এত বড় আশাদীপ্ত চেতনাটা যেন এইবার মাথা তুলবারই শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

আকস্মিকের যে আবার একটা আঘাত ব'লে ব্যাপার আছে, এমন ক'রে কোনদিন বুঝতে পারেনি কুশল। রত্না ব্যাঙ্কের আঘাতটাকেও আকস্মিকের এত বড় নিষ্ঠুরতা ব'লে মনে হয়নি। আকস্মিক ভাবে নন্দা দেবী বাপের বাড়ির সম্পত্তি লাভ করেন, আকস্মিকভাবেই নবলার মত মেয়ের প্রণয় লাভ করা যায়, কিন্তু আকস্মিকের কাছ থেকে আঘাত পাওয়া যায়, এমন ধারণা কোনদিনই ছিল না কুশলের।

যোগ্যতায় তার চেয়ে যোগ্যতর মানুষ থাকতে পারে, একথাটাও কোনদিন তার চিন্তায় দেখা দেয়নি। আগে ছিল অবহেলা, আজ ঘৃণা আসে এই পৃথিবীর উপর, যে পৃথিবী তার চেয়ে যোগ্যতর মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়ে তার স্বপ্ন এভাবে ব্যর্থ করতে চায়।

আকস্মিকের এই ভয়ানক পরিচয় জানতো না কুশল, তার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। তাই বুঝতে পারে না কুশল, এর বিরুদ্ধে লড়বার পদ্ধতিই বা কি। সোসাইটির বিরুদ্ধে একটা মামলা করা যায়, কিংবা নয়াদিল্লীর দপ্তরের মন টলাবার জন্য আর একটা আবেদন করা যায়। কি করা যায় এবং কি করা যায় না, কিছু ভেবে উঠতে পারে না কুশল। নিজেকে এমন অসহায় সে কোনদিনও বোধ করেনি।

ছুটে যেতে ইচ্ছা করে নবলার কাছে। যদি গিয়ে তাকে একবার বলা যায়— এই খবর বিশ্বাস করো না নবলা, আমি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছি মনে করো না। আর একটু সময় দাও, পিয়ালের ছায়ায় যে স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আজই তার মেয়াদ শেষ ক'রে দিও না। এ চাকরি না হয়, অন্য চাকরি হবে। তোমার যোগ্য হয়েই আমি তোমার হাত ধরবো।

বলতে পারা যায় ; কিন্তু এমন ক'রে বলার সাহসও আজ মনের মধ্যে খুঁজে পায় না কুশল। আবার নতুন ক'রে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাভ কি ? আবার কোন্ আকস্মিকের আঘাত সে প্রতিশ্রুতিকে একেবারে অর্থহীন ক'রে দিয়ে যাবে। গরীবের বাড়ির একটি পাশকরা শিক্ষিত ছেলে, পঁচাশি টাকা মাইনে চাকরির সম্ভাবনা আছে, এই পরিচয় নিয়ে নবলার মত মেয়েকে আজ প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটা প্রহসনের মতই দেখাবে।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া নয়, এই অসহায়তার মধ্যে আজ প্রতিশ্রুতি খোঁজে কুশল। খোঁজে আশ্বাস। আনন্দ-সদনের এই বদ্ধ-দুয়ার কক্ষ থেকে হ্যাপি মুকের ক্রোটন-কুঞ্জ

অনেক দূরে এবং অনেক উর্ধ্বে। সে উর্ধ্বের অধীশ্বরীকে আশ্বাস দেবার যোগ্যতা নেই কুশলের। বরং, সেখানে গিয়ে, আজকের এই মূল্যহীন সত্তা নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে, তার করুণা জাগিয়ে, যদি আশ্বাস নিয়ে আসা যায়, তবেই কুশলের স্বপ্ন রক্ষা পায়। এছাড়া আর পথ কি ?

এলোমেলো চিন্তার উপদ্রব থেকে একটু মুক্তি পাওয়ার জন্য, অথবা একটু সুস্থভাবে চিন্তা করার জন্য ঘরের আবদ্ধতা ছেড়ে বাইরে বের হয় কুশল। বাগানে নেমে এদিক ওদিক পায়চারি করে, একটা রোগী যেন খোলা বাতাসে চলাফেরা ক'রে একটু প্রাণের জোর পেতে চাইছে।

অনেকটা সুস্থ বোধ করে কুশল। চিন্তার মধ্যে এই জ্বালার ভাব কমে যায়। নবলাকে ওভাবে এতটা অকরুণ মনে করা উচিত নয়। খারাপ খবর থাকলেও এস, নবলা নিজের মুখেই তো একথা বলেছে।

ঘরে ফিরে এসে কাগজ-কলম নিয়ে বসে কুশল। সোসাইটির কাছে নতুন ক'রে আবেদন জানায়, তার সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য। ঘর ছেড়ে একবার যায় কাছারি এলাকায়, আবেদনটা টাইপ করবার জন্য; তারপর যায় পোস্ট অফিসে। আবেদন পত্রটা রেজিষ্টারি ডাকে ছেড়ে দিয়ে আবার পথে এসে যখন দাঁড়ায় কুশল, তখন অপরাহ্ণ বেলা। ঘড়িঘরের ছায়া পূর্বমুখী হয়েছে। শীতের আমেজ লেগে সড়কের দেওদারগুলি সির সির করে। ক্লান্ত বোধ করলেও ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কুশল। প্রথমে পার্ক রোড, তারপর ক্রস রোড, তার পর কোথাও থেমে না থেকে আরও দূরের পথ ধরে কুশল।

পৌঁছতে হলো সন্ধ্যা। এত বড় বাড়ির মধ্যে নবলাকে কতক্ষণে খুঁজে পাওয়া যাবে কে জানে ? হ্যাপি-হুকে ঢুকেই প্রথমে একটু অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে থাকে কুশল।

তিনটে মোটরগাড়ি দাঁড়িয়েছিল ভিতরের লনের উপর। প্রখর দীপালোকে উজ্জ্বল হয়ে জন সাতেক অভ্যাগত সবচেয়ে প্রথম বড় ঘরটার মধ্যে বসেছিলেন। তার মধ্যে মৃগেনবাবু সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। বাইরে আবছা অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল, এই উজ্জ্বলতার মধ্যে প্রবেশ করবার সাহস তার নেই। এর মধ্যে কোন প্রয়োজনও নেই কুশলের।

যাকে পাওয়া প্রয়োজন, তাকে খুঁজে পেতে দেরি হলো একটু। চাকর বনমালীকে দেখা গেল না, দেখা হলো এক খানসামার সঙ্গে। খানসামাই পথ দেখিয়ে কুশলকে নিয়ে গেল মিস বাবা নবলার কাছে। মসৃণ মার্বেলের সিঁড়ি পার হয়ে দোতালার একটা কক্ষে।

হ্যাপি-নুকের ঐ নয়নাভিরাম ঐশ্বর্যের মধ্যে নবলাকে মানিয়েছে কি সুন্দর! এই ঘরটাতেও আলো জ্বলছে, তবু নবলা না থাকলে বোধ হয় ঘরটাকে এত রঙীন আর উজ্জ্বল মনে হতো না। একটা বড় কৌচ, ঝকঝকে ঝালরওয়ালা বিলাতি ব্রোকেডে জড়ানো। ফুলদানের উপর ফুলের মতন, কৌচের উপর ফুল্ল হয়ে বসেছিল নবলা।

হাসিমুখে কুশলকে অভ্যর্থনা জানায় নবলা—বসো।

কৌচের উপরেই বসবার জায়গা ছিল, নবলার পাশে। কিন্তু ওখানে বসতে পারে না কুশল, ঐ জায়গাটিই যে আজ অনিশ্চয় হয়ে গিয়েছে আকস্মিকের আঘাতে। অন্য একটা চেয়ারের উপর বসে কুশল জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায়?

—এই তো কিছুক্ষণ হলো মা বাইরে চলে গেলেন।

—কোথায়?

—আমাদের যে গাড়িটা কেনা হবে, সেটারই ট্রায়াল নিতে গেছেন। মার্কেট পর্যন্ত গিয়ে এখুনি ফিরে আসবেন।

—বাইরের ঘরে কারা সব এসেছেন মনে হলো।

—হ্যাঁ, ওঁরা সব হলেন কোলিয়ারির লোক।

—মৃগেনবাবু কি নতুন কোন কাজ ধরেছেন?

—হ্যাঁ, বিজনেস। মা'র নামে একটা কোম্পানি খুলেছেন বাবা।

—মা'র নামে কেন?

প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে এক ঝলক খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে নেয় নবলা। —ওটা বাবার একটা বাতিক। মা'র নামটা নাকি খুব পয়া, বাবার এই বিশ্বাস। গাড়িটাও মা'র নামে কেনা হয়েছে।

খানসামা এসে চা দিয়ে চলে যেতেই নবলা বলে—তোমার খবর কি?

কুশল—খবর এসেছে।

নবলা—ভাল খবর তো?

কুশল—না।

এই সংবাদে নবলারও স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যাবার কথা। পিয়াল ছায়ার প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তবু নবলার সুন্দর মুখটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে না, এক বছরের অনুভব ব্যথায় দীর্ণ হয়ে যায় না। শুধু চুপ ক'রে বসে থাকে নবলা, এতদিন পরে যেন শুধু গল্প করার মত একটা উপকথার খেই হারিয়ে গিয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।

কথা বললো কুশল—তোমার কষ্ট হচ্ছে নবলা ?

নবলা শান্তভাবেই বলে—না, লজ্জা পাচ্ছি।

কুশল—এ লজ্জা আমার ; তোমার তো কোন দোষ নেই।

মুখ ঘুরিয়ে কৌচের কাঁধে চোখ দুটো কয়েক মুহূর্ত চেপে রাখে নবলা, উত্তর দেয় না। তারপরেই সন্ত্রস্তের মত বলে—আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছে কুশল, চল বাইরে যাই।

ঘরের বাইরে এসেও নবলা থামে না, কুশলকে সঙ্গে নিয়ে শুধু চলতে থাকে। থামবার মত ঠিক জায়গা যেন আর নেই। ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে সিঁড়িতে—লনের উপর, ক্রোটন কুঞ্জের পাশে, আলো-ছায়ায় বা অন্ধকারে, কোথাও মুহূর্তের জন্যও থামা যায় না। কুশলের পাশে সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে বোধ হয় ভয় করছে নবলার।

হ্যাপি হুকের ফটক পার হয়ে একেবারে রাস্তার উপরেই এসে থামে নবলা, কুশলও থামে।

নবলা বলে—বড় অস্বস্তি হচ্ছে কুশল, কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

কুশল—আমাকে শুধু একটি কথা বলে দাও নবলা।

নবলা—কি ?

কুশল—বল, আমার অপেক্ষায় থাকবে ?……আমাকে সময় দাও, তুমি এরকম হতাশ হয়ে সব শেষ ক'রে দিও না নবলা।

নবলা—এ রকম ক'রে আজ আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না কুশল, আমি উত্তর দিতে পারবো না। আজ আমার কোন কথা বলবার সামর্থ্য নেই।

কুশল—আচ্ছা, আজ চলি। কাল আসবো।

এইবার সত্যি সত্যি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে নবলা—না, না, ভুল ক'রো না কুশল। ভাল ক'রে চাকরির চেষ্টা কর। আমি না ডাকলে এস না।

পথের উপর একটা মোটরগাড়ির হেড-লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ে, জোরে হর্ণ বাজিয়ে গাড়িটা ছুটে আসছে, পথ থেকে সরে যেতে বলছে, বোধ হয় নন্দা দেবীর নতুন গাড়ি।

কুশল বিদায় নেয়—আচ্ছা, আসি।

স্বপ্নের ঘোরটা রয়েই গেল। নবলা আবার যেদিন কাছে ডাকবে কুশলকে, তারই জন্য প্রতীক্ষা। আর রইল ঘৃণা—এই পৃথিবীকে, এই বাড়িকে, আর

এই বাড়ির বাপ-মা বিজয়বাবু ও মিত্রা দেবীকে ঘৃণা ক'রেই দিন কেটে যায় কুশলের।

অথচ এই বাড়ির ঐ কক্ষটি ছাড়া এখনও তার আর কোন ঠাঁই নেই, এবং এখনও এই বাড়ির অন্ন ছাড়া বেঁচে থাকারও আর কোন সঙ্গতি নেই। কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠ নয় কুশল, সে আধুনিক সেণ্ট ডেনিসের শিক্ষিত মানুষ। এমন ঘৃণার ঘর ছেড়ে ঝড়ের আকাশে আত্মহারা হয়ে যাবার দুঃসাহস তার নেই। নীড় রচনার শক্তি নেই, জীবিকা অর্জনের সামর্থ্য নেই। আছে শুধু কতগুলি আকাঙ্ক্ষার গর্ব, এবং এই গর্ব নিয়ে সে পৃথিবীর উপর অসহায় হয়ে পড়ে থাকতে পারে এবং সে পৃথিবীকে ঘৃণাও করতে পারে।

এই নিরুদ্যম অবসাদের জীবনে পৃথিবীর উপর ঘৃণা ছাড়া আর একটা জিনিস সম্বল হয়ে আছে কুশলের। একটি কল্পনা। আকস্মিকের অনুগ্রহে একদিন রত্নময় হয়ে উঠবে তার জীবন, সেই দিন এই নগণ্যতার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সোজা পথ ধরে হ্যাপি মুকের অন্তর্লোকে অনায়াসে চলে যেতে পারবে। এই কল্পনাকে বিশ্বাস করতে ভাল লাগে, ভাল লাগতে লাগতে কল্পনাই একটা বিশ্বাস হয়ে ওঠে।

আমলকীর জঙ্গলে হরভবনের স্তূপ খুঁড়ে ভারত ইতিহাসের কতগুলি জঞ্জাল তোলা ছাড়া কি আর কোন গৌরবের চাকরি নেই? সার্ভে অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদের চেয়ে কি বড় মাইনের আর কোন পদ নেই? খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে বেছে বেছে যত বড় বড় চাকরির জন্য দরখাস্ত করে কুশল। বড় মোহ আর বড় বিশ্বাস নিয়ে দরখাস্ত লেখে। মনে হয় ব্যর্থ হবে না। ভাগ্যের দরবারে এই দিনের পর দিন আবেদন, তার মধ্যে কি একটিও সার্থক হবে না? গল্পে আছে, এইভাবে ঠুকে ঠুকেই তো পাগলের লোহার শিকল সোনা হয়ে গিয়েছিল, পরশ পাথরের ছোঁয়ায়।

দরখাস্তের উত্তরগুলি আসে। শুধু না, না, না, চাকরি হয় না। পরশ পাথর নেই কোথাও। কদর্য ধুলো ছাড়া আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে। কোন আবেদন সোনা হয়ে যায় না।

তবু আবার আবেদন করে, না ক'রে উপায় নেই। যদি সোনা হয়ে যায়, এই কল্পনার আশ্বাস ছাড়া আর কোন্ সম্বল আছে কুশলের?

একদিন বিকালের ডাকে একটা চিঠি এসে কুশলের কল্পনার আশ্বাসকে কিছুটা বাস্তবের রং লাগিয়ে দিল। পরশ পাথর কোথাও যেন আছে ব'লে মনে হচ্ছে। আশার চমক লাগে কুশলের চোখে।

স্যামুয়েল নামে এক ইহুদী সাহেবের বিরাট এক এস্টেট আছে। ঝালদা রোডের উপর তাঁর প্রাসাদতুল্য ভবন। জমিদারি, কোলিয়ারি, গালাকুঠি. আর ট্যানারি নিয়ে তাঁর বিরাট বিত্তসাধনার ক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে মহারাজপুরের চারদিকে। মহারাজপুর শহরের মধ্যেও আছে। ক্রস রোডের উপর কুড়িটা বাড়ি, আর মার্কেটের কাছে সিনেমা হাউসটা স্যামুয়েল সাহেবের এস্টেটেরই জিনিষ। এ হেন এস্টেটের ম্যানেজার চাই, মাইনে আটশো টাকা, তা ছাড়া গাড়ি ও বাংলো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই কাজটার জন্য দরখাস্ত করেছিল কুশল। সেই দরখাস্তের উত্তর আসেনি, কিন্তু দরখাস্ত সম্পর্কে একটি চিঠি এসেছে। পত্রলেখক জনৈক চক্রবর্তী কুশলকে জানিয়েছেন, ঐ কাজ সম্পর্কে কতগুলি জরুরি বিষয় আলোচনার জন্য তাঁর সঙ্গে কুশল যেন দেখা করে। সাক্ষাতের স্থান স্টেশন ক্লাবের বার, চার নম্বর কামরা। সাক্ষাতের সময়—সন্ধ্যা সাতটা। আর তারিখটা? আজই সেই তারিখ।

সাতটা বাজতেও বেশি দেরি নেই। কুশলের ব্যস্ততা প্রায় প্রমত্ততা হয়ে ওঠে। বহুদিন পরে ভাল ক'রে প্রসাধন করে কুশল! বহুদিন পরে আবার ট্রাউজার আর কোটের উপর বুরুশ চালায়। সুসজ্জিত হয়ে ট্যাক্সি চড়ে এক নতুন আশার আহ্বানে উদ্দীপ্ত মন নিয়ে স্টেশন ক্লাবের দিকে রওনা হয়।

যখন ফিরে আসে কুশল, তখন রাত্রি দশটা। ফিরে আসার সময় আর ট্যাক্সি নয়, হেঁটে হেঁটেই এসেছে। সে প্রমত্ততাও ছিল না। ছিল না সে উদ্দীপ্ত ভাব। ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢোকে না কুশল, অবসন্নের মত হলঘরের অন্ধকারে চেয়ারের উপর বসে থাকে। বোঝা যায়, কুশলের লোহার অদৃষ্টে কোন পরশ পাথরের স্পর্শ লাগেনি।

চক্রবর্তীর পরামর্শ আর প্রস্তাবটার কথাই চিন্তা করছিল কুশল। এই ধরনের বড় বড় চাকরির পরশ পাথরকে আগেই নাকি কিছু সোনা উপহার দিতে হয়, নইলে পরশ পাথর প্রসন্ন হন না। অত্যন্ত গণ্যমান্য তিন ব্যক্তি নিয়ে একটা বোর্ড আছে, স্যামুয়েল সাহেবের এস্টেটকে পরামর্শ দেবার জন্য। এই বোর্ড অনুমোদন করলেই কুশল ম্যানেজারের পদ লাভ করতে পারে, নইলে নয়। অনুমোদন পেতে হলে বোর্ডকে প্রসন্ন করতে হয়। বোর্ডের এই প্রসন্নতার দাম হলো অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা। চক্রবর্তী প্রেরণা দিয়ে বলেছেন—এ খরচ সার্থক হবে মশাই, যা-তা চাকরি তো নয়। মাসোহারার কথা বাদ দিন, উপরির যে সীমা নেই।

হলঘরের এই আনন্দসদনের অন্ধকারে অনন্তকাল হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকলেও ত্রিশ হাজার টাকা কখনও হাতে আসবে না। কোন বাহুবলেও এই মুহূর্তে হাত

বাড়িয়ে ত্রিশ হাজার টাকার একটা তোড়া ধরা যাবে না। রত্না ব্যাঙ্ক যদি দরজা বন্ধ না করতো, আর আনন্দসদনের বৃদ্ধ যদি পরলোকে থাকতো, একমাত্র তবেই এই সুন্দর চাকরিটাকে বশীভূত করা সম্ভব হতো, ত্রিশ হাজার টাকার তোড়া ডালি দিয়ে। কিন্তু সে ভরসার তরু কবেই নির্মূল হয়ে গিয়েছে, আজ আর এই সব চিন্তার কোন অর্থ হয় না। এই অভিশপ্ত বাড়িটার জীবনের উপর আকস্মিক শুধু আঘাত দেয়, ঐশ্বর্য দেয় না। যেটুকু ছিল তা'ও একেবারে বাতিকের প্রকোপে অসার হয়ে গিয়ে ঘৃণা ও ঘৃণিতের আবাস হয়ে উঠছে বিজয় ইঞ্জিনিয়ারের এই সংসারটি। ভাবতে গিয়ে সহ্য করতে পারে না, ক্ষমা করতে পারে না কুশল।

একটা মোটরগাড়ি সশব্দে এসে ফটকের কাছে থামে। কৌতূহলী হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কুশল, কেউ একজন আসছে ব'লে মনে হচ্ছে। সুইচ টিপে হল ঘরের আলো জ্বালে কুশল।

একটা বড় চামড়ার সুটকেস প্রায় দু'হাত দিয়ে টানতে টানতে প্রৌঢ় বয়সের এক ভদ্রলোক এসে বারান্দার উপর উঠলেন। কুশল এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক চিৎকার ক'রে উঠলেন—এই যে বাবা কুশল, সব কুশল তো?

চেঁচিয়ে কথা বলাই ভদ্রলোকের অভ্যাস। অনেকদিন পরে দেখা হলেও কুশল চিনতে পারে, ইনি হলেন—গয়ার রমেশ কাকা, সম্পর্কে বিজয় বাবুর এক জ্ঞাতি ভাই।

রমেশ কাকার রব নিস্তব্ধ আনন্দ-সদনকে কাঁপাতে থাকে। কোথায় বিজয়-দা? বৌঠান কই? পুজোর ঘরে আছেন না কি? নিজের কথার আবেগে রমেশ কাকা যেন বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঢুকলেন হলঘরে, তারপর হলঘর থেকে ছিটকে পড়লেন ভিতর বারান্দায়। বিজয় বাবুর কাছে এগিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। বিজয়বাবু বলেন—বসো রমেশ। কিন্তু রমেশ কাকা এত সহজে বসবার পাত্র নন। এগিয়ে গেলেন মিত্রা দেবীকে প্রণাম করতে। মিত্রাদেবী পায়ে হাত দিতে দেবেন না, সসঙ্কোচে সরে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। রমেশ কাকা প্রায় তাঁকে তাড়া ক'রে গিয়ে ঢিপ ক'রে একটা প্রণাম করলেন।

—একটা রাত্রির মত জ্বালাতে এসেছি বৌঠান। আমার সঙ্গে পাউরুটি আছে, আপনি শুধু একবাটি মুগের ডাল রান্না করে দেবেন, বাস্।

মিত্রাদেবী মৃদু হেসে আপত্তি করেন—ও কি কথা? শুধু মুগের ডাল দিয়ে···।

রমেশ কাকা গর্জন করলেন—হ্যাঁ, স্রেফ একবাটি মুগের ডাল। এত রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা করতে পারবেন না।

গর্জন শেষ ক'রে তখুনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন রমেশ কাকা। জামাটা গা থেকে খুলে ঝপ ক'রে মেজের উপর ফেলে দিয়ে বলেন—স্টোভ থাকে তো দিন বৌঠান, আর কোথায় আপনার মুগের ডাল, নিয়ে আসুন। আমি এখানে বসেই দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী ক'রে নিচ্ছি।

মিত্রাদেবীর আপত্তিতে রমেশ কাকার ব্যস্ততা ব্যর্থ হয়। মিত্রাদেবী চলে গেলেন রান্নাঘরে। রমেশ কাকা হাত-পা ধুয়ে মেজের উপরেই এসে ধপ ক'রে বসলেন। তারপর একটু শান্ত হলেন। বিজয় বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন—সুখে-দুঃখে দিনগুলি একরকম মন্দ কাটছে না বিজয়দা। একটা বড় কাজে হাত দিয়ে ফেলেছি। সুধার-নগর থেকে বড়াচটি পর্যন্ত রোড তৈরীর কণ্ট্রাক্ট পেয়েছি। যদি একটু সামলে, খরচ টেনে টেনে দশ পারসেণ্ট মারজিন রেখে কাজটা সারতে পারি তবে……।

রমেশ কাকা হঠাৎ কথা বন্ধ করেন। তারপরেই কুশলকে লক্ষ্য ক'রে বলেন—চল হে কুশল, আমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বক বক করি। বিজয়দা'র শান্তি নষ্ট করা উচিত নয়।

হলঘরে ব'সে অনেকক্ষণ বকবক করলেন রমেশ কাকা। অনেক ইতিবৃত্ত, অর্থ উপার্জনের অনেক কর্মঠ উদ্যোগের ইতিহাস, অনেক অতীত ঘটনা। তারপর এলেন বর্তমানের প্রসঙ্গে।—কাজটা আরম্ভ হতে একটু দেরি আছে, তাই এখনও এই শহরে কোন অফিস খুলিনি। তোমাদের বাড়ির ঠিকানাতেই কুলি সর্দারদের আসতে বলে দিয়েছি। কাল সকালেই সব হাজির হবে। প্রত্যেককে দু'চার হাজার ক'রে আগাম ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে এত কুলি যোগাড় করা দুষ্কর।

সুটকেস খুললেন রমেশ কাকা। মস্ত বড় ও ভারি একটা নোটের থলি বের করলেন। তারপরেই চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন—বৌঠান, বৌঠান, একবার দয়া ক'রে এদিকে আসবেন।

মিত্রাদেবী আসতেই রমেশ কাকা থলিটা এগিয়ে দিয়ে বলেন—আমার এই ট্রেজারিটি আজকের মত আপনাদের কাছে রেখে দিন বৌঠান। কাল সকালে আবার নেব।

মিত্রাদেবী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। রমেশ কাকা গর্জন করেন—নিয়ে যান, নিয়ে যান। আপনাদের কোন সেফ টেক যা আছে, তার মধ্যে রেখে দিন।

নোটে ভর্তি নেটের থলিটা নিয়ে মিত্রাদেবী চলে যেতেই রমেশ কাকা তাঁর নিজের প্রসঙ্গে আসেন।—এইভাবে টাকা ঢেলে টাকা আনতে হয় কুশল। সর্দারদের হাতে আগাম টাকা দিতেই চল্লিশ হাজার টাকা বের হয়ে যাবে, তাতেও কুলোবে কিনা

সন্দেহ। কম তো নয়, প্রায় দেড় হাজার কুলিকে এক মাসের মজুরি আগাম দিয়ে গেঁথে রাখতে হবে।

মৃগেন বাবুর নামে কি-যেন বলতে গিয়েই হঠাৎ সামলে নিয়ে রমেশ কাকা বললেন। —নিজের টাকা ঢেলেও অনেক দাগা সহ্য করতে হয় কুশল, তার পর দুটো টাকা লাভ উঠে আসে।

সুটকেশ থেকে এইবার কাগজে মোড়া পাউরুটি বের করলেন রমেশ কাকা। গল্প বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ ঝিমোলেন, তারপরেই চোখ খুলে ক্লান্তস্বরে বলেন—কুশল, চল এবার ভেতরে যাই বাবা। মুগের ডালটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।

কুশল—আপনি যান, খেয়ে নিন। আমার একটু দেরি আছে।

রমেশ কাকা পাঁউরুটী হতে নিয়ে ভিতর বারান্দায় গিয়ে আবার মেজের উপর বসলেন। ডাক দিলেন—কই বৌঠান, ডালটা হলো ?

কুশলও নিজের ঘরে চলে যায়। স্টেশন ক্লাব থেকে ফেরার পর থেকে এখন পর্যন্ত তার সুট-সজ্জা ছাড়েনি কুশল।

জুতো আর মোজা খুলে কিছুক্ষণের মত অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে কুশল। উঠে গিয়ে জানালাটার কাছে দাঁড়ায়। তারপরেই কোটটা গা থেকে খুলে নিয়ে ব্র্যাকেটের হুকে ঝুলিয়ে রাখে। তারপরেই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়। আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন নিজের মুখের উপর গভীর অন্ধকারের প্রলেপ মাখতে থাকে। কুশলের হাত-পায়ের চাঞ্চল্যগুলি যেন তার ইচ্ছার বাইরে চলে যাচ্ছে, তাই কেমন একটা খাপছাড়া অস্থিরতা। যেন মনের ভিতর কিসের একটা বাধা অল্প অল্প ক'রে ভাঙছে।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল হিসাব রাখে না কুশল। প্রতিদিনের অভ্যাসমত আজ রাত্রে রান্নাঘরের নিভৃতে গিয়ে খাবার খেয়ে আসতেই ভুলে গেল

তখন হলঘরে ঘুমন্ত রমেশ কাকার নাকের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও ছিল না। ঘুমিয়ে পড়েছে আনন্দ-সদন, ঘুমিয়ে পড়েছে মহারাজপুর। কুশল ঘুমোতে পারে না। এই স্তব্ধতার মধ্যে পা টিপে টিপে হাঁটতে ইচ্ছা করে। এই অন্ধকারের মধ্যে আজ হাত বাড়িয়ে দিলে হাত ভরে উঠবে, আকস্মিকের উপহারে। দোতলার ঘরে বর্মা সেগুনের দেরাজে চল্লিশ হাজার টাকার থলি ঘুমিয়ে আছে। তুলে নিয়ে চলে আসতে কোন বাধা নেই। কেউ দেখবার নেই।

বুঝতে পারে কুশল, এমন সুন্দর আকস্মিকের সুযোগ যারা নিতে পারে না, তাদের

জীবনে হ্যাপি-মুক কখনও দেখা দেবে না। সুযোগও বার বার আসে না। বোধ হয় একবারই আসে এবং সে সুযোগ উপেক্ষা করার চেয়ে বড় মূর্খতা আর নেই। পাপ হবে? কে বলে? নিঃস্ব হয়ে, বেকার হয়ে অথবা বড় জোর একটা পঁচাশি টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে, নবলার মত মেয়েকে এই জীবন থেকে বিসর্জন দিয়ে একটা অমানুষ হয়ে যাবার চেয়ে বেশি পাপ কি আছে? রমেশ কাকার ক্ষতি হবে? ভবিষ্যতে একদিন ঘুমন্ত রমেশ কাকার বালিশের নীচে একটা চল্লিশ হাজার টাকার থলি লুকিয়ে লুকিয়ে রেখে আসলেই তো ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে।

সবই বোঝে কুশল। বুঝে চুপ ক'রে থাকে। তারপরেই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বিছানার উপর টান হয়ে শুয়ে পড়ে। আদালতের পাহারাওয়ালা ঘণ্টা বাজায়—ঢং ঢং। রাত দুটো। খোলা জানালা দিয়ে রাত্রির বুক থেকে একটা শীতল নিশ্বাস যেন কুশলের মাথার উপর এসে সির-সির করতে থাকে।

চক্রবর্তী টাকা চাইছেন। যেন শুনতে পেয়েছে কুশল; কানের কাছে হঠাৎ বেজে উঠেছে চক্রবর্তীর দাবী। তন্দ্রা ভেঙে যায়! ধড়ফড় ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কুশল। দরজা খুলে বাইরে আসে। বারান্দায় কেউ নেই, সিঁড়িতে কেউ নেই। সিঁড়ি ধরে দোতলার বারান্দায় পৌঁছেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল। মনে হলো নীচের তলায় কে যেন জেগেছে। উৎকর্ণ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনবার চেষ্টা করে। না, কেউ জাগেনি।

সিঁড়ির ডান দিকে এই প্রথম ঘরের ভিতরেই বর্মা সেগুনের দেরাজ আলমারি। দরজার কড়াতেও তালা লাগানো নেই। অন্ধকারে এতখানি পথ হেঁটে আসতে একটা হোঁচটও খায়নি কুশল, পথে একটা কাঁকরও ভুল ক'রে পড়ে নেই যে পায়ে বিঁধতে পারে।

হাত দিয়ে ঘরের দরজাটার উপর ঠেলা দেয় কুশল। সেই মুহূর্তে চারদিকের অন্ধকারটা যেন দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে। হাত সরিয়ে নেয় কুশল। পিছন ফিরে তাকায়। সত্যিই যে সিঁড়িতে আলো জ্বলছে, কেউ নিশ্চয় সুইচটা টিপেছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে কুশল। বুকের ভিতর নিঃশ্বাসের স্পন্দন এলোমেলো হয়ে যায়। বিজয়বাবু ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছেন। বিজয়বাবুর স্নান সারা হয়ে গিয়েছে। খালি গায়ের উপর একটা ধবধবে সাদা আলোয়ান জড়ানো।

দৃশ্যটা সহ্য করতে পারে না কুশল। আনন্দ-সদনের প্রেতাত্মা যেন একটা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে কুশলকে আক্রমণ করার জন্য সমাধি-গহ্বর থেকে উঠে আসছে।

পরিধানে শার্ট ও ট্রাউজার, গলার টাই তখনও একটা ফসকা গেরোর মতন লেগে

রয়েছে, খালি পা, উসকো-খুসকো চুল, কুশলের এই অস্বাভাবিক মূর্তি দেখে বিস্মিত হন বিজয়বাবু। প্রশ্ন করেন—কি ব্যাপার? শরীর খারাপ? ঘুম হয়নি?

কুশল—না, সে সব কিছু নয়।...আপনি কি খুঁজছেন?

বিজয়বাবু—বেরালটা আমার আসনের উপর ঘুমিয়ে রয়েছে। তাই ওপরতলায় এসেছি, ভোরের প্রার্থনাটা এখানেই সেরে নিই।

ভোর হয়েছে? চমকে উঠে অন্ধকারের দিকে তাকাতে গিয়ে কুশল দেখতে পায়, পুবের আকাশপ্রান্তে প্রভাময় একটা রেখা জেগে উঠেছে। তারাগুলি পালিয়েছে।

তা'হলে আর কোন আশা নেই! দুপ দাপ শব্দ ক'রে সিঁড়ি ধ'রে ছুটে নেমে যায় কুশল, আলোর সাড়া পেয়ে রাতের দস্যু যেমন চরম হতাশ হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

রাধেশবাবু, শক্ত ইটবাবু ব'লে যাঁর এত খ্যাতি ছিল এবং সেদিন পর্যন্ত খাটুনির দৈত্য ব'লে পাড়াপড়শি যাঁকে ঈর্ষা আর প্রশংসা করেছে, তিনি চূর্ণ হয়েছেন এতদিনে। রত্না ব্যাঙ্কের সিঁড়িতে মাথা ঠুকেছিলেন, কপালটা কেটে গিয়েছিল। কাটার ঘা'টা এখন শুকিয়েছে, রয়ে গিয়েছে শুধু দাগটা। মনে হচ্ছে, এ দাগটা এই জীবনে আর মিলিয়ে যাবে না।

কিছু জমিয়েছিলেন রাধেশবাবু। কে জানতো, রাধেশবাবুর মত এক ক্ষুদ্র সাবান বেচা মানুষ এতগুলি প্রাণী নিয়ে একটা সংসারকে খাইয়ে পরিয়ে আবার দু'পয়সা জমাতে পারে? জমেছিল মোট তেরশো টাকা, দশ বছরের সঞ্চয়। ভবিষ্যতের একটা মস্ত বড় আনন্দের ঘটনাকে উপঢৌকন দেবার জন্য যেন নীরবে ও গোপনে বিন্দু বিন্দু ক'রে এই পরিমাণ রুপোর কণিকা জমিয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে বেশ জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন—মাত্র তেরশো টাকা বলিস না স্বরূপা, আমার তেরশো সের রক্ত।

জোরে পাখার বাতাস দিয়ে শান্ত করতে চায় স্বরূপা। কথা দিয়েও শান্ত করবার চেষ্টা করে—গিয়েছে, বেশ হয়েছে, ওসব ভুলে যাও বাবা। তুমি যেমন ছিলে আবার তেমনি হও।

এতদিন পরে স্বরূপার মনের একটা পুরনো লোভও সার্থক হবার সুযোগ পেয়েছে। পাখার বাতাসে বা কথায় শান্ত না হয়ে যখন অবুঝ ছোটছেলের মত কান্নাকাটি করেন রাধেশবাবু, তখন আঁচল দিয়ে তাঁর চোখ-মুখ মুছে দেয় স্বরূপা। কিছুক্ষণের মত শান্ত থাকেন, তারপরেই আবার অস্থির হয়ে ওঠেন রাধেশবাবু। বেশ ভাল করেই ভেঙে

গিয়েছে ইটবাবুর সত্তা, জোড়া আর লাগে না, লাগার লক্ষণ দেখা যায় না। বরং দিন দিন আরও বেশি ক'রে ভেঙে পড়তে থাকেন।

ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন নেমেও পড়ছেন, যেমন শরীরের দিক দিয়ে তেমনি মনের দিক দিয়ে। বুকের মধ্যে একটা ধড়ফড়ানির ব্যারাম হয়েছে, জোরে কথা বললেই হাঁপাতে থাকেন এবং হাঁপানি আরম্ভ হলেই আরও জোরে কথা বলেন। যতক্ষণ পারেন মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন, নয়তো বসে থাকেন। উঠে দাঁড়াতে একেবারেই চান না। স্বরূপা হাত ধরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে, আবার মাদুরের উপর বসিয়ে দেয় রাধেশবাবুকে। অনুনয়ের সুরে বলে—তুমি একটু হাঁটা-চলা কর বাবা।

ছোট বউকে একদিন অকারণে একটা কড়া কথা বললেন রাধেশবাবু। করুণা ভাগ্নীও একদিন ধমক খেল। রাধেশবাবুকে মুড়ি দিতে সামান্য একটু দেরি করেছিল ছোট বউ; আর করুণা ভাগ্নীর অপরাধ, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, বার বার তিনবার এক গেলাস জল চেয়েও করুণা ভাগ্নীর কোন সাড়া শুনতে না পেয়ে রেগে উঠলেন রাধেশবাবু।

ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নী চুপ ক'রে থাকলেও এই অপমান একেবারে ভুলে থাকতে পারে না। না খেয়েই দিনটা পার করে দেয়। বিপদে পড়ে স্বরূপা। ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নীকে অনেক ক'রে বোঝাতে ও সাধতে হয়। তারপর আবার রাধেশবাবুকে এসে বোঝাতে হয়—তোমার যা দরকার, আমার কাছে চাইবে বাবা, আমাকেই ডাক দিও।

ক'টা দিন বেশ একটু সুস্থ হয়ে রইলেন রাধেশবাবু। যদিও হাঁটাচলা করেন না, তবু শান্তভাবে মাদুরের উপর বসে চিঠিপত্র লেখালেখি করেন। আর, ক'দিন পরেই এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক এসে রাধেশবাবুর বাড়ির দাওয়ার উপর উঠে ডাক দিলেন—রাধেশবাবু হ্যায় ?

রাধেশবাবু ঘরের ভিতর থেকেই উৎসাহিতভাবে সাড়া দিয়ে বলেন—জী হাঁ।

স্বরূপা আতঙ্কিতের মত প্রশ্ন করে—কি ব্যাপার বাবা ?

রাধেশবাবু—সাবানের কারবারটা বেচে দিচ্ছি।

স্বরূপা হাত চেপে ধরে রাধেশবাবুর—দিও না বাবা।

রাধেশবাবু—না দিয়ে উপায় কি ? কে চালাবে ?

স্বরূপা—তুমিই চালাবে। তুমি কি ভাবছো, তুমি আর ভাল হয়ে উঠবে না ?

রাধেশবাবু—না।

স্বরূপা—তবুও বেচে দিও না, আমরা চালাবো।

রাধেশবাবু—বাজে কথা বলিস না স্বরূপা।···যা যা, এখন যা এখান থেকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরদস্তুর ক'রে মারোয়াড়ির কাছে সব দেনা-পাওনার দায় আর সব মজুত মাল এবং জিনিষপত্র সমেত সাবানের কারবার বিক্রী করা হয়ে গেল। নগদ সাড়ে চারশো টাকা দিয়ে রসিদ আর খাতাপত্র নিয়ে মারোয়াড়ি চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর মারোয়াড়ির লোকজন দুটো গরুর গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছলো। বড় বড় কয়েকটা কড়া, তেলভরা পিপে, নানারকম কেমিক্যালের বাক্স, ছাঁচের বোঝা আর সাবানের স্তূপ রাধেশবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে টেনে নিয়ে গাড়ির উপর তুললো। রাধেশবাবুর দশ বছরের জীবিকার যজ্ঞক্ষেত্রটাকে দু'ঘণ্টার মধ্যে যেন উপড়ে তুলে নিয়ে চলে গেল গরুর গাড়ি, নিঃশব্দে বসে বসে রাধেশবাবু দৃশ্যটা দেখলেন। ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নী আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি দেখলো। সবার আড়ালে ঘরের ভিতর গিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে রইল স্বরূপা, কিছুই দেখতে পেল না।

সাড়ে চারশো টাকা ফুরিয়ে যেতে সহস্র বছর লাগবে, এই রকম একটা নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত ভাব নিয়ে বসে থাকেন রাধেশবাবু। তবু যে তিনি শান্ত হয়েছেন, এইটুকু দেখতে পেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয় স্বরূপা। এক একবার অনুরোধ করে—তুমি একটু উঠে দাঁড়াও বাবা। একটু চলাফেরা কর। আমি বলছি, ইচ্ছে করলেই পারবে, হাঁটতে ভাল লাগবে, ওঠ।

ঘাড় নেড়ে দৃঢ়ভাবেই প্রতিবাদ জানান রাধেশবাবু—উহুঁ, বুঝছিস না তুই। আমাকে বাতেও ধরেছে।

হাঁটুর কাছটা টিপে টিপে বাতের অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকেন রাধেশবাবু। স্বরূপা দুশ্চিন্তায় মুখ কালো ক'রে অন্য কাজে চলে যায়।

বেশিদিন লাগলো না। সাড়ে চারশো টাকার উপর একে একে কতগুলি বড় বড় দাবি এসে থাবা তুলে দাঁড়ালো। সময় বুঝেই এসে পড়লো বাড়িওয়ালার কয়েক মাসের পাওনা ভাড়ার কড়া দাবি। ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নী বার বার মুখ ভার করে, বটা কালু ও ঝুনুর শীতের জামা-কাপড় এখনও কেনা হলো না কেন?

সব দাবি মেটাতে গিয়ে আর কিছু থাকে না, থাকতে পারে না। ঐ সাড়ে চারশো টাকা, রাধেশবাবু দশ বছরের কারবারের অস্থি-ভস্মটুকুও ফুরিয়ে যায়। যেমন ঘরের বাইরের রক্তকরবীটা, তেমনি ঘরের ভিতরের প্রাণটা যেন শীতার্ত

শূন্যতার মধ্যে শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে বুক কাঁপে স্বরূপার। এই ভাবে ফুরিয়ে যেতে থাকলে কি হবে পরিণাম ?

ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নী এবার থেকে একটু অস্পষ্টভাবে অভিযোগ করে, তাঁদের বড় বেশি অচ্ছেদ্দা করা হচ্ছে, ছেলেপুলেদের কষ্ট হচ্ছে সব চেয়ে বেশি। একদিন অভিযোগটা একেবারে স্পষ্ট ক'রেই তারা ঘোষণা করে দিল, ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নী।

সে দিন রান্না করছিল ছোট বউ। স্বরূপা একটা ছোট শিশি নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। সরষের তেলের বড় বোতলটা থেকে শিশিতে তেল ঢেলে দিয়ে বোতলটা তাকের উপর উঠিয়ে রাখে স্বরূপা।

ছোট বউ তার দু'চোখের কৌতূহল তীক্ষ্ণ ক'রে ঘটনাটাকে দেখলো। তার পরেই স্বরূপার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—এ কি হলো স্বরূপা ?

স্বরূপা—কি হলো কাকিমা ?

ছোট বউ—তোমাদের সংসারে খুব বেশি তেল খরচ ক'রে দিচ্ছি, না ?

স্বরূপা চমকে অপ্রস্তুতভাবে তাকায়—ছোট শিশিতে তেল থাকলে হাতের কাজ করতে সুবিধে হয় কাকিমা ?

ছোট বউ—থাক, আর অমন ব্যাখ্যা ক'রে বলোনা। সবই বুঝি।

স্বরূপা উত্তর না দিয়ে চলে গেলেও ঘটনার জের মিটলো না। সে রাত্রে না খেয়ে শুয়ে রইলো ছোট বউ, করুণা ভাগ্নীও খেল না। আরও ভয়ানক—বটা কালু ও একরত্তি মেয়ে ঝুনুকেও না খাইয়ে তারা ঘুম পাড়িয়ে রাখলো। স্বরূপা এসে অবশ্য ঝুনুকে জোর ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেয়, কিন্তু মাঝ রাত্রি পর্যন্ত সাধাসাধি ক'রে ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নীকে খাওয়াতে পারলো না স্বরূপা। বটা আর কালুও ঘুমিয়ে রইল। খাওয়া হয় না স্বরূপারও।

হেঁসেল ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে অবসন্নভাবে কিছুক্ষণের মত দরজায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা। ভেঙ্গে পড়ছে সংসার। বোঝালে বোঝে না, হাত ধরে তুলতে গেলেও ওঠে না, আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছিয়ে দিলেও শান্ত হতে চায় না, শুধু ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। কি করলে এই ভাঙ্গন থামবে ? থামাবার শক্তি কই তার ? শান্তি মুড়িওয়ালি কাছেই থাকে ব'লে তাকে দিয়ে বাজার থেকে কেনা-কাটার কাজটুকু করানো যায়, এই মাত্র ; নইলে আর তো কেউ সহায় নেই তার।

যখন ঘুমোতে যায় স্বরূপা, তখন মাঝ-রাতও পার হয়ে গিয়েছে। শব্দহীন পৃথিবী যেন সব সহ্য ক'রে সমস্ত প্রাণের দৌরাত্ম্যকে শান্ত করে রেখেছে শেষ রাত্রির

গভীর নিদ্রা দিয়ে। কত সহ্য করছে পৃথিবী! স্বরূপার হঠাৎ মনে হয়, এছাড়া তার পক্ষেও আর কোন উপায় নেই, কারণ অন্য কোন শিক্ষাদীক্ষা বা গুণও তার নেই। এই নীরব পৃথিবীর মত শুধু সহ্য ক'রে ক'রে দুঃখের মানুষগুলিকে শান্ত করা আর ধরে রাখা ছাড়া আর কি সে করতে পারে?

কিন্তু ধরে রাখতে পারা গেল না।

গুম হয়ে বসেছিলেন রাধেশবাবু মাদুরের উপর। কিছুদিন হলো কথা বলা একরকম বন্ধ ক'রেই দিয়েছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্বরূপা ঝুনুকে নিয়ে রাধেশবাবুর কাছে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। রাধেশবাবুর জড়তা ভাঙবার জন্য এই একটি চিকিৎসার কৌশল বের করেছে স্বরূপা। কারণ স্বরূপা জানে, ঝুনুকে বরাবরই একটু বেশি আদর করতেন রাধেশবাবু। কাজ থেকে রাত্রিবেলা ঘরে ফিরে সবার প্রথম একবার মশারি তুলে ঘুমন্ত ঝুনুকে দেখতেন।

আজ ঝুনু রাধেশবাবুর একেবারে গা ঘেঁষে বসে আছে, তবু তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন না। গুম হয়েই আছেন।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে বাইরের ঘরে একটা ব্যস্ততার সাড়া ও কলরব শুনতে পেয়ে স্বরূপা কাজ ছেড়ে উঠে আসে। বাইরের ঘরে রাধেশবাবুর সামনে দাঁড়িয়েছিল করুণা ভাগ্নী ও ছোট বউ। বটা আর কালুও দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার উপর দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে ছোট বৌ কেষ্টনগরে, তার ভাসুরপো'র কাছে। করুণা ভাগ্নী যাচ্ছে তার জায়ের বাড়ি, পুরুলিয়াতে। শান্তি মুড়িওয়ালিও এসে দাঁড়িয়ে আছে, স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে তাদের গাড়িতে উঠিয়ে দিতে।

ছোট বউ আর করুণা ভাগ্নী রাধেশবাবুকে প্রণাম ক'রে বলে—আমরা চললাম, অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন রাধেশবাবু, কোন উত্তর দিলেন না। করুণা ভাগ্নী ঝট ক'রে হাত বাড়িয়ে যেন একটা ছোঁ মেরে ঝুনুকে হঠাৎ মাদুরের উপর থেকে তুলে নিজের কোলের উপর নিল। বিমূঢ়ের মত সেই রকমই তাকিয়ে রইলেন রাধেশবাবু। চলে গেল সবাই।

কোথা থেকে যেন একটা অদৃশ্য বাহু এসে, রাধেশবাবুর চারদিকে থেকে যত হাসি-কান্না, আদর-অভিমান আর মায়া-মমতা সবই নিয়ে চলে গেল। তবু তিনি যেন কিছুই দেখতে পেলেন না।

অনেকক্ষণ ধরে রাধেশবাবুর মাথায় পাখার বাতাস দেবার পর স্বরূপা প্রায় চিৎকারের স্বরে বলে—ঝুমুরা চলে গেল বাবা।

রাধেশবাবু আস্তে আস্তে উত্তর দেন—হুঁ, তাতে কি হয়েছে?

প্রত্যুত্তর শুনে একটু আশ্বস্ত হয় স্বরূপা, তবু সাড়া দিয়েছেন। রাধেশবাবু নীরব হয়ে গেলেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় স্বরূপা। রাধেশবাবু রাগ ক'রে দুটো কঠিন কথা বললেও স্বরূপা মনে মনে খুশি হয়, বিশ্বাস হয় বাবার মনটা তবু জেগে আছে।

দুর্ভাগ্যের দানকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে স্বরূপা। বাড়ির শূন্যতা ও নিস্তব্ধতা দেখে যদিও মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা চমকে ওঠে, তবু ভবিষ্যৎ নিয়ে আর ভয় করতে চায় না। এই শূন্যতার মধ্যে তার হাতের কাছে আছে শুধু একটি অসহায় মানুষের প্রাণ। দিন-রাত্রি হাত বুলিয়ে সেই প্রাণকে একটু সজীব ক'রে রাখতে চায় স্বরূপা। এ ছাড়া তার আর কোন কাজ নেই। কখনও পুতুল খেলার মত, কখনও বা ব্রতের খেলার মত রাধেশবাবুকে স্নান করাতে, ভাত খাওয়াতে আর ঘুম পাড়াতে হয়।

রক্তকরবীর গায়ে ফাল্গুনের প্রথম বাতাস লাগে। রাধেশবাবুকে ঘুম পাড়িয়ে জানালার কাছে এসে বসে থাকে স্বরূপা। তখন হঠাৎ মনে পড়ে স্বরূপার, এই বাড়িতে স্বরূপা নামে আর একটা মানুষ আছে, তার একটা মন আছে এবং সে মনের একটা ইতিহাসও আছে। যদিও ফাল্গুনের প্রথম বাতাস সে ইতিহাসের গায়ে লেগে কোন চঞ্চলতা জাগাবে না।

ভালবাসি—একথা বলা যায় না তাকে, বড় বেশি লোভীর মত শোনাবে কথাগুলি। ভালই হয়েছে, এমন ভয়ানক লোভের কথা তার কানে পৌঁছয়নি কখনও। ভালবাস—এমন কথাও বলা যায় না তাকে, বড় নির্লজ্জ কথা। একথা তার কাছে কোনদিন বলেনি স্বরূপা।

তবু ভাবতে বেদনা লাগে কেন? কিসের জন্য এবং কার জন্যই বা এই বেদনা! এ'কেই কি ভালবাসার মন ব'লে? সন্দেহ হয় স্বরূপার, এ হয়তো মনের বিকার, একেবারে অনর্থক। তার কাছে কিছু চাই না, শুধু কাছে কাছে থেকে দেখতে চাই—খায়ও হলো কি না, ঘুমলো কি না, সুখী হলো কি না, আর দুঃখ পেল না তো?

এই যদি ভালবাসা হয়, তবে আর দুঃখ কি? বাইশ বছর বয়সের জীবনে তার দশটি বছর স্বামীর ঘর করা হয়েই গিয়েছে। তারপর হয়েছে তার মৃত্যু। সেই মরা স্বরূপা যেন পরলোক হতে চুপি চুপি উঠে এসে ছায়া হয়ে এখন বসে আছে গভীর রাতের কোলে।

সব বুঝতে পেরেও আজ ঘুম আসে না স্বরূপার, ফাল্গুনের প্রথম বাতাস তার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। রাধেশবাবু ঘুমোচ্ছেন গভীরভাবে, একটানা অনেকক্ষণ ধরে, অন্য দিনের মত আজ ঘুমের ঘোরে থেকে থেকে আক্ষেপ বা আর্তনাদ করেন না। তবু স্বরূপা নতুন বাতাসের লোভ ছেড়ে দিয়ে একবার ঘরের ভিতরে যায়, রাধেশবাবুর মুখটা দেখে নিয়ে, আর মাথার বালিশটা একটু উঁচু ক'রে তুলে দিয়ে আসে।

নিজের উপর রাগ যে হয় না, তা নয়। কারণ, নিজেকে প্রশ্ন ক'রেও কোন উত্তর পায় না স্বরূপা, এমন করে ভালবাসলো কেন কুশলকে? লেখাপড়া ভাল ক'রে জানলে হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই খুঁজে বের করতে পারতো। তাই রাগ হয়, যে-মনে বুদ্ধি নেই সে-মনে এত দুঃসাহসই বা হয় কি ক'রে? কুশলের মন তো এই ভুল করেনি। দশ বছর ধ'রে কুশল তার বাবার ইট-বাবুর মেয়ে স্বরূপাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে পথের দিকে তাকায়নি। দশ বছর ধরে কেন, তার মধ্যে সুখ দুঃখের কোন একটি মুহূর্তে স্বরূপার কথা কি মনে হয়েছে তার? কখনই নয়। এমন প্রমাণ কোনদিন পায়নি স্বরূপা। তাহলে আজ আর রাতের রক্তকরবীর দিকে তাকিয়ে ছায়া-শরীর হয়ে বসে থাকতে হতো না। ভুল হয়েছে। হয় দশটি বছর ও-বাড়িতে ছুটোছুটি ক'রে সে ভুল করেছে, নয় প্রথমেই ভুলটা ক'রে নিয়ে তারপর দশটি বছর ছুটোছুটি করেছে। এর মধ্যে কোন্ ভুলটা সত্য? নিজেকে আজ এতদিন পরে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নেই, উত্তর পাওয়া যাবে না। এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেবার মত মনের বিজ্ঞান তার পড়া নাই।

ভুল হোক, বেদনা হোক, রাগ হোক—তার জীবনের ঐ দীর্ঘ দশটি বছরের আকুলতাই সবচেয়ে বড় সত্য। এই আকুলতার মৃত্যু হবে কি কোনদিন? ডাক আসবে না, অপেক্ষা করতে হবে না; এই আকুলতার মান রাখবার জন্য আকাশের কোন রাতের লগ্ন তার এই জীবনটাকে শাঁখা সিঁদুর আর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজাতে আসবে না। তবু এই আকুলতাকে সহ্য ক'রে যেটুকু বেদনার আনন্দ পাওয়া যায়, তাই সম্বল ক'রে তাকে দিন রাত্রির জীবন পার ক'রে দিতে হবে।

কয়েকটা দিন একটু বেশি ঘুমিয়ে আর নীরব থেকে তার পরেই রাধেশবাবু যেন একটু ভাল ক'রে জেগে বসলেন। গরুটা বিক্রি ক'রে দিলেন গোঁসাই পাড়ার এক গয়লার কাছে। গরুটা দুধ বন্ধ করেছে, এই অভাবের বাড়িতে প্রাণীটা এখন একটা ভার আর খরচ মাত্র। স্বরূপা আপত্তি করলো, রাধেশবাবু গ্রাহ্যই করলেন

না। স্বরূপা কেঁদে ফেলে। রাধেশবাবু বলেন—মায়াকান্না দিয়ে পেট চলে না স্বরূপা।

চোখ মুছে স্বরূপা আজ তীব্র বিস্ময় নিয়েই রাধেশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু ভয় পায় স্বরূপা, বাবা যেন এই ক'দিনের ঘুমের পর বেশ একটু কঠোর ভাবেই জেগে উঠেছেন। সব মায়াকান্নার দাবি তুচ্ছ ক'রে একে একে সব বিদায় ক'রে দেবার জন্য যেন তিনি তৈরি হয়েছেন।

গরু-বেচা টাকার বেশির ভাগ শেষ হয়ে গেল মুদির পাওনা মেটাতে এবং তার পরেই এল বাড়িওয়ালার বিল। এ-পাওনা শোধ করতে পারলেন না রাধেশবাবু, ঝগড়া করলেন বাড়িওয়ালার পিয়নের সঙ্গে। পিয়ন গালা-গালি দিয়ে চলে গেল।

সে রাতেই পড়লো ঢিল, প্রথম রক্তকরবীর মাথার উপর, তার পরেই আঙিনার উপর, ঘরের চালায় আর জানালার গায়ে। জেগে বসে রইলেন রাধেশবাবু। আদৌ বিমূঢ়ের মত নয়, বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছেন তিনি, অভাবের অপমান এইবার ভূতের উপদ্রব হয়ে, কুৎসিত আক্রোশ নিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেছে সব কিছু কেড়ে নেবার জন্য। আর উঠে দাঁড়িয়ে এই উপদ্রবকে পাল্টা ঢিল মেরে তাড়াবার শক্তি নেই তাঁর।

সারা রাত ধরে শুধু চিঠি লিখলেন রাধেশবাবু। একটা নয়, দুটো নয়, একটার পর একটা অনেকগুলি। চিঠি লেখার মত এতগুলি আপনজন পৃথিবীতে তাঁর আছে, এমন প্রমাণ কোনদিনও পাওয়া যায়নি। আজ হঠাৎ যেন তিনি ভূতের উপদ্রবে আতঙ্কিত হয়ে এক রাতের মধ্যে এক কুড়ির উপর সহায় আর সুহৃদকে আহ্বান জানিয়ে বসে রইলেন। গোটা তিনেক বিহিত সম্মান পুরঃসর, গোটা পাঁচেক প্রীতিভাজনেষু, দুজন সুহৃদ্বরেষু, দুজন পরমকল্যাণীয়েষু এবং আরও নানারকমের সম্ভাষণের আস্পদের কাছে আহ্বান। সাহায্য চাই—এই হলো সব চিঠির সার কথা। ভেঙে পড়ছে, আর নেমে পড়ছে শক্ত ইটবাবুর সত্তা।

সবশুদ্ধ চারজন সুহৃদ্বর দেখা দিলেন রাধেশবাবুকে ভূতের উপদ্রব থেকে পরিত্রাণের জন্য। এর মধ্যে একমাত্র শ্রীধরবাবুই রাধেশবাবুর পরিচিত। বয়সে রাধেশবাবুর সমান না হলেও বেশি ছোট নয়। রাধেশবাবু চিঠি পেয়ে একটু সহানুভূতির ভাব নিয়েই এসেছেন।

আর তিনজন যাঁরা এসেছেন তাঁরা রাধেশবাবুর পরিচিত নন; তাঁদের কাছে রাধেশবাবু কোন চিঠি দেননি। তাঁরা কে জানে কেমন ক'রে ভূতের উপদ্রবের সংবাদ পেয়েই রাধেশ বাবুকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছেন দৈব-প্রেরিত উপকারের

দূতের মত। এঁরা বয়সে রাধেশবাবুর চেয়ে অনেক ছোট। এঁদের মধ্যে একজনের সম্বল দরবারি কানাড়া, আর একজন কলিয়ারি অঞ্চলের নাটকীয় জীবনের বিখ্যাত রিজিয়া, আর একজন শুধু জিমন্যাস্টিক জানেন।

প্রতিদিনই এঁরা আসেন, রাধেশবাবুকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তার পর একে একে চলে যান। সবচেয়ে দেরিতে ওঠেন শ্রীধরবাবু।

দরবারি কানাড়া, রিজিয়া আর জিমন্যাস্টিক কয়েক দিনের মধ্যে শেষবারের মত এসে চলে গেলেন, আর এলেন না, বোধ হয় কোন সাড়া পেলেন না তাই। শুধু রয়ে গেলেন শ্রীধরবাবু।

শ্রীধরবাবুই একদিন একটা পাঁজি হাতে নিয়ে আর সিগারেট ধরিয়ে বেশ স্পষ্ট ভাষায় রাধেশবাবুকে প্রেরণা দিলেন।—আমার সংসার তেমন কোন ভিড়ের সংসার নয় রাধেশবাবু। ছেলেমেয়ে নিয়ে সবশুদ্ধ চারটি, তার মধ্যে দুটি তো বড় হয়ে উঠেছে, নতুন মাকে এরা বরং সাহায্য করতেই পারবে। ছোট দুটি, আর বিশেষ ক'রে সবচেয়ে ছোট ঐ জগুটা তো নতুন মা পেলে আহ্লাদে নেচে উঠবে।

রাধেশবাবু বলেন—সোনার সংসার, সোনার সংসার, আমাকে আর বেশি বলতে হবে না শ্রীধরবাবু।

শ্রীধরবাবু তবু বলতেই থাকেন।—সারাদিন দোকান চালিয়ে খেটেখুটে যখন ঘরে ফিরি, তখন মনটা কি চায় বুঝতেই পারছেন রাধেশবাবু। এই একটুখানি সেবা, এক আধটা ভাল কথা, তার চেয়ে বেশি একটা কিছু তো নয়? সেই দিক দিয়ে আমার মনে হয়, আপনার মেয়েটি···।

রাধেশবাবু—আর বলতে হবে না শ্রীধরবাবু।

শ্রীধরবাবু—আর একটু বলে নিচ্ছি রাধেশবাবু। আসল কথা হলো, আপনাকে সাহায্য করা; নইলে কোনই দরকার ছিল না। জগুর মা বিগতা হবার পর কম দিন তো হলো না, এর মধ্যে কত সম্বন্ধ এল আর গেল। একেবারেই গা করিনি। এ-শুধু আপনাকে সাহায্য করার জন্যই।

আরও কিছুক্ষণ বসে পাঁজির পাতা উল্টিয়ে নানারকম সুলগ্নের দিন ও তথ্য খুঁজলেন শ্রীধরবাবু। তার পর উঠলেন—আসি এখন, আর একদিন এসে দিনক্ষণ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি···।

রাধেশবাবু মাদুরের উপর বসেই একটু চঞ্চল হয়ে আপ্যায়নের সুরে বলেন—আসুন, আসুন, সব ভার আপনার উপর ছেড়ে দিলাম, আমার আর কিছু বলবার নেই।

শ্রীধরবাবু চলে যেতেই স্বরূপা এসে রাধেশবাবুর সামনে দাঁড়ায়। একটু ক্লান্ত দেখায় স্বরূপাকে, আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে, যেন এতক্ষণ ধরে একটা কঠিন কাজের উত্তেজনা ও ব্যস্ততার মধ্যে ছটফট করছিল মনটা, শরীরটাও।

—কার ওপর কিসের ভার ছেড়ে দিলে বাবা?

শান্তভাবে কথাগুলি বললেও স্বরূপার চোখের দৃষ্টিটা আজ ঠিক স্বরূপার মত নয়, একটু অস্থিরতার মধ্যে শাণিত হয়ে যেন ঝকঝক করছে।

রাধেশবাবু ক্রূরভাবে তাকিয়ে বললেন।—শ্রীধরের ওপর তোমার ভার।

স্বরূপা—ভুল করো না বাবা, আমার ভার কারও ওপর দেবার চেষ্টা করো না।

রাধেশবাবু—তার মানে?

স্বরূপা—তার মানে, আমার বিয়ে হতে পারে না।

রাধেশবাবু—কেন?

স্বরূপা মুহূর্তের মত অপ্রস্তুত হয়।—আমি বিয়ে করবো না।

রাধেশবাবু—করবে না তো ক'রো না, কিন্তু তোমার ভারও আমি আর বইতে পারবো না।

বলতে বলতে রাধেশবাবু হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠেন—অনেক করেছি, আর পারবো না। তুমি আমার তেরশো টাকার রক্ত খেয়েছ, হতভাগা মেয়ে, তোমার বিয়ের জন্যেই…।

ছলছল চোখ নিয়ে, ছোট্ট আদুরে মেয়ের মত রাধেশবাবুর হাত ধরে স্বরূপা—ওরকম ক'রে কথা বলো না বাবা।

রাধেশবাবু তিলমাত্র বিচলিত হলেন না। তেমনি চিৎকারের সুরে বলেন—একশো বার বলবো।

স্বরূপার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন রাধেশবাবু। হাতটা সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পর অবসন্ন রোগীর মত যেন কাঙাল দৃষ্টি তুলে আস্তে আস্তে বলেন—উপায় নেই স্বরূপা, নইলে চলবে কি ক'রে?

স্বরূপা—কার কথা বলছো?

রাধেশবাবু—আমার, আমি শ্রীধরের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, নইলে আমার চলবে কি করে?

স্বরূপা—শ্রীধরবাবুর টাকা ফেরত দিয়ে দাও।

রাধেশবাবু কঠোর ভাবে তাকান—তারপর? চলবে কি ক'রে?

স্বরূপা—আমি চালাবো।

শরীরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে; কি-যেন সন্দেহ করেন, এবং চোখ বড় বড় ক'রে জ্বালাভরা দৃষ্টি তুলে রাধেশবাবু যেন হুংকার চেপে প্রশ্ন করেন—কি ক'রে ?

স্বরূপা—জিজ্ঞেসা করো না। বলতে পারবো না।

চুপ ক'রে গেলেন রাধেশবাবু, তাঁর সন্দেহের হুংকার আর ধ্বনিত হলো না। জিজ্ঞাসা করবার আর কিছু নেই। স্বরূপা যেন তাঁকে একটি কথায় ভেঙে-পড়া আর নেমে-পড়ার শেষ ধাপে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আর কোন দুশ্চিন্তা করতে হবে না। টাকার জন্য স্বরূপা যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে চাইছে, নামবার নরক সেইখানে এসে ফুরিয়ে গিয়েছে, তার নীচে আর কিছু নেই।

যেন নিজের কাছ থেকে পালাবার জন্য খাটুনির দৈত্যের পঙ্গু আত্মাটা শেষ-বারের মত ছটফট ক'রে ওঠে। হাঁটুর বাত আর বুক ধড়ফড়ানির বাতিক ভুলে গিয়ে মাদুরের উপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ান। বাতাস হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যেয়ে, বাইরের ঘরের ভিতর গিয়ে ধপ ক'রে বসে পড়েন রাধেশবাবু। আর কোন কথা বলেন না।

স্বরূপা বার বার এসে অনুনয় করে, মিনতি করে, হাতে-পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—কথা বল বাবা, কথা বল। রাগ ক'রে বল, আমি কিছু মনে করবো না।

কোন উত্তর দেন না রাধেশবাবু।

সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। এসেছিল একটিবার কুশলের জীবনে, সৌভাগ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত নিয়ে। চক্রবর্তীর প্রস্তাবের কয়েক ঘণ্টা পরেই রমেশ কাকার আবির্ভাব, এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত কখনও আসে না। তবু সে ইঙ্গিত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, সুযোগ সার্থক করতে পারেনি কুশল, আনন্দ সদনের দুর্ভাগ্যের অপচ্ছায়া ঠিক সেই মুহূর্তে জেগে উঠে অন্ধকারের সুন্দর রাত্রিটাকে অসময়ে ভোর করিয়ে দিয়েছে।

আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে শক্ত ক'রে ধরার জন্য শেষবারের মত যেন সকল শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কুশল। সব ব্যর্থ ক'রে দিয়ে আঘাতটাও যেন শেষবারের মত বসিয়ে দিল তাকে। আর উঠতে হবে না।

কুশলের মনে আজ আর সন্দেহ নেই, তার স্বপ্নের আশা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য। সম্মুখে আর কোন পথ নেই, পথ ফুরিয়ে গিয়েছে। সব উদ্বেগেরও যেন অবসান হলো এতদিনে। পিয়ালের ছায়াতল আর হ্যাপিনুক—উঠে গিয়েছে বহু ঊর্ধে, সরে গিয়েছে বহু দূরে। সেখান থেকে কোন আহ্বান আসবে না কোনদিন,

কুশলের মত নগণ্যের কাছে। অসম্ভবের জন্য আর আশা ক'রে কাজ কি? প্রতীক্ষার কোন অর্থ হয় না।

এতদিন একটা স্বপ্নের পিছনে ছুটোছুটি করছিল কুশল, একমনে, একভাবে, তবু একটা কাজ ছিল। সে স্বপ্ন লুকিয়ে পড়েছে, পড়ে আছে শুধু কুশল একা, ক্ষয় হতে হতে একটুখানি ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

কোন মূল্য নেই এই ধ্বংসাবশেষের, পৃথিবীতে কোন কাজে লাগবে না। এর দ্বারা বড় চাকরি করানো যাবে না, বিলাত যাওয়ানো সম্ভব হবে না, নবলার মত রূপের মেয়ের রঙীন মনের প্রেম জয় করানো যাবে না।

এত দিন ধরে বাইরের পৃথিবীকে ঘৃণা ক'রে এসেছে কুশল। সেই ঘৃণার সাধনা পূর্ণ হয়েছে। এই পৃথিবীকে আর এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করা যায় না।

স্বপ্ন গেল, পৃথিবী গেল, তারপর নিজের যোগ্য একটা স্থান খুঁজে বের করে নিয়েছে কুশল, যেখানে নিজের হাতে ভাগ্য নিয়ে খেলা করা যায়—পাঁচু মুস্তফীর ক্লাব। কুশলের ধ্বংসাবশেষটুকু এখানে বেশ আনন্দেই রাত দুপুর পর্যন্ত সময় কাটিয়ে যায়, রাতও ফুরিয়ে দিয়ে যায় মাঝে মাঝে।

পাঁচু মুস্তফী বলে—শত্রুতে যাই বলুক কুশলবাবু, আমার ক্লাব হলো গুড লাকের ক্লাব। বলুক দেখি, কোন্ ব্যাটা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে, আমার ক্লাবে এসে ফতুর হতে হয়েছে? কেউ বলতে পারবে না।

মার্কেটের কাছে তুলোপটির এক গলিতে পাঁচু মুস্তফীর ক্লাবঘরে তক্তপোষের উপর বসে থাকে কুশল। যতক্ষণ না পার্টি আসে, ততক্ষণ পাঁচু মুস্তফীর কাছে নূতন পৃথিবীর গল্প শোনে। সব জানালা বন্ধ, গলির দরজাটুকু শুধু একটু ফাঁক করা, অল্পক্ষণ পর পর নতুন নতুন একেবারে অপরিচিত মানুষের দল ঘরে এসে ঢোকে এবং তাসের একটি দান পড়তে না পড়তেই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। খেলা শেষ ক'রে এক-একটা পার্টি চলে যায়; আবার নতুন লোক ঢোকে। নানা জাতের নানা পোষাকের লোক। পাঁচু মুস্তফী সন্তর্পণে জানালা খুলে যেন গলির অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে পাশের বুড়ো মিঞার হোটেল থেকে কাটলেট কেনে। বাধানো দাঁতের সেট মাড়ি থেকে খুলে নিয়ে কাটলেট চিবোয় পাঁচু। কুশলের দিকে তাকিয়ে বলে—নকল দাঁতে কাটলেট চিবিয়ে কোন আনন্দ পাই না কুশলবাবু। মনে হয়, যেন আমারই পয়সায় অন্য লোকে খেয়ে মজা মারছে। তাই···।

বাইরে থেকে জানালায় পরিচিত শব্দের টোকা পড়তেই আবার জানালা খোলে পাঁচু মুস্তফী, অন্ধকারের সঙ্গেই যেন দরদস্তুর করে। তারপর আলমারি খুলে বার

করে কবরেজি মদের বোতল, স্পেশাল সঞ্জীবনী। এক হাতে টাকা নিয়ে আর এক হাতে ক্রেতার হাতে বোতল তুলে দিয়ে আবার জানালা বন্ধ করে পাঁচু।

বেশ লাগে কুশলের, তুলোপটির গলির ভিতর এই ছোট ক্লাবঘরের আলোকে বাতাসে ও গন্ধে কেমন একটা উৎসব আছে, যার আস্বাদ সমস্ত স্নায়ুজাল নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে। তাকিয়াতে হেলান দিয়ে, সঞ্জীবনী-ঢালা কাচের গেলাস হাতে নিয়ে পাঁচু মুস্তফী অভিভাবকের মত বলে—তবে একটা কথা, দান দেবার আগে একটু সামলে ডিসিসন করতে হয়, বাস। একবার মার খেয়েই দমে যেতে নেই।

পাঁচু মুস্তফী হাই তুলে নিয়ে তার বক্তব্যটাকে আরও জোরে ধ্বনিত করে।—আরে মশাই, জীবনটাই তো একটা জুয়া, হারজিতের খেলা। আপনার মত এডুকেটেড মানুষকে কি আর এসব কথা বোঝাতে হয় কুশলবাবু?

মিথ্যে বলেনি পাঁচু মুস্তফী, এডুকেটেড কুশল বুঝেছে ঠিকই। ভাল লাগে পাঁচু মুস্তফীকে, ভাল লাগে তাসের জুয়া। জিতে জিতে মাঝরাত করতে, আর হেরে হেরে ভোর ক'রে দিতে। পাঁচ আনা রেখে আরম্ভ ক'রে দেড় ঘণ্টার মধ্যে বিজয়বস্তু হয়ে পঞ্চাশ টাকার নোট মুঠো ক'রে ধরতে মন-প্রাণ উল্লাসে শিউরে ওঠে।

ধুলপাহাড়ের মাথা থেকে চৈত্রের বাতাস মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হয়ে ছুটে এসে শহরের উপর ভেঙে পড়ে, তপ্ত শিলার নিঃশ্বাস লেগে গরম হয়ে ওঠে মহারাজপুর। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত শহরের বাতাসে শুকনো জ্বালা লেগে থাকে।

সন্ধ্যা একটু ঘন হবার পর প্রতিদিনের মত সেদিনও পাঁচু মুস্তফীর ক্লাবের দিকে যাবার জন্য বের হলো কুশল। বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ফাইল বগলে একজন পুলিশ অফিসার উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছিলেন। কুশলকে দেখতে পেয়েই প্রশ্ন করলেন—এটা আপনার বাড়ি? মানে আপনাদের বাড়ি?

কুশল—হ্যাঁ।

পুলিশ অফিসার খুশি হয়ে বললেন—একটা তদন্তে এসেছি মশাই, আপনার কাছেও কিছু খবর পেতে চাই।

কুশল—কিসের খবর?

পুলিশ অফিসার লজ্জিতভাবে বলেন—আর বলবেন না মশাই।

দূরে একটা ল্যাম্প পোস্টের দিকে আঙুল তুলে পুলিশ অফিসার বলেন—ফুলবাড়ির ঐ রাস্তায় রাধেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। কাঁচা বয়সের একটি মেয়েও তাঁর আছে। আপনি এ খবরটা জানেন তো?

কুশল—জানি।

পুলিশ অফিসার—ব্যাপার হলো, একটি বেনামি চিঠি এসেছে আমাদের কাছে। চিঠির অভিযোগে হলো, রাধেশবাবুর বাড়িতে সময়ে-অসময়ে আজে-বাজে লোকের যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা কুৎসিত কারবার চলছে। অবিলম্বে পাড়া থেকে ওদের উঠিয়ে দেওয়া হোক, এই হলো চিঠির অনুরোধ। এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য হলো……।

কুশল বিরক্তভাবে বলে—আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবার কিছু নেই।

পুলিশ অফিসার—কিছু মনে করবেন না মশাই। দু-পাঁচজন বিশিষ্ট প্রতিবেশী ভদ্রলোকের স্টেটমেণ্ট খুঁজছি, এইমাত্র। জিজ্ঞাস্য হলো, আপনি কখনও স্বচক্ষে এসব বেচাল কাণ্ড-কারখানার কিছু দেখেছেন?

কুশল—না।

পুলিশ অফিসার—বাস, এতেই আমার কাজ হয়ে যাবে। এইটুকুর জন্যই আপনাকে বিরক্ত করলাম।

নোট বইয়ে খসখস ক'রে লিখে নিয়ে পুলিশ অফিসার চলে গেলেন।

গেটের সামনেই রাস্তার ওধারে একটা কামারশালা। নেহাইয়ের উপর টকটকে লাল একটা তপ্ত লোহার পিণ্ড সাঁড়াশি দিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরে রেখেছে বৈজু কামার। দুটো ছায়ামূর্তি দুমদাম শব্দে তার উপর ঘান হাতুড়ির বাড়ি মারছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের একটা রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডকে হাতের কাছে পেয়ে কেউ যেন হাতুড়ি মেরে খেলা করছে।

কেন জানি হাসি পায় কুশলের। স্বরূপার কথা মনে পড়ে বোধ হয়। বড় কৌশলে বড় উপরে উঠতে চেয়েছিল সাবানওয়ালার মেয়ে। কিন্তু একটি ধাক্কাও সামলাতে পারলো না, সামান্য ক'টা দিনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। নেমে গেল, যতদূর নীচে নামা যায়।

হন হন ক'রে তীব্রবেগে হেঁটে চললো কুশল। পাঁচু মুস্তফীর ক্লাবে আলো জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ।

মাঝরাত্রি পার, নির্জন পথ, ল্যাম্পপোস্টের মাথায় ধোঁয়াটে আলো জ্বলে, তার নীচে দাঁড়িয়ে কুশল, মাথার ভিতর উগ্র সঞ্জীবনীর জ্বালা।

ফুলবাড়ির রাস্তা, আর একটা ল্যাম্পপোস্ট অনেক দূরে, মধ্যে ঘুমন্ত অন্ধকার, তার মধ্যে একটা বোবা রক্তকরবী, তার পাশে একটা বাড়ি, বাড়ির দরজার ফাঁক আর ফাটলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আলোর রেখা লেগে রয়েছে।

ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বলছে এখনও। প্রদীপের পাশে হয় ঘুমিয়ে, নয় জেগে বসে আছে সে, কুশলের এক ডাকে উঠে এসে প্রাণ দিয়ে দিতে পারে যে।

এগিয়ে আসে নিশাচরের অভিসার, কোন প্রাণীর প্রাণ নেবার লোভে নয়। একটি নারীর বাইশ বছর বয়সের যৌবন গ্রাস করবার লোভে। পাঁচু মুস্তফীর ক্লাবের তাস, আর মাঝরাত্রির স্বরূপা, মন্দ কি? দুইই সমান, লোকচক্ষুর আড়ালে দুটি উৎসবের খেলা, রাত ফুরোলেই ফুরিয়ে গেল। কার্নিভালের আসরের মত, দিনের বেলায় নিত্য মরে যাওয়া আর সন্ধ্যাবেলায় নিত্য বেঁচে ওঠা, জীবনে এর চেয়ে বড় বৈচিত্র্য আর কি হ'তে পারে? কালো অন্ধকারের যবনিকায় ঢাকা এই নতুন আনন্দের জীবনে স্বরূপাকে আজ যোগ্য সহচরীর মত পেতে পারা যায়। কারণ, এতদিনে পথে এসেছে স্বরূপা।

স্বরূপাকেও যে কখনও এত লোভনীয় ব'লে মনে হবে, কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি কুশল। ভাগ্যিস পুলিস অফিসার খবরটি দিয়ে গেল, আর পাঁচু মুস্তফী দিল এক গেলাস স্পেশ্যাল সঞ্জীবনী!

আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়ে কুশল, ঘরের ভিতর প্রদীপ কেঁপে উঠলো মনে হয়। আস্তে আস্তে ডাকে কুশল—স্বরূপা। ঘরের ভিতরে প্রদীপের গায়ে যেন হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটা লেগেছে মনে হয়।

—স্বরূপা। একটু স্পষ্ট ক'রে ডাক দেয় কুশল। দরজা খুলে যায়।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে স্বরূপা। মাথায় ভাঙা বেণী, গায়ের উপর এলোমেলো ক'রে জড়ানো শাড়ি, আঁচলটা কোমরের চারদিকে শক্ত পাক দিয়ে গোঁজা, ঘুমভাঙা চোখের কালো তারা দুটো অচঞ্চল, স্বরূপা কুশলের দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যিই তো সে এসেছে, স্বরূপার নীরব আকুলতার আরাধ্য হয়ে আছে যে। না, নিশির ডাক নয়, স্বপ্নের ছলনা নয়, সে-ই এসেছে।

পরিধানে ট্রাউজার আর শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল, গলায় লালরঙের একটা টাই, চোখ লাল, উসকো খুসকো চুল—রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে কুশলও দেখতে থাকে—হ্যাঁ লোভনীয় বৈকি। তুলোর মত নরম মাংস, ফুলেল শোণিত আর মাদক নিঃশ্বাস দিয়ে তৈরি একটা নারীর শরীর। দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের উপর তুলে নিয়ে, আর পিষে পিষে ঐ শরীরকে কাঁদিয়ে দিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছা করে।

কুশল বলে—চল, আমার সঙ্গে।

স্বরূপা—কোথায়?

কুশল—আমার ঘরে।

স্বরূপা—কেন ?

কুশল—কোন ভয় নেই, কেউ টের পাবে না, ভোর হবার আগেই ছেড়ে দেব।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা, তুলোর তৈরি মূর্তি মুহূর্তের মধ্যে যেন পাথরের মত হয়ে উঠেছে।

কুশল—এত কি ভাবছো স্বরূপা ?

স্বরূপা—ভেবেছিলাম তোমায় প্রণাম করবো, কিন্তু করবো না।

কুশল—কে তোমার প্রণাম চাইছে ?

স্বরূপা—জানি, তুমি প্রণাম নিতে আসনি।

কুশল—তবে আর কি ? আর বেশি কথা নয়, চলে এস।

স্বরূপা—চলে যাও তুমি।

কুশল—কি বললে ?

স্বরূপা—চলে যাও, আর কখনও এস না।

কুশলের চোখ দুটো জলে ওঠে। স্বরূপার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—জান, তোমাকে এই মুহূর্তে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যেতে পারি ?

স্বরূপা—না, পার না।

কুশল দাঁতে দাঁত চেপে বলে—জান, তোমাকে মেরে ফেলতে পারি ?

স্বরূপা—হ্যাঁ জানি, সে অধিকার তোমার আছে।

কুশল শান্ত হয়—বেশ তো, তবে চল, যখন জান আমার অধিকার আছে……।

স্বরূপা—আমি তো জানি, কিন্তু তুমি জান কি ?

কুশল—কি ?

স্বরূপা—আমার উপর তোমার অধিকার আছে ?

কুশল—জানি বৈকি, দশ বছর ধরে পাশে পাশে ঘুর ঘুর ক'রে লোভ দেখিয়েছ আমাকে, আমার অধিকার হবে না তো কার হবে ?

স্বরূপা—আমি না হয় লোভ দেখিয়েছি, কিন্তু তুমি কি লুব্ধ হয়েছ ?

কুশল—হয়েছি বৈকি, নইলে আসবো কেন ?

স্বরূপার চোখের তারা দুটো টলমল ক'রে ওঠে। দশ বছরের ইতিহাসে যে ধ্বনি কখনও শোনা যায়নি, তাই শোনা হলো আজ। এই প্রথম। যার উপর অধিকার আছে, যার উপর লোভ হয়, ঘৃণায় চক্ষু দিয়েও তাকে আজ যেন দেখতে পাচ্ছে কুশল। কিন্তু তাকে বুঝবার মত শক্তি নেই।

স্বরূপা বলে—তুমি যাও, এভাবে আমার কাছে আসতে নেই।

কুশল—কেন, তুমি কি ? কোথাকার মহীয়সী ?···টাকা দিলে নিশ্চয় চলে যেতে বলতে না ?

স্বরূপা—টাকা ?

কুশল বিদ্রূপ করে—ওঃ, একেবারে অবাক হয়ে গেলে যে ! তোমাদের চলছে কি করে ?

স্বরূপা হেসে ফেলে—শাস্তি মুড়িওয়ালিকে জিজ্ঞাসা ক'রে শুনে নিও।

কুশল—তার মানে ?

স্বরূপা—তার মানে মুড়ি বিক্রি ক'রে দিন চলছে, আর ভালই চলছে।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে কুশল—কিন্তু পুলিশ অফিসার যে বললেন।······

স্বরূপা—কি বললেন ?

কুশল—এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে নানারকম লোক-জন আসে, আর তুমি·········।

স্বরূপা আবার হাসে—বেনামি চিঠির কথা বলছো ?

কুশল—হ্যাঁ।

স্বরূপা—ওটা বাড়িওয়ালার কীর্তি, বাড়ি থেকে ওঠাতে চায়। পুলিশ অফিসারকে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে শুনে নিও।

কুশল অদ্ভুতভাবে শূন্যদৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে স্বরূপার মুখের দিকে। যেন নেশা ছুটে গিয়েছে, চোখে জ্বালা নেই। বিড় বিড় ক'রে বলে—তবে বৃথা এসব···তোমাকে এত ঘেন্না করতে এখানে এলাম কেন ? আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছি ?

স্বরূপা—আমাকে ঘেন্না করতে যদি ভাল লাগে তো করো, কিন্তু···।

ঘেন্না করবে কা'কে ? দু'চোখ ভরে দেখে নিয়েও যেন স্বরূপাকে চিনতে পারছে না কুশল। রাধেশবাবুর মেয়ে তো নয়, দশবছরের মধ্যে একদিনেরও জন্য এই মেয়েকে সে দেখেনি। প্রদীপের আলোটা যেন ফুলবাড়ির গলির অন্ধকারে নীহারিকার মত এক রহস্য ছড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে ফুটে রয়েছে স্বরূপা নামে একটা মূর্তি, শরীরটা শুক্লারাতের শেষযামের জ্যোৎস্না, মুখটা প্রভাত বেলা, আর চোখ দুটো সন্ধ্যা। এই অবাস্তব মূর্তির কাছে তো আসবার কথা ছিল না। ভয়ানক ভুল পথে চলে এসেছে কুশল।

স্বরূপার মুখের দিকে আর তাকায় না কুশল, তাকাতে পারে না। লোকচক্ষুর আড়ালে সংসারের একটা সহের মূর্তি যেন চরম অপমানের পরেও তার দু'চোখের দৃষ্টিকে অভিশাপ হয়ে জ্বলে উঠতে দিচ্ছে না, কিন্তু দিতে পারে এই মুহূর্তে। ভয় করে স্বরূপার ঐ মুখের দিকে তাকাতে।

স্বরূপা বলে—কিন্তু নিজেকে ঘৃণা করো না।

স্বরূপার কথাটা শেষ হতে না হতেই চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নেয় কুশল। তারপরেই শঙ্কিতের মত একটা লাফ দিয়ে সরে এসে রাস্তার উপর দাঁড়ায়। নামতে নামতে এতদিনে যেন পাথরের মত শক্ত ও কঠোর একটা ভয়ের হাতে পাল্টা ধাক্কা খেয়ে পিছন দিকে ছিটকে পড়েছে কুশল।

ভয় করে পিছনে তাকাতে, ভয় করে আশেপাশে তাকাতে, ফুলবাড়ির সড়কে মাঝরাত্রির অন্ধকার যেন জীবনদ্রোহী নিশাচরের জীবনের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। নিকটের এক গলির মোড় থেকে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাউণ্ডের পুলিস হাঁক দেয়—হল্ট্, খাড়া রহো।

দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় কুশল।

ভয় হয় বন্ধ-কপাট ঘরের ভিতর একা একা প'ড়ে থাকতে, ঘরের আলো নিভিয়ে দিতে, জানালা বন্ধ ক'রে দিতে। বাইরের সাড়া শব্দ যদি ঘরে না আসে, আলো যদি নিভে যায়, বাতাস যদি না ঢোকে, তবে এক মূহূর্তও থাকা যায় না এই ঘরে। কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠ ঘুমিয়ে পড়লেই মনে হয় প্রাণটা যেন একলা হয়ে গেল, এমনই অদ্ভুত রকমের ভয় ঢুকেছে কুশলের মনে।

বেশিক্ষণ নিজের ঘরে থাকতে পারে না কুশল। দু'চারটা বই তুলে নিয়ে ভিতর বারান্দায় এসে বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে মেজের উপর পা ছড়িয়ে। বাঘছালের চটি পায়ে দিয়ে বিজয়বাবু একমনে পায়চারি করেন। এক একবার দেখা যায়, মিত্রা দেবী রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দা পার হয়ে দোতালায় চলে গেলেন। আবার নেমে এসে চলে গেলেন তাঁর পূজোর ঘরের দিকে। এই সব সাড়াশব্দের একটু কাছাকাছি যেন থাকতে চায় কুশল।

বিজয়বাবু হয়তো অনুভব করেন এবং মিত্রা দেবী স্পষ্ট ক'রে দেখতেই পান, কুশল কিছুদিন থেকে তাঁদের কাছছাড়া হয়ে থাকতে চায় না। মিত্রা দেবী না ডাকতেই নিজে থেকে এসে খাবার খায়; রান্না না হতেই খাওয়ার জন্য দু'একবার এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যায়; কখনও বা খাবার ঘরে ঢুকে নিজেই আসন পেতে বসে থাকে। অনেকদিন পরে নতুন ক'রে যেন শৈশবের অভ্যাসটা আবার হঠাৎ দেখা দিয়েছে, যে শৈশবে বাবা-মা'র গা ঘেঁষে বসে থাকতে ভালবাসতো কুশল, আর পথে হারিয়ে যাবে ব'লে ভয় করতো। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে বিস্মৃত-প্রায় এক অতীতের অভ্যাস, কুশল যখন এত লেখা-পড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি।

কুশলকে দেখেও মনে হয়, পথে হারিয়ে যাবে বলে যেন একটা ভয় ঢুকেছে তার মনে। বাড়ির বাইরে যায় না। মিত্রা দেবী অনেক ভোরে ঘরের বাইরে এসে মাঝে মাঝে দেখতে পান, ভিতরের বারান্দায় মেজের উপর বালিশে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে কুশল। কিছুদিন থেকে গরম পড়েছে খুব, ঘরের ভিতর না শুয়ে বারান্দার খোলা হাওয়ার মধ্যে শুয়ে থাকলে তবু ঘুম হয়। ঘুমন্ত কুশলের মুখটা দেখলে মনে হয়, স্বপ্নের মধ্যে তার শৈশব যেন মা-বাবার কোলের উপর পড়ে রয়েছে।

কখনও বা কোন মধ্যাহ্নে নিজের ঘরের ভিতরেই শান্ত হয়ে বসে থাকে কুশল, বাগানের দিকে তাকিয়ে। কুয়োর আলিসায় তৃষ্ণার্ত কাক ঠোঁট ঘষে, নেবুগাছের মাথা রোদে পুড়ে পুড়ে নেতিয়ে পড়ে। ছাই-রং হয়ে যায় আকাশটা।

বুকের ভিতর অদ্ভুত রকমের একটা শূন্যতা বোধ করে কুশল। যা কিছু ছিল সেখানে, সবই যেন ঘৃণা ক'রে ক'রে একে একে হারিয়ে ফেলেছে সে। বিদ্যা দিয়ে ঘৃণা করেছে আনন্দ-সদনের শান্তিকে, সুখ-স্বপ্ন দিয়ে ঘৃণা করেছে পৃথিবীর দুঃখকে, অসাধারণ হবার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ঘৃণা করেছে মানুষকে।

ঘৃণা ক'রে ক'রে কাউকে ছোট ক'রে দিতে পারেনি কুশল, ছোট ক'রে দিয়েছে নিজেকে। কারও ক্ষতি করতে পারেনি, ক্ষয় হয়ে গিয়েছে নিজে। পুব আকাশের আলোর পারাবারের দিকে শ্রদ্ধার চক্ষু তুলে কোনদিন তাকায়নি, তার জন্য ছোট হয়ে যায়নি পুবের আকাশ, শুকিয়ে যায়নি আলোর পারাবার। তার ঘৃণ্য জীবনের ফুৎকারে নিভে যায়নি স্বরূপার প্রদীপ, নিভে গিয়েছে সে নিজে।

ভয় করে, বিশ্রী রকম কালি-ঝুলি মাথা একটা ভয়। ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসে কুশল। ভিতরের বারান্দার একদিকে সূর্যমুখীর কতগুলি টবের পাশে পর্দাফেলা আবছায়ার মধ্যে বেতের চেয়ারের উপর চোখ বন্ধ ক'রে বসে আছেন বিজয়বাবু। কুশল গিয়ে বিজয়বাবুর চেয়ারের কাছাকাছি মেজের উপর চুপ ক'রে বসে থাকে।

মিত্রা দেবী পুজোর ঘর থেকে ফেরেন, কুশলকে দেখে কি যেন ভাবেন, তারপর বলেন—কিরে, একটা বালিশ দেব?

কুশল বলে—দাও মা, ঘরের ভিতর বড় গরম লাগছে।

নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়তে পারে কুশল। তার পাশেই বেতের চেয়ারে বসে আছেন বিজয়বাবু, কুশল যেন একটা মন্দিরের ছায়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। গ্রীষ্মের তপ্ত মহারাজপুরের মধ্যে স্নিগ্ধতম একটি নিভৃত, একপাশে সূর্যমুখীর টব আর বেনা ঘাসের পর্দা। এক ঝাঁক চড়ুইও ছায়ার লোভে এই নিভৃতে এসে ঢোকে। উড়ে উড়ে

খেলা করে। মাঝে মাঝে বিজয়বাবুর গায়ের উপর, কখন বা মাথার উপর বসে। ধুলপাহাড়ের মাথা রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত বিজয়বাবু যেন নির্ভয় শান্তির ছায়া রচনা ক'রে ঠিক এই জায়গাটিতে বসে থাকেন।

কুশল ওঠ রে! ঘুমের মধ্যে বহুদিন পরে একটা স্নেহললিত কণ্ঠস্বরের আহ্বান কুশলকে উঠতে বলছে, শুনতে পায় কুশল। ঘুম ছেড়ে উঠে বসতেই কুশল বুঝতে পারে, বাবা ডাকছেন। বহুদিন পরে ডেকেছেন, এই ডাক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন। এতদিন পরে এই ডাক শুনতে কত ভাল লাগছে, আর কত নতুন বলে মনে হয়।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, তাই বিজয়বাবু কুশলকে ঘুম ছেড়ে ওঠবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, বিশু উকিলও বসে আছে, বোধ হয় বিজয়বাবুর সঙ্গে কোন কাজের কথা আছে।

বারান্দা ছেড়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বাগানের ভিতর গিয়ে একবার দাঁড়ায় কুশল। তারপর ঘোরাফেরা করতে থাকে। আজ অনেকক্ষণ ধরে বাগানের অন্ধকারে হাজার হাজার পাতা ও ফুলের নিঃশ্বাস মেশানো বাতাস গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগলো কুশলের।

—কুশল শোন রে! আবার ডাকলেন বিজয় বাবু! কারণ খাবার সময় হয়েছে।

একে একে আনন্দ-সদনের পুরনো আদরগুলি যেন সাড়া দিয়ে জেগে উঠছে। একে একে শুনতে পাচ্ছে কুশল। খেতে বসে স্বচক্ষে আবার নতুন ক'রে দেখতেই পায়, বিজয়বাবু এসে তাঁর রাত্রের খাবার কয়েক টুকরো ফল রেকাবি সুদ্ধ কুশলের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন—নে, তুই খেয়ে ফেল, আমি আজ আর কিছু খাব না।

ঘুমটাও এল অনেক রাতে একটা সান্ত্বনার নিবিড়তা নিয়ে এবং তারও অনেক পরে, একটা আচমকা ঘটনায় আনন্দ-সদনের স্তব্ধতা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল।

—শাঁখ বাজালো কে?—কে ঢুকলো পূজোর ঘরে? বলতে বলতে ধড়ফড় ক'রে ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠলেন মিত্রা দেবী। দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। উতলা হয়ে ছুটে এলেন ভিতর বারান্দায়।

গ্রীষ্মের শেষ রাত, ঠাণ্ডা বারান্দার মেজের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল কুশল। কম্পিত স্বরে মিত্রা দেবী ডাকতে থাকেন,—শাঁখ বাজালো কে?—বারান্দায় আলো নেই কেন? সে গেল কোথায়?

মিত্রা দেবীর ডাকে চমকে জেগে ওঠে কুশল। উঠেই বারান্দার সুইচ টিপে আলো

জালে। শঙ্কিতভাবে মিত্রা দেবীর দিকে তাকায়। মা'র মুখে এতটা উতলা ভাব কোনদিন দেখেনি কুশল।

কুশল—কি হলো মা?

মিত্রা দেবী—শাঁখ বাজালো কে?

কুশল—কই, আমি তো কিছু শুনিনি।

মিত্রা দেবী—তুই তো ঘুমিয়েছিলি।

কুশল—তুমি কি ঘুমোওনি?

মিত্রা দেবী—হ্যাঁ ঘুমিয়েছিলাম, তবু যেন শুনলাম।

কুশল—তুমি স্বপ্নের মধ্যে শুনেছ মা।

মিত্রা দেবী—স্বপ্নের মধ্যেই বা শুনবো কেন?

উত্তর দেয় না কুশল। মিত্রা দেবী বারান্দার এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকেন। তার পরেই আরও উতলা ভাবে বলেন—সে গেল কোথায়?

কুশল ভয় পায়। তাই তো? বেতের চেয়ারটি আছে, আসনটাও রয়েছে। কিন্তু সেখানে বিজয়বাবু নেই, ভোরের স্তব মূর্ত ক'রে যেখানে তিনি বসে থাকেন।

নীচতলা দোতলা কোন ঘরেই তিনি নেই। মিত্রা দেবীর পূজোর ঘরেও তালাবন্ধ, সেখানে থাকার কথা নয়। খোঁজাখুঁজির পর বিজয়বাবুকে পাওয়া গেল বাগানে, তুলসীকুঞ্জের পাশে ঘাসের উপর বসে আছেন। চোখ খুলে শান্ত দৃষ্টি তুলে চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন বিজয়বাবু। কিন্তু মিত্রা দেবী ও কুশল যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু এইটুকু দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। যেন এক মহামৌনের সান্নিধ্যে বসে তিনি তাঁর সকল পার্থিব অনুভব ক্ষণিকের মত লয় ক'রে বসে আছেন।

একটু পরেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন বিজয়বাবু। হাসতে হাসতে বললেন—তোমরা দেখছি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।

বিজয়বাবুর হাসি দেখে কুশলের দুর্ভাবনা কেটে যায়। মিত্রা দেবী তবুও ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করেন—এখানে উঠে এলে কেন?

চলতে চলতে বারান্দার উপর উঠে এসে বিজয়বাবু বলেন—হঠাৎ কেমন একটা শ্বাসকষ্ট হলো, তাই ঘর ছেড়ে একেবারে খোলা বাতাসে মাটির ওপর গিয়ে বসলাম! ভালই লাগলো।

একটু থেমে নিয়ে বিজয়বাবু বলেন—এমন ভাল কোনদিনই লাগেনি।

একটু পরিশ্রান্তভাবে বেতের চেয়ারের উপর বসলেন বিজয়বাবু। বড় বিষণ্ণ

দেখায় মিত্রা দেবীকে, ভোরের আলো ফুটে উঠলেও তাঁর মুখটা যেন সন্ধ্যার আঁধারে ভ'রে উঠেছে। বিজয়বাবুর সম্মুখেই মেজের উপর নিঃশব্দে বসে রইলেন মিত্রাদেবী।

বিজয়বাবুই কথা বলেন—তোমরা যাও। বসে কেন? কাজ টাজ কর।

মিত্রা দেবী—এখন কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

বিজয়বাবু—না।

মিত্রা দেবী—তা'হলে কিছু খাবার ক'রে এনে দিই?

বিজয়বাবু—না।

মিত্রা দেবী—কিছুই খাবে না?

বিজয়বাবু—না, হাতের কাছে একটু জল রেখে দাও, তাহ'লেই হবে।

এক গেলাস জল এনে চেয়ারের কাছে একটা টুলের উপর রাখেন মিত্রা দেবী। বিজয়বাবু মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন—এখনও তেষ্টাটা আছে, তাই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিজয়বাবুর মুখের দিকে তাকাতেই মিত্রা দেবীর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে ওঠে। বিজয়বাবু বলেন—যাও, কাজকর্ম সেরে এস। আমি আছি, এখনও দেরি আছে।

পুজোর ঘরে চলে যান মিত্রা দেবী। কুশল এতক্ষণ বিস্মিত হয়ে এই দুর্বোধ্য দৃশ্যের তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করছিল। বস্তুর জগতে একেবারে দু'টি অবাস্তব সত্তার মত হেঁয়ালি ভাষায় কথা বলছেন বিজয়বাবু আর মিত্রা দেবী। কিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে? কোথায় যেতে চাইছেন বাবা? মা কি সত্যই প্রবাস-যাত্রী স্বামীর কথা ভেবে কেঁদে চলে গেলেন পুজোর ঘরে?

পুজোর ঘর থেকে মিত্রা দেবীর বের হয়ে আসতে অনেক দেরি, হলো এর মধ্যে এলেন বিশু উকিল। অনেকগুলি রসিদ ভাউচার ও বিলের একটা বাণ্ডিল আর নগদ ন'টাকা তিন আনা বিজয়বাবুর সামনে রেখে দিয়ে নমস্কার জানান—আসি তাহ'লে। বিজয়বাবুও হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে বিশু উকিলকে বিদায় জানান। যেন বেশ কিছুটা হালকা হয়ে উঠলেন বিজয়বাবু। জমি বিক্রি ক'রে বিজয়বাবুর সব দেনা শোধ করা হয়ে গিয়েছে। উদ্বৃত্ত ন'টাকা তিন আনা আর তার হিসাব রেখে দিয়ে চলে গেলেন বিশু উকিল।

দুপুর বেলায় সামান্য একটু জল খেলেন বিজয়বাবু, বিকাল হলেই স্নান করলেন, তারপর বসলেন আসনের উপর। গীতা পড়লেন কিছুক্ষণ, চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

খর গ্রীষ্মের বৈকাল যখন প্রায় নিস্তেজ হয়ে এসেছে, তখন চোখ খুললেন বিজয়বাবু। মনে হলো আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছেন। কোন দিকে এবং কারও দিকে না তাকিয়ে বললেন—যেতে হবে, শোবার একটা ঠাঁই ক'রে দাও।

বারান্দার উপরেই মাদুর পেতে দিলেন মিত্রা দেবী। আসন ছেড়ে উঠে মাদুরের উপর টান হয়ে শুয়ে পড়লেন বিজয়বাবু।

মিত্রা দেবী বসে রইলেন বিজয়বাবুর পায়ের কাছে। কুশল ধীরে ধীরে বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়ায়, নিঃশব্দে, অনেকক্ষণ, সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার সময় হয়।

মিত্রা দেবী ডাকেন—কুশল।

কুশল—কি মা?

মিত্রা দেবী—এসে প্রণাম কর, চলে গেছেন অনেকক্ষণ।

আনন্দ-সদনের নীরবতা চমকে দিয়ে কুশল চিৎকার ক'রে ওঠে—কি বললে মা?

শোক নয়, কুশলের বিস্ময়টাই যেন চিৎকার ক'রে উঠলো সবার আগে। মৃত্যুকে যে এইভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বরণ করা যায়, কল্পনাও করতে পারেনি কুশল। সত্তর বছরের জীবনের নীড় এই পরিচিত পৃথিবী থেকে একটি মানুষ একেবারে পরম অপরিচয়ের মধ্যে চলে গেল কী নির্ভয় ভঙ্গীতে! কি অদ্ভুত এই অন্তর্ধানের ছন্দ। সঙ্গীতের সুরের মত প্রাণকেও লয় ক'রে দেবার যে এমন একটা রীতি থাকতে পারে, না দেখলে স্বীকার করতে পারতো না কুশল। আজ স্বীকার করলেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, আর এই অবিশ্বাসটাই বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে ওঠে—কি বললে মা?

ডাক্তার এসে যখন মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়ে চলে গেলেন, তখন বিশ্বাস করে কুশল, আনন্দ-সদনের মন্দিরের ছায়া সরে গিয়েছে। কিন্তু কাঁদতে পারে না। মাথার ভিতর শুধু জ্বালাময় কতগুলি স্ফুলিঙ্গ ছুটোছুটি করতে থাকে। কাঁদবার অধিকার নেই, তার নিজের মনের ভস্মস্তূপের ভিতর এক ফোঁটা চোখের জলের ঐশ্বর্যও নেই।

স্টেশন ক্লাবের কম্পাউণ্ড থেকে একদিন একটা টু-সিটার বেশ একটু রাত্রে সশব্দে স্টার্ট নিয়ে গোঁ গোঁ ক'রে সবেগে ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর উঠে ডাইনে মোড় নেবার চেষ্টা করলো, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কিনারায় একটা প্রকাণ্ড শিশু গাছের গা রগড়ে দিয়ে ছিটকে পড়লো আর একদিকে। আহত জন্তুর মত পালাতে গিয়ে যেন আচমকা একবার থমকে দাঁড়ালো টু-সিটার।

ধাক্কাটা খুব জোরে লাগেনি, তবু গাড়ির বনেট একটু তেবড়ে যায়। আর শার্শিটা একেবারে চুর চুর হয়ে যায়। ষ্টিয়ারিং ধরে বসে আছে এক সুশ্রী যুবক, ভাঙা শার্শির টুকরো লেগে কপাল কেটে রক্ত ঝরে। শিশু গাছ আর টু-সিটারের সংঘর্ষের শব্দ শুনে ক্লাবের ভিতর থেকে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটে বের হয়ে আসে। ফার্স্ট-এড বাক্স হাতে নিয়ে ছুটে এলেন ক্লাবের ম্যানেজার। সকলে উদ্বিগ্নভাবে টু-সিটারের সামনে এসে ভিড় করতেই, সুশ্রী যুবক হুইস্কির ঢেঁকুরের সঙ্গে উল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠে—লাইফ ইজ এ স্পোর্ট! ইয়ে জিন্দগী হ্যায় খেল!

উদ্বিগ্ন জনতাকে একটা শিথিল দৃষ্টি আর ক্ষুদ্র ভ্রূক্ষেপে একেবারে তুচ্ছ ক'রে দিয়ে তৎক্ষণাৎ স্টার্ট নিয়ে তীব্র বেগে উধাও হয়ে গেল টু-সীটার।

এঁরই নাম দেবীনাথ রায়। নামটাকে অনাথ ক'রে দেওয়ার ফলে এখন দাঁড়িয়েছে দেবী রায়। ক্লাবের ব্রিজ খেলার আসরে অথবা টেনিস কোর্টে কলিয়ারির সাহেবরা ডাকেন—ডেভি রয়। ইনি যে ভাল খেলোয়াড় তাতে সন্দেহ নেই, মহারাজপুরে এরই মধ্যে যার জন্য তাঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা হয়েছে। আলাপে ও আচরণে বোঝা যায়, নিশ্চয় কিছুদিন বিলাতে ছিলেন। আর লোকের মুখের রটনা থেকে জানা যায়, নয়াদিল্লীতে দেবী রায়ের বাবার কয়েকটা বড় বড় বাড়ি আর নানারকম ভাল ভাল সম্পত্তি আছে।

এঁরই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজপুরের সার্ভে অফিসে আর আমলকির জঙ্গলে হরভবনের ভগ্নস্তূপে চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। ইনিই হলেন, সার্ভে অফিসের নতুন সুপারিণ্টেডেণ্ট। বাংলোর পাশে একটা মাটির ঢিবির উপরে অ্যালসেশিয়ানের বকলস মুঠো ক'রে ধরে ইউকালিপটাসের নীচে একবার কিছুক্ষণের মত দাঁড়িয়ে থাকেন দেবী রায়, প্রতি সকাল বেলায়। দূরের আমলকির জঙ্গলে হরভবনের স্তূপের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন। শেষ হয় তাঁর ডিউটি।

এক ভূতবাদী কেরানিবাবু আর এক পাগল দারোয়ান আছে সার্ভে অফিসে। এই দুটী প্রাণীই এতদিন ধ'রে কর্মহীন সার্ভে অফিস আর মিউজিয়ামকে আগলে রেখেছিল। এক আধ দিন নয়, কয়েকটা বছর। প্রতি সকালে ঘুম থেকে উঠে পাগলা দারোয়ান শুধু আউড়েছে রামায়ণী দোঁহা। আর প্রতি সন্ধ্যায় কেরানিবাবু ছেড়েছেন ভুতুড়ে গল্প। মাইনে সময় মত না পেয়ে আর কম মাইনের শোকে কেরানিবাবুর শীর্ণ চেহারাটা ঘুণে খাওয়া বৃষকাষ্ঠের মত জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, আর পাগলা দারোয়ান হয়েছে আরও পাগল। এতদিনে প্রাণের সাড়া জেগেছে সার্ভে অফিসে। নতুন সার্ভেয়ার এসেছেন কয়েকজন, এক'শো জন মাটি কাটা কুলি। মিউজিয়ামের

দরজার তালা যদিও এখনও খোলা হয়নি, ফটকের দুই থামের দুই মাথায় বড় বড় আলো জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

স্পোর্টসম্যান দেবী রায় ঐভাবেই প্রতি সকালে কুকুরের বকলস ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডিউটি সেরে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। টু-সিটারের স্টিয়ারিং ধরতেই কেরানিবাবু আর দু'চারজন সার্ভেয়ার সামনে এসে দাঁড়ায় কাজের নির্দেশ নেবার জন্য।

কোন সার্ভেয়ার বলে—একটা পাম্প না হ'লে কাজ এগুচ্ছে না স্যার, তিন নম্বরের ট্রেঞ্চটায় জল জমেছে খুব।

দেবী রায় বলেন—ডজ ক'রে বেরিয়ে যান, পাম্পের কোন দরকার নেই।

সার্ভেয়ার হয়তো এই খেলোয়াড়ি বুলির তাৎপর্য বুঝতে পারেন না, হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকেন। দেবী রায় একটু প্রাঞ্জল ক'রে বলেন—একটু পাশে সরে গিয়ে নতুন ট্রেঞ্চ কাটুন, যেদিকে জল নেই।

টু-সিটারে স্টার্ট দেবার আগে দেবী রায় সকলেরই উদ্দেশে জোরালো ভাষায় অনুযোগ করেন—আরে মশাই, এতদিন ধরে করছেন কি আপনারা? শুধু খুঁড়ছেন আর খুঁড়েই যাচ্ছেন, কিন্তু মাল কই?

আর একজন সার্ভেয়ার একটু আগ্রহ ক'রে বলেন—সত্যিই বড় এলোপাথাড়ি কাজ হচ্ছে স্যার। আপনি যদি একবার সাইটে গিয়ে মাঝে মাঝে···অর্থাৎ আগের সাহেব যেমন করতেন তেমনই একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন তা'হলে···।

কেরানিবাবু বাধা দিয়ে বললেন—কোন দরকার নেই স্যার। আগের সাহেব রোজ ফিল্ডে গিয়েই তো সব গোলমাল ক'রে রেখে দিয়ে গেছেন। তার চেয়ে, আপনি যেমন এখানে দাঁড়িয়েই দু'চার কথায় যেভাবে এত সুন্দর ক'রে সহজে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই যথেষ্ট।

দেবী রায় অবিলম্বে টু-সিটারে স্টার্ট দিয়ে দিলেন—আগের সাহেব অনেক ভুল ক'রে গেছেন। যাক সে সব কথা।···যেখানে খুশি, যে জায়গায় ইচ্ছে হয় কোদাল ঠুকে দিন। হিট করুন, হিট যেখানে সেখানে, ঐ আমলকির জঙ্গলের সবখানেই ভারত ইতিহাসের বিরাট রাবিশ চাপা পড়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস।

দেবী রায়ের মত এইরকম একজন ভারতীয় ইতিহাসের অকৃত্রিম উপাসক কোথা থেকে এবং কেমন ক'রে বার শো টাকা মাইনেতে সার্ভে অফিসের কর্তা হয়ে হরভবনের ভগ্নস্তূপে নতুন জীবন সঞ্চার করতে আবির্ভূত হলেন, তার রহস্য এই কেরানি-কুলি-সার্ভেয়রের জনতা জানে না, বুঝবার ক্ষমতাও নেই। দেবী রায় প্রতি সকালে

এইভাবেই টু-সিটারে ব'সে কাজের নির্দেশ দিয়ে চলে যান। কেরানিবাবু এবং সার্ভেয়ারের দল এই ভাবেই নির্দেশ নিয়ে থাকেন।

সন্ধ্যা বেলা টু-সিটার নিয়ে বের হবার আগে কাজের হিসাব নেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায়। কোদাল গাঁইতা জমা দিয়ে কুলির দল বসে থাকে মাঠের উপর, দু'চারজন সার্ভেয়র ও কেরানিবাবু সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, পাগলা দারোয়ান পাঠকজী ফটকের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে টু-সিটারের পথ মুক্ত ক'রে দিয়ে।

সেদিনও সন্ধ্যায় টু-সিটার নিয়ে দেবী রায় বের হলেন। আজ একটু ব্যস্ততা আছে, এবং পরিচ্ছদেও ব্যতিক্রম আছে। সার্ট ট্রাউজার নয়, আজ একেবারে ধবধবে সাদা খদ্দরের সাজ পরেছেন দেবী রায়।

কেরানিবাবুর কাছে সারাদিনের কাজের রিপোর্ট শুনে টু-সিটার স্টার্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে আক্ষেপ করে উঠলেন দেবী রায়—আরে মশাই মাল কই? মাল তুলুন। অন্তত দু'চার ডজন বেম্মা বিষ্টু না তুললে যে অফিসের মান থাকে না, আর সোসাইটির কাছে আমিই বা মুখ দেখাই কি ক'রে?…স্কোর করুন মশাই, স্কোর করুন। মিউজিয়ম ভ'রে ফেলুন।

সার্ভে অফিসের ফটক ছেড়ে হু হু ক'রে খেলোয়াড়ি উল্লাসে ট-সিটার ছুটে গিয়ে থামে একটা সাংস্কৃতিক উৎসবের তোরণ দ্বারে। সেণ্ট ডেনিসের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক প্রীতি সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের পুরোহিত হলেন সার্ভে অফিসের নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐতিহাসিক শ্রীদেবী রায়।

আধুনিক ও সুশিক্ষিত মহারাজপুরের রুচি অনুসারেই সুন্দর ক'রে সাজানো হয়েছে সেণ্ট-ডেনিসের সুরম্য হর্ম্যের হল। চীনা ফানুস-বাতি, কতগুলি রাংতার চন্দ্রসূর্য আর আম পাতার একটা স্তবক দিয়ে হলঘরকে উৎসবের বেশ পরানো হয়েছে। অধ্যাপকের দল ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত আর সকলেই প্রাক্তন ডেনিসিয়ান। অধিকাংশই বাঙালী ছাত্রছাত্রী, বিহারী আর পাঞ্জাবী ছাত্রও কম নয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও খুবই হাস্য কলরব আমোদ ও উত্তেজনার ভিতর দিয়ে জমে উঠলো। একজন প্রাক্তন ছাত্র তাসের ম্যাজিক দেখালেন, একজন পেশাদার যাদুকর ব্ল্যাক-আর্ট দেখালেন। আর একজন শোনালেন হরবোলা। ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ রেড-ইণ্ডিয়ান সর্দার, কেউ নাগা মুণ্ডশিকারী, কেউ কাশ্মীরের মেয়ে-মাঝি, কেউ বা স্প্যানিশ জিপসির রূপ ধ'রে মঞ্চের উপর উঠলেন, দর্শকদের করতালির ঝড় বয়ে গেল। একজন গান গাইলেন,

আর একজন বাজালেন গীটার, নবলা বাজালো পিয়ানো। একজন পেশাদার যোগী কড়মড় ক'রে কাচ চিবিয়ে আর নাইট্রিক এসিড খেয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ ক'রে আনলেন।

সব শেষে বক্তৃতা দিলেন অনুষ্ঠানের পুরোহিত দেবী রায়। প্রেরণা আবেগ এবং অভিনবত্ব, সবই ছিল দেবী রায়ের বক্তৃতায়। বক্তৃতার উপসংহারে গাঢ়স্বরে দেবী রায় এই আশা প্রকাশ করলেন যে, এই প্রাক্তন ডেনিসিয়ানেরাই একদিন অতীতের সেই স্বপ্নময় ভারতের কালচারকে নতুন ক'রে উদ্ধার করবে।...এক বিরাট টুর্নামেণ্টের মত সেই কালচার। বিশ্বের কত দূর দূর সভ্যতা থেকে যুগে যুগে কত টিম এসে সে টুর্নামেণ্টে যোগদান করেছে। ভারত থেকেও কত টিম গেছে বাইরে, রোম চীন মিশর তিব্বত ও ইন্দোচীনে। কত ট্রফি জয় ক'রে নিয়ে এসেছে ভারতের এক একটী টিম। অশোকের চন্দ্রগুপ্তের হর্ষবর্দ্ধনের টিম। আমি সেইরকমই একটি আধুনিক টিমের একজন নীরব সেণ্টার ফরওয়ার্ড।

অনুষ্ঠানের শেষে প্রাক্তন ডেনিসিয়ানদের ছোট একটা ভিড় ঘিরে দাঁড়ালো দেবী রায়ের টু-সিটারকে, কৃতজ্ঞতা ও চমৎকার বক্তৃতার জন্য অভিনন্দন জানাতে। অভিনন্দন গ্রহণ ক'রে দেবী রায় পাল্টা কৃতজ্ঞতা জানালেন।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতরে একটি স্মিতা তরুণীর মূর্তিকে লক্ষ্য করে দেবী রায় অকুণ্ঠ উল্লাসে হাত বাড়িয়ে দিলেন—অভিনন্দন জানাই আপনাকে, মিউজিকে কী মিষ্টি হাত আপনার!

কলহাস্যে নিজেকে মুখর ক'রে দিয়ে নবলা দেবী রায়ের প্রসারিত হাতে হাত স'পে দিয়ে বলে—মিষ্টি হাত না ছাই হাত।

ভিড় দু'ভাগ হয়ে এই সুন্দর সম্প্রীতির দৃশ্যটাকে একেবারে মাঝখানে রেখে উৎসুক চক্ষে হাসতে থাকে। দেবী রায় বলেন—সত্যিই আমার বিশেষ অভিনন্দন জানবেন মিস...মিস হোয়াট?

দেবী রায় একটু লজ্জিতভাবে ও অপ্রস্তুতের মত জিজ্ঞাসু চক্ষে তাকিয়ে থাকেন।

নবলা বলে—বলবো না, অনুমান করুন।

এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে দেবী রায় নবলার হাত ধ'রে একটা শক্ত ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানান—মিস ইণ্ডিয়া নাইনটিন-ফরটি-এইট!

নবলা কৃতার্থভাবে হাসে, ঘটনার নাটকীয় পুলকে দর্শক জনতার উৎসুক চক্ষে রসাবেশ লাগে, হেসে লুটিয়ে পড়ে।

গাড়িতে উঠে ষ্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে দেবী রায় আর একবার নবলার দিকে তাকান।—আপনার গন্তব্য কোন্ দিকে?

নবলা—হ্যাপি স্থক।

দেবী রায়—ওঃ, তাহ'লে তো আমার পথেই পড়বে···আর না পড়লেই বা কি? আস্থন, আপনাকে পৌঁছে দিই।

নবলার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল কাছেই। দ্বিধাগ্রস্তভাবে নবলা বলে—আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

দেবী রায় টু-সিটারের দরজা খুলে দিয়ে বলেন—যেতে বলে দিন আপনার গাড়িকে, আমার সঙ্গে আস্থন।

নবলাকে নিয়ে টু-সিটার তীব্র উল্লাসে স্টার্ট দেয়। গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি ক'রে আর হেসে হেসে অস্থির হয়ে নবলার কলেজবান্ধবীর দল কৌতুকানন্দে চেঁচিয়ে ওঠে—চিয়ারও মিস ইণ্ডিয়া!

পৃথিবীর এতগুলি আলোক ও চক্ষুর মাঝখান থেকে যেন এক মুহূর্তে অক্লেশে ছোঁ মেরে নবলাকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন দেবী রায়। একটু সঙ্কোচ বা জড়তার প্রমাণ ছিল না তাঁর আচরণে। যেমন সবল উৎসাহে ষ্টিয়ারিং ধরেন, তেমনি সবল আগ্রহে প্রথম আলাপেই অপরিচিতা তরুণীর হাত ধরতে পারেন এবং বামসঙ্গিনী নবলাকে নিয়ে ক্রস রোডের উপর দিয়ে উদ্দামবেগে চলতে চলতে মন খুলে কথা বলতেও তিলমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না।

—জীবনটাই একটা স্পোর্ট মিসিণ্ডিয়া। সার্ভিস করি শখের খাতিরে, নইলে একটা পেট চালাবার জন্য সার্ভিসের কোনই দরকার ছিল না।

—শখের খাতিরে এমন একটা খাটুনির সার্ভিস নিলেন কেন? আপনার মত স্কলার তো ইচ্ছে করলেই···।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু এই সার্ভিসে একটু অ্যাডভেঞ্চার আর স্পোর্ট আছে মিসিণ্ডিয়া, সেটাই হলো আমার আসল লোভ। নইলে এ ছাই মাটি-কাটা চাকরির জন্য আমি পৃথিবীতে এসেছি নাকি? আমার শুধু দিল্লীর বাড়ি থেকে যে ভাড়া পাই, তাই তো এ চাকরির মাইনের চেয়ে বেশি।

—দিল্লী ছাড়া আর কোথাও আপনার বাড়ি আছে?

—আছে বৈকি, মীরাটে আর সিমলায়। এসব বিষয়ে পিতৃদেব আমার বেশ করিৎকর্মা মানুষ। ভ্যাগাবণ্ড ছেলের সুখের জন্য যা কিছু দরকার সবই যোগাড় ক'রে রেখে দিয়েছেন।

—তিনি কোথায় ?

—দিল্লীতে।

—কি করেন তিনি ?

—আমার ওপর উপদ্রব করেন।

—তার মানে ?

—তার মানে প্রতি এয়ার-মেলে একটি ক'রে কড়া তাগিদ দিচ্ছেন আমাকে, বিয়ে করার জন্য।

—তা এমন কি অন্যায় করছেন ?

—অন্যায় বৈকি, এত তাড়াহুড়োর কি দরকার ?

—আপনিই বা দেরি করছেন কেন ?

মোড় ঘুরবার জন্য গাড়ির স্পিড মৃদু করেন দেবী রায়। তেমনি মৃদু আক্ষেপের সুরে বলেন—আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না মিসিগুিয়া, আমি নিজেই জানি না কেন দেরি করছি।...ও, এই তো হ্যাপি মুক।

জোরে ফুট ব্রেক চাপেন দেবী রায়। হ্যাপি মুকের আলোকিত ফটকে পরিশ্রান্ত টু-সিটার থামে। নবলা গাড়ি থেকে নেমে অনুরোধ করে—বসে রইলেন যে ? ভেতরে চলুন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবী রায় বলেন,—মাপ করবেন মিসিগুিয়া, স্টেশন ক্লাবে এক লণ্ডন-বন্ধু আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। আর দেরি করলে লজ্জায় পড়বো।

নবলা—মাত্র দু'মিনিটের জন্য আসুন, শুধু মা-বাবার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন।

দেবী রায়—আমার বিনীত নমস্কার জানাবেন আপনার মা ও বাবাকে। আমি চলি, খুবই দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না টু-সিটার, হ্যাপি মুকের ফটকে পোড়া পেট্রলের গন্ধ রেখে ক্লাব রোডের দিকে উর্ধশ্বাসে ছুটে চলে গেল।

দোতলার ব্যালকনির উপর চায়ের টেবিল ফেলা হয়েছে। বিকাল পার হয়ে সন্ধ্যা হলো, তার উপর হঠাৎ নতুন বর্ষার একটা দমকা বাতাস ছুটে চলে গেল হ্যাপি মুকের ঝাউয়ের প্যাগোডা জলে ভিজিয়ে দিয়ে। নন্দা দেবী একটু বিরক্ত হয়েই ডাক দিলেন—আমি মার্কেটে চললাম নবলা, আর অপেক্ষা করতে পারবো না। তুই এসে বস, যতক্ষণ পারিস।

নন্দা দেবীর পক্ষে একটু বিরক্ত হবারই কথা। অনেকক্ষণ হলো সাজসজ্জা সেরে বসে আছেন। আঁটসাঁট ক'রে পরেছেন একটা বাদামি রঙের শাড়ি, নতুন টাকার মত ঝলমলে রুপো রঙের লেস লাগানো পাড়। মাথায় কাপড় দেওয়া তাঁর অভ্যাস অনেকদিন হলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আজও দেননি। আগের মত চেপে চেপে বাঘের থাবার মত খোঁপা বাঁধার অভ্যাসও এখন নেই, তাই চুলের স্তবক দুভাঁজ ক'রে ঘাড়ের উপর তুলে রেখেছেন, দু'পাশ থেকে দু'টি সোনার ড্রাগন এঁটে দিয়ে।

সাজ সারতে একটু বাকি ছিল নবলার। সবই হয়ে গিয়েছে শুধু আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আঁচলের ট্রেল ঠিক করতে আরও দু'টি মিনিট সময় লাগলো। তারপরেই নন্দা দেবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চায়ের আসরে এসে দাঁড়ালো নবলা।

নন্দা বলেন—এ তুই কাকে নেমন্তন্ন ক'রে বসে রইলি নবলা, যার কোন সময় জ্ঞান নেই ? তোর কথা শুনে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে আমার তো একটা ভাল ধারণাই হয়েছিল, এখন দেখছি··· ।

টু-সিটারের হর্ন বাজলো হ্যাপি নুকের ফটকে।—এসেছে, নিশ্চয় এসেছে ! বলতে বলতে নবলা খুশির উচ্ছ্বাসে আকুল হয়ে আঁচলের ট্রেল দুলিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে যায়। উঠে আসে তেমনি খুশির আবেগে ছন্দিত ভঙ্গীতে, সিঁড়ির উপর পদে পদে আঁচলের ট্রেল বুলিয়ে, দেবী রায়কে সঙ্গে নিয়ে।

দেবী রায়কে দেখে খুশিই হন নন্দা দেবী। মৃগেনবাবুও ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চায়ের আসরে উপস্থিত হন। দেবী রায়ের সঙ্গে একটু ব্যস্তভাবে আলাপ সেরে নিয়েই বলেন—আমি এখন তোমাদের সঙ্গে চায়ে বসে আনন্দ করতে পারবো না, বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।

নবলা—কেন বাবা ?

মৃগেনবাবু—সিমেণ্টের সোরাবজী বসে রয়েছে হিসাব নিয়ে, এখুনি ওকে··· ।

নন্দা দেবী হেসে হেসে কৃত্রিম তিরস্কার করেন—হ্যাঁ, তুমি বিদেয় হও। শুধু বিজনেস আর বিজনেস, টাকা আর টাকা।

সহাস্যে চায়ের আসরকে মৃদু সম্ভ্রম জানিয়ে চলে যান মৃগেনবাবু।

কথা বলে দেবী রায়—এখানে এসে এক মিনিটের মধ্যে বুঝে নিয়েছি, যা আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

নবলা—কি বুঝেছেন ?

দেবী রায়—আপনাদের বাড়ির নামটি সার্থক, আপনারাও সার্থক।

নন্দা বলেন,—তুমিই বা কি অনর্থক ? নবলার কাছে সবই শুনেছি।

দেবী রায়—আমার কথা ছেড়ে দিন। আমার ঐ টু-সিটার আর তার জন্যে কয়েক গ্যালন পেট্রল, বাস্ তাহ'লেই আমার হয়ে গেল। জীবনটাকে নিয়ে হু হু ক'রে ছুটে বেড়াবো, ক্লান্তও হব না, থামবোও না।

হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে নবলা দেবী রায় ও নন্দা দেবী চা খাওয়া শেষ করেন। দেবী রায় চকিতে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর স্যুট-সজ্জিত ঋজু ও বলিষ্ঠ দেহটাকে টান ক'রে উঠে দাঁড়ায়। তারপর নন্দা দেবীর দিকে তাকিয়ে বলে—আমার টু-সিটার রয়েছে, ট্যাঙ্কে পেট্রলও আছে, আকাশে মেঘও নেই, বরং এক টুকরো চাঁদ উঠেছে, আর ওদিকে দামোদর দিয়ে বর্ষার নতুন জলও ছুটেছে।

নন্দা দেবী কৌতূহলী হয়ে বলেন—তা'তে এখুনি ওঠবার কি হয়েছে?

দেবী রায়—নবলা যদি সঙ্গে যেত তবে একবার দমোদর পর্যন্ত দৌড়ে আসতাম, এই মাত্র।

নন্দা দেবী খুশি হয়ে বলেন—এই কথা! বেশ তো, ঘুরে এসো।......যা নবলা।

চোখমুখ একটু গাম্ভীর্যে সংযত ক'রে রেখে, চায়ের আসর ছেড়ে দেবী রায়ের সঙ্গে চলতে চলতে টু-সিটারে এসে উঠেই হাসির ফোয়ারা হয়ে ভেঙে পড়লো নবলা। —একদিনেই মা'র কাছে অমন স্পষ্ট ক'রে কথা ব'লে আমাকে নিয়ে আসতে একটুও লজ্জা করলো না তোমার?

দেবী রায়—সেদিন সেণ্ট-ডেনিসে একেবারে পৃথিবীর চোখের ওপর থেকে তোমাকে তুলে আনতে আমার কোন লজ্জা দেখেছিলে?

নবলা—এ নির্লজ্জতার পরিণাম কি হবে?

দেবী রায়—পরিণাম···পরিণাম তোমার হাতে।

ধাবমান টু-সিটারে চুপ ক'রে বসে ভাবতে থাকে নবলা। ভেজা শালবনের মাথায় জ্যোৎস্না চিক চিক করে। নতুন বর্ষার জলে আকুল দামোদরের দুরন্ত কলহর্ষের ধ্বনি শোনা যায়। ছুটেই চলেছে টু-সিটার, থামতে চায় না। অনেকক্ষণ পরে, নবলার সম্মোহিত চেতনা থেকে যখন স্তব্ধতা ভাঙে, তখন মন্থর হয়ে আসে টু-সিটার, পুলের কাছে এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে দেবী রায় ও নবলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দমোদরের জ্যোৎস্নালোকিত শোভা দেখতে থাকে। ছুটছে জল, শত শত শিলার বাধা ছাপিয়ে একটা সুতরল গর্বের কল্লোল যেন ছুটে চলে যাচ্ছে। দু'পাশের শালের জগৎ শুধু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

দেবী রায় নবলার হাত ধরে—মিসিণ্ডিয়া।

নবলা—কি বলতে চাও?

দেবী রায়—আমার জীবন দিয়ে কি কাউকে সুখী করা যায়?

নবলা—কেন যাবে না?

আরও কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গাড়িতে ওঠে। যেন সুতীব্র স্পিডের নেশায় মত্ত হয়ে টু-সিটার পিচঢালা সড়কের চড়াই উতরাই পরম অবহেলায় পার হয়ে ছুটতে ছুটতে হ্যাপি হুকের ফটকে এসে থামে। নবলার হাত ছেড়ে দেবার আগে দেবী রায় প্রশ্ন ক'রে—কি ইচ্ছে করছে মিসিণ্ডিয়া?

নবলা—তোমার সঙ্গে ছুটে চলতে।

দেবী রায় দুঃখিত ভাবে বলে—তবু থামতে হলো···আচ্ছা আসি।

দেবী রায়ের টু-সিটার অদৃশ্য হয়ে গেলে হ্যাপি হুকের অন্তরে প্রবেশ করে নবলা। এতটা ছুটোছুটি ক'রে এসেও একটুও ক্লান্তি বোধ হয় না আজ। বরং মনে হয়, জীবনে আজ প্রথম তার স্বপ্নলোকের সব পরমাণু যেন সুন্দর এক ঝড়ের দীক্ষা লাভ করেছে। থামতে ইচ্ছা করে না, পিছনে তাকাতে ইচ্ছা করে না। অনেক দিন পরে যেন ঘুম ভেঙ্গে আজ হঠাৎ জেগে উঠেছে নবলা। মনে হয় ঘুমটাই মিথ্যা, আর স্বপ্নটাই সত্য, নইলে কল্পনাকেও ছাপিয়ে দিয়ে এত সত্য হয়ে কেন আসে দেবী রায়? কোথা থেকে এল এমন দুরন্ত দেবী রায়, দামোদরের অবিরল ঢলের দিকে তাকিয়ে নিবিড়ভাবে হাতে হাত দিয়ে তার জীবনের সব ঐশ্বর্য দিয়ে কেন নবলাকে সুখী করতে চায়, পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে?

নবলাও যে তাই চায়, এমনি এক দুরন্ত ঐশ্বর্যের মূর্তিকে সাথী ক'রে নিয়ে ছুটে ছুটে এগিয়ে যেতে, প্রতিদিন নতুন হয়ে আর প্রতি মুহূর্তে সুখী হয়ে। তারই মনের আশা কি বাতাসে ভেসে গিয়ে দূরান্ত থেকে ডাক দিয়ে নিয়ে এল দেবী রায়কে?

ড্রইং রুমে ঢুকতেই দেখতে পায় নবলা, নন্দা দেবী সোফায় বসে একটা জুয়েলারির দোকানের ক্যাটালগ পড়ছেন। রাত হ'লেও সন্ধ্যার সাজটা তখনও ছাড়েননি। নবলাকে দেখে নন্দা দেবী জিজ্ঞাসা করেন—দেবী কি চলে গেল?

নবলা—হ্যাঁ!

নন্দা দেবী বলেন—তোর একটা সাধারণ ভদ্রতার বুদ্ধি আজও হলো না। দেবীকে ওভাবে গেট থেকে চলে যেতে দিস কেন?

সত্যি থেমে যায়নি, আর ক্লান্ত হয়েও পড়েনি দেবী রায়ের টু-সিটার। হ্যাপি-হুকের সান্ধ্য হৃদয়ে উন্মাদনা ভরে দিয়ে নিত্য বেজে ওঠে টু-সিটারের হর্ন ঠিক সময়টিতে। চায়ের আসর তেমনি প্রস্তুত হয়ে থাকে সযত্নে অভ্যর্থনার পুলকে।

নন্দাদেবী সাজ-সজ্জা সেরে প্রস্তুত হয়ে থাকেন অপরাহ্ণের সূচনা হতেই, আর নবলা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে।

ক্বচিৎ কখনও আসেন মৃগেনবাবু, কারবারের চাপে উদ্ব্যস্ত আত্মাটিকে এক চুমুক চায়ের সান্ত্বনায় মুহূর্তের জন্য শান্ত করতে। বেশিক্ষণ বসতে পারেন না। হয় কারবারি বন্ধুদের ডাক আসে, নয় নন্দা দেবী কাজের কথা স্মরণ করিয়ে তাড়া দেন। কয়লা ও সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো তাঁর চিন্তার বাজারে বেচা কেনার অন্ত নেই। ওয়াগন পারমিট আর লাইসেন্স নিয়ে তিনি স্বপ্নের মধ্যেও ব্যস্ত। তিনিও থেমে নেই, মাথা ভরা প্ল্যান আর হাতভরা উৎকোচের তোড়া নিয়ে সকল বাধাকে বশীভূত ক'রে তিনি এগিয়ে চলেছেন। সাফল্যের পর সাফল্য, থামবেনই বা কেন? যাদুকরের মত দুই হাতে মহারাজপুরের বাতাস নিংড়ে তিনি দিনের পর দিন মুঠো মুঠো টাকা বের করছেন, হ্যাপি-হুকের জীবনে সম্পদের প্রাচুর্য ছড়িয়ে যাচ্ছেন। কোথা থেকে যেন তাঁর বহুদিনের কাম্য সেই পরম ক্যাপিটাল পেয়ে গিয়েছেন। লোকে অবশ্য বলে, রত্না ব্যাঙ্ককে ডুবিয়ে দিয়ে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গিয়েছে মৃগেন স্ত্রৈণ; একের পর এক নতুন কারবার ফাঁদছে স্ত্রীর বেনামিতে।

মনে-প্রাণে এই প্রাচুর্যকে সার্থক করেছেন নন্দা দেবী। নিত্য নতুন না হয়ে উঠলে এই বৈভবকে অসম্মান করা হয়, সুতরাং তিনিও থেমে নেই। রূপে নতুন, রুচিতে নতুন। আজকের জীবনকে পরদিন একেবারে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে নতুন জীবন লাভ করতে ইচ্ছা হয়। ডিজাইন পাল্টাবার এক অফুরান নেশা, জীবনটাই যেন একটা সোনার গয়না।

মাঝে মাঝে কিচেনে গিয়ে খানসামার রান্নার কাজ তদারক ক'রে আসেন নন্দা দেবী। ডিমের হালুয়া তৈরি করে খানসামা; নন্দা দেবী হালুয়ার উপর একরাশ কিসমিস ছড়িয়ে দেন, তার পরেই ছাড়েন দু'মুঠো পেস্তা। একটু ভেবে নিয়ে আরও কয়েক চামচ ঘি ঢেলে দেন, তার উপরেও পাঁচ ফোঁটা ভ্যানিলা। কারণ, আস্বাদটা নতুন হওয়া চাই, আর একটু রিচ হওয়া চাই, নইলে রুচিতে বাধে, আর মনও ভরে না।

এই প্রাচুর্যে বিলসিত হ্যাপি-হুকের মধ্যে নতুন প্রাণ এনেছে দেবী রায়। এনেছে ছুটে চলার আবেগ। থামেনি নবলাও। প্রতি সন্ধ্যায় এসে টু-সিটারের হর্ন তাকে ডেকে নিয়ে যায় এক একটি উৎসবের ক্রোড়ে। একদিন ধুলপাহাড়ের উপত্যকায়, পরদিন বোকারো কয়লা খনির পাতাল লোকে, তার পরের দিন শিলোড়া ঘাটের শিলাভূমিতে। স্টেশন ক্লাবে গিয়ে নিঃসঙ্কোচে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে নবলা, ঢুকেছে

ক্লাবঘরে, বারে বসে চেরিমধু পান করেছে ঠাণ্ডা সোডার সঙ্গে। দেবী রায়ের হাত ধরে আর পাশে বসে সে সবই করতে পারে। এই ক্লাব ঘরেরই দ্বারপ্রান্তে আলোর কাছে দাঁড়িয়ে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা প্রিয় নামে দেবীকে ডেকে ফেলেছে নবলা—চল ডেভি।

কোন্‌দিন দুরন্ত টু-সিটার চলে যায় ফাঁকা শালবনের ভিতরে, খানা-গর্ত ডিঙিয়ে, চাকার চাপে ঘুমন্ত পাহাড়ী সাপের মাথা চেপ্টা ক'রে আবার সহর্ষে পথের উপর এসে ওঠে। কখনও বা মাঠে নেমে পড়েছে টু-সিটার, অড়হর ক্ষেতের গা ছুঁয়ে ছুটে গিয়েছে সন্ত্রস্ত কোটরা হরিণের পিছু ধাওয়া ক'রে। উন্মাদনায় টু-সিটারের রেডিয়েটারে জল ফুটে উঠেছে টগবগ ক'রে, আর শিউরে উঠেছে নবলার বুকের রক্ত, শক্ত ক'রে খিমচে ধরেছে দেবী রায়ের সিল্কের শার্ট।

অন্য দিনের মত আজ সন্ধ্যায় চায়ের আসর থেকে দেবী রায়ের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে গেল নবলা। তারপর বের হয়ে গেলেন নন্দা দেবী তাঁর নিজের গাড়িতে প্রতিদিন যেমন যান, মার্কেটে অথবা সিটিতে, দোকানে ঘুরে জিনিস কিনতে অথবা পছন্দ করতে।

ক্রস রোডের উপরেই কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করার পর দেবী রায়ের ও নবলার মনে হয়, আজকের বাতাসটা ছুটাছুটি করছে আরও জোরে। সত্যিই তাই, আকাশটাও কালোয় কালো হয়ে গিয়েছে, তার উপর লিকলিকে আগুনের সাপের মত মুহুর্মুহু বিদ্যুতের চমক। টু-সিটার বড় সড়ক ছেড়ে ধীরে ধীরে নামে একটা সুরকির রাস্তায়, তারপর চলতে চলতে এসে থামে সার্ভে অফিসের বাংলোতে। সঙ্গে সঙ্গে নামে বৃষ্টি, ঘরের ভিতরে ঢুকে সোফার উপর পাশাপাশি বসে দেবী রায় ও নবলা।

বাইরে টু-সিটার ভিজতে থাকে। আর ভিতরে দেবী রায় ও নবলা বসে থাকে নিঃশব্দে। ধারাহত পৃথিবীর সব শব্দ ছাপিয়ে বর্ষার সঙ্গীত যেন তন্দ্রা ঝরায়। সে তন্দ্রাকে স্বপ্নালু ক'রে নবলার মুখের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে দেবী রায় বলে—মিসিসিপ্পিয়া!

—কি ডেভি?

—তুমি এত সুন্দর কেন?

—তুমি এত দুরন্ত কেন?

—আমি দুরন্ত না হ'লে কি তোমাকে আজ এইভাবে এখানে পেতাম?

—আমি সুন্দর না হ'লে কি তোমাকে এত কাছে পেতাম ডেভি?

দেবী রায় উঠে গিয়ে আলমারি খোলে, একটা গেলাসে কিছুটা শেরি ঢেলে নিয়ে আবার সোফার উপর বসে। ছোট একটা টেবিল সামনে টেনে নিয়ে তার উপর রাখে শেরির গেলাস। —মিসিণ্ডিয়া, আজকের রাতে এই শেরির গেলাসে আমি মুখ দিতে পারবো না, যদি না তার আগে আমার জীবনের শেরির মুখে···।

চোখ বন্ধ করে নবলা, আজকের রাতের দুরন্ত তৃষ্ণাকে নিঃশব্দে দুই অধরে বরণ করে নেয়।

দেবী রায় ডাকে—মিসিণ্ডিয়া।

নবলা—বল।

দেবী রায়—তুমি আমার চিরকালের।

নবলা—হ্যাঁ ডেভি।

দেবী রায়ের কাঁধের উপর মাথাটা অলসভাবে সঁপে দেয় নবলা। পকেট থেকে একটি হিরা-বসানো হেয়ার পিন বের ক'রে নবলার খোঁপায় এঁটে দেয় দেবী রায়।

নবলা বিহ্বল ভাবে বলে—এ কি করলে ডেভি ?

দেবী রায়—আজকের রাতটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখলাম প্রীতি চিহ্ন দিয়ে।

থেমে গিয়েছে বৃষ্টি। ঘর ছেড়ে আবার দু'জনে হাতে হাত ধরে বাইরে এসে কিছুক্ষণের জন্য লাল সুরকির পৃথিবীতে দাঁড়ায়। দেবী রায় বলে—এখন জলে ভেজা মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে কেমন লাগবে মিসিণ্ডিয়া ?

নবলা আকুল হয়ে বলে—বেশ লাগবে ডেভি। চল।

পর মুহূর্তে ছুটে যায় টু-সিটার, সুরকির পথ ছেড়ে মাঠের উপর। চারটি চাকার সংঘাতে মাঠের বুকে চারটি ফোয়ারা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে যায় দূর হতে দূ'রে, পার্থিব সকল দুঃখের ছোঁয়ার বাইরে। দুটি সুখী জীবনের ছুটন্ত অনুরাগ, অর্ধেকটা তার আলোক আর অর্ধেকটা বাষ্প, অপার্থিব।

অনেকক্ষণ পরে সিটারের দিকে তাকিয়ে দেবী রায়ের যেন চমক ভাঙে, সংযত হয় টু-সিটার। মাঠ ছেড়ে দিয়ে পথের উপর উঠে একটু পার্থিব মূর্তি ধরে চলতে থাকে; মৃদুগতি হয়ে, বর্ষাধৌত হ্যাপিমুকের ফটকের আলোকের কাছে এসে পড়ে।

হ্যাপিমুকের ড্রইং রুমে অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলেন নন্দা দেবী। অনেকক্ষণ হলো তিনি ফিরে এসেছেন মার্কেট থেকে। মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন, কখনও বা আকাশের দিকে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছিলেন, ফটকের কাছে এসে বুঝি একটা ইঞ্জিনের গুঞ্জন থামলো।

দেবী রায় আর নবলাকে আজ একটু নতুন ছন্দেই আসতে দেখলেন নন্দা দেবী। দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে ড্রইং রুমের দিকে আসছে। মাঝে মাঝে দুজনের মিলিত হাসির গমক লেগে শিউরে উঠছে দুজনের দেহের ভঙ্গী।

ড্রইং রুমে ঢুকতেই নবলার মাথায় ঝলক দিয়ে ওঠে হিরা-বসানো হেয়ার পিন। তেমনি হাসির ঝলক তুলে জিজ্ঞেস করে নবলা—তুমি এখনও বসে আছ মা? কখন ফিরলে?

নন্দা বলেন—অনেকক্ষণ।

পাইপে এক চিমটি তামাক পুরে দিয়ে দেবী রায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—আমি আসি।

নন্দা দেবী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বললেন না। প্রণয়গর্বিত দুটি প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা যেন হঠাৎ চমকে উঠেছে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন নন্দা দেবী। নবলার হেয়ার পিনের হিরাটা তাঁর চোখে যেন আলোর ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে।

নবলা বলে—আমি ওপরে যাই।

নন্দা দেবীর চোখ দু'টোকে যেন এই ধাঁধার মধ্যে একলা ছেড়ে দিয়ে আর ড্রয়িং রুম ছেড়ে, পরমুহূর্তে দুজনে চলে যায় দু'দিকে, এই রাতের মত ভিন্ন হয়ে। দেবী রায় হ্যাপিহুকের বাইরে, আর নবলা হ্যাপিহুকের উপরে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে উথলে ওঠে নবলার মন। টু-সিটারের হর্ন রাতের বিদায় জানিয়ে স্টার্ট নিচ্ছে গেট থেকে, আজ রাতের মত নবলাকে স্বপ্নের মধ্যে একা ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু আজকের রাতে কি ঘুম আসবে, হিরা-বসানো হেয়ারপিনে চিরন্তন হলো তার ভালবাসা যে রাতের কোলে?

ভাল লাগে ডেভিকে, ভাল লাগে ডেভির লুব্ধ নিঃশ্বাসের কাছে মুখ তুলে দিতে। ভাল লাগে ডেভির দুরন্তপনার বুক ঘেঁসে থাকতে, আর হাত ধরে ছুটে চলতে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে গিয়ে বার বার আকুল হ'য়ে ওঠে নবলার মন।

এগিয়ে আসছে আরও আকুল হ'য়ে ছুটে চলার দিনগুলি। ঝড় হোক বৃষ্টি হোক, কাল সন্ধ্যায় শিলোড়া ঘাটের চড়াই পার হতে হবে, নিজে ড্রাইভ করবে নবলা। কথা আছে, যেতে হবে একদিন ঝালদা রোডে, রেল লাইনের পাশে পাশে, এক্সপ্রেস ট্রেণের সঙ্গে রেস দিতে। তারপর আছে, একদিন বড় ঝিলে রঙীন পানকৌড়ি শিকার।

ফুলবাড়ির সরু সড়কে বর্ষার সন্ধ্যা। জল জমেছে। ল্যাম্পপোস্টের পায়ের কাছে ঘোলাটে আলো জলের উপর কেঁপে কেঁপে ভাসে। এই জলো সড়কের উপর দিয়েই ধীরে ধীরে চলতে থাকে একটি বড় মোটরকার। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায়। ষ্টিয়ারিং থেকে এত হাত তুলে নিয়ে চশমাটা একটু তুলে ধরে ঋদ্ধিনাথ। রাস্তার পাশেই একটি ক্ষুদ্র ও মলিনমূর্তি বাড়ির জানলার দিকে তাকায়। তারপরেই বলে—দেখ দেখ, একটা দৃশ্য দেখ বৌদি।

পিছনের সিটে বসেছিলেন দুই মহিলা, রেখা বৌদি আর লেখা বৌদি। ঋদ্ধিনাথের কথায় কৌতুহলী হয়ে সড়কের পাশ সেই ক্ষুদ্র বাড়ির জানালার দিকে দুজনেই তাকালেন।

ঘরের বাইরে রক্তকরবীর পাশে জানালার উপরে একটা বাতি তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্বরূপা। রাধেশবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের ভিতরে, জানালার কাছে, দু'চোখ বন্ধ ক'রে, নির্বাক হয়ে। ভিতরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন রাধেশবাবু। তাই বাইরে এসে স্বরূপা তাঁকে ডাকছে—বাবা, দরজা খুলে দাও বাবা।

রাধেশ বাবু নড়েন না।

স্বরূপা ডাকে—আমি একবার তোমার কাছে যাব বাবা, দরজা খুলে দাও।

রাধেশবাবু যেন শুনতে পান না।

স্বরূপা—কখন রান্না হয়ে গেছে, তুমি এবার খেয়ে নাও বাবা।

রাধেশবাবুর মূর্তিতে কোন চঞ্চলতা লাগে না।

স্বরূপা—একবার কথা বল বাবা। লক্ষ্মী, সোনা, কথা বল।

রাধেশবাবু সাড়া দেন না।

বাতিটা একটু উঁচু ক'রে তুলে ধরে স্বরূপা—একটিবার তুমি আমার মুখের দিকে তাকাও বাবা, একটিবার তাকাও।

স্বরূপার চোখে জল, মুখের উপর আলো। যেন ঐ রক্তকরবীর মনটাই একটা কঠিন দুঃখের বেদনায় সজল ও সুন্দর হয়ে জানালার কাছে ফুটে রয়েছে। রাধেশবাবু মুখ ঘোরালেন, চোখ খুললেন, তারপর স্বরূপার মুখের দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে রইলেন।

স্বরূপা বলে—দরজা খুলে দাও বাবা, আমি তোমার কাছে যাব।

জানালার কাছ থেকে সরে যান রাধেশবাবু। খিল খোলার শব্দ শোনা যায়। বাতি হাতে দাওয়ার উপর উঠে ঘরের ভিতর চলে যায় স্বরূপা। রাধেশবাবুর হাত ধ'রে বলে—এই তো, এইরকম লক্ষ্মীটি হয়ে আমার কথা শুনে···।

হঠাৎ চমকে ওঠে স্বরূপা। রাধেশবাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে তাকায়। বাইরের দাওয়াতে যেন কতগুলি পায়ের শব্দ বাজছে। পরমুহূর্তে পায়ের শব্দগুলি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লো। রাধেশবাবু একবার হতভম্বের মত তাকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে ভিতরের দাওয়ায় গিয়ে বসলেন।

লেখা বৌদি আর রেখা বৌদি একেবারে ঘরের ভিতরেই ঢুকে পড়েছিলেন, আর ঋদ্ধিনাথ দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরজার কাছে। দু'জন সুবেশা মহিলা, আর একজন চশমা চোখে সুবেশ যুবক। কে এঁরা? এখানেই বা কেন? বিস্মিত হয়ে, আর একটু ভীত হয়ে তাকিয়ে থাকে স্বরূপা, চমক ভাঙে না।

আগন্তুক মহিলাদের মধ্যে যিনি একটু প্রবীণা, তিনিই স্বরূপার সঙ্গে কথা বললেন প্রথম।—আমাদের দেখে লজ্জা করবার বা ভয় পাবার কিছু নেই। কি ব্যাপার বল তো?

স্বরূপা—কই কি ব্যাপার দেখলেন?

—কা'র সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি? কাঁদলেই বা কেন? ঘরের ভেতর উনি কে? তোমার বাবা?

—হ্যাঁ।

—তোমার ওপর রাগ করেছেন?

—না।

—তবে? কোন অসুখ-বিসুখ বা শোক···কি হয়েছে বলই না?

—কিছুদিন হলো বাবার মন ভাল নয়, তাই মাঝে মাঝে এইরকম হয়ে থাকেন, কথা বলতে চান না।

—কোথায় গেলেন তোমার বাবা? ওঁর শরীরটাও তো ভাল মনে হলো না।

লেখা বৌদির কথা শেষ হতে না হতেই ঋদ্ধিনাথ বলে—বলেন তো এখনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসতে পারি।

লেখা বৌদি স্বরূপার দিকে তাকিয়ে আবার বলেন—হ্যাঁ, কোন বিপদ আপদ বা অসুবিধের ব্যাপার হয়ে থাকলে বল। লজ্জা করবার কিছু নেই।

বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা, বলবার মত কোন উত্তর খুঁজে পায় না। তিনটি অপরিচিত মানুষের এই সৌজন্য ও উপকারের আগ্রহ যেমন আকস্মিক তেমনি দুর্বোধ্য।

স্বরূপার নীরবতা ও বিব্রত ভাব দেখে লেখা বৌদির কথা বলার উৎসাহ কিছুটা দমে যায়। ঘরের ভিতর চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন লেখা বৌদি। প্রশ্ন

ক'রে যেটুকু বুঝতে পেরেছেন, তার অনেক বেশি এইভাবে বিনা প্রশ্নে চোখ ঘুরিয়ে দেখাটুকু দিয়েই বোধহয় বুঝতে পারেন।

এইবার কথা বলেন মহিলা দু'জনের মধ্যে বয়সে যিনি নবীনা, তিনি। স্বরূপার কাছে এগিয়ে এসে একটু চাপা স্বরে প্রশ্ন করেন রেখা বৌদি।

—আপনার নামটি বলবেন?

—স্বরূপা।

রেখা বৌদি—বাড়িতে আর কেউ নেই?

স্বরূপা—না।

রেখা বৌদি—আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এত লজ্জা করছেন কেন?

স্বরূপা - কই, লজ্জা কথায় দেখলেন?

রেখা বৌদি—রাগ করছেন না তো, গায়ে পড়ে এত কথা বলছি বলে?

স্বরূপা যেন এতক্ষণে কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পায় এবং লজ্জিতও হয়।—না না, রাগ করবো কেন? রাগ করবেন আপনারা, এতক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন, বসতেও বলিনি। বসুন।

লেখা বৌদি আর রেখা বৌদি একটা চৌকির উপর বসেন। স্বরূপার দিকে দু'জনেই একটা তীব্র বিস্ময় নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। স্বরূপা আবার বিব্রত বোধ করে।

রেখা বৌদি হাসতে হাসতে বলেন—আমাদের একেবারেই চেনেন না আপনি, তবু তো আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন না?

স্বরূপা লজ্জিত হয়—বলুন।

রেখা বৌদি—না, বলবো না।

হঠাৎ রেখা বৌদি ব্যস্তভাবে চৌকি ছেড়ে ওঠেন। তারপর একটু বিরক্তিভরা স্বরেই বলেন—চলুন ঠাকুরপো। মিছিমিছি এতক্ষণ…।

পরমুহূর্তে স্বরূপার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেন রেখা বৌদি। —যাচ্ছি ভাই, আর আগেই জানিয়ে যাচ্ছি, কাল আবার আসবো। আপনার সঙ্গে জমিয়ে ভাব করার ইচ্ছে আছে।

লেখা বৌদি বলেন—হ্যাঁ, হঠাৎ এসে একদিনেই এত কথা জিজ্ঞেসা ক'রে তোমাকে লজ্জা দিয়েছি, কিছু মনে করো না।

লেখা বৌদি, রেখা বৌদি আর ঋদ্ধিনাথ গাড়িতে ওঠে। দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা। আলোর ঝলক তুলে ফুলবাড়ির জলো সড়ক আলোড়িত ক'রে গাড়িটা চলে যাবার পর স্বরূপা বিস্মিত আর বিব্রত হয় সবচেয়ে বেশি।

কে এঁরা? অহংকারের মানুষ বলে তো মনে হয় না। হঠাৎ তার কান্নাভরা মুখের আকর্ষণে একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকে দুঃখের খোঁজ নিতে চাইলেন, উপকার করতে চাইলেন, আর মিষ্টি কথা বললেন। বাইরের পৃথিবী থেকে এরকম সৌজন্যের বাতাস এঘরে প্রবেশ করেনি কখনও। দিন দিন শুধু নিজের মনের জ্বালা নিয়ে ব্যস্ত থেকে থেকে অভ্যাসটা এমনই বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে যে, এঁদের সঙ্গে ভাল ক'রে দুটো কথা পর্যন্ত বলতে পারা গেল না। কে জানে কি মনে ক'রে এঁরা চলে গেলেন? তবু ভাবতে মনটা খুশি হয়ে ওঠে, দুটো কথার কথাও হঠাৎ কোথা থেকে এসে এই ঘরের একলা বেদনাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে গেল।

শোনা যায়, গান গাইছে মুড়িওয়ালি শান্তি বোষ্টমি। সারা ফুলবাড়ির মধ্যে শুধু শান্তি বোষ্টমিই গান গায়, আর কেউ নয়। নেড়া মাথা তিলককাটা শান্তি, স্বামী নেই, সন্তান নেই, একা। সারাদিন খাটে আর সন্ধ্যা হলে গোঁসাইপাড়ার রাধাশ্যাম মন্দির থেকে প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। শান্তি বোষ্টমির গানকে আজ নতুন ক'রে ভাল লাগে স্বরূপার। ফুলবাড়ির বর্ষার এই সন্ধ্যাটাই যেন বেদনা ভুলে একা একা গান গাইছে।

দরজা ছেড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই আরও চমকে ওঠে স্বরূপা।

রাধেশবাবু বসেছিলেন চৌকির উপর শান্ত হয়ে। স্বরূপাকে দেখতে পেয়েই প্রশ্ন করেন—কারা এসেছিল রে স্বরূপা? বেশ ভাল লোক ব'লে মনে হলো।

রাধেশবাবুর প্রশ্ন শুনে স্বরূপার আনন্দ যেন চিৎকার করে উঠতে চায়। বাবা যে সেই আগের মতই সহজভাবে তাঁর সরল মনের সুর মেশানো স্বরে কথা বলছেন। এতদিন যেন বাইরের পৃথিবীর ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আজ কি সে ভয় হঠাৎ ভেঙে গেল। পৃথিবী থেকে ভাল লোকের গলার স্বর আজ তাঁর কানে এসে পৌঁছেছে, যে স্বরে সহৃদয় সান্ত্বনা আছে। তাই কি? নইলে এতদিন পরে হঠাৎ এমন ক'রে তিনি তাঁর হারানো মন ফিরে পাবেন কেন?

স্বরূপা বলে—হ্যাঁ ওঁরা খুব ভালো লোক বাবা, কিন্তু ওঁদের চিনি না।

রাধেশবাবু—তবে তো সত্যিই ভাল লোক।

রাধেশবাবু তাঁর মনের ভিতরে একটা ধারণাকে যেন সমাধি থেকে টেনে তুলছেন, যে ধারণার মৃত্যু হয়েছিল একটি অমানুষিক আঘাতে। তাঁর মনটাকেও যেন অন্ধ ও বধির ক'রে দিয়েছিল সে আঘাত। তাই পৃথিবীকে দেখতে আর শুনতে পারছিলেন না এতদিন। আজ ফিরে পেয়েছেন তাঁর হারানো ধারণার আনন্দ। আছে আছে, পৃথিবীতে মানুষ আছে, আবার সত্যিই ভাল মানুষও আছে।

ঘরের ভিতর এসে ঢোকে শান্তি বোষ্টমি।—কারা এল আর চলে গেল স্বরূপদি ?

স্বরূপাকে আর উত্তর দিতে হলো না। রাধেশবাবুই শান্তিকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে বলেন—দু'জন মহিলা আর এক ভদ্রলোক এসেছিল। ওদের আমরা চিনি না, ওরাও আমাদের চেনেন না, অথচ কী সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে গেল।

শান্তি খুশি হয়ে বলে—বাবার শরীরটা বড় ভাল মনে হচ্ছে আজ।

চুপ ক'রে কি যেন নিজের মনে ভাবতে থাকেন রাধেশবাবু, তারপরেই যে প্রশ্নটা ক'রে বসেন, তার আঘাতে কিছুক্ষণের মত ঘরের এই আনন্দের আবেশ ছিন্ন হয়ে যায়।—হ্যাঁরে স্বরূপা, বিজয়দা কেমন আছেন বলতে পারিস ?

বলতে পারে না স্বরূপা, দু'হাতে মুখ ঢাকা দেয়। দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ছুঁইয়ে উত্তর দেয় শান্তি—তিনি আর এ জগতে নেই বাবা।

নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন রাধেশবাবু, খোলা জানালা দিয়ে তাঁর দৃষ্টিটা কিছুক্ষণের মত বাইরে অন্ধকারের দিকে ছড়িয়ে যায়। তারপর নিজের মনেই বলেন—তাহ'লে বিজয়দা আর আসবেন না······ আসছে দশমীতে তাঁর কোলাকুলি আর পাব না। চলেই গেছেন··· এ জন্মের মত চলে গেছেন।

শান্তি বলে—বড় ভালভাবে তিনি গেছেন বাবা।

রাধেশবাবু—কি অসুখ হয়েছিল তাঁর ?

শান্তি—কিছু না, একদিন সবাইকে ডাক দিয়ে, আমি যাই ব'লে মহানন্দে চলে গেলেন।

রাধেশবাবু বোধ হয় বুঝতে পারেননি তাঁর চোখের পাতা জলে ভিজে গিয়েছে। চৌকি ছেড়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াতে থাকেন। নিজের মনেই বলতে থাকেন—বুঝতে পারিনি স্বরূপা, কেন বিজয়দা এসে কোলাকুলি দিয়ে যেতেন, তার দাম তখন বুঝতে পারিনি।

ছটফট ক'রে ঘরের বাইরে গিয়ে দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রাধেশবাবু যেন শোকার্তের মত ফুঁপিয়ে ওঠেন—শুধু খাটতে শিখলেই হয় না রে, নির্ভর রাখতে হয় আর একজনের ওপর, নইলে ভেঙ্গে পড়তে হয় !

স্বরূপা এসে হাত ধরে—তুমি এত দুঃখ করছো কেন বাবা ?

রাধেশবাবু একটু শান্তভাবেই বলেন—দেখলি তো বিজয়দা কেমন সারাজীবন সোজা হয়ে রইলেন আর কেমন নির্ভয়ে চলে গেলেন। দেখলি তো, আমি কেমন ভেঙ্গে পড়লাম, আর ভয়ে ভয়ে মরে রইলাম।···ভুল হয়েছে রে, মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।

এতকালের খাটুনির দৈত্যের মনটা যেন অন্ধকারের নির্মোক ভেদ ক'রে একটা আলোর আভাস দেখতে পেয়েছে। কিসের অভাবে, কি একটা নির্ভরহীন শূন্যতার জন্য অপূর্ণ হয়েছিল জীবন, হঠাৎ জেগে উঠেছে পূর্ণ হবার ব্যাকুলতা। ভেঙ্গে পড়ার এই গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে চিরজীবন সোজা হয়ে চলবার আর নির্ভয় আনন্দে চলে যাবার রহস্যটা তিনি দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু ধরতে পারছেন না, তাই তৃষ্ণার্তের মত ছটফট ক'রে উঠছেন।

শান্তি বোষ্টমি বলে—তা আপনিই বা কেন ভয় করবেন বাবা? মনের সুখে মঠে-মন্দিরে ঘুরে বেড়াবেন, নাম করবেন, নিশ্চিন্তি হয়ে থাকবেন। গোঁসাই প্রভু তো বলেই গেছেন, সকলি সমর্পি তাঁহে তুমি হবা ধীর।

আরও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি ক'রে ঘুরতে থাকেন রাধেশবাবু। তারপর ক্লান্ত-ভাবে আবার চৌকির উপর ব'সে বলেন—আমাকে একটু বাতাস কর তো স্বরূপা।

তারপর শান্তি বোষ্টমির দিকে তাকিয়ে বলেন—তুই কথাটা মন্দ বলিসনি শান্তি।

বৃদ্ধিনাথ সিদ্ধিনাথ আর ঋদ্ধিনাথ, তিন ভাই। নোংরা সিটির মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বাড়িটাই হলো এঁদের বাড়ি। মহারাজপুর ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস নামে একটা কারবার আছে এঁদের, তিন ভাই তার সমান অংশীদার। ভাল কারবার, গোটা দশেক লম্বা লম্বা রুট আছে—মহারাজপুর থেকে ঝালদা, রাঁচি, রামগড়, ধানবাদ এবং আরও নানা দিকে, যার উপর মহারাজপুর মোটর ট্রান্সপোর্টের যাত্রিবাহী বাস প্রতিদিন নিয়মিত যাওয়া আসা করে এবং লাভও আনে ভালই। কারবারের নিয়ম-কানুন এবং এই পরিবারের নিয়ম-কানুন, দুই-ই ঠিক ক'রে দিয়ে গিয়েছেন কর্তা, যিনি এখন আর নেই, কর্ত্রী গিয়েছেন তাঁরও আগে।

নিয়ম হলো, ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের অফিসে যতক্ষণ তিন ভাই থাকবেন, ততক্ষণ একেবারে তিন অংশীদারের মত নিজের নিজের স্বার্থ আর দায়িত্ব পুরাপুরি বুঝে নিয়ে কাজ করবেন। এটা হলো কর্তার তৈরি কারবারিক নিয়ম। আর যখন ঘরে ফিরবেন, তখন তিন ভাই হবেন তিন বন্ধু, এটা হলো পারিবারিক নিয়ম।

আরও কতগুলি নিয়ম আছে, তার মধ্যে একটা হলো, গরীবের মেয়ে বিয়ে করতে হবে। কর্তা বেঁচে থাকতেই বৃদ্ধিনাথ ও সিদ্ধিনাথ সেই নিয়ম রক্ষা করেছেন, ঋদ্ধিনাথের বেলাতেও সেই নিয়ম রক্ষার চেষ্টা চলছে। আরও একটা কথা। বড় বউ আর মেজ বউয়ের বাপের বাড়ির দেওয়া নাম ছিল অসিতা আর রেণুকা, কর্তা

সেই নাম বাতিল ক'রে দিয়ে নতুন নাম দিয়ে গিয়েছেন—লেখা ও রেখা। এই নিয়মের মর্যাদা রক্ষা ক'রে ছোট বউয়ের নামও হবে শিখা, এই কথাও কর্তা বলে গিয়েছেন।

শিখার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত মেয়ের দেখা এবং সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তারমধ্যে কোন্নগরের একটি মেয়েকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে, যাকে শিখা ক'রে এবাড়িতে আনা যেতে পারে। ওপক্ষ থেকে ছেলেও পছন্দ হয়েছে এবং বিয়ের কথাও চলছে।

রাত আটটায় ঘরে ফিরে বৈঠকখানায় বসতেই তিন ভাই একেবারে তিন বন্ধু হয়ে যান। দুনিয়ার সমস্যা নিয়ে তর্ক আর তর্কের গর্জন চলে রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর ছেলেপুলেরা ঘুমিয়ে পড়লে তিন ভাই। একসঙ্গে এসে খেতে বসেন খাবার ঘরে। ঠাকুর শুধু রান্নাঘর থেকে ভোজ্য-দ্রব্য বহন ক'রে নিয়ে আসে, পরিবেশন করেন ঋদ্ধিনাথের লেখা বৌদি আর রেখা বৌদি। এটাও এবাড়ির নিয়ম, কর্তা ঠিক ক'রে দিয়ে গিয়েছেন।

খেতে বসলেন তিন ভাই। বড়দা বুদ্ধিনাথ বললেন—তুই নাকি ফুলবাড়ির রাধেশবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিস ?

ঋদ্ধিনাথ—দোষ কি ? তোমার মত বিয়ে করার পর ক্ষেপে উঠতে চাই না।

মেজদা সিদ্ধিনাথ বলেন—মেয়েটি দেখতে কেমন ?

ঋদ্ধিনাথ—মেজ বৌদির চেয়ে ভাল।

মেজদা—আরে স্টুপিড, মেজবৌদির চেয়ে ভাল হলেই কি সুন্দর বলা চলে ?

ঋদ্ধিনাথ—বিয়ে করা চলে তো ?

বড়দা মাছের মুড়ো চিবিয়ে বলেন—কিন্তু রাধেশবাবুর মেয়েকেই বিয়ে করতে চাইছিস কেন ? প্রেমের ব্যাপার হয়েছে না কি ?

ঋদ্ধিনাথ ঝোলের বাটিতে চুমুক দেন—ওটা বিয়ের পরে হ'লেই ভাল হয় না কি ?

মেজদা দইয়ের উপর সন্দেশ ভাঙেন—উনি উপকার করতে চাইছেন।

বড়দা—উপকার করতে হয় কর, তাই বলে বিয়ে করতে হবে এমন কি কথা আছে ?

ঋদ্ধিনাথ—বিয়ে করলে কি অপকার করা হবে ?

মেজদা—এত উপকার করার ইচ্ছেটাই বা কেন হচ্ছে শুনি ?

ঋদ্ধিনাথ—বিয়ে করার জন্য।

বড়দা—কি আশ্চর্য ! উপকার করতে চাও বিয়ে করার জন্য, আর বিয়ে করতে চাও উপকার করার জন্য ?

ঋদ্ধিনাথ—হ্যাঁ, এই তো পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ, সোজা সহজ কথা।

মেজদা সিদ্ধিনাথ চিৎকার ক'রে তাঁর অভিমত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন—আমি তর্ক করতে চাই না, এসব তর্কের ব্যাপারের মধ্যেও আমি নেই।

বড়দা বুদ্ধিনাথ প্রায় একটা অটল প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন—আমি এসব গোঁয়াতুর্মির ত্রিসীমানার মধ্যে নেই। নিজের বিয়ের জন্যই একটা ভালমন্দ বাছাই পর্যন্ত করলাম না, এখন পরের বিয়ের জন্য···হেঃ!

আঁচিয়ে উঠে আর তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে একটা পান মুখে দিয়েই বড়দা লেখা বৌদিকে বলেন—একদিন মেয়েটিকে নিয়ে এস, আমরাও দেখি।

মেজদা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রেখা বৌদিকে বলেন—কালকেই নিয়ে এস, ভাল দিন আছে।

এইবার ঋদ্ধিনাথ বলে—আমি কিন্তু এসব ব্যাপারের মধ্যে একেবারেই নেই, আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কাল বাড়িতে থাকবো না।

আলোচনার আরম্ভ ও পদ্ধতি দেখে আদৌ বিচলিত হননি লেখা বৌদি বা রেখা বৌদি। আলোচনার পরিণতি দেখেও তেমনি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন না। এই ধরনের কথা শুনতে আর এরকম দৃশ্য দেখতে তারা অনেকদিন থেকেই অভ্যস্ত হয়ে আছেন। তিন ভ্রাতা তাদের যুক্তির যুযুৎসু ও বাদপ্রতিবাদের মল্লযুদ্ধ দিয়ে কি বোঝাতে চাইছেন, তা অনেকক্ষণ আগেই তারা বুঝে ফেলেছেন।

ঋদ্ধিনাথ খাওয়া শেষ করেও বসেছিল। লেখা বৌদি আর রেখা বৌদি খেতে বসলেন। বুদ্ধিনাথ ব্যস্তভাবে ডাক দিলেন—ওরে সিদ্ধি, একবার ইদিকে আয় দেখি।

তারপর বুদ্ধি ও সিদ্ধি, দুই ভাই একসঙ্গে বাড়ির ছাদটার দিকে দৃষ্টি তুলে উঠানের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। অর্থাৎ রাধেশবাবুর মেয়ের সঙ্গে ঋদ্ধিনাথের বিয়েটা যেন হয়েই গিয়েছে, বাকি আছে বৌ ভাতের অনুষ্ঠান এবং ঐ ছাদটাই হলো এখন একমাত্র সমস্যা। বর্ষার দিন, ছাদের উপর একটা ওয়াটারপ্রুফ সামিয়ানা না চড়ালে নিমন্ত্রিতেরা বসবেনই বা কোথায়? আলোচনা করছিলেন বুদ্ধিনাথ ও সিদ্ধিনাথ।

ওদিকে আলোচনা করছিলেন লেখা বৌদি আর রেখা বৌদি আর ঋদ্ধিনাথ।

লেখা বৌদি বলেন—কাল তুমিই গিয়ে স্বরূপাকে নিয়ে এস রেখা।

রেখা বৌদি—আচ্ছা।

ঋদ্ধিনাথ—হ্যাঁ, তুমিই যেও রেখা বৌদি, তুমি বেশ গুছিয়ে হেসে হেসে বলতে পার?

লেখা বৌদি—রাধেশবাবুর জন্য উনি কতগুলি ফুড, কডলিভার অয়েল আর কি

কি কতগুলি পেটেণ্ট ওষুধ কিনে এনে রেখেছেন, সঙ্গে নিয়ে যেও। আর কিছু ফল কিনে নিও মার্কেট থেকে।

ঋদ্ধিনাথ—সেই সঙ্গে কিছু কাপড়-চোপড় দিলে কেমন হয়?

লেখা বৌদি বলেন—না।

রেখা বৌদি—ঠাকুরপো সঙ্গে যাবে না কি?

ঋদ্ধিনাথ—না না, আমি এসবের মধ্যে নেই।

রেখা বৌদি—চলই না, আর একবার সেই আলো-মাখা মুখখানা দেখে আসবে।

ঋদ্ধিনাথ—না, এখন আর নয়। বার বার দেখলে পুরনো হয়ে যাবে। দেখবো একেবারে সেই, কি যেন বলে, শুভদৃষ্টির সময়।

রেখা বৌদি—তা হলে স্বরূপাকেই বিয়ে করবে একেবারে স্থির ক'রে ফেলেছ?

ঋদ্ধিনাথ—হ্যাঁ। আমি একেবারে সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছি।

রেখা বৌদি—হৈ চৈ ক'রে নিয়ে পরে আবার কোন আপত্তি উঠবে না তো?

ঋদ্ধিনাথ—আমার দিক থেকে কোনই আপত্তি উঠবে না।

রেখা বৌদি—মেয়ের দিক থেকে যদি আপত্তি ওঠে?

ঋদ্ধিনাথ বিস্মিত হয়—কেন, কি অপরাধ করলাম যে, মেয়ে আপত্তি করবে?

রেখা বৌদি—ধর যদি আপত্তি করেই, তবে কি হবে?

ঋদ্ধিনাথ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে ভাবে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়—তবে আর কি? তবে কুছ পরোয়া নেই। কোন্নগরের মেয়েকে শিখা ক'রে নিয়ে আসবো, বাস।

রেখা বৌদি তাঁর কথার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এরই মধ্যে পর পর ক'দিন স্বরূপাদের বাড়িতে এসেছেন, জমিয়ে ভাব করতে একটুও অসুবিধা হয়নি তাঁর।

গুছিয়ে কথা ব'লে এবং মিষ্টি মিষ্টি ঠাট্টা দিয়ে স্বরূপার লজ্জাকে জব্দ করতে, আর অন্তরঙ্গতা দিয়ে স্বরূপার ভয় ভাঙতে পেরেছেন রেখা বৌদি। রাধেশবাবুর জন্য ফল আর ওষুধ গছিয়ে দিতে পেরেছেন, স্বরূপা প্রতিবাদ করেও শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারেনি।

আজও এসেছেন রেখা বৌদি, এবং তাঁর মুখের হাসির ভঙ্গী দেখে বোঝা যায়, কিযেন একটা উদ্দেশ্য রয়েছে তাঁর মনের ভিতরে।

রাধেশবাবুর সামনে ঘরের মেজের উপরে বসে রেখা বৌদি তাঁর পরিচয় জানালেন। রাধেশবাবু খুশি হয়ে বলেন—চিনি বৈকি, আমি ওঁদের চিনি।

রাধেশবাবুই স্বরূপাকে তাগিদ দিয়ে বলেন—যা, একটু ঘুরে আয় স্বরূপা, এত আগ্রহ ক'রে এঁরা যখন ডাকছেন, যা। আমিও যাই, অম্বিকা মন্দিরে আরতি দেখে আসি।

এর পর আর কোন অসুবিধা হয়নি রেখা বৌদির, ফুলবাড়ির সড়কের ধারে এই মলিনমূর্তি বাড়ি থেকে স্বরূপাকে তুলে সিটির এক প্রকাণ্ড ও পরিচ্ছন্ন হাসিখুশির বাড়িতে একদিন নিয়ে গেলেন রেখা বৌদি। এবং কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়ে দিয়েও গেলেন।

রাধেশবাবু অম্বিকা মন্দির থেকে ফেরেননি তখনও, এই-মাত্র স্বরূপাকে পৌঁছে দিয়ে রেখা বৌদির গাড়িটা চলে গেল। চলে গেল আজকের মত, কিন্তু আবার আসবে। রেখা বৌদি বলেছেন, এবার থেকে প্রায়ই আসবেন এবং বেড়াতেও নিয়ে যাবেন স্বরূপাকে।

অবিশ্বাস করে না স্বরূপা, আসতেই থাকবে বড় বাড়ির গাড়িটা। এখন থেকে প্রায়ই আসবে, তারপর থেকে হয়তো প্রতিদিন আসবে, এবং তারপর ?

যেন বড় বেশি হাঁপিয়ে আর ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে স্বরূপা, ঘরের ভিতর ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে বসে হাঁপ ছাড়বার জন্য।

স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ে লেগেই আছে, খুলতে ভুলে গিয়েছে স্বরূপা। জরিপাড়ের প্লেন সাদা শাড়ি, আর মুগার কাজ করা ঘাসি রঙের ব্লাউজ, ঠিক এই সাজেই একদিন মিত্রা মাসির সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছিল স্বরূপা, তার পর আর এই সাজের কোন প্রয়োজন হয়নি। সেই বেড়াবার জীবন ঘুচে গিয়েছে অনেক-দিন হলো, আজ নতুন ক'রে আবার দেখা দিয়েছে। তাই এই সাজের নতুন ক'রে প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু বেড়িয়ে ফিরে এমনই অবসন্ন ও বিষন্ন মূর্তি নিয়ে জানালার কাছে বসে থাকে স্বরূপা যেন এই সাজটাই একটা বোঝার মত হয়ে তার বেড়াবার আনন্দটুকু মাটি ক'রে দিয়েছে।

দেখে এসেছে স্বরূপা, সত্যিই হাসিখুশির বাড়ি, প্রকাণ্ড ও পরিচ্ছন্ন! মানুষগুলি সত্যিই ভাল। লেখা বৌদি ও রেখা বৌদি, বড়দা ও মেজদা, মিষ্টি কথায় ও আন্তরিকতায় কে কার চেয়ে কম ? কারও আচরণে অহংকারের লেশও খুঁজে পাওয়া গেল না, বরং সবাই যেন ধন্য হয়ে গিয়েছেন তার মত এক নগণ্যকে বাড়ির মধ্যে পেয়ে। মানুষগুলি মনখোলা, বড়দা তো মুখের উপরেই নিঃসঙ্কোচে বলে দিলেন—যা মনে করেছিলাম, তুমি দেখছি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

মেজদা বললেন—এই তো, এর চেয়ে ভাল স্টাইলের মেয়ে আর কি হতে পারে।

হাসিখুশির বাড়িতে হাসির উচ্ছ্বাস উঠেছে, ব্যাপার দেখে স্বরূপাও হেসে ফেলেছে। সেই হাসিটুকু নিয়েই যদি ফিরতে পারতো স্বরূপা, তবেই ভাল ছিল। জানালার কাছে এসে এমন বিষণ্ণতা নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতে হতো না।

মনে পড়ছে হাসিখুশির বাড়ির ঘটনাগুলি। একটা ঘরের ভিতর টেবিলের উপর আছে রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটি ফটো। রেখা বৌদি গল্প করতে করতে স্বরূপাকে টেবিলের কাছে নিয়ে আসেন। ফটোর দিকে ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন দেখতে চেহারাটি?

স্বরূপা—বেশ সুন্দর।

রেখা বৌদি—কে বল তো? চিনতে পার?

স্বরূপা চিনতে পারে।—আপনার দেবর, যিনি সেদিন আমাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।

রেখা বৌদি আর কোন প্রশ্ন না ক'রে হঠাৎ টেবিলের উপর থেকে একটা সেণ্টের শিশি তুলে নিয়ে স্বরূপার আঁচলের উপর উপুড় ক'রে ঢেলে দেন।—আজ শুধু এই গন্ধটুকুই গায়ে মেখে যাও।

চমকে ওঠে স্বরূপা। হাসিখুশির বাড়ির এই আন্তরিক সমাদরের অর্থটুকু সব রহস্য ভেদ ক'রে হঠাৎ ঝলক দিয়ে ওঠে। কিন্তু চমকে উঠলেও প্রতিবাদ করতে পারেনি স্বরূপা। রাগ করতেও পারেনি। কেমন ক'রে রাগ হবে রেখা বৌদির উপর? স্বরূপাকে অপমান করার জন্য তো তিনি এ-কাণ্ডটা করেননি। লেখা বৌদি যে এত জেদ ক'রে স্বরূপাকে খাবার খাওয়ালেন, বড়দা নিজে হাতে স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি ক'রে দিয়ে গেলেন, স্বরূপাকে ভাল লেগেছে তাই। এরা সত্যিই ভাল মানুষ, তাই তো ভয় পেয়েছে স্বরূপা।

কোলের উপর আঁচল টেনে নিয়ে একট শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে স্বরূপা। সেই শূন্যতার মধ্যে সুন্দর একটি সোনার খাঁচা হঠাৎ কে যেন, কোথা থেকে এসে পেতে রেখে গিয়েছে। তার ক্লান্ত অন্তরাত্মাকে সম্মান সমাদর আর হাসিখুশির অভ্যর্থনা দিয়ে সম্মোহিত করার এক সুন্দর আয়োজন।

হাসিখুশির বাড়ির আহ্বান প্রতিরোধ করবে স্বরূপা আজ কোন্ শক্তি দিয়ে? স্বরূপার সে শক্তিকে যে চূর্ণ ক'রে দিয়ে গিয়েছে কুশল। যাদের ঘৃণা করতে পারবে না, তারা এগিয়ে আসছে স্বরূপাকে আপন ক'রে নিতে। আর যাকে সংসারে আপন ক'রে রেখেছিল অনুভবের মধ্যে, সে পালিয়ে গিয়েছে ঘৃণা হয়ে। দশ বছরের আকুলতার ইতিহাস কি পরাভূত হয়ে যাবে এমনই অগৌরবে?

শঙ্কা শূন্যতা ও অগৌরবের মধ্যে যেন একটা জ্বালা নিয়ে পুড়তে থাকে স্বরূপার মন। কেমন আছে, কোথায় আছে সে? সত্যিই সে কি নোংরা পৃথিবীর দুঃস্বপ্নের গ্লানি, মাতাল হয়ে গভীর রাতে ঘুমন্ত ঘরের দ্বারে করাঘাত ক'রে নারীর দেহ খুঁজে বেড়ায়? সত্যিই কি ওর চোখে জল নেই, বুকে ভালবাসা নেই, মনে অনুভব নেই? পৃথিবীর আকাশ-বাতাস আর সূর্য তারা কি ওর ভাল লাগে না? কে বলে দেবে, কেমন করে বুঝবে স্বরূপা—না, সে-রাতের মূর্তি ওর একটা ছদ্মবেশ মাত্র, স্বরূপাকে পরীক্ষা করতে এসেছিল। সে আছে, নিজের অহঙ্কার আকাঙ্খা আর স্বপ্ন নিয়ে ভালভাবেই আছে, এইটুকু জানতে পারলেই স্বরূপা আর রেখা বৌদিকে কিংবা হাসি-খুশির বাড়িকে ভয় পাবে না।

জানালার কাছ থেকে উঠে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায় স্বরূপা। ঘরে কেউ নেই, অম্বিকা মন্দিরে আরতি দেখতে গিয়েছেন রাধেশবাবু। বাইরের দাওয়ায় এসে চেঁচিয়ে ডাক দেয় স্বরূপা—শান্তিদি! শান্তিদি!

ব্যস্তভাবে ছুটে আসে শান্তি।—কি হলো, এমন করে ডাকছো কেন?

—আমি বাঁচবো না শান্তিদি, যদি একটা খবর আমাকে না এনে দাও।

—বল কিসের খবর? শান্ত হয়ে বল, ওরকম করছো কেন?

—মিত্রা মাসির বাড়ির খবর জান?

—জানি, একরকম ভালই তো আছেন।

—মিত্রা মাসির ছেলে কুশলদার খবর জান?

শান্তি তার তিলক-কাটা কপাল তুলে, চোখ-ভরা কৌতূহল নিয়ে স্বরূপার মুখের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে থাকে।—এ কিরকম কথা বলছো স্বরূপদি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

স্বরূপা—আমার মরণের কথা।

শান্তি—কবে থেকে এমনটি হলো?

স্বরূপা—দশ বছর থেকে।

শান্তি—তবে আজ আর কি কথা জানতে চাও?

স্বরূপা—সে এখন কোথায় আছে কেমন আছে, শুধু এইটুকু জানতে চাই।

শান্তি—আচ্ছা। খবর এনে দেব। কিন্তু তোমার দশা দেখে আমার বড় ভাবনা হচ্ছে স্বরূপদি।

স্বরূপার চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে—আমার এরকম দশা কেন হলো শান্তিদি, বলতে পারো? তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না, সে আমাকে চায় না, সবই জানি।

কিন্তু তবু সব সময় জানতে ইচ্ছে করে, সে ভাল আছে কি না। আর, ভাল আছে জানতে পেলেই ভাল লাগে।

দু' চোখ বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ কি ভাবতে থাকে শান্তি, তার পর বলে—এরকমই হয় শুনেছি। গোঁসাই বলেছেন, না গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ।

স্বরূপা চমকে উঠে প্রশ্ন করে—কি বললে শান্তিদি ?

শান্তি—না গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ। এই প্রেমেই তো কেষ্ট পায় মানুষ।

হঠাৎ চমকে উঠে তাকিয়ে থাকলেও যেন মনের সব আগ্রহ নিয়ে শান্তির কথাগুলি শুনতে থাকে স্বরূপা, এবং শোনার পর হঠাৎ শান্ত হ'য়ে যায় স্বরূপা, যেন হঠাৎ এক আশ্বাস লাভ ক'রে শান্ত হয়ে গিয়েছে মনের বেদনাগুলি।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে হেঁট মুখ হয়ে দু-হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বিনুনি খুলতে থাকে স্বরূপা। বড় বেশি করুণ আর সুন্দর দেখায় স্বরূপাকে।

শান্তি একটু স্নেহবিচলিত সুরে বলে—তুমি শান্ত হয়ে কাজকর্ম কর স্বরূপাদি, আমি এনে দেব খবর। এখন উঠি।

আনন্দ সদনের হলঘরে দেয়াল-ঘড়ি বেজে চলেছে আগের মতই। সময় তার ছন্দ হারায়নি। পল অনুপল দণ্ড প্রহর আসে আর ফুরিয়ে যায়। দিনান্তের পর নিশা, নিশান্তের পর দিন।

কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠ তেমনি আলস্যে ঘুমোয় আর আকাশের দিকে তাকায়। বাগানের গাছের পাতায় ফেঁপে ওঠে সুরসিত সবুজ, আর বর্ষারাতের কালোতে ফুটে ওঠে টগরের সাদা। তবু বৎসরের পালায় বাঁধা এসব দৃশ্য আনন্দ সদনের জীবনে নতুন কিছু নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এইভাবেই তো চলে এসেছে আনন্দ সদনের জীবন ,বদলায়নি কিছু।

বদলায়নি বাহিরটা, বদলে গিয়েছে আনন্দ-সদনের ভিতরটা। বারান্দার উপর সেই বেতের চেয়ারটা আজও আছে, কিন্তু চেয়ারের উপর সেই মানুষটি কই ? সন্ধ্যার ধূপের ধোঁয়ায় বা প্রথম ভোরের আভায় এক অপার্থিব দেহীর মত যে বৃদ্ধের মূর্তিকে বসে থাকতে দেখা যেতো, সে মূর্তি অন্তর্হিত হয়েছে, এই নিভৃতকে রিক্ত ক'রে দিয়ে। বিজয়বাবুর আসন আর গীতা তুলে নিয়ে গিয়েছেন মিত্রাদেবী তাঁর পুজোর ঘরে।

আর, যেন অগ্নিস্নান সেরে উঠে বসেছে কুশল। বেতের চেয়ারের কাছে মেজের উপর নিঃশব্দে বসেছিল কুশল, অনেকদিন পরে। পুজোর ঘরে যেতে যেতে কুশলকে

ওভাবে বসে থাকতে দেখে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিত্রাদেবী, কিন্তু বললেন না। কুশলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই চলে গেলেন।

থাকুক বসে শান্ত হয়ে কুশল। এই কটা মাস তো শুধু ছটফট ক'রে কাটিয়েছে, সারা রাত্রির মধ্যে একটি মিনিটও ঘুমিয়েছে কিনা সন্দেহ। ভয় পেয়েছে, চমকে উঠেছে, মাঝ রাতে উঠে মিত্রাদেবীকে ডেকেছে—মা ওঠ।

আবার কখনও-বা শেষ রাত্রে ঘর ছেড়ে উঠে এসে বারান্দার উপর পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে কুশল, যেন কারও স্পর্শপূত বাতাসের লোভে। অথবা ইচ্ছা ক'রে ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন তৈরি করতে, যার মধ্যে জাগ্রত দিনের দুঃসহ বাস্তব মিথ্যা হয়ে হয়তো দেখা যাবে, বাবা বসে আছেন বেতের চেয়ারে, কিম্বা পায়চারি করছেন বারান্দায়। শোনা যাবে তাঁর বাঘছালের চটি মৃদু শব্দ ক'রে ঘুরে বেড়ায়, কিংবা তাঁর ডাক—কুশল ওঠরে।

আজ পর্যন্ত চুপ ক'রে বসেই আছে কুশল, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকু আরম্ভই করতে পারছে না। কেমন ক'রে আরম্ভ করা যায়, কে বলে দেবে তার নিয়ম?

মিত্রাদেবী কিছু বলেন না। কিন্তু বলবার যে অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে আবার এমন একটা বক্তব্য আছে, যা না বললে কোনমতেই চলে না। একেবারে প্রতিদিনের জীবনের একটা কঠোর ও বাস্তব প্রয়োজনের কথা, অন্নবস্ত্রের কথা।

বিজয়বাবু নিজে খালি হয়ে গিয়েছেন, আনন্দ সদনও এক দিক দিয়ে খুবই বেশি খালি হয়ে গিয়েছে। বর্মা সেগুনের দেরাজে টাকা-পয়সা যা আছে, তা গুনলে মাত্র একটি মাসের মত দু'বেলা পেট-চলার সঙ্গতি গোনা হয়, আর এক বেলা ধরলে দুটি মাস। টেনেটুনে তার বেশি আর কোনমতেই চলতে পারে না। মিত্রাদেবী প্রায়ই বলতে চেষ্টা করেন—একটা চাকরি-বাকরি ধর কুশল, নইলে যে চলে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত বলতে পারেননি এবং কুশলের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসারের মায়া থেকে আলগা হওয়ার সাধ এখনও তাঁকে যেন ভুলে থাকতে হচ্ছে।

না ভুলে থেকে উপায় নেই, একেবারে যেন ছেলেমানুষের মত বাড়ির কোল-ঘেঁষা হয়ে বসে থাকে কুশল, অসহায়ের মত। অতীতের একটা ছবি মনে পড়ে যায় মিত্রাদেবীর, সত্যিই ছেলেমানুষ ছিল যখন কুশল। স্কুলে যেতে ভয় পেত যখন, কিম্বা যেতে ভাল লাগতো না, তখন ঠিক এইভাবেই ঘরে বসে মিত্রাদেবীর মন ভোলাবার জন্য বই সামনে রেখে পড়াশুনায় মন দেখাতো কুশল। পৃথিবীর ভয়ে ঘরের কোনে পড়ে থাকা এই রকম একটা অসহায়ের কাছে চাকরি নামে জীবন-

সংগ্রামের দায়িত্বটা স্মরণ করিয়ে দিতে সঙ্কোচ হয় এবং বেদনাও বোধ করেন মিত্রাদেবী। তাই বলতে গিয়েও বলেন না, অথচ না বললেও চলে না।

পাশ-করা শিক্ষিত ছেলে কুশল, কিন্তু আজকাল ওর চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাব দেখে মনে হয়, ওর শিক্ষা এবার-শুরু হয়েছে মাত্র। যা শিখেছিল, সবই ভুলে গিয়েছে বোধ হয়।

এই অনুমানও মিথ্যে নয়; ভুলতে চেষ্টা করছে কুশল। তার এতকালের শিক্ষাব বোঝা পুরোপুরি খালি ক'রে দিয়ে নতুন ক'রে আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। যে শিক্ষা মস্তিষ্ক দেয়, কিন্তু হৃদয় দেয় না, যে শিক্ষা বুদ্ধি দেয়, কিন্তু অনুভব দেয় না—নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে সেই বিকট শিক্ষার অবশেষটুকুও।

ইতিহাসের বই পড়তে আজ ভাল লাগছে কুশলের। সবই সেই পুরনো বই, যা অনেকদিন আগেই তার পড়া হয়েছে। এবং আজই হঠাৎ বুঝতে পারে, বই পড়াও এরকম ভাল কোনদিন লাগেনি। সব বিদ্যার অহমিকা বিনত ক'রে আজ নিজের মনের লজ্জায় বুঝতে পারে কুশল, সে পাশ করবে ব'লে সাত হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের উপত্যকায় প্রাগার্য সভ্যতার উপনিবেশ স্থাপিত হয়নি, অথবা সে ভাল চাকরি পাবে ব'লে সরস্বতীর তীরে বসে বৈদিক আর্য প্রথম যজ্ঞের আগুন জ্বালেনি। মানুষের ইতিহাস যে কতগুলি ঘটনার সন-তারিখের ঘটা নয়, তার মধ্যে একটা রূপ আছে, আর সেই রূপটুকু একেবারে মনের অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়ে আজকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে অনুভব করা যায়, জানা ছিল না কুশলের। পুরনো পড়া ইতিহাস পড়তে আজ নতুন রকম লাগে।

একথাও জানে কুশল, চাকরি একটা ধরতে হবে, অর্থাৎ জীবিকার জন্য কাজ করতে হবে। জীবিকার জন্য চাকরি, জীবনের জন্য নয়। এবং এটুকুও স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে, আর দেরি করা চলে না, অভাব ঘিরে ধরেছে, অনশনের সঙ্কেত দেখা দিয়েছে।

একটা চাকরি হাতের কাছেই আছে, ইচ্ছা করলে এখনই পাওয়া যায়। কিন্তু সে চাকরির কথা মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে মন। সার্ভে অফিসের সুপারভাইজারের চাকরি, মাইনে পঁচাশি থেকে আরম্ভ। অন্য কোথাও পঞ্চাশ টাকার মাইনের চাকরি নিতে কোন আপত্তি নেই কুশলের; কিন্তু সার্ভে অফিসের পঁচাশি টাকার কাছে গিয়ে হাত পাততে সে পারবে না। ও-চাকরিটা যে তার বিকারগ্রস্ত আকাঙ্ক্ষার ইতিহাসে একটা কঠিন বিদ্রূপ, অধঃপতনের স্মারকচিহ্ন, ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়িয়ে দেবে কুশলকে তার পিছনে-ফেলে-আসা কালি-মাখা জীবনের গ্লানি।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে দেবী রায় সদুঃখে বলে—আরে, আমি তো বলছি না যে একটা পিরামিড খুঁড়ে বের কর। মাত্র ভাল ভাল মূর্তির দু'চারটে লট যদি বের করতে পারেন তাহলে······তাহলে এক রকম হয়।

রুমাল দিয়ে ষ্টিয়ারিং-এর চাকা মুছতে মুছতে দেবী রায় বলে—আপনাকে দুটো দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কুশলবাবু। ওরা কি খুঁড়ছে বা না খুঁড়ছে, সাইটে গিয়ে রোজই দেখবেন আর দেখিয়ে দেবেন। তাছাড়া মিউজিয়ামটাকেও দেখবেন। ওটার ভেতর কি মাল আছে বা না আছে, তা ভগবান জানেন, আজ পর্যন্ত তালাবন্ধ হয়েই রয়েছে। কেরানীবাবু অবিশ্যি বলেন, ওর ভেতর রাজ্যির যত ভূত আর গোখরো ঘুরে বেড়ায়।

টু-সিটারে স্টার্ট দিয়েই দেবী রায় বলে—আপনাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে কুশলবাবু। এখন আমি শুধু দেখতে চাই যে আপনার দায়িত্ববোধ আছে। যান, অফিসে গিয়ে পুরনো ফাইল আর রিপোর্ট যা আছে আজই একবার ভাল ক'রে পড়ে ফেলুন। কাল থেকে সাইটে যাবেন।

কথা শেষ হতেই ফটক ছাড়িয়ে লাল সুরকির বুকে দু'চাকার দাগ কেটে ছুটে চলে যায় দেবী রায়ের টু-সিটার।

বার শো টাকা মাইনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেমন যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে, তার একটা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হলো কুশলের। কিন্তু তার জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভের আলোড়ন জাগে না কুশলের মনে। সে এসেছে চাকরি করতে, মাসে মাসে পঁচাশিটা টাকা নিয়ে যাবার জন্য, দেবী রায়ের সহজ ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে নয়। মনে মনে এই পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হয়েছিল কুশল। এবং বুঝতে পারে, এই পরীক্ষাতেও সে পার হয়ে গিয়েছে। কোন বিদ্বেষ না নিয়ে এবং বিচলিত না হয়ে সে সহ্য করতে পেরেছে দেবী রায়কে।

বাংলোর দক্ষিণে একটু দূরে, বড় বড় আট দশটা নিমের ছায়া-ছড়ানো উঁচু ঢিবির মত জায়গাটার উপরে অফিস ঘর। তার পূর্বদিকে সামান্য একটু সরে গুদামের মত বড় ঘরটা হলো মিউজিয়াম। পশ্চিম দিকটা একেবারে মুক্ত। প্রথমে কিছুদূর পর্যন্ত লম্বা লম্বা খেজুর আর ছোট ছোট ফণী মনসার ঝোপ। তারপর দেখা যায় শান-বাঁধানো চত্বরের মত একটা খোলা জায়গা, মসৃণ ও সাদা মস্ত বড় একটা পাথর সমস্ত জায়গাটা জুড়ে রয়েছে; দেখে মনে হয় ভূস্তর ভেদ ক'রে অতিকায় কোন প্রাণীর কবচাবৃত একটা পিঠ উপরে ভেসে উঠেছে। সারা দিন কাঠবিড়ালির দল ছুটোছুটি করে পাথরের উপর, মাঝে মাঝে ঝোপঝাপ থেকে নেউল আর সাপ লড়তে

লড়তে বের হয়ে এসে এই পাথরের উপরেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করে। এর পরেই আমলকি জঙ্গলের আরম্ভ, এবং সব চেয়ে দূরে মেঘকায় ধুলপাহাড়ের ঢেউ।

অফিস ঘরের চারদিকটা যত নয়নাভিরাম, ভিতরটা তেমন নয়। দেয়াল জুড়ে কতগুলি বড় বড় কাঠের র‍্যাক, তার উপর কাগজ পত্রের ছোট বড় অনেক ফাইল আর বাণ্ডিল, ধুলোয় ঢাকা। অনেক ম্যাপ, রিপোর্ট আর খসড়া স্কেচ—সবই আগের সাহেবের অর্থাৎ চৌধুরী সাহেবের হাতের কাজ। বোঝা যায়, চৌধুরী সাহেব খেটে ছিলেন খুব। অনেক তথ্য ও তত্ত্বের একটা স্তূপ তিনি রেখে গিয়েছেন, কিন্তু গুছিয়ে রেখে যেতে পারেন নি। এবং তাঁর লেখা বিরাট রিপোর্টটাও হঠাৎ যেন এক জায়গায় এসে থেমে গিয়েছে। ব্যাপারটাও তাই, হরভবন স্তূপের পরিচয় তিনি মাত্র গুছিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, শেষ করতে পারেন নি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কাঠের তাকের উপর থেকে ফাইল-বাঁধা কতগুলি ম্যাপ নিয়ে একটা টেবিলের উপর রেখে পড়তে থাকে কুশল। একটা টাইপরাইটার আর হিসাবের খাতার ছোট একটা স্তূপ নিয়ে আর একটা টেবিল আছে অফিস ঘরে, কেরানিবাবু বসে আছেন এই টেবিলের কাছে। চোখের চশমাটা নাকের উপর একটু নামিয়ে দিয়ে কুশলের দিকে তাকান কেরানিবাবু, তারপর বলেন—কি মশাই, এসেই যে একেবারে কাজে মন দিয়ে ফেললেন?

কুশল হাসে—কাজটা যখন নিয়েছি, মন তো দিতেই হবে।

কেরানিবাবু—তা দেবেন বৈকি, অমন ঝড়াক্ ক'রে প্রথম চোটেই পঁচাশি টাকা মাইনে হ'লে কাজে মন না দিয়ে পারবেন কেন?

কুশল কৌতূহলীভাবে তাকায় কেরানিবাবুর দিকে। কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা দুটি ক্ষুব্ধ ভুরুর নীচে চোখের মতই দেখতে দু'টো বিরক্ত ও তিক্ত গোলাকার কাচখণ্ড যেন কুশলের দিকে তাকিয়ে আছে। আশঙ্কা হয় কুশলের, এই বোধ হয় আর একটি পরীক্ষার মূর্তি।

কুশলের আশঙ্কা মিথ্যা নয়। এত দীর্ঘকাল ধরে, এই ভুতুড়ে মিউজিয়ামের ধুলো আর জংলি স্তূপের কাঁটার হিসাব যিনি আগলে রেখে আসছেন, তাঁর মাইনে ষাট-টাকা মাত্র। আর যত টেম্পোরারি অর্বাচীন এসে প্রথম থেকেই মাইনে মারতে থাকে, কেউ পঁয়ষট্টি কেউ সত্তর, কেউ আশি বা পঁচাশি। ঐ সার্ভেয়ারগুলোই বা কি কম নরাধম? আরম্ভই করেছে ষাট টাকায়।

সপ্তাহে দু'দিন ক'রে সোসাইটির দপ্তরে পত্র লেখেন কেরানিবাবু, মাইনে বাড়াবার

জন্ম আবেদন জানিয়ে। মাইনে বাড়াবার অক্ষমতা জানিয়ে সোসাইটি উত্তর দেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখের মত দেখতে কেরানিবাবুর দুটি গোলাকার কাচখণ্ড অভিশাপের স্ফুলিঙ্গ তুলে তাকায়, যাকে সম্মুখে পাওয়া যায় তারই দিকে।

কে না তার মাইনের পথে কণ্টক? পাগলা দারোয়ান পাঠকজী বেশি হাসাহাসি করলে কেরানিবাবু চটে যান। সন্দেহ হয়, হয়তো এই বেটাই হেসে হেসে তাঁর মাইনে কমিয়ে দেবার মতলব করেছে। কুলির দল যখন সন্ধ্যাবেলা কোদাল গাঁইতি জমা দিয়ে মাঠে বসে গান গায়, সহ্য করতে পারেন না কেরানিবাবু। কে জানে, অসভ্যগুলোর এই সব গানটানই হয়তো তাঁর ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে রেখেছে! মাইনেটাই তাঁর জীবন, এবং চোখের সামনে যাকে দেখা যায়, সেই তাঁর মাইনের শত্রু। এমন মানুষের পক্ষে নতুন লোক কুশলের পঁচাশি টাকা সহ্য করা কষ্টকর বৈকি।

কেরানিবাবুর কথার কোন উত্তর না দিয়ে মন দিয়েই ম্যাপ দেখতে থাকে কুশল। তারপর একটা রিপোর্ট তুলে নিয়ে পড়তে বসে।

কেরানিবাবুও তাঁর হিসাব লেখার মাঝখানে কলম থামিয়ে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে আর একবার কাচবিদ্ধ করেন কুশলকে। জিজ্ঞেসা করেন—পড়ছেন তো খুব, বুঝছেন কিছু?

কুশল—না, এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

কেরানিবাবু—আর বেশি বোঝাবুঝির দরকার কি? পঁচাশি টাকা তো বাগিয়েই ফেলেছেন!

কুশল—আপনি কত পাচ্ছেন?

কেরানিবাবুর চোখের কাচখণ্ড হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দুলতে থাকে। উত্তপ্ত স্বরে বলেন—বেশি দম্ভ করবেন না মশাই, মাইনে তুলে কথা বলবেন না। আপনি কি মনে করেন যে, আমার তুলনায় আপনার মনুষ্যত্বের দাম পঁচিশ টাকা বেশি?

কুশল হেসে ফেলে—নিশ্চয় নয়।

কেরানিবাবু সংযত হন বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে যান যে, এই পঁচাশি টাকার মূর্তিটা এখান থেকে অপসারিত না হলে তাঁর মাইনে বাড়বার আর কোন ভরসাই নেই।

ধুলোয় ভরা রিপোর্টের ফাইল নিয়ে পড়তে পড়তে কখন্ যে মনটা এক ধ্বংসস্তূপের ধুলোর রহস্যের মধ্যে ডুবে গিয়েছে, বুঝতে পারেনি কুশল। কতক্ষণ যে পার হয়ে গিয়েছে, তা'ও বুঝতে পারে না। এরই মধ্যে কেরানিবাবু উঠে নিজের

ঘরে গিয়ে স্নানাহার সেরেছেন। তারপর কখন্ এক বাটি চা নিয়ে অফিস ঘরের চেয়ারে এসে আবার বসেছেন কেরানিবাবু, কিছুই লক্ষ্য করেনি কুশল।

হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারে কুশল, বিকাল হয়েছে। চেয়ারের উপর বসে বৈকালীন চা খাচ্ছেন কেরানিবাবু। কেরানিবাবুর দিকে তাকাতে মনে একটুও রাগ বা তিক্ততা হয় না কুশলের, বরং দুঃখ হয়, ভদ্রলোক কেন অকারণে মনের শান্তি নষ্ট ক'রে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন।

কেরানিবাবুর দিকে তাকিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ে কুশলের, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা। সারাদিন খাওয়া হয়নি আজ। তৃষ্ণার্ত বোধ ক'রে কুশল, এক কাপ চা পেলে মন্দ হতো না।

কিন্তু অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চা খাচ্ছিলেন কেরানিবাবু। চায়ের ভরসা ছেড়ে দিয়ে কুশল বলে—মিউজিয়ামটা একবার দেখবো কেরানিবাবু।

কেরানিবাবুর কাচখণ্ড দপ ক'রে ঝলসে ওঠে—এখন বাড়ি যান মশাই বাড়ি যান, কাল দেখবেন। একদিনেই খুব বেশি ক'রে দেখে ফেললে, খুব বেশি ক'রে মাইনে বাড়বে না।

আর একটা ছোবল দিয়ে কেরানিবাবু অফিস ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বিব্রত বোধ করলেও কোন জ্বালা লাগে না কুশলের মনে। পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দীক্ষা নিতে আজ প্রতিজ্ঞা ক'রেই বের হয়েছে কুশল। এক একটি ক'রে মানুষের পরিচয়ও লাভ করছে, প্রথম দেবী রায় তারপর কেরানিবাবু। তার প্রতিজ্ঞাকে যেন ভয় দেখিয়ে টলিয়ে দেবার জন্য পর পর দুটি আঘাত। প্রথম দিনেই মানুষের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে পালিয়ে যাবার পক্ষে এই দু'টি কুদৃশ পরিচয়ের আঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু আঘাত লাগলেও আঘাতটা মনে বাজে না, বিচলিত বা বিদ্বিষ্ট হয় না কুশল। নিজের অহংকারকে ছোট ক'রে দিয়ে সে আজ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছে। কেরানিবাবু চলে গিয়েছেন, একা অফিস ঘরে ক্লান্তভাবে বসে থাকে কুশল, তবু বুঝতে পারে এবং ভাবতে ভাল লাগে যে, আর একটা পরীক্ষাতেও সে পার হতে পেরেছে।

আসুক পরীক্ষা, পৃথিবীকে সে আজ গ্রহণ করতে এসেছে, পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নয়। এই কাঁটাগুলিই হয়তো পৃথিবীর সব নয়, ফুলের আনন্দও আছে। কোথায় আছে কে জানে? এখন শুধু কাঁটাগুলোই বিঁধছে—বিঁধুক। শুধু এইটুকু ধারণা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে, পেলাম না ব'লে পালিয়ে যেতে পারবে না কুশল।

জানালার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ায় কুশল। সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরি

আছে। শারদ বৈকালের এই উজ্জ্বলতা গায়ে মেখে এখন পথ ধরে বাড়ি ফিরতে ভালই লাগবে।

দূর ধুলপাহাড়ের বুকে এখনও সিঁদুরের ঢেউ জাগেনি, আমলকির বনের উপর পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়ায়, আর খেজুর বনের কাছে সাদা পাথরের উপর…।

দুটি মূর্তি! একজন হলো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায়, তার বুকে হেলান দিয়ে এক তরুণীর মূর্তি বন্দুক তুলে আকাশের দিকে তাক ক'রে রয়েছে।

দেখতে ভুল হয়নি কুশলের। সত্যিই বন্দুক তুলে শরতের নীলাকাশ শিকার করছে নবলা। একটু দূরেই একটা কাঁটা ঝোপের পাশে টু-সিটার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বন্দুকের শব্দে একবার শুধু চমকে ওঠে কুশল, কিন্তু তারপর আর নয়। বেশ স্পষ্ট ক'রে সহজভাবে দু'চোখ দিয়ে, আর বৈকালী বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পারে কুশল, কলহাসির শব্দে সারাদেহ রণিত করে আবার বন্দুক লোড করছে নবলা।

বন্দুকের গুলি চালিয়ে নীলাকাশকে ছিন্ন করতে পারলো না নবলা। কিন্তু কুশলের মনের গভীরে তারই অগোচরে অতীত জীবনের কতগুলি প্রহসনের অপচ্ছায়া যেন জমাট অন্ধকারের মত লুকিয়েছিল, ছিন্ন হয়ে গেল সেই অন্ধকার। মুক্ত হয়ে হালকা হয়ে ওঠে কুশল। একটা লজ্জাহত বেদনা যেন গোপন ক্ষতের মত লুকিয়ে ছিল তিক্ত স্মৃতিভার হয়ে, নেমে গেল সেই ভার। একবার চমকে উঠলেও এই পরীক্ষাটাও পার হতে পারলো কুশল। পিয়ালতলার প্রতিশ্রুতির ভাষা হাসি আর ব্যাকুলতা-গুলিকে বেশ স্পষ্ট করেই মনে পড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য; কারও উপর রাগ হয় না, বরং হাসি পায়।

দেখতে পায় কুশল, চলে গিয়েছে টু-সিটার। নীলাকাশ নীল হয়েই আছে, কাঠবিড়ালির দল নির্ভয়ে সাদা পাথরের উপর ছুটাছুটি করে আর ঘাসের বীজ খায়।

সন্ধ্যা নামতেও আর বেশি দেরি নেই। অফিসঘর ছেড়ে বের হয় কুশল। দেখতে পায়, দারোয়ান পাঠকজী রুটি ও গুড় হাতে নিয়ে গাছতলায় বসে আছেন। পাশে এক ঘটি জল। একজন জংলি জাতের যুবক বসে আছে পাঠকজীর সামনে। তারও হাতে একটা রুটি, বোধ হয় পাঠকজীই দিয়েছেন।

জংলি যুবক রুটি হাতে তুলে নিয়েও খেতে পারে না। পাঠকজী প্রশ্ন করেন—কি হলো?

জংলি যুবক ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকায়—আমার জরুও ভুখা আছে, তাকে না দিয়ে আমি একা কি ক'রে খাই?

সব রুটি জংলি যুবকের হাতে তুলে দিয়ে পাঠকজী বলেন—যাও, বাড়ি গিয়ে দুজনে মিলে খেও।

কুশলকে দেখতে পেয়েই পাঠকজী চীৎকার করেন—আরে, আপনি এখনও আছেন দেখছি, বাড়ি যাননি ?

কুশল—এই যাচ্ছি।

পাঠকজী—তা'হলে সারাদিনের মধ্যে খেলেন কি আপনি ?

কুশল—কিছু না, এইবার বাড়ি গিয়ে খাব।

পাঠকজী হাত ধুতে ধুতে অনুযোগ করেন—এরকম কাণ্ডও করতে হয়, ছিঃ। শুধু একবার এসে যদি আমাকে একটা আদেশ দিয়ে যেতেন, বাস্—তা'হলেই তো আমি পনর :মিনিটের মধ্যে আপনার জন্য খিচুড়ি ফুটিয়ে দিতাম। রামজীর কৃপায় আমার এখন চালও আছে·ডালও আছে।

হাত ধোয়া হয়ে যায় পাঠকজীর! কুশলের সামনে হাত জোড় ক'রে মিনতি জানায়।—মাত্র আর দশটা মিনিট অপেক্ষা যদি করেন কুশলবাবু, এখুনি গরম গরম রুটি সেঁকে দিই, খেয়ে নিন। রামজীর কৃপায় আমার এখন আটাও আছে লকড়িও আছে।···আসুন আমার সঙ্গে।

পাঠকজীর সঙ্গে গিয়ে একটি মাটির ঘরে ঢোকে কুশল। দেয়ালগুলি মাটির, চালাটা খাপরার, ঘরের সামনে একটা নিকানো জায়গা আর মাঝখানে একটি তুলসী। এই হ'লো পাঠকজীর আশ্রয়।

ঘরে ঢুকতেই পাঠকজী কুশলের দিকে একটা কম্বল টেনে দিয়ে বলেন—বসুন কুশলবাবু, রামজীর কৃপায় আমার একটা কম্বলও আছে, আবার একটা পিতলের লোটাও আছে।

শালপাতার ঠোঙায় আটা মাখতে মাখতে পাঠকজী যেন নিজের মনেই বলে ওঠেন —সন্তোখ, সন্তোখ! সন্তোখ চাই জীবনে, বাস তাহ'লেই তো হয়ে গেল। আর কি চাই ?

চমকে পাঠকজীর মুখের দিকে তাকায় কুশল, যেন হঠাৎ আকাশবাণীর মত একটা ধ্বনি তার কানে এসে পৌঁছেছে। কে বললে এই কথাটা ? শালপাতার ঠোঙায় আটা মাখছে পাঠকজী নামে পরিচিত ঐ পনের টাকা মাইনের এক মহা দরিদ্র, সে-ই কি ?

—মিললো যদি আটা আর গুড় তবে ভালই। তা না হ'লে, হয় আটা না হয় গুড়। আর তা'ও যদি না হয়, তবে এক লোটা জল। মন্দ কি ? আর, এক লোটা জলও যদি না মিলে কুশলবাবু, তাহ'লেই বা ভয় কি ? আছে রামজীর কৃপা।

ক্ষুধার্তের মত আগ্রহ নিয়ে পাঠকজীর কথাগুলি শুনতে থাকে কুশল। কথা-গুলি যেন একেবারে মনের গভীরে গিয়ে শিহরণ তুলে বাজতে থাকে, ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়, ভয় ভাঙ্গিয়ে দেয়। একটা মেটে ঘরের রিক্ততার মধ্যে কেমন ক'রে এমন আনন্দে সোনা হয়ে আছে পাঠকজীর মন ?

—সন্তোখ! সন্তোখ! উনুনে ফুঁ দিতে দিতে নিজের মনের আবেগেই আবৃত্তি করতে থাকেন পাঠকজী, কুশলের বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরটা যেন তারই মধ্যে ধ্বনিত হয়।

চুপ ক'রে বসে থাকে কুশল। পাঠকজীর ঘরে এসে এতক্ষণ সে কোন প্রশ্ন করেনি, কথা ব'লে আলাপও করেনি। কথা বলতে ইচ্ছাও করে না কুশলের; কথা বলতে গেলে যেন তার এই মুগ্ধ মনের আবেশ ছিন্ন হয়ে যাবে।

তুলসীর তলায় প্রদীপ রাখেন পাঠকজী; তারপর শালপাতার ঠোঙ্গায় রুটি আর গুড় নিয়ে কুশলের সামনে রেখে কৃতার্থভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর একটা অনুরোধ জানান।—আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে দুপুর বেলাটা রোজই আপনার জন্য খিচুড়ি ফুটিয়ে দিতে পারি। আপনার দরকার মত চাল-ডালটা শুধু বাড়ি থেকে নিয়ে আসবেন, নইলে সকালে এসে আবার বাড়ি ফিরে খেয়ে আসবার সময় পাবেন কোথায় ?

কুশল—কিন্তু আপনার কোন কষ্ট হবে না তো ?

পাঠকজী—কি যে বলেন! আমি আর কি দিলাম যে আমার কষ্ট হবে ? আপনার চাল-ডাল আপনি খাবেন। রামজী আমাকে দু'টো হাত দিয়েছেন, আমি শুধু তারই জোরে রান্না ক'রে আপনাকে খাইয়ে দেব, এই তো ?

পাঠকজীর সৌহার্দ্যের প্রসাদ রুটি গুড় আর জল খেয়ে উঠে দাঁড়ায় কুশল—তাই হবে পাঠকজী। আজ আসি।

রওনা হলো কুশল। সার্ভে অফিসের এলাকা ছেড়ে মাঠে মাঠে হেঁটে চলতে থাকে। পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দীক্ষা আজ পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন পাঠকজী। কতগুলি কাঁটার খোঁচার পর এতক্ষণে যেন এক শতদলের কোমল স্পর্শ এসে লেগেছে কুশলের প্রথম দিনের চাকরির জীবনে।

ঐ কাঁটার আঘাতগুলিও এক একটা উপহার। মুছে দিয়েছে ঈর্ষা, জাগিয়েছে ক্ষমা। তার মিথ্যা-শিক্ষায় জর্জরিত জীবনের শোণিত থেকে কতগুলি পুরনো বিষের বাষ্প বের ক'রে দিয়েছে। নবলার বন্দুকের শব্দ আরও বড় উপহার, একটা দুঃস্বপ্নের পাহাড় চূর্ণ হয়ে যাবার শব্দ।

ভারমুক্ত নির্ভয়-মনের প্রসন্নতা নিয়ে এই সন্ধ্যার বাতাসকে বুকভরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বরণ করতে পারে কুশল। কাঠ কাটতে গিয়ে কাঠুরিয়া মানিক কুড়িয়ে পায়, চাকরি করতে এসে প্রথম দিনেই এক দুর্লভ উপহার পেয়ে যেন ধন্য হয়ে ঘরে ফিরে যায় কুশল।

মিউজিয়মের দরজার মরচে-পড়া তালাটা খুলতেই দেখা গেল যেন এক পরিত্যক্ত শ্মশান-ভূমিতে মাকড়সার জালে ঢাকা শত শত শিলীভূত মৃতদেহ আর তাদের সংসারের বহু ও বিচিত্র সব উপকরণ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। বহুদিন পরে আলো ও বাতাস ঢুকলো এই মিউজিয়াম ঘরে।

আর ঢুকলো কুশল, সঙ্গে জন পঞ্চাশ কুলি। সারাদিন ধরে চললো মিউজিয়াম সাজাবার কাজ। ঝুড়ি ঝুড়ি ধুলো ময়লা তুলে নিয়ে বাইরে ফেলা হলো। পিপেয় ভ'রে জল নিয়ে এসে পিচকারি দিয়ে মূর্তিগুলিকে স্নান করানো হলো। বদ্ধ জানালা-গুলির ছিটকিনি থেকে মরচে ছাড়িয়ে আবার খুলে দেওয়া হলো, আরও আলো আর বাতাস ঢুকলো ঘরে। চুনকাম করা হলো দেয়াল। মেজেটা ধুয়ে তকতকে করা হলো। ছুতোর লাগিয়ে কাঁচাকাঠের তক্তা দিয়ে কতগুলি গ্যালারি তৈরি করে ফেললো কুশল।

তারপর চললো সত্যি ক'রে সাজাবার কাজ। এতক্ষণে, এত ধোয়া মোছার পর মূর্তিগুলিকে স্পষ্ট ক'রে চেনা যায়। এক একটা গ্যালারি আর তাকের নম্বর দিয়ে, মূর্তি আর সামগ্রীগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও স্তরে সাজিয়ে রাখতে থাকে কুশল। এক নম্বর গ্যালারিতে তিনটে জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তি, দু'নম্বরে গোটা'দশেক পোড়া মাটির বৃষ, তার পরেরটায় চূণা পাথরের একটা বিরাটকায় ভগ্ন সিংহ। নাগরী লিপির শিলাশাসনগুলি সাজিয়ে রাখে একটা তাকে, আর একটা তাকে ব্রাহ্মী লিপির পাথরগুলি। নাগ বৃক্ষ স্বস্তিকা বা গরুড়ের মূর্তি আঁকা মুদ্রাগুলি গুণে গুণে গুছিয়ে রাখে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে—রুপোর তামার ও পোড়ামাটির মুদ্রা! কোন্ দূরাতীত কালের মানুষের এক সমৃদ্ধ উপনিবেশের কত শত টুকরো টুকরো স্মৃতি আর নিদর্শন—শঙ্খের বেদিকা, অস্থি-ভস্মের আধার, গজদন্তের মঞ্জুষা। ধাতুর দীপাধার আর রঞ্জিত ইষ্টকের খণ্ড। কোন্ পুরসুন্দরীর চিরকালের মত হারিয়ে যাওয়া একটি পাথরের কজ্জলশলাকা আর স্খলিত নূপুর। কোন্ বিলাসবতীর একটি দর্পণের ভগ্নাংশ, কোন্ কর্মিণী গৃহবধুর একখানি দুগ্ধমন্থনের দণ্ড আর শস্য পেষণের শিলাচক্র। কোন্ বিপনিস্বামীর কয়েকটি তৌলের পাথর আর সুতনুকা তরুণীর লাক্ষার কর্ণপূর। পুঁতির মালা, মাটির পাত্র, তামার কুঠার—ভিন্ন ভিন্ন গ্যালারিতে

তাকে আর সারিতে সুবিন্যস্ত ক'রে রাখে কুশল। দুটি সৌধস্তম্ভের ভগ্নাংশকে ঠিক মিউজিয়ামের দরজার দু'পাশে রাখা হয়। অনেকগুলি দ্বিভঙ্গ নায়িকামূর্তিও ছিল, অনেকগুলি কাঠের টুল তৈরি করে তার উপর মূর্তিগুলিকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে দেয় কুশল। লাল বেলে পাথরের জীর্ণশীর্ণ এক যক্ষকে তুলে নিয়ে একটা থামের গায়ে হেলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়।

ঘরের মাঝখানে চূর্ণবিচূর্ণ অনেকগুলি মূর্তি একটা ঢিবি হয়ে পড়েছিল। কাছে গিয়ে নাড়া-চাড়া করতেই কুশলের মনটা হঠাৎ ব্যথিত হয়ে ওঠে। শিবের ও শিবসঙ্গিনীর রূপের নানা মূর্তি, কোনটাই আর আস্ত নেই। কালসংহারের হাতের ত্রিশূলটি আছে, কিন্তু গলিতজটা ও ত্রিনয়ন চূর্ণ হয়েছে। অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্যপর নটরাজের দু'টি পা মাত্র আছে, উর্ধ্বাঙ্গ নেই। শিবের কোলে বসে আছে ছোট একটি উমা, কিন্তু উমার সুন্দর মুখখানা গ্রীবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুন্দর একটা ঢেলার মত পাশেই পড়ে আছে।

মিউজিয়াম ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের মঞ্চ তৈরি ক'রে তার উপর শিব ও শিবানীর এই চূর্ণীকৃত রূপের এক একটি টুকরো সযত্নে সাজিয়ে রাখে কুশল। সব শেষে একটি মূর্তি পাওয়া যায়, ধুলোর উপর লুটিয়ে শুয়েছিল এই মূর্তি। কুশল দেখে খুশি হয়; এই মূর্তিটা অটুট আছে।

একটা ব্রঞ্জের দেবিকামূর্তি। সমস্ত অবয়বের সৌষ্ঠবে কেমন একটা ছন্দ রয়েছে। মূর্তির চোখে মুখে ও শরীরে যেন কল্লোলিত হয়ে রয়েছে লাবণ্যময় কান্তি। পাথুরে পরিচ্ছদটাও অদ্ভুত। কটি-মেখলার সঙ্গে গ্রথিত, যেন ঢেউ দিয়ে তৈরি একটি আচ্ছাদক, তার মাঝে মাঝে জলবেণীর কুঞ্চন।

কি আশ্চর্য; অনেক চেষ্টা ক'রেও এই অটুট দেবিকামূর্তিকে মঞ্চের উপর দাঁড় করাতে পারা গেল না। মূর্তিটা যেন নিজের পায়ে ভর দিতে জানেনা, দাঁড় করাতে গেলেই হেলে পড়তে চায়। এই রহস্য বুঝে উঠতে পারে না কুশল, ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়, বিস্ময়টাও মাঝে মাঝে মৃদু শঙ্কার মত শিউরে ওঠে।

জানতে হবে এর রহস্য, তীব্র কৌতূহল মাথায় চেপে বসে কুশলের।

খুবই ক্লান্ত হয়েছিল কুশল। বেলাও পড়ে এসেছিল, লোকজন সব চলে গিয়েছে, তবু বসে থাকে কুশল। অফিস ঘর থেকে তিনটে দেয়াল বাতি নিয়ে এসে মিউজিয়ামের দেয়ালে লাগিয়ে দেয় কুশল; দুই প্রান্তে দুটো আর মাঝখানে একটা। চৌধুরী সাহেবের লেখা রিপোর্টের সব ফাইল নিয়ে পড়তে বসে কুশল। তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে, এই কল্লোলিতকান্তি দেবিকামূর্তির পরিচয় যদি কিছু পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার আরম্ভে আলো জ্বলতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায় টেনিস র‍্যাট হাতে নিয়ে মিউজিয়ামে ঢোকে। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে বলে—মন্দ হয়নি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তে ব্যস্তভাবে চলে যায় দেবী রায়।

ধীরে ধীরে, থমকে থমকে, মিউজিয়াম ঘরে এসে ঢোকেন কেরানিবাবু। কোন দিকেই তাকান না। একজোড়া কাচখণ্ডের মত চোখ তুলে তাকান কুশলের দিকে। —মাইনে বাড়াতে পারবেন মশাই, কোন সন্দেহ নেই, পারবেন। কেরানিবাবু চলে যান।

হাতে একটা ধূপদান নিয়ে ভজন গাইতে গাইতে মিউজিয়াম ঘরে ঢোকেন পাঠকজী। চারদিকে তাকিয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন—বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর, এইবার জমে উঠেছে মহাকালের সংসার!

সারা ঘরে ধূপের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে পাঠকজীও চলে যান। একা বসে থাকে কুশল।

চোখ তুলে এইবার চারদিকে তাকায় কুশল। হ্যাঁ, মহাকালের সংসার বটে! হাজার হাজার বছরের প্রীতি পুণ্য ও বৈভবের রূপ নিথর ও নির্বাক হয়ে রয়েছে। চোখ থাকলে দেখা যায়, হৃদয় থাকলে বোঝা যায়।

ক্ষণিকের কল্পনার আবেশ সংযত করে কুশল। চাকরি করতে এসেছে সে, এমন ক'রে কল্পনার আবেশে হারিয়ে যাবার জন্য নয়। মিউজিয়ামের ঐতিহাসিক নিদর্শনের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তাই জানতে হবে, এই কল্লোলিত-কান্তি মূর্তিটি কার মূর্তি? চৌধুরী সাহেবের রিপোর্টে আবার মন দেয় কুশল।

অনেকক্ষণ পরে, যখন দেবী রায়ের টু-সিটার এসে গ্যারেজে ঢুকে পড়েছে, কেরানিবাবু তাঁর ভুতুড়ে হিংসা নিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন, আর পাঠকজী রামায়ণী দোঁহা পড়তে আরম্ভ করেছেন, তখন সেই অল্পরাতের একটি মুহূর্তে রহস্যটা আবিষ্কার করে কুশল। চৌধুরী সাহেব তাঁর রিপোর্টের এক জায়গায় লিখে গিয়েছেন—এই মূর্তিটা হলো গঙ্গা। এর গঠনভঙ্গী দেখে কোন সন্দেহ থাকে না যে, এটি হলো যুগলমূর্তির একটি। মনে হয়, এই মূর্তির পাশেই ছিল শিব গঙ্গাধর, যার প্রসারিত একটি বাহুতে গ্রীবার ভর সঁপে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গা।

রিপোর্টের ফাইল রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কুশল। মিউজিয়ামের দরজা বন্ধ করার আগে কাঠের ফ্রেমে হেলানো গঙ্গার মূর্তিটার দিকে একবার দৃষ্টি পড়ে। হ্যাঁ, কল্লোলিতকান্তি গঙ্গা, তাই দু'চোখে এমন স্নিগ্ধতা, হাসি মাখানো দুটি ঠোঁটে এমন ললিত মায়া। কে জানে কোথায় ওর গঙ্গাধর লুকিয়ে আছে, হরভবনের

ধ্বংসস্তূপের কোন্ আড়ালে, আমলকির জঙ্গলের নীচে বালু মাটি আর কাঁকরের কোন্ গভীরে।

ভুলে গিয়েছে কুশল যে, পঁচাশি টাকা মাইনের চাকরি করতে সে এসেছে এই আমলকির জঙ্গলে, ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে। যেন গঙ্গাধরকে আবিষ্কার করার দায়িত্ব পড়েছে তার উপর। যেমন ক'রেই হোক, যতদিন লাগুক, অহোরাত্রির চিন্তা আর পরিশ্রম দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে, কোথায় লুকিয়ে আছেন সোমমৌলী গঙ্গাধর, কোথায় কোন্ গহনে তাঁর বাম বাহু প্রসারিত ক'রে প্রিয়াকণ্ঠস্পর্শ খুঁজছেন, খুঁজছেন তাঁর বুকের পাশে গঙ্গার কল্লোলিত মাধুরীর অভিষেক।

পর পর সাতটা ট্রেঞ্চের ভিতর নেমে কুলিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কাজের নির্দেশ দেয় কুশল। কখনও বা একা একা ঘুরতে থাকে আমলকির জঙ্গলে। কখনও বা একটা শ্যাওলা-মাখা ভাঙা স্তম্ভের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও বা দু'হাজার বছর আগের এক পথিকের মত যেন চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে কুশল। মনে হয়, যেন এইখানে ছিল তার ঘর, কবে কেমন ক'রে হারিয়ে গেল কে জানে ?

মাঝে মাঝে তার খাতাপত্র নিয়ে ঘাসে ছাওয়া মাটির ঢিবির উপর বসে থাকে কুশল। কাজ চলতে থাকে। একশো কুলির হাতে এক'শো কোদাল গাঁইতা খেলছে। ঝপ ঝপ ঝপ! এক'শো মানুষের শরীরের মাংসপেশী নৃত্য করে। মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেই গান গায় কুলির দল। ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে হরভবনের প্রাচীন মাটি যেন গুঞ্জরিত হয়ে সাড়া দিয়ে ওঠে। যেন দু'হাজার বছরের হারানো অনুভবের ভাষা শুনছে কুশল।

একটু ক্লান্ত হয়ে যখন ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে কুশল, তখন এই অনুভব যেন আরও নিবিড় ও আরও স্পষ্ট হয়ে তার মনটাকে ঘিরে ধরে। এত স্পষ্ট ক'রে এবং সত্যি ক'রে গায়ে মেখে পৃথিবীর মাটিকে অনুভব করার সুযোগ কোনদিন পায়নি কুশল। কখনও কল্পনা করতেও পারেনি কুশল, এরকম মায়ের আদরের মত লাগবে এই মাটির স্পর্শ।

কল্পনার কুহক থেকে মুক্ত হয়ে উঠে বসে কুশল। আমলকির জঙ্গলে বসে পঁচাশি টাকা মাইনের সুপারভাইজারের মত আবার ট্রেঞ্চের কুলিদের দিকে তাকায়। তবু চোখে যেন একটা মোহাঞ্জন লেগেই থাকে। কী সুন্দর দেখতে কুলিদের মুখগুলি, যেন কত হাজার বছরের চরিত্র আঁকা রয়েছে এই স্বেদাক্ত মুখগুলির রেখায় রেখায়। ওরাই তো আর কিছুক্ষণ পরে সার্ভে অফিসে ফিরে গিয়ে কোদাল ছেড়ে দিয়ে

পাঠকজীর দোঁহা শুনবে মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে। সন্ধ্যার মাঠে বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে গান গাইবে, আর ঘরে ফিরে গিয়ে ভাত খাবার আগে চুমো খাবে কোলের ছেলেমেয়েকে।

হয় তো স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে না, কিংবা বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে না কুশল, বার বার তার কল্পনা অনুভব আর চোখের দৃষ্টি দিয়ে আজ নিজেকেই যেন আবিষ্কার ক'রে চলেছে। ভাল লাগে শরতের এই বৈকালী আলোক। আমলকির ছোট ছোট ছায়া, বনপিপুলের গন্ধ, পাখির ডাক আর লক্ষ লক্ষ লতাপাতা ও ফুলের রঙ নিয়ে একটা প্রাণ জেগে রয়েছে চারদিকে। ঐ প্রাণ প্রতি মুহূর্তে তারই শোণিতে আর নিঃশ্বাসে ছন্দ রেখে চলছে। নইলে দেখতে এত ভাল লাগে আর আপন লাগে কেন পৃথিবীকে ?

চমক ভাঙে কুশলের যখন পাঁচ নম্বর ট্রেঞ্চে কুলির দল হল্লা ক'রে ওঠে উল্লাসে—মিলা হ্যায়! আস্তে কোদাল! মিলা হ্যায়!

কি মিললো ? ছুটে গিয়ে ট্রেঞ্চের ভিতর নামে কুশল। মাত্র ছয় ফুট গভীরে দুধিয়া মাটির কাদায় মাখা দু'টি মূর্তি পড়ে রয়েছে। আশে পাশে আস্তে আস্তে কোদাল চালায় কুলিরা, আরও মূর্তি থাকতে পারে। এক ঘণ্টা ধরে মাটি সরাতে সরাতে এক এক ক'রে পাওয়া গেল সব সুদ্ধ তেরটি ছোট-বড় কৃষ্ণশিলার মূর্তি।

সেদিনকার মত পাঁচ নম্বর ট্রেঞ্চের কাজ বন্ধ ক'রে সন্ধ্যা হবার আগেই কাদামাখা মূর্তিগুলি নিয়ে কুলির দল ও কুশল ফিরে গেল অফিসে। মূর্তিগুলিকে ধোয়া মোছা ক'রে মিউজিয়াম ঘরের মেজের উপর জমা করা হলো।

মূর্তিগুলি সবই অটুট, শত শত বছর ধরে কাদামাখা হয়ে থেকেও কৃষ্ণশিলার মসৃণতা একটুও নষ্ট হয়নি। মূর্তিগুলি দেখতেও সুন্দর, প্রত্যেকটির দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে কুশল, যদিও একেবারে নিঃসংশয় হয়ে বুঝে উঠতে পারে না, কোনটি কার মূর্তি। কোনটিকে দেখে মনে হয় বামদেব, কোনটিকে বীরভদ্র। একটিকে স্পষ্ট করেই বোঝা যায়, অর্ধনারীশ্বর। কিন্তু যাকে মনের সমস্ত আগ্রহ দিয়ে খুঁজছিল কুশল, তাকেই পাওয়া গেল না। এই তেরটি মূর্তির মধ্যে বামবাহু প্রসারিত ক'রে কোন মূর্তি নেই। আসেননি গঙ্গাধর।

আবার কাল সকালে আরম্ভ হবে গঙ্গাধরের অন্বেষণ। এখন শুধু এই নবাগন্তুক মূর্তিগুলিকে ভিন্ন একটা গ্যালারিতে সাজিয়ে রেখে বাড়ি চলে যাবে কুশল।

হঠাৎ ঘরে ঢুকলো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায়, সঙ্গে কেরানিবাবু।—শুনলাম আজ বেশ ভালরকম মাল উঠেছে ?

কুশল—হ্যাঁ।

দেবী রায়—কোথায়? কোন্‌গুলো বলুন তো?

মূর্তিগুলিকে দেখিয়ে দেয় কুশল। আজ আর দেখামাত্র ব্যস্ত হয়ে চলে যায় না দেবী রায়। বরং আস্তে আস্তে ঘুরে ফিরে মিউজিয়ামের সব নিদর্শনগুলিকে বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখতে থাকে। তারপরেই ইঙ্গিতে কুশলকে সামনে ডেকে নিয়ে বলে—এইবার একটা কাজের মত কাজ ক'রে ফেলুন।

কুশল—বলুন।

দেবী রায়—মিউজিয়ামের সমস্ত আস্ত আস্ত মূর্তিগুলোর, দেবতা বা জানোয়ার টানোয়ার যা আছে, সবারই নাম আর পরিচয়ের একটা লিস্ট তৈরি ক'রে ফেলুন। আমি কালই একজন ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে দেব, লিস্ট দেখে প্রত্যেকটির ফটো তুলিয়ে নেবেন। মুদ্রা-টুদ্রা বা পাত্র-টাত্র যা আছে, তারও একটা ভিন্ন লিস্ট করবেন।

কুশল—আচ্ছা।

কেরানিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দেবী রায় চলে যায়।

সন্ধ্যাবেলাটা মিউজিয়াম ঘরে কিছুক্ষণ একলা বসে থাকতে ভাল লাগে কুশলের। এটা একটা নিত্যদিনের অভ্যাসের মত হ'য়ে উঠেছে। আর একটা মোহ হয়ে উঠেছে, মিউজিয়াম থেকে যাবার আগে কিছুক্ষণ গঙ্গামূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা; যেন দু' চোখের দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ ঐ মূর্তির স্নিগ্ধ মুখের মাধুরীকে উপাসনা ক'রে চলে যায় কুশল।

আজও বসে রইল কুশল, অভ্যাস আর মোহ ছাড়া আর একটা কাজের জন্য। হরভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারিত শিব ও শিবপ্রিয়ার মূর্তিগুলির রূপতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা লেখা আরম্ভ করবে কুশল। এতদিন পরে সত্যি ক'রে রিসার্চ করবার একটা তাগিদ এসেছে মনের ভিতর থেকেই।

হরভবনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হারিয়ে আছে রূপ, সেই রূপকে নতুন ক'রে খুঁজে বের করতে আর ফিরে পেতে আকুলতা জেগেছে কুশলের মনে। লিখতে থাকে কুশল। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে গেলেও শান্ত মনে গভীর আগ্রহ নিয়ে মনোময় ভারতের এক বিচিত্র রূপতত্ত্বের ইতিহাসের পরিচয় লিখতে থাকে কুশল, যে বৈচিত্র্যের অনুভব লাভ ক'রে এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রঙীন হয়ে উঠেছে তার মন।

লেখা থামিয়ে মাঝে মাঝে যখন অন্যমনস্কের মত আলোকিত মিউজিয়ামের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে কুশল। তখন মনে হয়, ক্ষণিকের মত যেন সে তার এই একত্রিশ বছর বয়সের জীবনকেই রিসার্চ ক'রে দেখছে। অনেক জঞ্জাল,

অনেক কাঁটা, অনেক ভুল আর অনেক আলেয়া ও অন্ধকার ছিল সে জীবনে। এক পরম দৈব যেন দয়া ক'রে সে-জীবনের সব উদ্ধত মূঢ়তার প্রয়াস পদে পদে চূর্ণ ক'রে দিয়েছে।

হরভবনের ধ্বংসস্তূপের ভিতরে লুকিয়ে আছে অনেক রূপের মূর্তি, কিন্তু কুশলের জীবনের ঐ পুরনো ধ্বংসস্তূপের ভিতর কি এমন কোন মূর্তি লুকিয়ে আছে, যাকে ফিরে পেতে নতুন ক'রে আকুলতা জাগবে কুশলের মনে? তার জীবনের ঐ লাঞ্ছিত অতীতের মধ্যে এমন কিছু কি আজও রয়ে গিয়েছে বরণীয় হয়ে আর অটুট হয়ে? ফিরে পাওয়ার মত, কামনা করার মত?

লেখা থামিয়ে মিউজিয়াম ঘরের দরজা বন্ধ করার আগে প্রতিদিনের মত আজও একবার ব্রঞ্জের গঙ্গার দিকে তাকায় কুশল। ঘুরে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে, বার বার দেখতে থাকে। দেখার মোহটা যেন আজ আরও নিবিড় ক'রে পেয়ে বসেছে কুশলকে। ব্রঞ্জের গঙ্গাকে আজ দেখতে একটু ভিন্ন রকমের লাগছে। অনেকটা যেন সেই দশ বছর ধরে দেখা একটি স্মিতচক্ষু মেয়ের শান্ত মুখরুচির মত। ঐ কল্লোলিত কান্তির মধ্যে যেন একটা বেদনা রয়েছে। নির্ভর হারিয়ে অসহায় হয়ে রয়েছে ঐ মূর্তি। মিউজিয়ামের মৃদু দীপালোকে, রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে যেন একটা বাষ্পীভূত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কঠিন ব্রঞ্জের গঙ্গা। অনেকটা সেই তার মতই অবাস্তব। দূর নীহারিকার ভিতর থেকে যেন মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে।

মিউজিয়াম ঘর, সম্মুখে ব্রঞ্জের গঙ্গা, কিন্তু ঠিক এইখানে এই মুহূর্তে দূর ফুল-বাড়ির এক রক্তকরবীর আড়াল থেকে একটা বেদনা এসে তার মনের ভিতরটাকে এত উতলা ক'রে দেবে, এমন হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না কুশল।

তাড়াতাড়ি ও ব্যস্তভাবে আলো নিভিয়ে আর মিউজিয়াম ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ায় কুশল। চলতে থাকেও ব্যস্তভাবে। আর বেশি রাত করা উচিত নয়, হয়তো মা আবার চিন্তা করবেন।

অস্বীকার করে না কুশল, এই চাকরিটা পেয়ে অনেক কিছু লাভ হয়েছে তার। যা আশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশি লাভ। এক মাসের শেষে অফিস থেকে মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মা'র হাতে পঁচাশিটা টাকা তুলে দিতে এরকম যে একটা তৃপ্তিতে মন ভরে উঠবে, আগে অনুমান করতে পারেনি কুশল। আজকের এই আনন্দ-সদনের কাছে পঁচাশিটা টাকার মূল্য যে অনেকখানি, তা'তে

সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু এই জন্যই নয়। কুশল মনে করে, এতদিনে যেন তার অহংকারহীন জীবনের শ্রম ও শক্তির জোরে আনন্দ-সদনের আত্মাকে প্রথম শ্রদ্ধার উপহার দিতে সে পেরেছে। পাঠকজী যাকে সন্তোষ বলেন, এই তৃপ্তিই কি তাই?

এতদিনে যেন সত্যিই কুশলের জীবন চলতে আরম্ভ করেছে। পেয়েছে অন্বেষণের প্রেরণা। অন্বেষণ করতে হয়—কোথায় আছেন গঙ্গাধর। খুঁজতে হয়—হরভবনের স্তূপের গভীরে চাপা পড়ে আছে যে রূপলোক। বুঝতে হয়—ব্রঞ্জের ঐ গঙ্গার চোখ দুটো এত সুস্মিত কেন? ইচ্ছা হয়, স্বরূপার মত একটি ভালবাসার সন্ধ্যাতারাকে খুঁজে বেড়াই সারাজীবন ধরে।

দুপুর বেলায় অফিস ঘরে বসে লিখছে কুশল। আজ আর সাইটে যায় নি। কেরানিবাবুও নিজের টেবিলের কাছে বসে হিসাব লিখছিলেন, আর মাঝে মাঝে গল্পালাপ করছিলেন আর একজনের সঙ্গে, যিনি বসেছিলেন একটি টুলের উপর সাত আটটা পুরনো পঞ্জিকা হাতে নিয়ে। ইনি সম্পর্কে কেরানিবাবুর ভায়রা।

লেখার মাঝে মাঝে কলম থামিয়ে কুশল শুনছিল কেরানিবাবু আর তাঁর ভায়রার গল্পালাপ। আর, কেরানিবাবু মাঝে মাঝে গল্পালাপ থামিয়ে তাকাচ্ছিলেন ভুরুর নীচে একজোড়া কাচখণ্ডের ভিতর দিয়ে কুশলের দিকে।

কুশলের ঐ লেখা-জোখা কেরানিবাবুর আর একটা মনোযন্ত্রণার কারণ হয়েছে। তার উপর আবার গভীর মনোযোগ দিয়ে লেখে কুশল, এটাও কেরানিবাবুর যন্ত্রণার উপর অতিরিক্ত একটা জ্বালা হয়ে উঠেছে। মাইনে বাড়াবার জন্যে কিরকম উঠে পড়ে লেগেছে এই সুপারভাইজারটা! বাড়িয়ে ফেলবে নির্ঘাৎ, যদি না এরই মধ্যে বেশ প্ল্যান ক'রে একটা বাধা দেওয়া হয়।

ভুতুড়ে হিংসার প্ল্যান নিয়ে কেরানিবাবু কাজের দিক দিয়েও কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। এরই মধ্যে কুশলের অকর্মণ্যতার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়ে সোসাইটির কাছে একটি বেনামি চিঠি পাঠিয়েছেন। সার্ভেয়ারদের আড়ালে ডেকে নিয়ে বুঝিয়েছেন—নিজেদের ভবিষ্যৎ যদি নষ্ট না করতে চান মশাই, তবে একসঙ্গে মিলে, হয় সুপারভাই-জারকে সরান, না হয় ওর মাইনে কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন, কিংবা ওর মাইনে বাড়াবার চেষ্টা ব্যর্থ করুন।···আমার কাছে আপনাদের নামে কিরকম জঘন্য সব কথা যে বলেছে এই সুপারভাইজার, তা যদি শুনতেন তা'হলে···।

কেরানিবাবুর কাছে কুশলের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রয়াসের একটা বিরাট কাহিনী শুনেও সার্ভেয়ারদের মধ্যে কেউ সাড়া দেননি, মাত্র একজন ছাড়া, সার্ভেয়ার বিশ্বনাথ। ইনি মাঝে মাঝে কেরানিবাবুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গের মধ্যে তাঁর জীবনের আদর্শ

ঘোষণা ক'রে থাকেন—যাই বলুন কেরানিবাবু, জীবনটাই হলো টু-পাইস। সুতরাং, এই টু-পাইসে যদি কেউ বাধা দেয় কেরানিবাবু, তা'হলে…।

সার্ভেয়ার বিশ্বনাথ এরই মধ্যে কেরানিবাবুর পরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, জীবনের টু-পাইসের শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে কুশলের অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা এবং ফাঁকিবাজির এক ডজন উদাহরণ উল্লেখ ক'রে এসেছেন। আরও ব'লেছেন—এমনকি আপনার নামেও অপবাদ দিতে লোকটার একটু বিবেকে বাধে না স্যার।

অভিযোগ শুনে রুষ্ট হয়েছেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেরানিবাবু অনেকটা আশান্বিত হয়ে আছেন, ব্যর্থ হবে না তাঁর এই অন্তরালের উদ্যোগ। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, যদি কোনরকমে জানা যেত সুপারভাইজারটার জন্মের তারিখ ও সময়টা। ওর অদৃষ্টে এখন কোন্ গ্রহের প্রকোপ চলছে, সেটুকু জেনে নিয়ে আবার এক দফা প্ল্যান ক'রে চেষ্টা করা যেত।

গ্রহযোগে সত্যিই বিশ্বাস করেন কেরানিবাবু ভূতবাদ ছাড়া এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র চর্চার বিষয়। এবং এই বিষয় নিয়েই তাঁর ভায়রার সঙ্গে তখন আলাপ করছিলেন—অদৃষ্টের সবই গ্রহযোগের ফল নিতাই ভায়া, শত চেষ্টা ক'রে এক চুল এদিক ওদিক করতে পারবে না।

নিতাই ভায়া সায় দিয়ে বলেন—সে কথা আর বলতে?

কেরানিবাবু—এই ধরনা কেন পাগলা পাঠকজীর কথা। পুজোর সময় ফুল তুলতে গিয়ে এমন একটা কালো কেউটের কামড় খেয়েও দিব্যি বেঁচে রইল। খোঁজ নিয়ে দেখ, দেখবে সেই সময় ওর গ্রহযোগে ছিল মৃত্যু হবে না, তাই হলো না। ও বেটা অবিশ্যি বলে যে রামজীর কৃপায় বেঁচে গেছে। ছোটলোকের কুসংস্কার, কি করবে বল? সায়েন্সে বিশ্বাস করে না।

নিতাই ভায়া বলে—একেবারেই না, যত সব বদ্ধ পাগল!

কেরানিবাবু একটু চাপা স্বরে বলেন—আমাদের সাহেবের কথাই ধর। এখন ওঁর কেমন সুন্দর গ্রহযোগ চলছে, বল দেখি ভায়া!

নিতাই ভায়া—বলবার আর কি আছে, সবই দেখতে পাচ্ছি।

কেরানিবাবু—সাবানওয়ালা রাধেশবাবুর কথাই ধর। সাত দরিদ্রের এক দরিদ্র, অকর্মণ্য হয়ে ঘরে পড়ে আছে। মেয়ে মুড়ি বেচে, তবে দিন চলে। এ হেন মেয়ের সঙ্গে তোমাদের মোটর কোম্পানির ছোটবাবুর বিয়ে, অ্যাঁ? বোঝ দেখি ব্যাপার!

নিতাই ভায়া—বিয়ের কথা চলছে, এখনও দিনটিন ঠিক হয়নি।

কেরানিবাবু—হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, গ্রহযোগে আছে খণ্ডাবে কে? নইলে রাজার মত মানুষ ভিখিরির মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠবে কেন, তুমিই বল?

নিতাই ভায়া উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমার কিছু বলবার নেই ভায়া, চোখের সামনেই সব দেখতে পাচ্ছি।···পাঁজিগুলি দিয়ে গেলাম, আর এই রইল আমার টেঁপির জন্ম তারিখ আর সময়। তুমি তোমার সময় মত একটু বিচার ক'রে ফলাফলটা লিখে রেখে দিও ভায়া, আমি এসে পরে নিয়ে যাব। এ বছর মেয়েটার গ্রহযোগে কি আছে জানতে পারলে, সেইরকম একটু বুঝেসুঝে পাত্রটাত্র খুঁজতাম।

নিতাই ভায়া চলে গেলেন, কেরানিবাবু তাঁর হিসাব লেখার কাজে মন দিলেন। কিন্তু তারও পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেরানিবাবুর টেবিলের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে কুশল। কি একটা ভয়ংকর রহস্যের বার্তা যেন এতক্ষণ ধরে ধ্বনিত হচ্ছিল সেখানে। সে ধ্বনি আর নেই, তবু সেইদিকেই তাকিয়ে আছে কুশল, যেন এখনও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।···কোন্ এক কোম্পানির ছোটবাবু, রাজার মত মানুষ, তারই সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে রাধেশবাবুর মেয়ের, এখনও দিন ঠিক হয়নি।

অফিস ঘর ছেড়ে বাইরে এসে নিমের ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে থাকে কুশল। বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু অবিশ্বাসেরই বা কি আছে? কেউ তো আর পৃথিবীতে কুশলের জন্য থেমে থাকতে আসেনি। নিজের নিজের জীবনের পথ ক'রে নিয়ে এগিয়ে যাবে সবাই। পৃথিবীতে কোন মানুষকে অন্তরের প্রীতি দিয়ে আজ পর্যন্ত দুটো কথাও কি বলতে পেরেছে কুশল যে তার জন্য পথের দিকে তাকিয়ে দু'টো মুহূর্তেও সে প্রতীক্ষা করতে রাজি হবে? ঠিকই করেছে স্বরূপা, বিনা সর্তে দশ বছর ধ'রে প্রতীক্ষা ক'রে আর বিনিময়ে শুধু অবহেলা পেয়ে সে যদি আজ পথ বদল করার জন্য প্রস্তুত হয়, কি অপরাধ হবে তার?

কোন অপরাধ করেনি স্বরূপা, ভুল হয়নি স্বরূপার। কিন্তু তবুও যে বুকের ভিতর একটা ভরাট দুরাশাই যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল। কোনদিন যে সত্য চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনি, আজ সে সত্য কত সহজে বুঝতে পারা যায়। এই দশ বছর ধরে কুশলের জীবনটা যে না জেনে আর না বুঝে স্বরূপারই গলা জড়িয়ে ধরে পড়েছিল। শুধু চোখ দুটো ঘুমিয়ে ছিল বলে দেখতে পায়নি কুশল। কিংবা এত চোখে চোখে ছিল বলেই হয়তো সে মেয়েকে চোখে পড়েনি। অথবা, নিতান্তই কুশলের দুটি ভুল চক্ষুর ভুল। সামনে একটা আলেয়া ছিল বলেই কাছের প্রদীপটা চোখে পড়েনি।

কোথা থেকে একটা ঘটনার কঠিন বাহু এসে স্বরূপাকে কুশলের জীবন থেকে চিরকালের মত উপড়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। ঘটনারও দোষ নেই।

কিন্তু স্বরূপা কেমন ক'রে এত সহজে চলে যেতে পারছে? এই দশ বছরের ভালবাসার ইতিহাস যে স্বরূপারই মনের রচনা। সে ইতিহাস মিথ্যা হয়ে গেলে স্বরূপাই যে মিথ্যা হয়ে যায়। কুশল ভুল করেছে বলে স্বরূপাও ভুল করবে কেন? করুক, ফুলবাড়ির ঐ মেয়েও আজ বুঝিয়ে দিল কুশলকে, ঐ রক্তকরবী হলো পাথরের ফুল। রং মাখানো একটা কঠোর নিষ্ঠুরতা।

বুঝতে পারে কুশল, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠছে। কিন্তু বৃথা, এবং উচিতও নয়। স্বরূপার উপর যেমন রাগ করবার, তেমনি স্বরূপার জন্য চোখ দুটো ঝাপসা করবার কোন অধিকার কুশলের আজ নেই। আজ শুধু স্বরূপাকে ভুলে যাবার অধিকার আছে।

কিন্তু ভুলতে যে পারা যায় না। দু'চোখের দৃষ্টিতে দুটি শূন্য ও অসহায় জ্বালা নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে কুশল, যেন নিজের মনের নাগাল থেকে দূরে পালিয়ে যাবার একটা পথ খুঁজছে।

—কি হলো কুশলবাবু? পাঠকজীর ডাক শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে কুশল। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায়, পাঠকজী একটু আশ্চর্য হয়ে কুশলের দিকে তাকিয়ে আছেন।

পাঠকজী হঠাৎ প্রশ্ন করেন—আপনার মনে কি কোন দুখ আছে কুশলবাবু?

কুশল—হ্যাঁ।

পাঠকজী—কিসের দুখ কুশলবাবু?

উত্তর দেয় না কুশল। পাঠকজীর দু'চোখের শান্ত-গভীর ও সরল দৃষ্টি কি যেন একটা সন্দেহকে দেখছে। প্রশ্ন করেন পাঠকজী—আপনার বাবা আছেন?

—না।

—মা আছেন?

—হ্যাঁ।

—আর কেউ আপন জন আছেন?

—আর একজন বড় কাছে ছিল, কিন্তু সে এখন পর হয়ে বড় দূরে চলে যাচ্ছে।

—তার জন্য দুখ করবেন কেন কুশলবাবু? যো মনমে রহে সো আঁখমে রহে। আপনি তাকে মনে রাখলে সে তো রয়েই গেল আপনার কাছে।

—কি বললেন? প্রশ্ন ক'রে পাঠকজীর মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকে কুশল।

—সে যদি সুখী হয়, তবে আপনিও সুখী হবেন, সে আপনার কাছে আসুক বা না আসুক। প্রীত হলো খোলা ডোর কুশলবাবু, গিঁট পড়লেই ছোট হয়ে যায়।

নিমের ঠাণ্ডা হাওয়া নয়; ফুরফুরে হাওয়ায় ছোঁয়াও নয়; বোধহয় পাঠকজীর এই কথাগুলির মধ্যেই অদ্ভুত এক স্নিগ্ধতার ছায়া আর ছোঁয়া ছিল। শুনতে শুনতে কুশলের বুকের ভিতরের সেই শূন্যতা যেন হঠাৎ নতুন বাতাসে ভরে উঠতে থাকে। মনের ভিতরে যেন একটা নতুন প্রতিজ্ঞার ভাষা মুখ খুলে ফেলেছে। আর ভেঙে পড়তে পারবে না কুশল। হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি সুখী হলেই আমি সুখী হব। ভাল লাগবে তোমাকে চিরকাল এই মনের মধ্যে আপন ক'রে রাখতে।

পাঠকজীর দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে কুশল বলে—আচ্ছা, আমি এখন যাই পাঠকজী, অনেক কাজ বাকি আছে।

ধীরে ধীরে চলতে চলতে মিউজিয়াম ঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে কুশল। ত্রিশূল চিহ্নিত অনেকগুলি রুপোর মুদ্রা তিন নম্বর ট্রেঞ্চ থেকে কালকেই উঠেছে, দুর্বোধ্য অক্ষরে কিসব লেখা উৎকীর্ণ আছে মুদ্রার দুই দিকে। এগুলির একটা তালিকা আর বিবরণ লিখে রাখতে হবে আজই, নইলে কাল আবার সময় পাওয়া যাবে না।

অন্যদিন মিউজিয়াম ঘর থেকে যাবার সময় ব্রঞ্জের গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বিদায় নিয়ে যেত কুশল। আজ ঘরে ঢুকতেই সবার আগে গঙ্গামূর্তির দিকেই চোখ পড়ে। অসহায়ের মত দেখায় বটে গঙ্গাকে, তবু তার চোখের দৃষ্টি বা ওষ্ঠের হাসির মধ্যে বিন্দুমাত্র অভিমান খুঁজে পাওয়া যায় না। যেন এক পরম প্রতীক্ষায় সুস্থির হয়ে রয়েছে গঙ্গার উদ্বেলিত কামনা। দেখতে ভাল লাগে কুশলের। খুঁজে বের করতে হবে, ধ্বংসস্তূপের আড়ালে কপালচন্দ্রে কাদা মেখে যেখানে যত গভীরেই থাকুন না কেন গঙ্গাধর। তিনটে নতুন ট্রেঞ্চ কাটতে হবে আমলকির জঙ্গলের দক্ষিণে, কাল থেকেই আরম্ভ ক'রে দিতে হবে কাজ।

আগেকার সার্ভের ম্যাপগুলি কাছে নিয়ে দেখতে থাকে কুশল। মাঝে মাঝে রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু দরকারি তথ্য নোট বইয়ে লিখে রাখে। তারপর বসে নতুন মুদ্রাগুলি নিয়ে, সংক্ষেপে একটা বিবরণী লিখে রাখবার জন্য।

কিন্তু লেখা আরম্ভের আগেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায়ের চাকর এসে জানায় —সাহেব ডাকছেন বাংলোতে, জরুরি কাজে, এখুনি।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলোতে ঘরের ভিতর এই প্রথম ঢুকলো কুশল। ঘরের ভিতর নানা-রকম আসবাব আর সামগ্রী আছে—সোফা টেবিল আয়না বন্দুক কাঁচের-আলমারি, অনেক কিছু। আলমারিতে অনেক বোতল, টেবিলের উপর দুনিয়ার যত নতুন মডেলের মোটর গাড়ির সচিত্র বিবরণ ও মূল্যের ক্যাটালগ।

ঐতিহাসিক দেবী রায়ের ঘরে পুরাতাত্ত্বিক একটি নিদর্শনও আছে। একটা আখরোট কাঠের টেবিলের উপর ছোট একটি পাথুরে শূলপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর ত্রিশূলের উপর উপুড় হয়ে রয়েছে দেবী রায়ের একটি ফেল্টের টুপি।

অভ্যর্থনার ভঙ্গী ক'রে দেবী রায় বলে—আসুন কুশলবাবু, বসুন। একটা বিশেষ জরুরি কাজে আপনাকে ডেকেছি।

কুশল বসতেই দেবী রায় একবার ঘরের ভিতরে পায়চারি ক'রে নেয়। তারপর বলে—মিউজিয়ামের জিনিষগুলির যে লিস্ট আপনি করেছেন, সেই লিস্ট অনুযায়ী মূর্তিগুলি আর মুদ্রা-টুদ্রা যা আছে সবই চালান ক'রে দিতে চাই।

কুশল—কোথায় ?

দেবী রায় গম্ভীরভাবে বলে—আগে সব কথা শুনুন, তারপর প্রশ্ন করবেন।... জোন্স নামে এক ইওরোপিয়ান ভদ্রলোক এসেছেন, স্টেশন ক্লাবের হোটেলে রয়েছেন। তিনি হলেন পৃথিবীর মধ্যে একটা বিখ্যাত কিউরিও কোম্পানির এজেণ্ট।.. মূর্তিগুলোর একটা গতি করে ফেলেছি, জোন্স এসে নিয়ে যাবে। আপনি তাকে সাহায্য করবেন, সেই কথা জানাবার জন্যেই আপনাকে ডেকেছি।

চুপ ক'রে বসে থাকে কুশল, দেবী রায়ের কথার কোন উত্তর দেয় না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কুশলের সম্মুখেই পা ছড়িয়ে বসে দেবী রায়, পাইপ ধরায়—তারপর জিজ্ঞাসা করে।—কি ? চুপ ক'রে রইলেন যে ?

কুশল—আপনার সব কথা কি বলা হয়েছে ?

দেবী রায়—হ্যাঁ, এই তো সব কথা।

কুশল—কিন্তু, আমি তো আপনার কথা থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না। মূর্তিগুলি কেনই বা আপনি চালান করছেন, আর কিউরিও কোম্পানির এজেণ্টই বা এর মধ্যে আসে কেমন ক'রে ?

দেবী রায় হাসে—বুঝেছি আপনার বোধ হয় খটকা লাগছে। নয় কি ?

কুশল—হ্যাঁ।

উঁচুদরের অফিসারের ভঙ্গী নিয়ে দেবী রায় গম্ভীর হয়ে বলে—দেখুন কুশলবাবু, আপনার যে দায়িত্ববোধ আছে তা আপনার কাজ দেখেই বুঝেছি। এখন আমি বুঝতে চাই যে, আপনি বিশ্বাসী এবং ওবিডিয়েণ্ট। ওসব খটকা ফটকা ছেড়ে দিন। যা বলছি, আমার ওপর বিশ্বাস রেখে তাই আপনাকে করতে হবে। এবং এই পূজোর সময় আনন্দ করার জন্য আপনাকে আমি কম করেও পাঁচশো টাকা দেব।

কুশল—আমার দ্বারা হবে না এসব কাজ।

দেবী রায় ভ্রূকুটি করে—তার মানে ?

কুশল—আপনি জোন্সকে আসতে বারণ করে দিন।

দেবী রায়—ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন বারণ করবো কি ক'রে ?

কুশল—ব্যবস্থা বাতিল ক'রে দিন। মিউজিয়ামের মূর্তি বিক্রি করা চলবে না।

দেবী রায়—আপনি আবার এসব চলা বা না চলার উপদেশ দিচ্ছেন কেন ? আমি যদি মূর্তি বিক্রি করা উচিত মনে করি, তবে আপনি বাধা দেবার কে ?

কুশল—আপনি এসব কথা তুলবেন না। মোট কথা মূর্তিগুলিকে বিক্রি করা চলবে না। আমি ছাড়বো না।

উঠে দাঁড়ায় দেবী রায়, উত্তেজিতভাবে বলে—আপনি ছাড়বেন না, এর মানে কি ? মূর্তিগুলি কি আপনার সম্পত্তি ?

কুশল—হ্যাঁ, আমার।

দেবী রায়—আপনার ? হেঁয়ালি ক'রে বলবেন না মশাই, স্পষ্ট ক'রে বলুন কি বলতে চাইছেন ?

কুশল—তার মানে, মূর্তিগুলি হলো আমার দেশের সম্পত্তি।

দেবী রায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নেয়, তারপর উত্তেজিত গলার স্বর একটু শান্ত ক'রে নিয়ে বলে—দেশ আপনাকে কি দিচ্ছে যে, বড় দেশ দেশ করছেন ?

কুশল শান্তভাবে বলে—ওসব কথা ছেড়ে দিয়ে আমার একটা অনুরোধ শুনুন।

—বলুন।

—সোসাইটিকে না ব'লে, গভর্নমেণ্টকে না জানিয়ে, মূর্তিগুলি এরকম অন্যায়ভাবে বিক্রি করবেন না।

দেবী রায়—কি পাচ্ছেন মশাই সোসাইটি আর গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে। পঁচাশি টাকার চেয়ে এক কড়ি বেশি কি ?...বড় বড় কথা ছেড়ে নিজের দিকটা দেখতে শিখুন।

কুশল—সোসাইটি আর গভর্নমেণ্ট তো আপনাকে মন্দ দিচ্ছে না, তবে আপনি এসব কাণ্ড করছেন কেন ?

দেবী রায় কিছুক্ষণ বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকে, তারপর হাসতে চেষ্টা করে।—আরে মশাই, আপনি বড় তর্ক করতে পারেন! ছাড়ুন ওসব বালাই। সোজাসুজি বুঝুন, কোথাকার কোন্ সোসাইটি আর কিসেরই বা গভর্নমেণ্ট! শত খেটে মরলেও মুখ তুলে কখনও আমাদের দিকে তাকাবে না। এই সব পাঁচ কথা ভেবে নিয়ে আমি

ব্যবস্থা করেছি, শুধু আমার নিজের জন্যে নয় আপনার জন্যেও।...খুব বেশি কিছু তো পাওয়া যাচ্ছে না, তবু আমি দাবি করবো, আপনাকে যেন এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। জোন্স আসলে আপনিও একটু চাপ দিয়ে আরও কিছু আদায় ক'রে নেবেন।

কুশল তার নিশ্বাসের চাঞ্চল্য কোনমতে সংযত করে—কত টাকায় ব্যবস্থা হলো?

দেবী রায় উৎসাহিত হয়ে বলে—কত আর দেবে বলুন? এই তো কিছুদিন আগে, তিব্বতের একটা মঠ থেকে বাগিয়ে জোন্স মস্ত বড় একটা লট ইউরোপে পাঠিয়েছে। আমি তার লিস্ট দেখেছি জোন্সের কাছে। বহু প্রাচীন ও দামি দামি সব ঐতিহাসিক জিনিস, ছবি পুঁথিপত্র মূর্তি এবং আরও কত কি। ধরুন, এত বড় একটা ভাল লটের জন্য জোন্স খরচ করেছে মাত্র দেড় লক্ষ। আর আমাদের এই কতগুলো ভোঁতা ভোঁতা পাথুরে মূর্তির জন্যে কত আর দেবে?

একটু অসন্তুষ্টভাবেই যেন আক্ষেপ ক'রে দেবী রায় টেবিলের উপর থেকে কুশলের তৈরী মূর্তির তালিকাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

কুশল প্রশ্ন করে—কম ক'রে এক লক্ষ দেবে তো?

দেবী রায়—আমি তো তাই দাবী করেছি, দেখি শেষ পর্যন্ত কততে গিয়ে দাঁড়ায়।

কুশল—আচ্ছা, আমি চলি।

দেবী রায় নিশ্চিন্তভাবে বলে—তা'হলে কথা রইল, জোন্স ঠিক সময় মত এসে মাল নিয়ে যাবে।

কুশল—আসতে পারে, কিন্তু আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো না। মূর্তিগুলিও ছেড়ে দেব না।

দেবী রায় দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে এবং অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে অনুযোগ জানায়—কি পাগলামি করছেন কুশল বাবু। শুনুন আমার কথা। জোন্সকে ব'লে দেব, যেন আপনাকে দশ হাজার টাকা দেয়।

কুশল—আমার একটা কথা শুনুন।

দেবী রায়—বাস্, আর কোন কথা নয়। জোন্স আসবে ট্রাক নিয়ে, একেবারে আপনার হাতে নগদ নগদ দিয়ে তারপর মাল নিয়ে যাবে। আপনি মূর্তিগুলো সামান্য একটু চটের কাপড়ে জড়িয়ে ছেড়ে দেবেন। আর ইচ্ছে করেন তো, কাজের সুবিধার জন্য, ঐ পাগলা দারোয়ানটাকে গোটা পঁচিশ টাকা বকশিস দিয়ে দেবেন। যান, আর কোন কথা নয়...আমি কোন কথা শুনবো না।

অনেকক্ষণ ধরে বেশ চেষ্টা ক'রে মনের উত্তেজনা ও রোষ শান্ত করছিল কুশল।

তাই আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। দেবী রায়ের সান্নিধ্য থেকে স'রে গিয়ে বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়ায়। ভাল ক'রে নিশ্বাস নেয়। আবার মিউজিয়াম ঘরে এসে ঢোকে, এরই মধ্যে কখন এসে আলো জ্বালিয়ে আর ধূপের ধোঁয়া দিয়ে চলে গিয়েছেন পাঠকজী।

অস্বস্তি বোধ করছিল কুশল। আজ আর কাজ করার মত যেন কিছু খুঁজে পায় না। এই অস্বস্তির ভার দূর করার জন্যই বোধ হয় মূর্তির গ্যালারি আর সারির কাছ ঘেঁষে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতে থাকে কুশল। লুণ্ঠকের বাহু এগিয়ে এসেছে, সে খবর জানে না এই পাথরের মূর্তিগুলি। গরিব পাঠকজীর ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত এই আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হবে দূর বিদেশে, শ্রদ্ধাহীন শৌখিনের কক্ষে আসবাবের মত পড়ে থাকবে হরভবনের বামদেব বীরভদ্র আর গঙ্গা।

দেবী রায়ের ঐ প্রস্তাবকে একটা পরীক্ষা ব'লেই মনে করে না কুশল। বাঁ পায়ের লাথি দিয়ে পথের জঞ্জাল সরিয়ে দেওয়ার মত অমন দশ হাজার টাকার ছলনাকে অবহেলায় সরিয়ে দিতে সে আজ পারে।

চিন্তা হয়, কি ক'রে কোন্ উপায়ে দেবী রায়ের এই নির্মম পরিকল্পনা থেকে হরভবনের গৌরবের জিনিসগুলি রক্ষা করা যায়?

হ্যাঁ, একটা উপায় হ'তে পারে। মিউজিয়ামের সব মূর্তি আর নিদর্শনের একটা লিস্ট দু'কপি তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, এক কপি সোসাইটির অফিসে আর এক কপি সরকারি দপ্তরে। সেই সঙ্গে অনুরোধও করা যেতে পারে, সোসাইটি ও সরকারের লোক যেন অবিলম্বে একবার স্বচক্ষে তদন্তের জন্য আসেন। আর, যতদিন না উপরওয়ালা দপ্তরের লোক তদন্তের জন্য আসেন, ততদিন পর্যন্ত যেভাবেই হোক, সর্বক্ষণ পাহারা রাখতে হবে, সাবধান হয়ে থাকতে হবে, যেন কোন ফাঁকে জোন্স এসে মূর্তিগুলি সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

আলো নিভিয়ে মিউজিয়ম ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ ক'রে তালা লাগায় কুশল। যেন তার মনের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে হাতের জোরটাকেও ঝালিয়ে নেয়। মিথ্যা নয়, কুশলের এই প্রতিজ্ঞাটা যেন একটা উল্লাস হয়ে তার দেহ-মন চঞ্চল ক'রে তুলেছে। যদি প্রয়োজন হয়, দেবী রায় ও জোন্সের পরিকল্পনাকে প্রতিরোধ করতে আর চূর্ণ করতে আজ হাতের জোরের পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত আছে কুশল।

মিউজিয়াম ঘর ছেড়ে কুশল রওনা হয়। কিছুদূর চলে এসে দেখতে পায়, পাঠকজী তাঁর ঘরের সামনে তুলসীতলার প্রদীপের কাছে ব'সে সুর ক'রে রামায়ণ পড়ছেন।

রামায়ণের সুরের মোহ কাছে টানছিল কুশলকে, পাঠকজীর কাছে গিয়ে বসে কুশল। কিন্তু এ ছাড়াও এখন আর একটা কাজ আছে কুশলের, পাঠকজীর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

আঁচ লাগে স্বরূপার মুখে।

উঠানের মধ্যে একটা একচালার নীচে আগে যেখানে উনুনের উপর বড় বড় কড়ায় রাধেশবাবুর সাবানের তেল ফুটতো, সেখানে এখন মুড়ি ভাজার খোলা তেতে ওঠে সকাল বেলায়, ঠাণ্ডা হয় দুপুরেরও পরে। এক একদিন খোলা গরম হয় ঠিক দুপুর থেকে, আর ঠাণ্ডা হতে বিকেলও হয়ে যায়। প্রতিদিন না হোক, সপ্তাহে অন্তত চারটি দিন।

ভিতরের দাওয়ার উপর যেখানে একদিন স্তূপ ক'রে সাজানো থাকতো রধেশবাবুর সাবান, সেখানে এখন ধামার মধ্যে স্তূপ ক'রে সাজানো থাকে মুড়ি।

রাধেশবাবুকে সাহায্য করতে গিয়ে আগেও সাবানের তেল জ্বাল দেবার জন্য উনুনের কাছে দাঁড়িয়েছে স্বরূপা। আজ দাঁড়িয়েছে মুড়ি ভাজবার জন্য। সাবান হোক আর মুড়ি হোক, সেই একই আগুনের আঁচ সহ্য ক'রে ফুলবাড়ির একটি কষ্টের সংসার জীবিকা অর্জন করে। এমন কোন নতুন অভিজ্ঞতার আঁচ নয় যে সইতে না পেরে দূরে স'রে যাবে, হাঁপিয়ে উঠবে বা ক্লান্ত হয়ে পড়বে স্বরূপা।

শেষ খোলা নামিয়ে যখন ঘরের ভিতর এসে জানালার কাছে বসলো স্বরূপা, তখন বিকালও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবং গাড়ি নিয়ে রেখা বৌদির আসবার সময় হয়েছে।

রেখা বৌদি আসছেন প্রায়ই, এরই মধ্যে আরও কয়েকবার এসে স্বরূপাকে সিটির সেই মস্ত বড় হাসিখুশির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। রেখা বৌদির সেই আদর পেয়ে, আর বড়দা ও মেজদার সেইরকমই অভ্যর্থনার চিৎকার শুনে ঘরে ফিরে এসেছি স্বরূপা।

আজও আসবেন রেখা বৌদি। বিচলিত হয়, ভালও লাগে স্বরূপার। রেখা বৌদির একটা উদ্দেশ্য আছে, বিচলিত হয় তার জন্য। রেখা বৌদির আর একটা পরিচয়ও পেয়েছে স্বরূপা, যেটা একেবারে উদ্দেশ্যহীন। স্বরূপাকেই ভাল লেগেছে তাঁর, তাই এখানে আসতে একটা প্রীতির টানও আছে। কই, সব সময় তো শুধু উদ্দেশ্যের জন্যই স্বরূপাকে তিনি বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পিড়াপিড়ি করেন না? বরং নিয়ে যান পার্কে, রাজবাঁধের তালকুঞ্জে কিম্বা গোঁসাইপাড়ার মঠে মহোৎসব দেখতে। বোঝা যায় না, রেখা বৌদির উদ্দেশ্যটা বড়, না উদ্দেশ্যহীন রেখা

বৌদিই বড়। অবশ্য এটাও স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় যে, রেখা বৌদি মাঝে মাঝে তাঁর উদ্দেশ্যটাকে একেবারেই ভুলে যান। স্বরূপার সঙ্গে মন খুলে গল্প ক'রে হাসতে এবং স্বরূপাকে হাসিয়ে দিতেই যেন তিনি আসছেন।

রেখা বৌদির ঐ হাস্যময় ব্যক্তিত্বের জোরও কম নয়। মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবার সময় নিজের গলার হার স্বরূপাকে গলায় পরতে বাধ্য করেছেন।—পর স্বরূপা, তোমার এমন সুন্দর গলাটা খালি থাকবে, ভাল দেখায় না।

স্বরূপা—আপনার গলাটা যে খালি হয়ে রইল, তার কি হবে?

রেখা বৌদি—আমার এই খাটের পায়ার মত গলায় হার থাকলেই বা কি? কেউ আমার গলার দিকে তাকাবে না। বরং গলার দোষে বেচারা হারটাকেও কেউ দেখবে না।

স্বরূপা—তাহ'লে আমিই বা প'রবো কেন?

রেখা বৌদি—তুমি পরলে কেউ আর হারের দিকে তাকাবে না, তাকিয়ে থাকবে তোমার গলার দিকে। নাও, পর।

রেখা বৌদি জোর ক'রে স্বরূপার গলায় হার পরিয়ে দেন।

এহেন প্রীতির রেখা বৌদি যেদিন স্পষ্ট ক'রে তার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করবেন, স্পষ্ট উত্তর জানতে চাইবেন স্বরূপার কাছে, সেদিন কি করবে স্বরূপা? কি বলবে? রেখা বৌদিকে স্পষ্ট ক'রে 'না' ব'লে দেবার মত শক্তি থাকবে তো মনের মধ্যে? কে জানে, আজই যদি রেখা বৌদি তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কথা পাড়েন, আর স্পষ্ট ক'রে উত্তর জানতে চান, তবে?

জানালার কাছে ব'সে হেমন্তের শীতভীরু বাতাসের স্পর্শে শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ ক'রলেও মুখের উপর যেন আবার আঁচ লাগে স্বরূপার। আঁচ আসে একেবারে মনের ভিতর থেকে। কোথায় গেল, কেমন আছে সেই মানুষ? দশ বছর ধ'রে চোখে চোখে থাকার পর এমন ক'রে একেবারে অন্ধকারে হারিয়ে গেল কি ক'রে? একবারও কি একটা উদ্বেগ জাগে না তার মনে? তারই চিরকালের জিনিষকে পথের উপর ফেলে গেল এমন তুচ্ছ ক'রে আর অসহায় ক'রে! এখন পৃথিবীর কেউ যদি প্রীতি দিয়ে আর সম্মান দিয়ে সেই জিনিষকে কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে যায়? যেখানেই যেভাবে থাকুক, এই চিন্তা কি কখনও আসে না তার মনে? হোক না নেশার মুখে, তবু তো বলতে হয়েছে, স্বরূপার উপর তার অধিকার আছে। স্বরূপার এই শরীরটারও উপর লোভ আছে। কিন্তু কোথায়, সেই অধিকারের জন্য জেদ কই? সেই লোভের জন্য আগ্রহ কই?

সে আছে, বেঁচে আছে, মাত্র তার এই অস্তিত্বটুকু ছাড়া আর কিছুর কোন খবর পায়নি স্বরূপা, শান্তি এর বেশি কিছু খবর দিতে পারেনি। বেঁচে আছে, ভাল খবর সন্দেহ নেই। কিন্তু কি নিয়ে সে বেঁচে আছে, এটুকু জানতে না পারলে যে স্বরূপার মনের জেদটুকু বাঁচে না। সে রাত্রির মূর্তিটা মিথ্যা, কুশল আছে কুশলের মতই তার গৌরবের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, স্বপ্ন সফল ও আশা সুখী হয়েছে, এইটুকু জানতে পারলেই স্বরূপা একটা কল্পনাকে ভালবেসে দিন কাটিয়ে দিতে পারবে। জীবনে আর নাই বা এল সে কাছে।

রাধেশবাবু একবার কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্বরূপার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। স্বরূপা জিজ্ঞেসা করে—কি বাবা ?

—যাচ্ছি, অম্বিকা মন্দিরে একবার ঘুরে আসি।

—এস।

—তুই এরকম চুপটি ক'রে বসে আছিস কেন ?

—এমনি।

—তোর ওপর দিয়ে বড় কষ্টের চাপ যাচ্ছে, না রে ?

—কি আবার কষ্ট দেখলে তুমি ?

—আমিও তোর এই কষ্ট দেখতে পারছি না স্বরূপা, কোন একটা কাজ ধরতেই হবে। শরীরটাতে একটু জোর পেলেই ধরবো।

—তুমি আজ আবার এসব কথা কেন বলছো বাবা? তুমিই না বলেছ, এবার থেকে ওপরের একজনের ওপর সব নির্ভর ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে থাকবে ?

—তাই তো চাই, তাঁরই ওপর নির্ভর ক'রে কিছু একটা কাজ টাজ ধরতে চাই।

—দরকার হ'লে কাজ ধরবে, তার জন্যে আবার দুঃখ করছো কেন ?

—না, দুঃখ করবো না। দুঃখ করতেই নেই।...আচ্ছা আমি চললাম স্বরূপা। কিন্তু তুই এমন চুপটি ক'রে থাকিস না।

হাতের লাঠির উপর অশক্ত দেহের ভর রেখে রাধেশবাবু আস্তে আস্তে চলতে থাকেন। দরজার কাছে এসেই আর একবার মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন।—সেই ভাল মেয়েটি আজ আসবে না স্বরূপা ?

—হ্যাঁ, আসবে।

—তবে আজ চুপটি ক'রে বসে আছিস কেন ? উঠে হাত মুখ ধুয়ে নে। মেয়েটির সঙ্গে গল্পসল্প করবি, মন ভাল থাকবে।

রাধেশবাবু চলে গেলেন। স্বরূপার মনে পড়ে, বাবা ঠিকই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হাত মুখ ধুয়ে, এই মুড়িভাজা শাড়িটা বদলে, একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে, হাসিখুশির সাজ পরতে হবে তাকে। নইলে রেখা বৌদি এসে হয়তো কিছু মনে ক'রে বসবেন।

ঘরে প্রবেশ করে শান্তি।—আজ একটা খবর পেলাম স্বরূপদি!

স্বরূপা নিশ্বাস বন্ধ ক'রে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্তি বলে—একটা চাকরি করছেন দাদাবাবু। সকাল বেলা বাড়ি থেকে চলে যান, বাড়ি ফেরেন রাত্তিরে।

চুপ ক'রে আবার জানালার বাইরে তাকিয়ে বসে থাকে স্বরূপা। শান্তি অনুযোগের সুরে বলে—এই তো একটা ভাল খবর পেলে, তবে আবার ওরকম মুখ শুকনো করছো কেন?

স্বরূপা—হ্যাঁ ভাল খবর, কিন্তু এ খবর থেকে কি ক'রে বুঝবো, কেমন আছে তোমার দাদাবাবু?

শান্তি—এর চেয়ে বেশি খবর কি ক'রে পাব বল দেখি স্বরূপদি? তুমিই ব'লে দিয়েছ, দাদাবাবুকে কোন কথা জিজ্ঞেসা করতে পারবো না, মাসিমাকেও কিছু জিজ্ঞেসা করতে পারবো না, তবে খবর পাই কোথা থেকে।

স্বরূপা—চাকরি করে, একথা কেমন করে জানলে?

শান্তি—বৈজু কামারকে জিজ্ঞেসা ক'রে জানলাম।

শান্তি চলে যায়, ভিতরে দাওয়ায় গিয়ে ধামার মুড়ি মাপতে বসে ডালা নিয়ে। আর, নিজের চিন্তার মধ্যেই আবার হারিয়ে যায় স্বরূপা।

চাকরি করছে করুক। কিন্তু মাত্র এইটুকু জেনে কি আর জানা হলো? জানা তো গেল না যে, সে আর নিজেকে ঘৃণা করে না। মাত্র এইটুকু সংবাদ থেকে তো এই সত্য প্রমাণিত হয় না যে, রাত্রির অন্ধকারে বিভীষিকার বিলাস নিয়ে কুশলের জীবন আর ছুটে বেড়ায় না। খুব বেশি কিছু তো জানতে চায় না স্বরূপা। সে রাত্রির দৃশ্যটা একটা ছলনা মাত্র, নীচে পড়ে যায়নি কুশল, শুধু এইটুকু জানতে পারলে স্বরূপার আত্মাটা যেন অতল শূন্যতার উপরেও ভেসে থাকতে পারবে।

সত্যই কি জীবনের ঘৃণার নেশায় নীচে পড়ে গিয়েছে কুশল? এই প্রশ্নটাই যে স্বরূপের জীবনের একটা শাস্তি। এখন কি শুধু এই একটা প্রশ্নের উত্তর জানবার, জন্য তার জীবন উৎকর্ণ হয়ে থাকবে? এ ছাড়া কি এই আনন্দহীন জিজ্ঞাসাকে আর

কোন উপায়ে চিরকালের মত স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না? সমাধানের কি আর কোন পথ নেই?

পথের উপর রেখা বৌদির গাড়ির হর্ন বাজলো। স্বরূপার চমকে ওঠার পরমুহূর্তে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন রেখা বৌদি।—এ কি স্বরূপা, এখানে এরকম হয়ে বসে আছ যে?

স্বরূপা—আজ আমি বেড়াতে যাব না রেখা বৌদি।

রেখা বৌদি—তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য আজ আমি আসিনি সুন্দরী। এসেছি কাজের কথা জিজ্ঞেসা করতে।

একথা শোনবার জন্য আজ বোধহয় মনে মনে প্রস্তুত হয়েই আছে স্বরূপা। রেখা বৌদির জিজ্ঞাসাটাও অনুমান ক'রে নিতে পারে। হাসিখুশির বাড়ির দাবি আজ একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে আর সরব হয়ে স্বরূপার জীবনের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে।

রেখা বৌদি বলেন—উত্তর দেবার জন্য তৈরী হও স্বরূপা। এখন আমি আর রেখা বৌদি নই, আমি ঘটক।

স্বরূপা—বলুন।

রেখা বৌদি—ঘোমটাটি মাথায় দিয়ে, সিদ্ধিনাথের বড়দা আর মেজদার ভাদ্দর বউটি হয়ে, কবে যাচ্ছ আমাদের বাড়ি, বল?

নিজের মনের আনন্দেই ছটফট ক'রে হেসে হেসে রেখা বৌদি আবার বলেন—আমরা আর দেরি করতে পারবো না স্বরূপা। বড়দা এখন ঘরে বসে পাঁজি দেখছেন, আর তোমার মেজদা মশাই ফর্দটর্দ তৈরি ক'রে ফেলেছেন। এখন তুমি শুধু বলে দাও, বিয়েটা এই অঘ্রাণেই হলে তোমাদের কোন অসুবিধা আছে কি না?

প্রশ্ন শেষ করতেই রেখা বৌদির মুখের হাসিও থেমে যায়। স্বরূপার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠেন—এ কি?...এর মানে কি স্বরূপা?

রেখা বৌদি তার শাড়ির আঁচলটা হাতে তুলে নিয়ে স্বরূপার কাছে এগিয়ে বেদনার্ত ভাবে প্রশ্ন করেন—কি হলো স্বরূপা, কাঁদলে কেন বলতো?

স্বরূপা—আমি তো ওভাবে আপনাদের বাড়ি যেতে পারব না রেখা বৌদি।

রেখা বৌদি—কেন বলতো ভাই?

স্বরূপা—ওভাবে গেলে আপনাদের অপমান করা হবে।

রেখা বৌদি বিস্মিত হন—কি বলছো স্বরূপা? তুমি আমাদের বাড়ির বউ হলে সবাই কত খুশি হবে, তা তুমি জান?

স্বরূপা—জানি রেখা বৌদি, সেই জন্য বলছি।

এত চালাক রেখা বৌদি কিছুক্ষণের মত যেন বিভ্রান্ত হয়ে স্বরূপার দিকে তাকিয়ে রহস্যটা বুঝবার চেষ্টা করেন। শেষে স্বরূপাই সব রহস্য একেবারে স্পষ্ট ক'রে দেয়। —আমি মনে মনে একজনের হয়ে আছি রেখা বৌদি।

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকবার আগেই রেখা বৌদি স্বরূপার হাত ধরেন।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন রেখা বৌদি। বড় করুণ হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। যেন আর সুযোগ হবে না, তাঁর প্রীতির সঙ্গিনী ফুলবাড়ির এই একেবারে অসহায় মেয়েটির হাত তিনি শেষবারের মত ধরে নিচ্ছেন!

স্বরূপা বলে—মাপ করবেন রেখা বৌদি, অনেকদিন আগেই বলা উচিত ছিল আমার।

রেখা বৌদি—বলনি, বেশ করেছ, তার জন্যে আবার এত দুঃখ করবার কি আছে।

স্বরূপা—দুঃখ হচ্ছে, আপনাদের মত মানুষের মনেও কষ্ট দিতে হলো।

রেখা বৌদি—কিন্তু তার জন্যে তুমি দুঃখ করবে কেন? না বুঝে সুঝে আমরাই তোমার ক্ষতি করতে উঠেপড়ে লেগেছিলাম, দুঃখ ক'বো আমরা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন রেখা বৌদি, সাধের উদ্দেশ্যটাকে মন থেকে যেন ধীরে ধীরে বিদায় ক'রে দিচ্ছেন এবং বিদায় ক'রে দিতে যেন কষ্টও হচ্ছে তাঁর। আস্তে আস্তে বলেন—তোমার ওপর বড় অন্যায় করা হয়েছে স্বরূপা, কিছু মনে করো না।

তার পরেই একেবারে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েন রেখা বৌদি। স্বরূপার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলেন—নাও ওঠ এবার; এক গেলাস জল দাও।

স্বরূপা গেলাসে ক'রে জল আনা মাত্র রেখা বৌদি হেসে ছটফট ক'রে ওঠেন।—আমার জন্যে আনতে বলিনি। তোমার জন্য চোখ মুখ ধুয়ে বসো আমার সামনে!

চোখ-মুখ ধুয়ে যখন রেখা বৌদির সঙ্গে গল্প করবার জন্য বসে স্বরূপা, তখন মনে হয়, সত্যিই এতক্ষণে যেন মুখের উপর থেকে আঁচ-লাগা লালচে ছায়াটা মুছে গিয়েছে।

স্বরূপা বলে—আমার ভাবতে বড় লজ্জা করছে রেখা বৌদি, বড়দা মেজদা আমাকে কি জানি কি মনে করবেন।

রেখা বৌদি—কেউ কিছু মনে করবেন না। উল্টো আমাকেই মনের ঝাল মিটিয়ে বকুনি দিয়ে হয়তো তিন ভাই এখানেই তেড়ে আসবেন তোমার কাছে মাপ চাইতে।

স্বরূপা আতঙ্কিত হয়ে বলে—রক্ষে করুন রেখা বৌদি, এখানে তাঁদের আসতে দেবেন না। আমার প্রণাম জানিয়ে বলে দেবেন, আমিই তাঁদের সবার কাছে মাপ চাইছি!

রেখা বৌদি হাসেন—বলবো। কিন্তু আমাকে তো বকুনি থেকে বাঁচাতে পারলে না স্বরূপা।

স্বরূপা—আপনি কেন বকুনি খাবেন?

রেখা বৌদি—আমার মূর্খতার জন্য। প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়ে তারপর হৈ হৈ করা উচিত ছিল আমার, কিন্তু তা করিনি, প্রথমেই ভুল ক'রে ফেলেছি।

স্বরূপা—ভুল তো আমারও হয়েছে, প্রথমেই আপনাকে বলে দিলে ভাল হতো।

রেখা বৌদি—তোমার ভুল কেউ ধরবে না। ধরবে আমারটাই, এতদিন পরে আমার চালাক নামটাই মিথ্যে হয়ে গেল।

রেখা বৌদি আর এক দফা হেসে নিয়ে বলেন—কিন্তু তোমাকে দেখে বুঝতে আমার ভুল হয়নি স্বরূপা। শুধু আমার সন্দেহটা ভুলে গিয়েছিলাম।

স্বরূপা—সন্দেহ করার মত কি দেখেছিলেন?

রেখা বৌদি—তোমার মুখ আর ঐ চোখ। দেখেই মনে হয়েছিল, এই মেয়ে কি এমনি এমনি পড়ে আছে এতদিন ধরে? পৃথিবীতে কি একটা চক্ষুওয়ালা লোক নেই যে, এই মেয়েকে আপন ক'রে নেবার জন্য এতদিন না এসে আছে?

স্বরূপা—আপন করে নেবার জন্য কেউ আসেনি রেখা বৌদি।

রেখা বৌদি—তার মানে? তোমার তিনি কোথায়?

স্বরূপা—কোথাও নিশ্চয় আছেন!

রেখা বৌদি—কবে আসবেন?

স্বরূপা—কোনদিন আসবেন বলে মনে হয় না।

রেখা বৌদি—তা হ'লে কি শুধু নিজেই ইচ্ছে ক'রে···।

স্বরূপা—হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে ক'রে তাঁকে আমার একজন ভেবে নিয়ে বসে আছি।

রেখা বৌদি—কবে থেকে?

স্বরূপা—বোধহয় দশ বছরেরও আগের কথা।

রেখা বৌদি—তিনি জানেন এসব?

স্বরূপা—সবই জানেন।

নিষ্পলক চক্ষু তুলে স্বরূপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন রেখা বৌদি। হয় ভয়

পেয়েছেন, নয় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। ভয় করছে তাঁর, কি হবে এই মেয়ের উপায়? একটা ভালবাসার প্রতিজ্ঞা যেন শত ঝড়ের মধ্যেও শিখা হয়ে জ্বলছে এই পৃথিবীতে দশ বছর ধরে। কিংবা রেখা বৌদির মন হয়তো এই মুহূর্তে একটা গর্বে উথলে উঠেছে, মেয়ে জাতের মনের সম্মান কত উঁচু ক'রে আর জোর ক'রে ধরে রেখেছে স্বরূপা, তার দুঃখভরা জীবনের জেদ দিয়ে। নিজের চোখে না দেখলে এই সত্যকে হয়তো নিছক গল্পশুলেই মনে হতো।

স্বরূপা একটু বিব্রতভাবে বলে—চুপ ক'রে রইলেন কেন রেখা বৌদি?

রেখা বৌদি করুণভাবে হাসেন - তোমার কাছে আমার আর বলবার মত কোন কথা নেই স্বরূপা। আমি তো শুধু হাসতে পারি, কিন্তু তোমার কাছে হাসতে লজ্জা করছে।···আচ্ছা, এখন আমি যাই স্বরূপা।

স্বরূপা রেখা বৌদির হাত চেপে ধরে—আবার আসছেন তো রেখা বৌদি?

রেখা বৌদি– না ভাই, আর আসবো না।

স্বরূপা—কেন?

রেখা বৌদি—এসে লাভ কি? তোমার কাছে এসে আর আমি তো হাসতে পারবো না স্বরূপা।

স্বরূপা—বুঝেছি রেখা বৌদি, আপনি ইচ্ছে ক'রেই আমাকে একেবারে ভুলে যেতে চাইছেন।

যেতে যেতেই স্বরূপার কাঁধে হাত দিয়ে একবার দাঁড়ান রেখা বৌদি।– একটা কথা যদি রাখ, তবে তোমাকে কখনই ভুলবো না স্বরূপা।

স্বরূপা—বলুন।

ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে একবার যেন এই কষ্টের সংসারটির রূপ শেষবারের মত তাকিয়ে দেখেন হাসিখুশি বাড়ির রেখা বৌদি। তারপর বলেন– কোন কিছু দরকার পড়লে আমাকে জানাবে বল?

স্বরূপা—আচ্ছা।

রেখা বৌদি ক্লান্তভাবে আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, তারপর গিয়ে গাড়িতে ওঠেন।

মিউজিয়াম ঘরের ভিতর থেকে যেন ছিটকে বের হয়ে এল জোন্স, তারপর প্রায় দৌড়ে গিয়ে একটা মোটর ট্রাকের উপর উঠে বসলো

সত্যি ক'রে হাত তোলেনি কুশল। জোন্সের দেওয়া দশ হাজার টাকার নোটের

একটা প্যাকেট জোন্সেরই হাতের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কুশল, তারপর দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলেছে—এখুনি চলে যান।

পাঠকজীও সত্যি ক'রে লাঠি তোলেননি, শুধু ফটকের দরজাটা খুলে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এক হাতে দরজা ধরে আর এক হাতে ইঙ্গিত করেছেন—চলে যান।

জোন্সের ট্রাক সেই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে যায় সার্ভে অফিসের এলাকা ছেড়ে।

তার পরেই বের হয় কুশল। মিউজিয়ামের সব মূর্তি আর নিদর্শনের দুটো লিস্ট তৈরি করা হয়েছে। এখন শুধু পোস্ট অফিসে গিয়ে রেজিস্টারি ডাকে পাঠিয়ে দিতে হবে, একটা সোসাইটির অফিসে, আর একটা সরকারি দপ্তরে।

মধ্যাহ্নের রোদে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চলতে থাকে কুশল। কারণ রাস্তা ধরে চললে পোস্ট অফিস যেতে দূর পড়বে অনেক। তা ছাড়া, এখনি একবার ফিরে আসতে হবে। একজন সার্ভেয়ার এই মাত্র খবর দিয়ে গিয়েছেন, লাল পাথরের বড় বড় চাপ দিয়ে তৈরি খিলানের মত একটা বস্তু দেখা দিয়েছে দু'নম্বর ট্রেঞ্চে, মনে হয় কোন মন্দিরের মণ্ডপ। জায়গাটাকে এখন একটু বুঝসুঝে খুঁড়তে হবে। পোস্ট অফিস থেকে ফিরে এসে তখনি একবার সাইটে যেতেই হবে।

কিছুদূর এগিয়ে আসার পর হঠাৎ একবার থামতে হলো কুশলকে, সহরের বিজলি-ঘরের ঠিক উত্তরে, ছোট একটা স্যাঁতসেঁতে মাঠের কাছে।

মহারাজপুর সহরের এই জায়গাটা বড় শব্দময়। অনেকগুলি ছোটবড় কারখানা এই-খানে কাছাকাছি আর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। কারও চিমনি আছে, কারও চিমনি নেই। বিজলি-ঘরের অবিরাম ধক্ ধক্ শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়েছে পাশের সরকারি ডিস্টিলারির উদ্দাম পাম্প। মতিলাল কোম্পানির লোহা ঢালাইয়ের কারখানাটাও কাছেই, দরজাটা খোলা। তাই দেখা যায়, শত শত রক্তময় ও নিরেট অগ্নিপিণ্ড নিয়ে যেন লোফালুফির খেলা চলেছে ভিতরে। পুবদিকে আছে অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানা, একটা বোতামের, দুটো হোসিয়ারির। তার পরেরটায় টিনের কৌটা তৈরি হয়, পাহাড়-প্রমাণ টিনের কৌটা জমা ক'রে রাখা হচ্ছে ফটকের দু'পাশে, পরক্ষণেই ট্রাক বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে। পটারির ভিতর থেকে একটা পাইপের ভিতর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, তাই মাঠটা এত স্যাঁতসেঁতে। ধোঁয়া ছাড়ছে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্মীবাবুর গম পেষাইয়ের মিল। প্রাচীরের উপর বাহারে লতার সাদা ফুলগুলি একেবারে কয়লার ফুল হয়ে গিয়েছে, কালো ধুলোয় ঢাকা পড়ে।

এই অঞ্চল মহারাজপুরের একটা সম্পদের গর্ব আর গর্বের সম্পদ। হাজার হাজার কেরানি-মজুরকে খাটায়, লক্ষ লক্ষ টাকা আয়কর দেয়, কত ছোট-বড় বিত্তবিলাসীকে

ডিভিডেণ্ড দেয় মহারাজপুরের এই কারখানা অঞ্চল। বয়লারের হর্ষে, টার্বাইনের স্ফূর্তিতে, ইঞ্জিনের গুরু গুঞ্জনে এইখানে আধুনিক মহারাজপুর বিংশ-শতাব্দীর সুখের দাবীকে যেন প্রবল সমারোহে শ্রদ্ধা জানায় দিনের পর দিন, আর রাতের পর রাত। ভ্যালভ পিনিয়ন পিস্টন বেয়ারিং ও নাট বোল্টুর সঙ্গে মানুষ এখানে একাকার হয়ে, বাষ্প ও বিদ্যুৎ খেলিয়ে পুরনো সংসারের রূপ নতুন ক'রে দিচ্ছে; আর আনছে সমৃদ্ধি।

স্যাঁতসেঁতে মাঠের কাছে কুশল থমকে দাঁড়িয়েছিল, মহারাজপুরের এই আধুনিক সম্পদ আর গর্বের রূপ দেখবার জন্য নয়। কুশল দেখছিল, পলাশ গাছের দু'পাশে দুটো মানুষের মূর্তি, ভেজা ঘাসের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। একেবারে সাড়াশব্দ-হীন দুটো মানুষ।

আমলকির জঙ্গলেও কাদার মধ্যে মূর্তি পড়ে থাকে এই ভাবে, কিন্তু সে-মূর্তি দেখতে তো এরকম অস্বস্তি হয় না। কাছে এগিয়ে যায় কুশল। এইবার স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে। দুটি মৃতদেহ—একটি পুরুষের ও একটি নারীর। পুরুষের চোখ দুটো খোলা, মুখটা হাঁ ক'রে আছে। মাছি উড়ছে মুখ আর চোখের উপর।

নারীর মৃতদেহটা এখনও কুঁকড়ে যায়নি। চোখ দুটো বন্ধ, এক সারি পিঁপড়ে এসে উঠেছে মাথা বেয়ে মুখের উপর।

এই মৃত দৃশ্যের মধ্যে ছোট একটা জীবন্ত দৃশ্যও বসেছিল গাছের গোড়ায়। মাস ছয়েক বয়সের একটা উলঙ্গ বাচ্চা। কুশলকে দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি হামা দিয়ে বাচ্চাটা এসে সেই মৃত নারীদেহের বুকের উপর উঠে বসলো।

এই দুটি মৃত আর একটি জীবন্তের পরিচয় অনুমান ক'রে নিতে পারে কুশল। জঙ্গলের লোক, জাতে বোধহয় পাহাড়ি ভুঁইয়া। পুরুষের মাথায় চুলের ঝুঁটি শক্ত ক'রে বাঁধা, গলায় ভেলা ফলের একটা মালা। মেয়েটির খোঁপা একটা সরু লতা দিয়ে বাঁধা। তার মধ্যে একটা শৌখিন আভরণও গোঁজা রয়েছে দেখা যায়, একটা কাঠবিড়ালির রোঁয়াভরা লেজ। দুটি মৃত আর একটি জীবন্ত—বাপ-মা এবং ছেলে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অনেকক্ষণ ধ'রে পলাশ গাছের কাছেই ঘোরাফেরা করতে থাকে কুশল। কে এরা? কোথা থেকে এল? মরলো কেন? এখানেই বা এমনভাবে মরে পড়ে থাকে কেন? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চমকে ওঠে কুশলের চোখ। ঐ মৃত লোকটার মুখটা যে কুশলের চেনা। ঐ না সেদিন পাঠকজীর কাছ থেকে রুটি চেয়ে নিয়েছিল? জীবনের সঙ্গিনীকে বাদ দিয়ে একা একা রুটি খেতে পারেনি, ঐ তো সেই লোকটারই মুখ।

চারদিকটা এত শব্দময়, তারই মধ্যে ভেজা ঘাসের উপর দুটি মানুষের প্রাণ

একেবারে শব্দহীন হয়ে পড়ে রয়েছে, কি ভয়ানক বিসদৃশ মনে হয়। পৃথিবীর রূপ যেন চলতে চলতে এইখানে এসে হঠাৎ ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। কেউ একবার এদিকে আসেও না যে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যায়। এটা যেন ঘটনাই নয়, চারদিকের এত জনতার মাঝখানে এই জায়গাটাই একেবারে নির্জন। অদৃশ্য একটা উপেক্ষার প্রাচীর যেন শব্দময় মহারাজপুর থেকে পলাশতলার এই স্যাঁতসেঁতে নিভৃতটিকে ভিন্ন ক'রে নিয়ে একেবারে বধির ক'রে রেখেছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে কুশল, বিকাল ফুরিয়ে এসেছে। পশ্চিমে অনেকখানি হেলে পড়েছে সূর্য। ধোঁয়াভরা বাতাসের স্তর ভেদ ক'রে সূর্যের রক্তিমা এসে ছড়িয়ে পড়েছে পলাশতলায়, নোংরা আবিরের মত। আজ আর পোস্ট অফিসে যাওয়া হলো না, গিয়ে লাভ নেই, সময় পার হয়ে গিয়েছে।

একটা উড়ন্ত শকুনির ডানার ছায়া কুশলের মুখ ছুঁয়ে সরে গেল। তারপরেই ডানা গুটিয়ে শকুনিটা বসলো মাঠের উপর পলাশতলার দিকে তাকিয়ে। ভয় পায় কুশল।

কিন্তু পরক্ষণেই একটা আগন্তুক শব্দে চমকে ওঠে কুশল। ঘড়াং ঘড়াং শব্দ ক'রে, চার চাকার উপর বসানো চৌবাচ্চার মত একটা হাতে-ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে দু'জন ডোম এসে পলাশগাছের কাছে থামলো।

ডোম দু'জন কিছুক্ষণ মৃতদেহ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন বিরক্ত হয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—উঠাও, আর দেখবার কি আছে? যত সব জংলি দরিদ্দরের লাস, রুপো তামার একটা কুচিও নেই। এর চেয়ে গরু-মোষের লাসও ভাল, চামড়াটা বেচে তবু কিছু পাওয়া যায়।

কুশল জিজ্ঞাসা করে—কি হলো? তোমরা রাগ করছো কেন?

একজন ডোম একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসে—রাগ করছি না বাবু, আমাদেরই পোড়া-কপালের দুঃখের কথা বলছি।

আর একজন ডোম বলে—কপালে একবার মাত্র কিছু জুটেছিল বাবু, সেই ভূকম্পের সময়। সিটির লাসগুলো থেকে কিছু কিছু সোনা-চাঁদি পেয়েছিলাম। কিন্তু ভূকম্প তো বার বার হয় না, আর অমন ভাল ভাল লাসও বার বার পাওয়া যায় না।

কুশল প্রশ্ন করে—কি হয়েছিল এদের? এখানে এসেই বা মরে পড়ে আছে কেন?

ডোম বলে—শুধু কি এরা? আজ তিন দিনের মধ্যে শহরের ভিতর থেকে পঞ্চাশেরও বেশি জংলিদের লাস তুলে সরাতে হয়েছে।

কুশল আমি জানতে চাই, কি হয়েছে এদের, যার জন্য এরা মরছে ?

একজন ডোম হাত দিয়ে পেট বাজিয়ে উত্তর দেয়—ভুখ ভুখ। খেতে না পেয়ে মরছে। তিন চার হাজার জংলি এসে জমা হয়েছে শিলোড়া ঘাটের কাছে। পুলিশের পাহারা আছে, তবু অনেকে ফাঁকে-ফাঁকে ঢুকে পড়ছে শহরে, ভিক্ষে করার জন্য।

কুশল—কোথা থেকে এল জংলিরা ?

ডোম—ঐ ধূলপাহাড়ের জঙ্গলের দিক থেকে।

কুশল—কেন এল ?

ডোম—জংলিদের চার পাঁচটা ডিহি একেবারে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আজ প্রায় পনর দিন ধ'রে একটা আগুন দৌড়চ্ছে জঙ্গলের ভিতর। রাত্রিবেলা ধূলপাহাড়ের দিকে তাকালেই আগুনের লহর দেখতে পাবেন!

মৃতদেহ দু'টোকে ধরাধরি ক'রে তুলে গাড়ির ভিতর রাখে ডোমেরা। একজন ডোম আক্ষেপ করে।—এদের আর দোষ কি বাবু ? মকাই মহুয়া ছাগল-টাগল যা ছিল সব পুড়ে গেছে, তাই ক্ষিধের চোটে শহরে এসে ঢুকতে চাইছে।

একজন ডোম এইবার বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে গাড়ির ভিতরে রাখে। কুশল আতঙ্কে একটা লাফ দিয়ে ডোমেদের সামনে এসে দাঁড়ায়, চিৎকার করে—বাচ্চাটাকে ওর ভেতর রেখে নিয়ে যাচ্ছ কেন ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

ডোমেরা হেসে ফেলে—ঘাবড়াচ্ছেন কেন বাবু। বাচ্চাটাকে তো আর শ্মশান-ঝিলে ফেলে দেব না। ডোম ব'লেই কি জ্যান্ত-মরা বাছাই করতে ভুলে গেছি ?

কুশল—তবে কি ক'রবে ওকে নিয়ে ?

ডোম—থানায় জমা ক'রে দেব।

কুশল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। ডোমেরা কুশলকে একটা সেলাম জানিয়ে গাড়িতে ঠেলা দেয়। কুশল বলে—থাম।

পকেটে হাত দিয়ে পাঁচ টাকার একটা নোট পায় কুশল। একজন ডোমের হাতে নোটটা তুলে দিয়ে বলে—বাচ্চাটাকে একজন কোলে ক'রে নিয়ে যাও, ঐ লাসের সঙ্গে ওকে আর রেখ না। আর, শ্মশানঝিলে যাবার আগেই বাচ্চাটাকে থানায় জমা ক'রে দিও। কেমন ?

—যে আজ্ঞে হুজুর। দু'জন ডোম আবার এক সঙ্গে কুশলকে সেলাম জানায়। একজন ডোম বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। মিউনিসিপ্যালিটির মড়া-তোলা গাড়ি চলে যায়। যাবার সময় আর ঘড়াং ঘড়াং শব্দের ঠুনকো উল্লাস শোনা যায় না।

মৃতদেহের ওজনের ভারে চারটি চাকার শব্দ চেপে গিয়েছে। চলমান সমাধির মত যেন বোবা শোকের পসরা নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায় মড়াতোলা গাড়ি। এরই মধ্যে সূর্যও ডুবে গিয়েছে।

এতক্ষণে পলাশতলা সত্যিই নির্জন হয়, শুধু একা দাঁড়িয়ে থাকে কুশল। আস্তে আস্তে পকেটে হাত দেয় কুশল, রুমাল বের করে। চোখের উপর চেপে ধরে রুমাল।

মানুষের প্রাণেরও এমন অপচয় আর এমন অপমান হয়? জলভরা মেঘের মত নরম হয়ে গিয়েছে কুশলের মন। এলোমেলো হয়ে মনের মধ্যে কল্পনা হয়ে যা কিছুই আসে, সবই যেন বেদনা বাড়িয়ে তোলে। কুশল নিজেই আশ্চর্য হয়েছে, আজ তার চোখে জল দেখা দিয়েছে। জীবনটা কি আজ সত্যিই এই পৃথিবীকে ভালবাসবার পথের উপর এসে দাঁড়ালো? এই চোখের জল কি সে যাত্রাপথের প্রথম পাথেয়?

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। আলোয় ঝলসে ওঠে কারখানা অঞ্চল। মহারাজপুরের চোখ বড় শুকনো, মহারাজপুর তার বৈভবের বাতি জ্বালিয়েছে।

পলাশ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কুশলের দৃষ্টি যেন এখান থেকে ছুটে গিয়ে দূরের অন্ধকারে অবহেলিত কতগুলি দুঃখী মানুষের মূর্তিকে দেখতে চায়। শিলোড়া ঘাট এখান থেকে কতদূর? দু' মাইলের বেশি নয়। এখনি কি একেবার গিয়ে দেখে আসা যায় না? তিন চার হাজার ক্ষুধাতুর প্রাণ সেখানে বসে বসে কি করছে আর কি ভাবছে? কি বলতে চায় তারা? দেখতে ইচ্ছা হয় কুশলের।

অনেকক্ষণ ধরে এইখানে থমকে আছে কুশল। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। চলতে যখন হবে, ক্লান্তি আর কুণ্ঠা কেন? চিন্তা কিসের? মতিলালের কারখানার পাশ দিয়ে সরু গলিটা ধ'রে এগিয়ে যায় কুশল, তারপর ক্রস রোড, তারপর সোজা শিলোড়া ঘাটের দিকে।

তিন চার হাজার পাহাড়ি ভুঁইয়া নরনারী ও শিশু এসে ঠাঁই নিয়েছে শিলোড়া ঘাটের ঢালুতে, যেখানে সারবাঁধা স্তম্ভের মত বড় বড় শিলাখণ্ড বিরাট বৃত্ত হয়ে পড়ে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ঐ শিলাখণ্ডগুলি নিজের থেকেই মাটি ফুঁড়ে ওঠেনি। মানুষই এনে সাজিয়ে রেখেছে ঐভাবে। এযুগের মহারাজপুরের মানুষ তারা নয়, সে-যুগের হরভবনের মানুষও তারা নয়, তারও আগের মানুষ। কত যুগ আগের কে জানে? আরণ্য জীবনের এক সুপ্রভাতে পাথরের বেদিকা স্থাপন

ক'রে তার উপর যারা সমাজের প্রথম ভূমিকা রচনা করেছিল, এই শিলাবৃত্ত হয়তো ছিল তাদেরই উপনিবেশ। এই শিলাবৃত্তে একদিন মানুষের প্রথম বিস্ময়ের কলরব ধ্বনিত হয়েছে, জেগেছে প্রথম উৎসবের হর্ষ। প্রথম সভ্যতার ছেলেমানুষি মেলা বসেছে একদিন হয়তো এই শিলাবৃত্তেরই আঙিনায়। এই শিলাবৃত্তকে আধুনিক কংক্রিটের মহারাজপুর আজ আর আত্মীয় বলে চিনতে পারে না। আরণ্য পিতামহদের ভয়-ভাঙা মশালের আলো এখানে নিভে গিয়েছে কবে? সে কত শত যুগ অতীতে?

লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেই পিতামহের দল তাদের আদিম গৌরব নিয়ে। চৌকিদারেরা শুধু বলে, এই শিলাবৃত্তে আজও রাতের অন্ধকারে অশরীরী কারা যেন ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু শিলোড়া ঘাটে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে কুশল, আজও তারা শরীরী হয়েই আছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে তিন চার হাজার প্রাক্ ইতিহাস, একেবারে সজীব দেহ নিয়ে কথা বলছে আর ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। ঘুমিয়ে আছে কেউ টাঙি হাতে নিয়ে। রোগে কাতরাচ্ছে কেউ, পাশে তার ধনুক আর তীরের গোছা। ঝুঁটি বাধা, অর্ধোলঙ্গ ও প্রায়-উলঙ্গ নরনারী ও শিশু। আধুনিক মহারাজপুরের পক্ষে চেনাই কঠিন এবং বিশ্বাস করা আরও কঠিন যে, এরাও মানুষ গোত্রের প্রাণী।

মাত্র তিন-চার হাজার পাহাড়ি ভুঁইয়া শুধু কিছু খেতে চাইছে, হাত পেতে এসে দাঁড়িয়েছে মহারাজপুরের সম্মুখে, এবং তাদের খেতে দিতে হবে। কিন্তু এটাই একটা মস্ত জটিল সমস্যা হয়ে মহারাজপুরের জীবনে উৎকট দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে। সমস্যা সমাধান করা কর্তব্য এবং করতে অনেকেই প্রস্তুত হয়েছে, অনেক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও দল। সমাধান করতে হবে। কিন্তু কোন্ উপায়ে? এখন এই উপায়টাই হয়ে উঠেছে প্রধান সমস্যা।

নতুন ক'রে অনেকগুলি রিলিফের দলও তৈরি হ'য়ে উপায় খুঁজছে। একটা দল ঠিক করেছেন, শিলোড়া ঘাট থেকে এই ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষগুলিকে মার্চ করিয়ে প্রথমে শহরে ঢোকানো হবে, তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সামনে নিয়ে গিয়ে দলে দলে বসিয়ে দিতে হবে।

বিশিষ্ট ব্যক্তি কয়েকজন এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রধান মন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করেছেন —অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে উদ্যোগী হবার জন্য, নইলে শীঘ্রই এনার্কি আর বিপ্লব দেখা দেবে মহারাজপুরে।

অনেকে বিবৃতি পাঠিয়েছেন সংবাদপত্রে। কেউ গভর্নমেণ্টের নিন্দে ক'রে, কেউ মিউনিসিপ্যালিটির নিন্দে ক'রে এবং কেউ বা জেলা বোর্ডের নিন্দে ক'রে।

মিউনিসিপ্যালিটি স্পষ্ট ক'রেই বলেন—আমাদের দায়িত্ব নেই, আমাদের এলাকার বাইরে পড়ে শিলোড়া ঘাট। দায়িত্ব হলো জেলাবোর্ডের।

জেলা বোর্ড বলেন—চ্যারিটি অর্থাৎ দাতব্য কাজের জন্য আমরা এই বছর কোন গ্র্যাণ্ট পাইনি সরকারের কাছ থেকে, এবং আমাদেরও ফণ্ডে জোর নেই।

শিলোড়া ঘাটের থানা-অফিসারকে বাংলোতে ডাকিয়ে এনে ধমক দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট—পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলেন না কি মশাই, নইলে জংলিরা একেবারে সদর পর্যন্ত চলে আসে কি ক'রে? বুদ্ধি ক'রে যদি চৌকিদার লাগিয়ে মাত্র এগার মাইল উত্তরে ওদের ঠেলে পার করে দিতে পারতেন, তাহ'লে আমার জেলার বাইরে ওরা থাকতো, আর আমাকে এসব সমস্যার মধ্যেও পড়তে হতো না।

খুবই প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে মহারাজপুরের সার্ভিস চ্যারিটি এবং পলিটিক্স, একই সঙ্গে। অনেকগুলি রিলিফ কমিটি আর সোসাইটির উদ্যোগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জনসভা হয়েছে। রিলিফের কাজের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদনও করা হয়েছে জনসাধারণের কাছে।

আবেদনে বিশেষ কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। কমিটি আর সোসাইটিগুলি অগত্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিয়ে প্রত্যেক দল থেকে দু'জন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে একটি ইউনাইটেড রিলিফ কমিটি স্থাপন করলেন। ইউ-আর-সি'র প্রথম জেনারেল বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি জলসা হবে, টিকিট বিক্রি ক'রে অর্থ সংগ্রহ করা হবে জংলি দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য। কলকাতার কয়েকজন শিল্পীকে আনতে পারলে টিকিট বিক্রি ভাল হবে, সুতরাং কমিটির দু'জন লোক চলে গেলেন কলকাতায়, নাচিয়ে আর গাইয়ে শিল্পী সংগ্রহ করতে।

কলকাতার শিল্পীদের আনতে খরচ আছে। এই খরচের টাকা অবিলম্বে যোগাড় ক'রে ফেলতে হবে। কমিটির কর্মীরা এক এক ক'রে শহরের এক একজন বিশিষ্টকে ধরাধরি আর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন, জলসাটাকে ফাইন্যান্স করার জন্য।

মোট কথা, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দুটি চারটি করে জংলি দুঃস্থ মরতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে চলতে থাকে আধুনিক মহারাজপুরের সার্ভিস চ্যারিটি আর পলিটিক্সের সনৃত্য উদ্যোগ।

এসব আলোড়নের বাইরে একটি মাত্র আয়োজন অনেকখানি এগিয়েছে দেখা যায়। শিলোড়া ঘাটের শিলাবৃত্তের পাশে দুটো একচালা গড়ে উঠেছে, একটা উত্তরে আর একটা দক্ষিণে। বাঁশের খুঁটোর উপর খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া একচালা। উত্তরের একচালাটা হলো সদাব্রত, বড় বড় মাটির হাঁড়িতে রান্না হয় মকাইয়ের ঘাট্টা, খুদের

ক'রে তার উপর যারা সমাজের প্রথম ভূমিকা রচনা করেছিল, এই শিলাবৃত্ত হয়তো ছিল তাদেরই উপনিবেশ। এই শিলাবৃত্তে একদিন মানুষের প্রথম বিস্ময়ের কলরব ধ্বনিত হয়েছে, জেগেছে প্রথম উৎসবের হর্ষ। প্রথম সভ্যতার ছেলেমানুষি মেলা বসেছে একদিন হয়তো এই শিলাবৃত্তেরই আঙিনায়। এই শিলাবৃত্তকে আধুনিক কংক্রিটের মহারাজপুর আজ আর আত্মীয় বলে চিনতে পারে না। আরণ্য পিতামহদের ভয়-ভাঙা মশালের আলো এখানে নিভে গিয়েছে কবে? সে কত শত যুগ অতীতে?

লুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেই পিতামহের দল তাদের আদিম গৌরব নিয়ে। চৌকিদারেরা শুধু বলে, এই শিলাবৃত্তে আজও রাতের অন্ধকারে অশরীরী কারা যেন ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু শিলোড়া ঘাটে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে কুশল, আজও তারা শরীরী হয়েই আছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে তিন চার হাজার প্রাক্ ইতিহাস, একেবারে সজীব দেহ নিয়ে কথা বলছে আর ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। ঘুমিয়ে আছে কেউ টাঙি হাতে নিয়ে। রোগে কাতরাচ্ছে কেউ, পাশে তার ধনুক আর তীরের গোছা। ঝুঁটি বাধা, অর্ধোলঙ্গ ও প্রায়-উলঙ্গ নরনারী ও শিশু। আধুনিক মহারাজপুরের পক্ষে চেনাই কঠিন এবং বিশ্বাস করা আরও কঠিন যে, এরাও মানুষ গোত্রের প্রাণী।

মাত্র তিন-চার হাজার পাহাড়ি ভুঁইয়া শুধু কিছু খেতে চাইছে, হাত পেতে এসে দাঁড়িয়েছে মহারাজপুরের সম্মুখে, এবং তাদের খেতে দিতে হবে। কিন্তু এটাই একটা মস্ত জটিল সমস্যা হয়ে মহারাজপুরের জীবনে উৎকট দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে। সমস্যা সমাধান করা কর্তব্য এবং করতে অনেকেই প্রস্তুত হয়েছে, অনেক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও দল। সমাধান করতে হবে। কিন্তু কোন্ উপায়ে? এখন এই উপায়টাই হয়ে উঠেছে প্রধান সমস্যা।

নতুন ক'রে অনেকগুলি রিলিফের দলও তৈরি হ'য়ে উপায় খুঁজছে। একটা দল ঠিক করেছেন, শিলোড়া ঘাট থেকে এই ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষগুলিকে মার্চ করিয়ে প্রথমে শহরে ঢোকানো হবে, তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর সামনে নিয়ে গিয়ে দলে দলে বসিয়ে দিতে হবে।

বিশিষ্ট ব্যক্তি কয়েকজন এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রধান মন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করেছেন —অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে উদ্যোগী হবার জন্য, নইলে শীঘ্রই এনার্কি আর বিপ্লব দেখা দেবে মহারাজপুরে।

অনেকে বিবৃতি পাঠিয়েছেন সংবাদপত্রে। কেউ গভর্নমেণ্টের নিন্দে ক'রে, কেউ মিউনিসিপ্যালিটির নিন্দে ক'রে এবং কেউ বা জেলা বোর্ডের নিন্দে ক'রে।

মিউনিসিপ্যালিটি স্পষ্ট ক'রেই বলেন—আমাদের দায়িত্ব নেই, আমাদের এলাকার বাইরে পড়ে শিলোড়া ঘাট। দায়িত্ব হলো জেলাবোর্ডের।

জেলা বোর্ড বলেন—চ্যারিটি অর্থাৎ দাতব্য কাজের জন্য আমরা এই বছর কোন গ্র্যাণ্ট পাইনি সরকারের কাছ থেকে, এবং আমাদেরও ফণ্ডে জোর নেই।

শিলোড়া ঘাটের থানা-অফিসারকে বাংলোতে ডাকিয়ে এনে ধমক দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট—পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলেন না কি মশাই, নইলে জংলিরা একেবারে সদর পর্যন্ত চলে আসে কি ক'রে? বুদ্ধি ক'রে যদি চৌকিদার লাগিয়ে মাত্র এগার মাইল উত্তরে ওদের ঠেলে পার করে দিতে পারতেন, তাহ'লে আমার জেলার বাইরে ওরা থাকতো, আর আমাকে এসব সমস্যার মধ্যেও পড়তে হতো না।

খুবই প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে মহারাজপুরের সার্ভিস চ্যারিটি এবং পলিটিক্স, একই সঙ্গে। অনেকগুলি রিলিফ কমিটি আর সোসাইটির উদ্যোগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জনসভা হয়েছে। রিলিফের কাজের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদনও করা হয়েছে জনসাধারণের কাছে।

আবেদনে বিশেষ কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। কমিটি আর সোসাইটিগুলি অগত্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিয়ে প্রত্যেক দল থেকে দু'জন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে একটি ইউনাইটেড রিলিফ কমিটি স্থাপন করলেন। ইউ-আর-সি'র প্রথম জেনারেল বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি জলসা হবে, টিকিট বিক্রি ক'রে অর্থ সংগ্রহ করা হবে জংলি দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য। কলকাতার কয়েকজন শিল্পীকে আনতে পারলে টিকিট বিক্রি ভাল হবে, সুতরাং কমিটির দু'জন লোক চলে গেলেন কলকাতায়, নাচিয়ে আর গাইয়ে শিল্পী সংগ্রহ করতে।

কলকাতার শিল্পীদের আনতে খরচ আছে। এই খরচের টাকা অবিলম্বে যোগাড় ক'রে ফেলতে হবে। কমিটির কর্মীরা এক এক ক'রে শহরের এক একজন বিশিষ্টকে ধরাধরি আর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন, জলসাটাকে ফাইন্যান্স করার জন্য।

মোট কথা, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দুটি চারটি করে জংলি দুঃস্থ মরতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে চলতে থাকে আধুনিক মহারাজপুরের সার্ভিস চ্যারিটি আর পলিটিক্সের সনৃত্য উদ্যোগ।

এসব আলোড়নের বাইরে একটি মাত্র আয়োজন অনেকখানি এগিয়েছে দেখা যায়। শিলোড়া ঘাটের শিলাবৃত্তের পাশে দুটো একচালা গড়ে উঠেছে, একটা উত্তরে আর একটা দক্ষিণে। বাঁশের খুঁটোর উপর খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া একচালা। উত্তরের একচালাটা হলো সদাব্রত, বড় বড় মাটির হাঁড়িতে রান্না হয় মকাইয়ের ঘাট্টা, খুদের

জাউ আর খিচুড়ি। একটু ভিন্ন ক'রে, আরও দুটো উনুনের উপর দুটি হাঁড়ির একটাতে জ্বাল হয় বার্লি, আর একটিতে ফোটে জল। থাক লাগানো শালপাতার ঠোঙা আর মাটির খুরিও আছে একদিকে। তিনজন খাটিয়ে লোক আছে যারা রান্না করে, এবং তার জন্য দৈনিক মজুরিও তারা নেয়। বেশি দেরি হয়নি, কুশল যেন তার চোখের জলের জেদটাকে মাতিয়ে তুলে শিলোড়া ঘাটের এই সদাব্রত গড়ে তুলতে পেরেছে।

দক্ষিণের একচালার ভিতর গোটা দশেক খেজুরের চাটাই পাতা, তার উপর শুয়ে আছে জন পাঁচেক রোগগ্রস্ত জংলি, কারও ভেদ-বমি হয়, কেউবা জ্বরে ধুঁকতে থাকে। একজন ব্রতী ছেলে কাজ ক'রে এখানে; কতগুলি ট্যাবলেট, কিছু পটাশ আর ব্লিচিং পাউডার, আর কয়েক হাঁড়ি বার্লি ও গরম জলের সম্বল নিয়ে। একজন ডোমও আছে কোদাল নিয়ে; যে রোগীর চির-কালের ছুটি হয়ে যায়, তাকে মাটি চাপা দিয়ে অন্তিমের কাজটুকু সেরে দেয় এবং তার জন্য মজুরিও নেয়।

কুশল আসে রোজই, হয় বিকালে না হয় সন্ধ্যায়। সকাল বেলাটায় আসতে পারে না কুশল, কারণ সিটির গোলা আর গঞ্জ এলাকায় একটা গরুর গাড়ি নিয়ে প্রতি আড়তের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। টাকা-পয়সা, পুরনো কাপড়, এক বস্তা খুদ, তিন বস্তা মকাই, দু'চার ধামা বুনো কলাই, চাল, ডাল—যে যা দেয় তাই গরুর গাড়িতে বোঝাই ক'রে পাঠিয়ে দেয় শিলোড়া ঘাটের সদাব্রতে। দুপুরে একবার সার্ভে অফিসে যেতেই হয়, তারই মাঝে একবার দৌড়ে গিয়ে দেখে আসতে হয় ট্রেঞ্চের কাজ। যেদিন অফিসের কাজ সারতে বেলা হয়ে যায়, সেদিন আমলকি জঙ্গলের ভিতর দিয়েই কাঠুরিয়াদের যাওয়া-আসার সরু পথের চড়াই ধরে চলতে চলতে শিলোড়া ঘাটে পৌছে যায় কুশল, আধঘণ্টার মধ্যে।

মাত্র দশটা দিনের ছুটোছুটি চেষ্টা আর পরিশ্রমের পর এই সদাব্রতটি গড়ে তুলতে পেরেছে কুশল। এর মধ্যে সবচেয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হলো, এই ছুটাছুটি ক্লান্তি আনে না। খুঁজলেই যেন প্রয়োজনের জিনিষগুলি চলে আসছে, না এলেও পাওয়ার জন্য আরও বেশি জেদ চাপে। ঐ ব্রতী ছেলেটি, ঐ অনুপমই বা কোথা থেকে এসে গেল? এর আগে ওর সঙ্গে কোনদিন মুখের-দেখা পরিচয়ও ছিল না কুশলের। শিলোড়া ঘাটের এই ভিড়কে জংলিদের ফুর্তির মেলা মনে ক'রে শোলার খেলনা বেচতে এসেছিল অনুপম। এক জোড়া হরিণ-শিং বাগিয়ে নিয়ে একটা শোলার খেলনা এই জংলিদের হাতে কত সহজে গছিয়ে দেওয়া হয়।

চোখের জলটা কাজে লেগেছে কুশলের। সেবার কাজে মেতে উঠবার নেশা

এনে দিয়েছে ঐ অদ্ভুত উষ্ণ-সজল স্পর্শ। শিলোড়া-ঘাটের জংলিদের দুঃখ দেখতে খারাপ লাগে, কিন্তু মনের বেদনাটাকে ভালই লাগে কুশলের। এই বেদনায় জ্বালা নেই, পীড়িত করে না। বরং মনে হয়, জীবনে কিসের একটা অভাব যেন ছিল, যার জন্য চলার আবেগ ভাল ক'রে জাগছিল না, সে শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছে এই বেদনা।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময়, তবু এরই মধ্যে কুশলের জীবনটা যেন বিচিত্র আনন্দের একটা জগৎ থেকে আর একটা জগতে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। এমন কাজের আর এমন পথের লোভ কে ছাড়তে পারে? মধ্যাহ্ন যায় হরভবনের স্তূপে; রূপের মূর্তি মাটি চাপা প'ড়ে আছে, তাদের উদ্ধার করতে হয়। সন্ধ্যাটা যায় শিলোড়া ঘাটের সদাব্রতে। মাটি-চাপা পড়তে চলেছে সব রূপের জীবন্ত মূর্তি, তাদের ধরে রাখতে হয়। আর, রাত্রি-শেষে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ফোটে রক্তকরবী। স্বরূপার সুন্দর মুখের ছবি, তার মধ্যে বিহ্বল মিষ্টি আর মায়ামাখা দুটি ঠোঁট। দু'চোখ ভরে দেখতে হয়, মন্দ কি?

এরই মধ্যে একটা উৎকণ্ঠাও আছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে, কল্লোলিত-কান্তি গঙ্গা যেন আবার চুরি না হয়ে যায়। আশ্বাসও আছে, সার্ভে অফিসের প্রহরী পাঠকজী জেগে আছেন নিশ্চয়। কোন ভয় নেই।

অপরাহ্ণ বেলা। বড় ঝিলের কাক-চক্ষু জল টলমল করে। তার উপর ভাসে সাদা সাদা শালুক, তার মধ্যে রঙীন পানকৌড়ি কখনও ডুব খায় আর কখনও ভাসে। ঠোঁট টুকটুকে লাল, গলার নীচটা ঘন নীল, উপরটা গোলা খয়েরের রং, বুকের কাছটা সাদা, আর ডানা দুটোর উপর যেন পৃথিবীর সব রঙের ছিটে এসে লেগেছে। ছোট নরম রঙীন পানকৌড়ি, শরতের মেঘ কেটে গেলেই নাকি ওরা সুদূর বৈকাল হ্রদ থেকে আকাশে পাড়ি দিয়ে এদিকে আসে।

সার্ভে অফিসের বাংলো থেকে সোজা দৌড়িয়ে টু-সিটার এসে দাঁড়িয়েছে বড় ঝিলের কিনারায়। আজ পানকৌড়ি শিকারের প্রোগ্রাম সার্থক করবে দেবী রায় আর নবলা।

নবলার সাজটাও আজ অভিনব। অনেকদিন থেকে নবলার কাছে দেবী রায়ের একটা সাধের অনুরোধ ছিল, একটা নতুন রকমের সাজ পরবার অনুরোধ। নিজেই কলকাতায় অর্ডার পাঠিয়ে সেই সাজটি আনিয়ে রেখেছিল দেবী রায়। খাকি সিল্কের ব্রিচেস প'রে সাধের শিকারিনী বেশে সাজ্জিত হয়ে এসেছে নবলা।

কিনারা থেকে মাত্র বিশ হাত দূরে একটা রঙীন পানকৌড়ি সাদা শালুকের গায়ে ঠোঁট ঘ'সে ঘ'সে ভেসে বেড়ায়। দেবী রায়ের বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলে তাক করে নবলা।

লক্ষ্য স্থির করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে নবলার। অপরাহ্ণের রোদ প'ড়ে নবলার মুখটাও তপ্ত হয়ে রক্তদ্যুতি ছড়ায়। নিঃশ্বাসের বাতাসটা যেন টিপ টিপ ক'রে বুকের ভিতর মাথা ঠোকে। ট্রিগার টানবার আগেই দম ফুরিয়ে যায় নবলার। একটা ডুব দিয়ে রঙীন পানকৌড়ি আবার ভেসে ওঠে।

বন্দুক নামিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে নবলা —পানকৌড়িটা বড় ছটফট করছে ডেভি, ঠিক পয়েণ্টে আনতে পারছি না।

দেবী রায় উৎসাহ দেয়—কি বলছো মিসিগুিয়া? এত কাছে তবু তাক করতে পারছো না? নাও, আবার ট্রাই কর।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক তোলে নবলা। মোমের মত মসৃণ ও কোমল দু'টি মেয়েলি হাত কঠিন পাথর হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের মত।

—শুট মিসগুিয়া! শুট!

দেবী রায়ের অনুপ্রাণিত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নবলার বন্দুক থেকে গুলি ছোটে। গলা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নবলা—লেগেছে ডেভি, ঠিক গলার ওপর লেগেছে।

রঙীন পানকৌড়ির নীল গলার উপর মুহূর্তের মধ্যে এক ঝলক লাল ফুটে ওঠে, সে লাল আবার ছিটকে গিয়ে লাগে সাদা শালুকের গায়ে। জলের উপর গলার রক্তাক্ত ক্ষত চেপে আর পাখার আছাড় দিতে দিতে তীব্র বেগে শালুকের ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে পানকৌড়ি। বিব্রত শালুকও ছটফট ক'রে নড়তে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আবার শুধু জলের দোলায় দুলতে থাকে।

পানকৌড়ির গলা থেকে এক ঝলক রক্ত, যেন এক ঝলক লাল ব্র্যাণ্ডি। উন্মাদনা আছে ঐ রক্তে, দেখলেই নেশা লাগে, মত্ত ক'রে তোলে নিঃশ্বাসের উল্লাস:—অব্যর্থ মিসিগুিয়া, একেবারে অব্যর্থ। নবলার মাথাটা মত্ত আগ্রহে বুকের উপর চেপে ধরে দেবী রায়।

এখানে আর না। এখানে মাংসের লোভে শিকার করতে আসেনি দেবী রায় আর নবলা। মাত্র একটা রঙীন প্রাণ-শিকারের আনন্দ আস্বাদ করবার প্রোগ্রাম ছিল, ছুটাছুটির জীবনকে একটু নেশা দেবার জন্য। সেই প্রোগ্রাম সার্থক হয়েছে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবী রায় বলে—এবার চল।

চললো টু-সিটার, আবার সোজা দৌড়ে ফিরে এল দেবী রায়ের বাংলোতে।

শিকারিনী নবলা থাকি সিল্কের ব্রিচেস ছেড়ে আবার ভয়েলের ধূপ ছায়া জড়িয়ে মধুরিকা হয়ে ওঠে। দেবী রায় পাইপ ধরায়।

দেবী রায় বলে—তোমার জন্যে কোন্ ঘরটা সাজাবো ঠিক করেছি জান?

নবলা—না, কোন্ ঘরটা?

দেবী রায়—এই ঘরটাই।……তার জন্যে কত খরচ করবো জান?

নবলা—না।

দেবী রায় এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বলে—শুনলে বুঝতে পারবে মিসিগুিয়া, আমি কত বড় পাগল।…ত্রিশটি হাজার টাকা খরচ করবো এই ঘরটি ফার্নিশ করতে। মেহগনি আর আইভরিতে ভরে দেব। পর্দাগুলো জয়পুর থেকে আনাবো ঠিক করেছি, আর কার্পেট লখনউ থেকে।

নবলা—কিন্তু আসল কথাটা তো আজ পর্যন্ত মা'কে বলাই হলো না ডেভি।

দেবী রায়—আজই বলবো মিসগুিয়া। আর, বিয়ের তারিখটাও ঠিক করে ফেলবো।

নবলা—আমার একটা শখ আছে ডেভি।

দেবী রায়—বল।

নবলা—বিয়ের তারিখটায় যেন আকাশে চাঁদ থাকে।

দেবী রায়—কেন বলতো মিসিগুিয়া?

নবলা—বিয়ের রাত্রেই তোমার সঙ্গে একবার দামোদরের পুলের ওপর সেই জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়াবো, যেখানে চাঁদের আলোতে তুমি প্রথম আমার হাত ধরেছিলে আমাকে পাওয়ার জন্য।

দেবী রায় নিবিড় আগ্রহে নবলার হাত ধ'রে বলে—তুমি যখন চাইছো, তখন আকাশে চাঁদ একটা রাখতেই হবে মিসিগুিয়া, নিশ্চয়।

পরমুহূর্তে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবী রায় বলে।—চল।

নবলা—কোথায়?

দেবী রায়—স্টেশন ক্লাব।

চললো টু-সিটার, দুটি সম্মিলিত হৃদয়ের উচ্ছল হাসির সম্ভার নিয়ে।

স্টেশন ক্লাবে এসে এক হাত ব্যাডমিণ্টন খেলার পর লনের ধারে কিছুক্ষণ বসলো দেবী রায় আর নবলা, কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে। তারপর উঠে গিয়ে ক্লাবের স্টল থেকে দু'টো লিলির তোড়া কিনে দু'জনেই দু'জনের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে, স্টলের প্রখর আলো চমকে ওঠে দু'জনের চোখে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবী রায় বলে—চল।

নবলা—কোথায় ?

দেবী রায়—ঝালদা রোডের কুয়াশার মধ্যে একবার দৌড়ে আসি।

ছুটে যায় টু-সিটার, স্টেশন ক্লাবের ফটক পার হয়ে পিচঢালা সড়ক ধরে পৌঁছে যায় ঝালদা রোডে। দুটি মিলনাকুল জীবনের সান্ধ্য উৎসবের বাতি যেন আলোর উল্কা হয়ে একটা কুয়াশার জগতে ছুটতে থাকে। ফিরে হ্যাপি-মুকের ফটকে যখন এসে থামে টু-সিটার, তখন হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবী রায় একবার আক্ষেপ ক'রে ওঠে—এঃ, অনেক রাত হয়ে গেছে দেখছি।

নবলা লিলির তোড়া দুটো হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—ক'টা বেজেছে ?

দেবী রায়—সাড়ে দশটা।

নবলা—তাহ'লে মা এখনও ড্রইং রুমেই আছেন, চল।

ফটকে ঢুকে দেবী রায়ের গা-ঘেঁসে চলতে চলতে নবলা বলে—আজ বড় লজ্জা করছে ডেভি। আমি কিন্তু মা'র কাছে একবার দেখা দিয়েই ওপরে চলে যাব। যা বলবার সব তুমি বলবে।

ড্রইংরুমেই বসে ছিলেন নন্দা দেবী, এবং লিলির তোড়া দুটো হাতে নিয়ে মা'র সামনে আজ দাঁড়াতে একটু লজ্জাই করছিল নবলার।

দেবী রায়ের দিকে তাকিয়ে নন্দা বললেন—বসো।

দেবী রায় বসতেই নন্দা দেবী হেসে হেসে যেন মৃদু অভিযোগের মত বলেন—আজ তোমাকে শাস্তি পেতে হবে দেবী। যেমন দেরি ক'রে এসেছ, তেমনি দেরিতে ছাড়া পাবে।

চকিত ভ্রূক্ষেপে দেবী রায়ের চোখের উপর একটা সহাস্য ইঙ্গিত ছেড়ে দিয়ে নবলা বলে—আমি ওপরে যাই।

ড্রইং রুম ছেড়ে, আলোকিত করিডর পার হয়ে বনহরিণীর মত যেন মনোমদ উল্লাসে লাফাতে লাফাতে চ'লে যায় নবলা। সিঁড়ির কাছে এসে সারা দেহ ছন্দিত ক'রে উপরে উঠে যায়। নিজের কক্ষটিতে ঢুকেই প্রথমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তার পরই আলমারি খুলে দুটো মিনা-করা কাশ্মীরি ফুলদান বের করে। লিলির তোড়া দুটো দুই ফুলদানে সাজিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর পাশাপাশি বসিয়ে রাখে নবলা।

হাত মুখ ধুয়ে, আর সাজ বদল ক'রে যখন আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের উপর পাউডার ছড়ায় নবলা, তখন নিজেই দেখতে পায়, তার চোখ দুটোতে ঝকমক করছে সফল স্বপ্নের হাসি।

একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছা করে, দুরন্ত ডেভি বিয়ের কথা বলতে সত্যিই লজ্জা পাচ্ছে কি না? তবু ইচ্ছাটাকে সংযত করে নিজের মুখ আর পাউডার নিয়ে ব্যস্ত থাকে নবলা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নবলা, প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। ডেভি নিশ্চয় আছে এখনও, টু-সিটারের হর্নের বিদায়ী সঙ্কেত এখনও বেজে উঠতে শোনা যায়নি। ঘর থেকে বের হয়ে ব্যালকনির শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায় নবলা, ড্রইং রুমকে দেখতে পাওয়া যায় এখান থেকে। আর দেখতে পাওয়া যায়, ড্রইং রুমে বসে খাবার খাচ্ছে ডেভি, নন্দা দেবী টি-পট তুলে চা ঢালছেন পেয়ালায়। এত রাতে চা খাইয়ে সত্যিই যেন ডেভিকে শাস্তি দিচ্ছেন নন্দা দেবী।

আবার নিজের ঘরে এসে দাঁড়ায় নবলা। শরীরটাও ক্লান্ত বোধ করে। কৌচের উপর অলসভাবে হাত ছড়িয়ে পড়ে থাকতে বড় আরাম লাগে, দেহে ও মনে। মাথাটাকে শুধু ডেভির বুকের উপর ফেলে রাখতে ইচ্ছা করে, কৌচের কাঁধের উপর নয়।

ভাবতে আশ্চর্যও লাগে নবলার, কোথা থেকে এল এই দুরন্ত ডেভি, আর আসা মাত্র মনটাকে এমন ক'রে কেড়ে নিল? নিজের অদৃষ্টকেই প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা ক'রে, যে অদৃষ্ট তার এমন মনের মত স্বপ্ন-সাথীকে জীবনে এনে দিল। ডেভিকে ভালবাসে নবলা, এর মধ্যে আজ বিন্দুমাত্র সংশয় বা প্রশ্ন নেই। ডেভির ভালবাসাও পেয়েছে নবলা, একেবারে নির্বাধ অকুণ্ঠ আর দুরন্ত ভালবাসা।

নিজেকেও ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে নবলার! সে তার জীবনের পথ আর প্রতিজ্ঞা থেকে নিজেকে একটুও বিচ্যুত করেনি। কোন দুর্বলতা, কোন আবেদন, কোন ক্ষুদ্র মোহ তার পথ ভুল ক'রে দিতে পারিনি। এই নিষ্ঠাটুকু অটুট ক'রে রাখতে পেরেছিল বলেই ভাগ্য তাকে বাঞ্ছিত উপহার এনে দিয়েছে একে একে; সেই ফিকে জ্যোৎস্নায় দামোদরের জলের উপর হাতে-হাতধরা কামনা, হিরা-বসানো হেয়ার পিনের প্রতিশ্রুতি, আর এই লিলি ফুলের যুগল-তোড়ার সংকল্প।

রাত সাড়ে বারোটা। যেন একটা তন্দ্রা থেকে চমকে জেগে উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নবলা। তারপরেই ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে। তন্দ্রাচারিণী এক চমকিতার মত ছুটে গিয়ে ব্যালকনির আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়ায়। বাইরের দিকে তাকায়।

দেবী রায় তখনও ঠিক চলে যায়নি, আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছে, গেটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন নন্দা দেবী, কথা বলতে বলতে।

স্টার্ট নিল দেবী রায়ের টু-সিটার, ফার্স্ট গিয়ারের আবেগেই ছুটে চলে গেল গেট থেকে অনেক দূর, তারপর আরও দূরে। মিলিয়ে গেল টু-সিটারের শব্দ।

উপরের ব্যালকনির আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে নবলার উৎকর্ণ আগ্রহ হঠাৎ যেন এলোমেলো হয়ে যায়। টু-সিটারের হর্ণ তো যাবার সময় বিদায়ধ্বনি বাজিয়ে গেল না? গেটের দিকে তাকালে শুধু দেখতে পাওয়া যায়, নন্দা দেবী আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন।

ছুটোছুটির জীবনে ক্লান্তি আসেনি এখনও, থেমে থাকতেও চায় না নবলা, তবু আজ তাকে সারাদিন ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতে হয়েছে।

মাঝে মাঝে ছটফট করতে হয় বিছানায় শুয়ে। উঠতে ইচ্ছা করে না। সারাদিন ধরে গায়ে যেন জ্বালা লেগে রয়েছে। সকাল থেকে জ্বর এসেছে নবলার।

প্রথমে বুঝতেই পারেনি নবলা যে তার জ্বর এসেছে। সকাল বেলা ঘুম ভেঙে গেলেও অনেকক্ষণ ধরে বালিশ আঁকড়ে বিছানার উপর পড়েছিল নবলা। আয়া ঘুম ভাঙাতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বলে—আপনার জ্বর হয়েছে মিস বাবা!

তা'হলে সত্যিই জ্বর হয়েছে। একবার বিছানা ছেড়ে উঠে বসে নবলা, তার পরই আয়াকে আবার নতুন ক'রে বিছানা ক'রে দিতে বলে।

বিছানা ক'রে দিয়েই আয়া জিজ্ঞেসা করে।—কি খাবেন আপনি?

রাগ করে নবলা—আমি কি খাব, তা কি আমাকে বলে দিতে হবে? বলবার মানুষ নেই বাড়িতে?

হ্যাঁ, বলবার মানুষ আছে বাড়িতে। যারা চিরকাল বলে এসেছে তারাই আছে। নবলা কি খাবে, এই প্রশ্ন জীবনে কোনদিন নবলাকে বিবেচনা ক'রে দেখতে হয়নি। যাঁরা চিরকাল বিবেচনা ক'রে এসেছেন তাঁরাই তো রয়েছেন, একজন ড্রইং রুমের পাশের ঘরে, আর একজন বাইরের হলঘরে। রাগ করার সঙ্গত কারণ আছে নবলার। জীবনের তেইশটি বছর পরে হঠাৎ আজ নিজের চেষ্টায় কি ক'রে বলতে পারে যে, সে কি খাবে? আয়া বলেছে, তবেই না বুঝতে পেরেছে নবলা যে তার জ্বর হয়েছে।

দুপুর হবার আগে খানসামা এসে এক পেয়ালা কোকো দিয়ে যায়, দু'চুমুক খেয়ে ঠেলে সরিয়ে রাখে নবলা। মুখ ভার ক'রে বিছানার উপরেই বসে থাকে। মা'র উপর অভিমান না ক'রে পারে না এবং বাবার উপর তো রাগই হয়। এখন পর্যন্ত কেউ একজন একটু উঁকি দিতেও এল না।

এই অভিমান আর রাগটার কিন্তু কোন সঙ্গত কারণ নেই।

নবলা জানে না, আজ চা খেয়েই বের হয়ে গিয়েছেন নন্দা দেবী, অনেকগুলি নোটের তাড়া নিয়ে সিটির পোদ্দার কোম্পানির গদিতে, নোটগুলিকে গিনি ক'রে আনবার জন্য।

আর মৃগেনবাবুর দোষ কি? সিমেণ্টের সোরাবজী এসে বসেছেন সূর্যোদয়ের পর থেকেই এক গাদা বিল আর চালান নিয়ে। মাত্র এক কাপ চা খেয়ে হিসাব আরম্ভ করেছেন এবং এখনও হিসাব চলছে। একটা হাত রেডি-রেকনারের উপর, আর একটা হাতে পেন্সিল, চশমাটা নাকের উপর ঝুলে পড়েছে, এখন যে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের অঙ্কে আলোড়িত বিরাট একটা প্রফিটের জগতে বসে আছেন মৃগেনবাবু।

আসুক আরও জ্বর। মুখ শুকিয়ে, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে আর তেষ্টায় বুক ফাটিয়ে দিয়ে জ্বরটা নবলার প্রাণের উপর একটা বিভীষিকা এনে দিক, তা না হ'লে হ্যাপিমুকের চৈতন্য বোধ হয় হবে না। রাগ করেই নবলা একটা চাদর গায়ের উপর টেনে নিয়ে বিছানার উপর অসাড় হয়ে শুয়ে থাকে।

ঘুম যদিও বা মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু স্বপ্নটা যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। আবার জেগে উঠে চুপ ক'রে বসে থাকে নবলা। তার অভিমানের ধোঁয়াতে সারা হ্যাপি-মুক যেন এই দিনের আলোতেই অন্ধকার হয়ে আছে। তার মধ্যে একটিও স্নেহোদ্বিগ্ন মূর্তি দেখা যায় না। মেয়ের অসুখ, তবু এই বাড়ির মেয়ের বাপ থার্মোমিটার হাতে নিয়ে ছুটে আসে না কেন? মেয়ের মা কেন একটা হাত-পাখা হাতে নিয়ে মেয়ের শিয়রের কাছে এসে বসে না?

বেলা যে তিনটে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নবলা আশ্চর্য হয়। সকালে মার্কেটে গিয়ে থাকলেও অনেকক্ষণ হলো নিশ্চয় ফিরেছেন নন্দা দেবী। খাওয়া-দাওয়াও সারা হয়ে গিয়েছে। তবে? তবে এখনও কি তাঁর সময় হলো না, উপরতলার এসে নবলাকে একবার দেখে যেতে?

বোধ হয় আজ জ্বরের ঘোরেই ভুলে গিয়েছে নবলা যে, প্রতিদিন ঠিক এই সময়টাতেই নীচের বারান্দায় একটা আরাম-চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে নখ পালিশ করেন নন্দা দেবী। একটা ছোট টেবিলও থাকে তাঁর সামনে, তার উপর একটা আয়না। নখ-পালিশ হয়ে গেলে, একটুখানি অলিভ অয়েল পুড়িয়ে হাতির দাঁতের কাঠিতে তুলে চোখে লাগাতে হয়—সুর্মার মত। তারপর অন্তত একটি ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকতে হয় নন্দা দেবীকে। এই নিয়মে চললে চোখ দুটো বড় বড় আর কালো কালো হয় এবং বেশ ঝকঝকও করে। হ্যাপি-মুকে আসবার পর থেকে প্রতিদিন বেলা তিনটে থেকে যে-নিয়মে চলে আসছেন নন্দা দেবী, আজও সেই নিয়মে চলছেন।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে, আজ এমন কোন ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি জানেন না। এইটুকু মাত্র আমার কাছে শুনেছেন যে, মিস বাবার জ্বর হয়েছে।

নবলার জ্বর হয়েছে, জ্বর সারাবার জন্য সব কর্তব্যের ভার তো দেওয়াই আছে বনমালীর উপর। ডাক্তারকে খবর দিতে চলেও গিয়েছে বনমালী অনেকক্ষণ আগে। নন্দা দেবী নীচের বারান্দা থেকে তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন ঘুমোবার জন্য।

বেলা তিনটে হয়ে গেলেও নন্দা দেবী উপরে উঠবার সময় পেলেন না। কিন্তু মৃগেনবাবু কোথায়? সোরাবজী নিশ্চয় এতক্ষণ পর্যন্ত আর বসে নেই!

বাড়িতে নেই মৃগেনবাবু। দুপুরেই বাইরের হলঘরে বসে তাড়াহুড়ো করে দু'মুঠো ভাত খেতে খেতে বনমালীর কাছে শুনেছেন যে নবলার জ্বর হয়েছে। তারপরই মৃগেনবাবু ট্যাক্সি ক'রে চলে গিয়েছেন, এখান থেকে অনেক দূরে একটা কয়লার খনিতে। ফিরবেন কখন্ তারও কোন ঠিক নেই।

চারটা বাজলো। ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে বনমালী এল উপরে। আজে-বাজে ডাক্তার নয়, ষোল টাকা ফি নিয়ে থাকেন যিনি, সেই ডাক্তার সমাদ্দার।

—সামান্য জ্বর, তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

ডাক্তার সমাদ্দার ওষুধের প্রেসক্রিপসনটা বড় ক'রেই লিখলেন। খাওয়া সম্বন্ধে নিষেধ করবার কিছুই বুঝলেন না।

—যা রোজই খাচ্ছেন তাই খাবেন। তবে, তার ওপর আরও কয়েকটা জিনিস খেতে হবে।

ভাইটামিনবহুল কতকগুলি মণ্টের নাম ও ধামের একটি তালিকা লিখে দিলেন ডাক্তার সমাদ্দার।

—হালকা হালকা বই পড়বেন আর এই ব্যালকনি আর ঐ লনে নিয়মমত একটু ঘুরে বেড়াবেন, যাতে শরীরেরও একটু হালকা হালকা ব্যায়াম হয়।

এই ঘরটুকু, তার বাইরে এই ব্যালকনি, আর বড় জোর ঐ লন। নবলার চলবার জীবনের সীমাটুকু যেন বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার সমাদ্দার, বনমালীও চলে গেল।

ডাক্তারের গাড়ি চলে গেল, বাইরের একটা গাড়ি এসে থামলো, নন্দা দেবীর গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের করা হচ্ছে, এখানে বিছানার উপর বসেই শুধু শব্দ শুনে শুনে বাইরের ঘটনাগুলিকে উপলব্ধি করতে পারে নবলা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নবলা বুঝতে পারে, টু-সিটারের শব্দ শোনারও সময় হয়ে এল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নবলা। ডাক্তার বলেছেন সামান্য জ্বর, তবে মাথার

মধ্যে থেকে থেকে এমন যন্ত্রণা বোধ হয় কেন? আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে, কয়েক ঘণ্টার জ্বরে চেহারাটাকে একেবারে পুরনো রোগীর মত ক'রে তুলেছে।

চোখে পড়ে, মিনা-করা কাশ্মীরি ফুলদানের উপর লিলির তোড়া দুটোও যেন জ্বরের জ্বালায় শুকিয়ে গিয়েছে।

পাঁচটা যে বাজতে চললো। লিলির তোড়া দুটোর উপর জল ছিটিয়ে দেবার পর নবলা বুঝতে পারে, এইবার তাকেও চোখে মুখে একটু জল ছিটিয়ে নিয়ে, তারপর সেজে নিতে হবে। ডেভির আসবার সময় হলো।

ডেভির কথা ভাবতে গিয়ে এখন একটু রাগ না হয়ে পারে না। কি এমন নতুন অহংকারে মন ভরে উঠলো ডেভির যে, কাল রাত্রে যাবার সময় প্রতিদিনের মত সামান্য একটা হর্নের শব্দ দিয়ে বিদায়ের ইঙ্গিতটুকু জানাতে ভুলে গেল? যে হাত নবলাকে লুফে নেবার জন্য এত দুরন্ত লোভে আকুল হয়ে রয়েছে, সে হাতে আবার এত সংযম কেন?

খানসামা এসে খাবার দিয়ে গেল। সাণ্ডউইচের প্লেট, ফলের প্লেট আর চা।

খাবারের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয় এবং বিরক্তও হয় নবলা। এখানে খাবার দিয়ে গেল কেন ইডিয়ট খানসামা? তবে কি নন্দা দেবী আজ একা একাই চা খাওয়া শেষ করেছেন? তা'ছাড়া, ডেভির জন্য চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করার ভদ্রতাটুকুও কি আজ ভুলে গিয়েছেন নন্দা দেবী?

ইচ্ছা করলেই এখনি নীচে নেমে গিয়ে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে আর বুঝে আসতে পারে নবলা। নন্দা দেবীকে জিজ্ঞাসাও করা যেতে পারে, ব্যাপার কি? আজ এমন বিশ্রী ভাবে সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে কেন? কিন্তু নীচে নামে না নবলা। দরকার নেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। শুধু এই প্রশ্নটা করবার জন্য নীচে নেমে গিয়ে তার সব চক্ষুলজ্জা রাগ আর অহংকারকে নীচে নামিয়ে দিতে পারবে না নবলা। নীচের শব্দহীন তুচ্ছতাকে সেও তুচ্ছ করবে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে।

শুধু চা'টুকু খেয়ে আর সব খাবার সরিয়ে রাখে নবলা। তারপর তাড়াতাড়ি ক'রে একটা শিশির-সাদা মসলিনের শাড়ি পরে, চিরুণী হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

গুছিয়ে পরা হয়নি, শাড়িটা যেন এলোমেলোভাবে নবলার জ্বরের শরীরকে জড়িয়ে ধরেছে। মুখটা শুকনো, চুলে ক্রিম পড়েনি, উসকো-খুসকো হয়ে আছে। শখের তপস্বিনীর মত দেখায় নবলার মূর্তিটাকে। জ্বর হয়েছে। আজ তো আর

টু-সিটার চড়ে ছুটতে হবে না, এর চেয়ে বেশি সেজে আর লাভ নেই। বরং এইরকম একটু হেলা-ফেলা সাজ ক'রে ডেভিকে একটু চিন্তিত ক'রে দিয়ে, এখানে বসেই ডেভির সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগবে নবলার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই শখের তপস্বিনীর মূর্তি আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। তবে কি আজ আর ডেভি আসবে না, ছ'টা যে বেজে গিয়েছে?

কি যেন ভাবতে থাকে নবলা। কিছুক্ষণ। তার পরেই নবলার ছটফটে মূর্তিটা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে যায়। আয়নার সামনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটোও নিষ্পলক হয়। চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখছে, একটা কুজ্‌ঝটিকার আবরণ ভয়ংকর রহস্যের মত হ্যাপি-হুকের উপর থমকে রয়েছে। নবলার স্বপ্নের পৃথিবীকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু এমন ভয়ানক সংশয়ের কি অর্থ হতে পারে? ডেভি এল না, তবে কি ডেভির কাছেই কেউ যাচ্ছে? সন্ত্রস্তের মত ছুটে যায় নবলা। বাইরের ব্যালকনির উপর দাঁড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পায় নবলা, নন্দা দেবী ধীরে ধীরে লনের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন তাঁর গাড়ির দিকে। সবুজ ঘাস ছুঁয়ে দুলতে দুলতে চলেছে নন্দা দেবীর আঁচলের ট্রেল। এমন নিখুঁতভাবে আঁচলের ট্রেল নামাতে এখনও শিখে উঠতে পারে নি নবলা।

সত্যিই টু-সিটার আজ আর এল না। স্টার্ট নিল নন্দা দেবীর গাড়ি, গেটের আলো পার হয়ে মহারাজপুরের হৈমন্তী সন্ধ্যার আলো-আঁধারে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

কতক্ষণ ধ'রে ব্যালকনির উপর দাঁড়িয়ে ছিল নবলা, তার কিছুই ধারণা করতে পারে না! শুধু বুঝতে পারে, সে দাঁড়িয়ে আছে অনড় পাথরের মত। রাতও অনেক হয়েছে ব'লে মনে হয়। গেটের কাছে পপলারের মাথাটা চিক চিক করছে, উপর থেকে আলো পড়ছে। আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকায় নবলা। ছোট এক টুকরো চাঁদ দেখা যায়। হ্যাঁ, চাঁদ ওঠার তারিখগুলি আসতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। তাহ'লে?

তাহ'লে আবার কি? এই হলো ভাগ্য। বোবা বধির নিরেট কঠোর অনড় একটা ঠাট্টা। একটা নীরব হিংসুক হাসি। এরপর থেকে চাঁদ ডুববার তারিখগুলি আসতে আরম্ভ করবে, এই মাত্র। নিজের ঘরে ফিরে এসে শুধু জ্বরের জ্বালাটুকু সঙ্গে নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকবার চেষ্টা করে নবলা, কিন্তু ছটফট করে।

ডাক্তার সমাদ্দার বলে দিয়ে গিয়েছেন, একটু সাবধানে থাকতে। সেরে গেলেও সাবধানেই থাকে নবলা। সারাদিন উপরতলায় নিজের ঘরেই থাকে, মাঝে মাঝে ব্যালকনির উপর এসে এক-আধটুকু ঘোরা ফেরা ক'রে যায়। কিন্তু নীচে নামে না একেবারেই!

শুধু সন্ধ্যা হবার অনেক পরে, নন্দাদেবী বের হয়ে যাবার পর নীচে নামে নবলা। ডাক্তার সমাদ্দারের উপদেশ মত লনের উপর ঘুরে বেড়ায়। বেশিক্ষণ নয়, বড় জোর এক ঘণ্টা। গেটের দিকে কোন শব্দ হ'লেই চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে ঝাউয়ের প্যাগোডার আড়ালে সরে যায়, কিংবা তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে যায় আবার উপতলায় নিজের ঘরে।

অনেকগুলি দিন পার হয়ে গিয়েছে, চাঁদ ওঠার তারিখগুলিও ফুরিয়েছে। এখন সন্ধ্যার আকাশে শুধু ওঠে অন্ধকার।

হ্যাপিহুকের সন্ধ্যাগুলিও বদলে গিয়েছে একেবারে এই ক'দিনের মধ্যেই। নন্দাদেবীর গাড়ি আজকাল সন্ধ্যা হ'লে গ্যারেজের মধ্যেই পড়ে থাকে। ঠিক ছ'টা বাজলে গেটের কাছে দুরন্ত টু-সিটার ক্ষণিকের মত এসে দাঁড়ায়, হর্ণ না বাজলেও তার ফুসফুসের শব্দ শোনা যায়। ড্রইং রুম থেকে বের হন নন্দা দেবী, লনের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চ'লে যান গেটের দিকে। তারপর আর নন্দা দেবীকে দেখা যায় না। শুধু শুনতে পায় নবলা, টু-সিটারের ফুসফুস একবার জোরে শব্দ ক'রে গেট ছেড়ে ছুটে চলে গেল।

আর একবার আসে টু-সিটার, রাত্রিবেলা। গেটের কাছে মুহূর্তের মত থেমে আবার চ'লে যায়। আর দেখা যায়, নন্দা দেবী আসছেন গেটের দিক থেকে। প্রথম এসে ক্লান্তভাবে ড্রইংরুমে কিছুক্ষণ বসেন, তারপর চ'লে যান তাঁর নিজের ঘরটির দিকে।

শুধু সন্ধ্যাগুলি কেন, হ্যাপিহুকের রাতগুলিও তারপর থেকে বদলে যেতে আরম্ভ করে। অনেক রাত্রে টু-সিটার গেটের কাছে ফিরে এসে একেবারে ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে দেবী রায় ভিতরে ঢোকে। ড্রইং রুম পর্যন্ত এসে নন্দা দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার তখুনি চলে যায় দেবী রায়।

ক'দিন থেকে শীতের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। হ্যাপিহুকের রাতগুলি বদলে যেতে আরম্ভ করেছে আরও কালো হ'য়ে। টু-সিটার থেকে নেমে এক সঙ্গে গল্প করতে করতে গেট পার হয়ে ভিতরে ঢোকে দেবী রায় আর নন্দা দেবী। সে গল্পের

শব্দ শুনে হলঘরের টেবিলের উপর একটা আলো যেন হঠাৎ মুখ ঢাকা দেয়। হিসাব লেখা থামিয়ে চকিতে টেবিল-বাতির উপর ঢাকাটা একটু বেশি ক'রে টেনে নামিয়ে দেন মৃগেনবাবু, তাঁর চোখের উপর আলোর ঝাঁজটা যেন আর না লাগে।

কারবারের হিসাবপত্র দেখতে আর লিখতে এমনিতেই রাত হতো মৃগেনবাবুর। অঘ্রাণ মাস থেকে কয়লার কারবারটা একটু জমে উঠতেই, হিসাব লেখার কাজ সারতে আরও রাত হচ্ছে। তার উপর, ক'দিন থেকে একটু বিচলিত হয়েও আছেন মৃগেনবাবু। কারণ নন্দা খুবই দুঃখ ক'রে বলেছে যে, হিসাবপত্র আজকাল বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলে নন্দার সন্দেহ হচ্ছে। এবার থেকে সব হিসাব অডিট করাবে নন্দা। অডিট করবে দেবী। দোষ দেওয়া যায় না নন্দাকে। কি লাভ হচ্ছে, কতখানি ক'রে জমছে প্রতি মাসে, এই সব উন্নতির হিসাবটা নন্দাকে তো স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে। এই উন্নতি আর এই হিসাব, সবই তো নন্দার জন্য। এই কারণে একটু গুছিয়ে হিসাব লিখতে হচ্ছে মৃগেনবাবুকে, রাত হচ্ছে বেশি।

এত রাত্রেও মাঝে মাঝে স্পষ্ট ক'রে শুনতে পান মৃগেনবাবু, ড্রইং রুমের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন বড় জোরে শিউরে উঠছে। হাত তুলে কান ঢাকা দিতে চেষ্টা করেন মৃগেনবাবু। পাশের জানালা দিয়ে কখনও বা লনের দিকে তাকিয়ে থাকেন মৃগেনবাবু। হঠাৎ চোখে পড়ে, দেবী চলে যাচ্ছে গেটের দিকে আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে। সাবধানে, কোন শব্দ না ক'রে, আস্তে আস্তে জানালাটা বন্ধ ক'রে দেন মৃগেনবাবু, শীতের বাতাসটা আজকাল সহ্য হয় না তাঁর।

যখন আরও নিস্তব্ধ হয় হ্যাপিনুক, যখন ড্রইং রুমে আর আলো দেখা যায় না, যখন নন্দা দেবী নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকেন, তখন নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে থাকেন মৃগেনবাবু। খানসামা এসে তাঁর হাতের কাছেই টেবিল টেনে রাতের খাবার দিয়ে চলে যায়—দু-স্লাইস পাঁউরুটি, নিরামিষ সুপ আর এক বাটি সাগুর পায়েস।

ডাক্তার সমাদ্দারের উপদেশ মত সাবধানেই চলছিল নবলা। ছুটাছুটি আর একেবারেই নয়, দিনের বেলায় ব্যালকনি এবং সন্ধ্যার পর লন, এর সীমা ছাড়িয়ে ঘোরা-ফেরা করে না নবলা।

লাইব্রেরি থেকে অনেক হালকা হালকা বই এনে দিয়েছে বনমালী, পড়তে পড়তে রাত হয় নবলার। হঠাৎ বই পড়া থামিয়ে আয়নার সামনে বসে। বেশিক্ষণ বসতে পারে না, উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে বসে থাকে আর একটা চেয়ারে। জ্বর সেরে গেলেও জ্বালাটা যেন সারেনি, তাই ছটফট করতে হয়। উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ায়।

সে রাত্রেও দাঁড়িয়েছিল নবলা, একটু বেশি রাত্রে, জানালার কাছে। দূরে জেলখানার প্রাচীরটার উপর গুমটিতে আলো জ্বলছে দেখা যায়। তার পরেই শুনতে পায় নবলা, পাগলা ঘণ্টি বাজছে জেলখানায়। বোধ হয় কোন কয়েদি পালিয়েছে।

নবলার মনে হয়, সহ্য করতে না পেরে ছটফট ক'রতে ক'রতে পালিয়ে গিয়েছে কয়েদিটা। চুপ ক'রে কিছুক্ষণ যেন ভাবতে থাকে নবলা। তারপরেই ঘর ছেড়ে বের হয়, সিঁড়ি ধরে অন্ধকারের মধ্যেই আস্তে আস্তে নামতে থাকে। জীবনে কখনও এভাবে আলোহীন সিঁড়ি দিয়ে একা একা নামেনি নবলা। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, এইভাবে নিঃশব্দে একা একা নেমে গিয়ে হ্যাপিহুকের অন্ধকারকে তুচ্ছ ক'রে আর ধিক্কার দিয়ে চিরকালের মত পালিয়ে যাবার দুঃসাহস যেন হঠাৎ পেয়ে গিয়েছে নবলা।

নীচে নেমে গিয়ে ঘুমন্ত হ্যাপিহুকের লনের উপর একবার দাঁড়ায় নবলা। আর একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে, হলঘরে একটি টেবিলের উপর আলো জ্বলছে, আর কলম হাতে নিয়ে মাথা উপুড় ক'রে হিসাব লিখছেন মৃগেনবাবু। কিসের হিসাব? বোধ হয়, কয়লা কিংবা সিমেন্টের লাভ খতিয়ে দেখছেন।

হ্যাঁ, লাভ বৈকি। হ্যাপিহুকের সৌভাগ্যকে অবিশ্বাস করে না নবলা। কোন লোকসান হয়নি হ্যাপিহুকের। এখানে আসার পর থেকেই, যে কারবারে হাত দিচ্ছেন মৃগেনবাবু তাতেই লাভ আসছে। একটার পর একটা নতুন কারবারে হাত দিচ্ছেন, থামছেন না মৃগেনবাবু। এখন ঐ ফটক বন্ধ, কাল দিনের আলোতে দেখা যাবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় কত গাড়ি এসে ঢুকছে ঐ ফটক ভেদ করে। আসবেন কত শেয়ারের দালাল, কত কোম্পানির এজেণ্ট আর ডিরেক্টর। কত খাতির করবেন তাঁরা এই মৃগেনবাবুকে। ঐশ্বর্যের হিসাব আর জল্পনায় জমে উঠবে হলঘরের আসর।

সরে গিয়ে আর একটু অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়ায় নবলা। মনে হয়, সে নিজেই যেন আজ একটা দেহহীন ছায়া হ'য়ে গিয়েছে, গত জন্মের একটা অপূর্ণ তৃষ্ণার জ্বালা নিয়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে এখানে। হয়তো তার বাবা আর মাকে খুঁজছে নবলা। কিন্তু এই বিরাট হ্যাপিহুকের মধ্যে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। মৃগেনবাবু এখানেই আছেন, কিন্তু নন্দা দেবীর স্বামী কই? নন্দা দেবী আছেন, কিন্তু মৃগেনবাবুর স্ত্রী কোথায়? নবলা আছে, কিন্তু মৃগেনবাবু আর নন্দা দেবীর মেয়ে কোথায়? কেউ নেই, সুন্দর এক একটা খোলস রেখে দিয়ে প্রাণগুলি যেন পালিয়ে গিয়েছে! এই সব-হারানো হ্যাপিহুকের দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে

থেকে আর লাভ কি? এত সহ্য করা আর ছটফট করার কি দরকার? জীবনের পাগলা-ঘন্টি ভাল ক'রেই বেজে উঠুক, হ্যাপিহুকের এই বঞ্চনার কারাগার থেকে এই মুহূর্তে না পালিয়ে গেলে বাঁচতে পারবে না নবলা।

গেটের দিকে তাকায় নবলা, কিন্তু, উঃ, পপলারের কাছে কি-ভয়ানক অন্ধকার! একটা দুঃস্বপ্ন যেন সেখানে কালো কালো থাবা তুলে প্রতীক্ষায় রয়েছে। না, সাহস হয় না, বড় ভয় করে, এমন ক'রে হারিয়ে যেতে পারবে না চিরকালের সুখস্বপ্নের মেয়ে নবলা। কোথায় পালিয়ে যাবে এই হ্যাপি হুক ছেড়ে? ভয়ে বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটাই শিউরে ওঠে কয়েকবার। চূর্ণ হয়ে যায় শখের পলাতকার দুঃসাহস।

যেন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পায় নবলা। ছুটে চলে আসে আবার সিঁড়ির দিকে। উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকেই সুইচ টিপে আলো জ্বালে।

হ্যাপিহুকের উজ্জ্বল নীড়ের আলো লেগে ভয় ভেঙে যায় নবলার। কিন্তু বুঝতে পারে নবলা, তবু সেই জ্বালাটা আছে। এই জ্বালাময় অস্থিরতা চিরকালের মত থামিয়ে দেওয়া যায় কি ক'রে?

যেন জোর ক'রে নিজেকে শান্ত করার জন্যই কৌচের উপর বসে নবলা। কিন্তু সহ্য হয় না। হিরা-বসানো হেয়ার পিন দেরাজের ভিতরে থাকলেও যেন কাঁটার মত বুকের ভিতর বিঁধছে। রঙীন স্বপ্নের পানকৌড়ি ছটফট করছে, গুলিটা লেগেছে ঠিক গলার উপর, রক্ত ছিটিয়ে পড়ছে সাদা শালুকের গায়ে। ঝালর-লাগানো বিলাতি ব্রোকেডে ঢাকা কৌচের কাঁধে চোখ চেপে বসে থাকে নবলা—ক্লান্ত অবসন্ন ও নিশ্চল। ছুটে চলতে চলতে এতদিন পরে যেন হঠাৎ খুব জোরে একটা হোঁচট খেয়ে আর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে নবলা। থেমে যেতে হয়েছে।

টু-সিটারে নতুন ক'রে স্পিডের নেশা লেগেছে। নতুন ক'রে মত্ততার আবেগ এসেছে দেবী রায়ের জীবনে, কারণ সে-জীবনের লক্ষ্যান্তরও ঘটেছে। যাকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে চলেছিল দেবী রায়, সে এখন পিছনের একটা ছোট ঘটনা মাত্র। আশা ছাপিয়ে আশাতিরিক্ত এসে গিয়েছে তার কাছে। নতুন ক'রে আলো পড়েছে তার পৃথিবীতে। এবার আর রুপালি চাঁদের ফিকে আলো নয়, সোনার চাঁদের আগুনে আলো! চাঁদের ফালিও নয়, একেবারে স্বয়ং পূর্ণ চাঁদ, দুঃসহ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে দিশেহারা হয়ে ড্রাগনের তৃষ্ণা নিয়ে ঝুপ ক'রে এসে পড়েছে দেবী রায়ের শেরির গেলাসে। দেবী রায়ের আশার স্বপ্নটাও ছড়িয়ে গিয়েছে কত বড় হয়ে। সে স্বপ্নে

ভেসে আসছে শেয়ারের অবাধ বন্যা, আসছে টু-সিটারের জন্য পেট্রলের অফুরান প্লাবন, আসছে হ্যাপিহুকের মত বাড়ির স্বত্ব। আসছে শত শত প্রাপ্তির মিছিল, তার মধ্যে জোন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ টাকায় থলি নিয়ে।

দুর্বল নয় দেবী রায়। না তার মন, না তার হাত। লোলুপ মনের বাঁধন দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারে তার কাম্যকে নাগপাশের মত। আর, আঁকড়ে ধরতে পারে তার লক্ষ্যকে, কঠিন কশাইয়ের বাহু অকুণ্ঠভাবে এগিয়ে দিয়ে। তার অভিযানের পথে সব বাধাকে সে অক্লেশে তুচ্ছ ক'রতে পারে, একটুও বুক কাঁপে না। বাধাটা যদি দুর্বল হয়, তবে তুলে নিয়ে একটা বিলাতি ব্রোকেডে ঢাকা কৌচের উপর ছুঁড়ে ফেলে নিশ্চল ক'রে দিতে এক মুহূর্তও লাগে না দেবী রায়ের। আর, বাধাটা যদি শক্ত হয়, তবে তাকে চূর্ণ করার জন্য যে-কোন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়াতেও সে বেশি দেরি করে না।

বেশি দেরি করেওনি দেবী রায়। কুশল জোন্সকে তাড়িয়ে দিয়েছে, খবরটা জানা মাত্র সেইদিনই এবং সেই মুহূর্ত থেকে প্রস্তুত হয়েছে দেবী রায়।

তাই আজ সকালে সার্ভে আফিসে একটা থমথমে ভাব দেখা যায়। প্রতিদিনের মত সকাল বেলায় টু-সিটার নিয়ে বের হয়ে যায়নি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায়। সার্ভেয়ার ও কুলির দল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ফটকের কাছে, নির্দেশের প্রতীক্ষায়, অনেকক্ষণ ধরে।

তেজস্বী অফিসারের মত আজ শক্ত হয়ে বসেছে দেবী রায় অফিস ঘরের বড় চেয়ারে, বড় টেবিলের সামনে। হাতের কাছে কাগজ কলম রেখেছে। একটা হেস্ত নেস্ত না ক'রে আজ আর উঠবে না সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায়।

কেরানিবাবুও যেন আজ গ্রহযোগ বিচার ক'রে বেশ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন দেবী রায়ের সম্মুখে, তাঁর দেহের আজ্ঞাবহ শীর্ণতাকে সানন্দে উৎসর্গ করার জন্য, ভুতুড়ে হিংসায় আকুল হয়ে।

দেবী রায় দাঁতে দাঁত চেপে আশ্চর্য হয়ে বলে—কি বলছেন কেরানিবাবু? লোকটা আমার নামে চুগলি ক'রে সোসাইটির কাছে আর গভর্ণমেণ্টের কাছে একটা নতুন লিস্টও পাঠিয়ে দিয়েছে?

কেরানিবাবু—হ্যাঁ স্যার।

দেবী রায়—কেমন ক'রে বুঝলেন?

কেরানিবাবু—প্রমাণ এই দেখুন না স্যার, রেজিস্টারি ডাকের রসিদ ওরই লেখার ফাইলের ভেতর থেকে বের করেছি।

দেবী রায় একটু চিন্তিতভাবে বলে—চুগলি যখন করেই ফেলেছে, তখন কেউ এক জন নিশ্চয় আসবেন ইনস্পেকশন করতে।

কেরানিবাবু—তার জন্য চিন্তিত হবার কি আছে স্যার?

দেবী রায়—তদন্ত করতে যদি একটা মাইডিয়ার গোছের চালাক অফিসার আসে তবে চিন্তার কিছু নেই, কিছু হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর ষ্টেশন ক্লাবে নিয়ে গিয়ে এক চুমুক টানিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। কিন্তু, ধরুন যদি মরালিটি-ওয়ালা একটা বেহদ্দ বেকুব লোক আসে, তবে?

কেরানিবাবু—আসুক না, আসতেও তো ক'টা দিন লাগবে, এরই মধ্যে জোজকে ডেকে মিউজিয়ামের রাবিশগুলো সরিয়ে দিলেই তো হয়।

দেবী রায়—কি ক'রে সরাবেন, যতদিন ও লোকটা রয়েছে ততদিন কি ক'রে যে কি হতে পারে, বুঝে উঠতে পারছি না কেরানিবাবু।

কেরানি বাবু—ও লোকটাকেই সরিয়ে দিন না স্যার।

দেবী রায়—কি ক'রে? ও'কেও যে সোসাইটি অ্যাপয়েণ্ট করেছে। আমি ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারি না।

কেরানী বাবু—সসপেণ্ড করুন!

দেবী রায়—তারও একটা যুক্তি থাকা চাই তো?

কেরানি বাবু—সে যুক্তি আমি তৈরি ক'রেই রেখেছি, একেবারে হাতে কলমে স্যার।

একটা হাজিরা রেজিস্টার টেবিলের উপর তুলে দেবী রায়ের সামনে খুলে ধ'রে কেরানিবাবু বলেন—এই দেখুন, গত পঁচিশ দিন ধ'রে কি ভয়ানকভাবে অফিসের কাজে ফাঁকি দিচ্ছে লোকটা। সকালের ডিউটি তো করছেই না, আর রোজ বিকেল না হতেই কেটে পড়ছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায়ের চোখ দুটো উৎসাহে জ্বলে ওঠে। হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা অস্ত্র হাতে পাওয়া গিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক সাব-অর্ডিনেটকে চূর্ণ করবার মত।

—ঠিক বলেছেন কেরানিবাবু। হাতের কাছে কাগজ টেনে নিয়ে সসপেণ্ড অর্ডার লিখতে থাকে দেবী রায়। লিখতে লিখতে একবার কলম থামিয়ে কেরানিবাবুর দিকে তাকায়। তারপরেই পকেট থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বের ক'রে কেরানি বাবুর হাতে তুলে দেয় দেবী রায়—শীত আসছে, একটা ভাল দেখে আলোয়ান কিনবেন।

লিখতে লিখতেই আর একবার জিজ্ঞেসা করে দেবী রায়—আর ঐ পাগলা

দারোয়ানটাকেও তো না সরালে হয় না কেরানিবাবু, ওটাকেও বিশ্বাসঘাতক ব'লে আমার সন্দেহ হয়।

কেরানিবাবু—ও তো অফিসের একটা মিনিয়াল স্তার, সোসাইটি ওকে অ্যাপয়েণ্ট করেনি। আপনিই ওটাকে শুধু মুখের কথায় বরাবরের মত খেদিয়ে দিয়ে নতুন দারোয়ান রাখতে পারেন।

দেবী রায়ের লেখা শেষ হয়। কলম থামিয়ে আর আঙুল বাঁকিয়ে দেবী রায় বলে—বাস, এদিকটা একরকম হলো। এখন রইল শুধু মিউজিয়ামের রাবিশগুলো সরানো। আমি বলছিলাম…।

কেরানিবাবু—বলুন স্তার।

দেবী রায়—জোন্সকে ব'লে দেব আজ কাল বা পরশুর মধ্যে আসতে। দিনের বেলায় না এসে বেশ একটু রাত ক'রে কিংবা শেষ রাতে ট্রাক আনতে বলে দেব। ঐ চুগলিখোর হু'টোর ভয়ে বলছি না। এসব ব্যাপারে বাইরের কোন চাক্ষুষ সাক্ষী টাক্ষী না থাকাই ভাল।

কেরানিবাবু—তাই বলে দেবেন। যত রাতেই আসুক জোন্স, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমি তো রাত্রে একেবারে ঘুমোই না স্তার।

দেবী রায় প্রস্তুত হয়ে নিয়ে বলে—বাস, তা'হলে এদিকটাও হয়ে গেল।…… লোকটা এখন এসেছে ?

কেরানিবাবু হেসে হেসে বলেন—হ্যাঁ, আজ একটু সময়মত এসেছে স্তার।

দেবী রায়—কোথায় আছে ?

কেরানিবাবু—মিউজিয়াম ঘরে।

দেবী রায়—ডাকুন ওটাকে. আর দারোয়ানটাকেও ডাকুন।

কেরানিবাবুর ছুটোছুটি এবং হাঁকডাকে সার্ভেয়ার ও কুলির জনতাও চিন্তিত হয়ে পড়লো।—ইধার আও দারোয়ান! কোথায় আছেন মশাই ঘুপটি মেরে? সাহেব ডাকছেন আসুন! তাঁর ভুতুড়ে হিংসার সফলতাকে যেন বিশ্বের গোচরে আনবার জন্য আনন্দে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি আর হাঁক ডাক করতে থাকেন কেরানিবাবু।

মিউজিয়াম ঘর থেকে বের হয়ে এল কুশল, আর তুলসী পিণ্ডার কাছ থেকে পাঠকজী। ফটকের জনতা দুশ্চিন্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অফিস ঘরের দিকে তাকিয়ে, দুটি চাকরির প্রাণীকে যেন একটা বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অফিস ঘরে ঢুকে আর বের হয়ে আসতে মাত্র দু'টি মিনিট সময় লাগলো কুশল ও পাঠকজীর।

কিছুক্ষণ সত্যিই অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে রইল কুশল। মনের রাগ চেপে রাখতে কষ্টও হচ্ছিল। ইচ্ছা করে কুশলের, ছুটে গিয়ে একবার মিউজিয়ম ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে আসে, কল্লোলিতকান্তি গঙ্গার চোখে সেই হাসিটা আছে না ফুরিয়ে গিয়েছে এতক্ষণে?

পাঠকজীও একবার তার ঘরের ভিতর গেলেন আর বের হয়ে এলেন। শালপাতার ঠোঙায় যেটুকু চাল ছিল, তুলসীর চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন পাখিদের জন্য। কাঁধের উপর কম্বল ও লোটা ঝুলিয়ে এবং হাতে রামায়ণ নিয়ে এগিয়ে এসে ফটকের কাছে দাঁড়ালেন।—আসুন কুশলবাবু। চেঁচিয়ে ডাক দিলেন পাঠকজী।

কোদাল কাঁধে এক'শো কুলি আর পাঁচজন সার্ভেয়ার একটু সন্ত্রস্তভাবেই দেখতে থাকে দৃশ্য। চলে যাচ্ছেন সুপারভাইজর কুশলবাবু আর দারোয়ান পাঠকজী।

ফটক পার হবার আগে অনেকদিন পরে নতুন ক'রে একবার পাগলামি ক'রে ফেললেন পাঠকজী। অফিসের দিকে দু'হাত তুলে চিৎকার ক'রে বলেন—কেউ আপনার চাকরি নিতে পারবে না কুশলবাবু, আবার আসতে হবে আপনাকে।

সার্ভে অফিসের ফটক, এইখানেই অফিসের এলাকা শেষ। ফটক পার হলেই লাল সুড়কির সড়ক। আর দু'পাশে মেঠো জমি। কিছু দূরে সড়কের পাশে একটা ছাতিম গাছ। পাঠকজী একবার চোখ তুলে গাছটার দিকে তাকালেন।

লোটা কম্বল আর রামায়ণ হাতে নিয়ে হন হন করে হেঁটে ফটক পার হয়ে এসে ছাতিম গাছের তলায় দাঁড়ালেন পাঠকজী। আর একবার চিৎকার ক'রে উঠলেন—এখান থেকে আমাকে সরাবে কে, কার সাধ্যি আছে, রামজী ছাড়া?

কুলির দল ও সার্ভেয়ারেরা এইবার হেসে ফেলে। হাসি থামবার আগেই কুশলও ফটক পার হয়ে পাঠকজীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পিছনে একটা শব্দ হয়—ঝনন্। কেরানিবাবু ফটক বন্ধ ক'রে দিলেন।

পাঠকজীর অস্থিরতা এরই মধ্যে শান্ত হয়ে যায়। ছাতিম গাছের তলায় একটা নিশ্চিন্ত ও নির্বিকার ভাব নিয়ে বসে থাকেন। কুশল সামনে এসে দাঁড়াতেই হেসে ফেলেন পাঠকজী।

একটু বিষণ্ণ হয়েছিল কুশল এবং বিব্রত বোধ না করেও পারছিল না। চাকরিটা বোধ হয় আর টিঁকবে না। পঁচাশি টাকা মাইনের ঐ চাকরিটাই যে তার জীবনে এনে দিয়েছে ব্রত, এনেছে সন্ধান, এনেছে গঙ্গাধরকে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা। সুন্দরের পূজা জাগিয়ে দিয়েছে তার জীবনে, ব্রজের অতিরূপা গঙ্গা।

কিন্তু এই বিব্রত হওয়ার চেয়েও বেশি কষ্ট দিয়ে আর একটা চিন্তা অস্বস্তি দিচ্ছিল

কুশলকে। মূর্তিগুলিকে চুরি থেকে রক্ষা করবার চিন্তা। এইখানে পথের উপর নিদ্রাহীন চক্ষু নিয়ে রাত্রিদিন সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রস্তুত আছে কুশল। দেবী রায়ের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে, জোন্সের ট্রাক আটক ক'রে ধরে রাখতে আজ হাতের জোরের আর প্রাণের জোরের পরীক্ষা দিতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু তার দিনরাত্রির শ্রম ও সতর্কতা যে এখন বাঁধা পড়েছে শিলোড়া ঘাটের সদাব্রতে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে একবার পৌঁছে যাবার কথা ছিল। সন্ধ্যাটা আর রাত্রিটা তো সেখানে থাকতেই হবে। কতদিন যে এভাবে চলবে তা সে জানে না। এরই মধ্যে এক ফাঁকে জোন্সের ট্রাক এসে লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে মিউজিয়ামের মূর্তিগুলি। ঠিক সুযোগ বুঝেই অস্ত্র তুলেছে দেবী রায়। পাঠকজীকেও সরিয়ে দিয়ে একেবারে নির্বাধ ক'রে নিয়েছে তার চক্রান্তের ফটক।

সরকারী ডাক্তার যাবে শিলোড়া ঘাটে, দুঃস্থদের টিকা দিতে। আজই সকালে যাবার কথা আছে এবং হয়তো এতক্ষণে পৌঁছেও গিয়েছে। কল্পনা করতেই অস্থির হয়ে ওঠে কুশল, এতক্ষণে বোধহয় সেই ক্ষুধার্ত আরণ্য মানুষগুলি আধুনিক মহারাজপুরের ছুঁচের খোঁচার ভয়ে শিলোড়া ঘাট শূন্য ক'রে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, আবার কোন দিকে কে জানে! কুশল সামনে না থাকলে ডাক্তারের ছুঁচকে ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। এখনও সময় আছে, আমলকির জঙ্গলে সরু পথের চড়াই ধ'রে পৌঁছতে পারা যায় শিলোড়া ঘাটে, এক ঘণ্টার মধ্যেই।

কুশল বিচলিতভাবে বলে—আমাকে যে এখুনি যেতে হবে পাঠকজী, শিলোড়া ঘাটে।

পাঠকজী—এখুনি চলে যান।

কুশল—কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে যে পারছি না।

পাঠকজী—কিসের জন্য?

কুশল—জোন্স এসে যদি…।

পাঠকজী—তার জন্য একটুকুও ভাববেন না। কেউ কিছু করতে পারবে না। সংসারে ভূত জেগে আছে, না রামজী জেগে আছেন, একদিন তা প্রমাণ হয়ে যায় কুশলবাবু। যান…যতদিন ইচ্ছা ভুখাদের সেবা করুন গিয়ে।

শীতের রোদে ঝলমল করছিল আমলকির জঙ্গল। পাঠকজীর কথার প্রেরণায় ঝলমল ক'রে ওঠে কুশলের মন। আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে রওনা হয়ে যায়।

তখন ফুরিয়ে আসছে শীতের বিকাল। বাইরের দাওয়ায় পড়ন্ত রোদের আলো

গায়ে মেখে বসেছিলেন রাধেশবাবু। অম্বিকা মন্দিরে যাবার সময় হয়েছে, ঘরের ভিতর এসে ঢুকলেন লাঠি আর চাদর নিতে, এবং স্বরূপাকে একবার জানিয়ে যেতে, রোজই যেমন জানিয়ে যান।

বিছানার উপর একটা সুজনি গায়ে জড়িয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল স্বরূপা। এই তো কিছুক্ষণ আগে ঘরের ভিতর ঘুরে ফিরে কথা বলছিল স্বরূপা, শান্তির সঙ্গে। মুড়কির ধামা আর মুড়ির বস্তা নিয়ে শান্তি চলে গিয়েছে, কতক্ষণই বা হলো? এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে স্বরূপা।

রাধেশবাবু কাছে এগিয়ে গিয়ে স্বরূপার কপালে হাত দিলেন। না জর নয়! এমনি, শরীরের ক্লান্তির জন্যই ঘুমিয়ে পড়েছে। খাটুনি আর ক্লান্তি ছাড়া কি-ই বা আর আছে ওর জীবনে? চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে রাধেশবাবুর।

স্বরূপার ঘুম ভাঙালেন না রাধেশবাবুর। বরং আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। গুনগুন ক'রে গাইতে থাকেন একটা ভজন, অম্বিকা মন্দিরে আরতির সময় কন্যা পাঠশালার মেয়েরা এসে যে সুন্দর ভজনটা প্রায়ই গেয়ে যায়।

মাঝে মাঝে বিছানার কাছে এসে একবার স্বরূপার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। আবার ঘুরে ফিরে গুন-গুন করেন। যেন অনেক দিন পরে মা-মরা মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছেন রাধেশবাবু এবং ঘুমপাড়ানি গানের আদরেই যেন আরও অঘোরে ঘুমোতে থাকে স্বরূপা।

রাধেশবাবু তাঁর লাঠি আর চাদর হাতে নিয়েও যেতে পারেন না, স্বরূপার ঘুম ভাঙ্গাতেও ইচ্ছা করেন না। আবার বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসে থাকেন, স্বরূপার ঘুম ভাঙলে তবে বের হবেন।

হঠাৎ ব্যস্তভাবে শান্তি এসে দাওয়ার উপর উঠতেই রাধেশবাবু বলেন—আমি মন্দিরে চললুম শান্তি। তুই ভেতরে থাক।

চলে গেলেন রাধেশবাবু।

ঘরের ভিতর ঢুকেই শান্তি চেঁচিয়ে ডাকে—ও স্বরূপদি।

স্বরূপা ধড়ফড় ক'রে উঠে বসতেই শান্তি অনুযোগের সুরে বলে—এ কি? এমন অসময়ে ঘুমোচ্ছ কেন?

স্বরূপা—তুমি এমন অসময়ে এসে ঘুম ভাঙাচ্ছো কেন?

শান্তি হাসে—আমার আবার অসময় কি? ধামার মুড়ি ফুরিয়ে গেলেই আমার সময়।

স্বরূপা—এই তো ধামা নিয়ে বের হলে, এরই মধ্যে ফিরে এলে যে?

শান্তি—বললাম যে, সব ফুরিয়ে গেল। ফিরে না এসে করবো কি?

স্বরূপা—সব বিক্রি হয়ে গেল?

শান্তি আবার হাসে—বললাম যে, সব ফুরিয়ে গেল।

স্বরূপা—তার মানে?

শান্তি—ফুরিয়ে দিলাম, ধামা আর বস্তা সুদ্ধ।

স্বরূপা—কোথায়?

শান্তি কোন উত্তর না দিয়ে মেজের উপর পা দু'টো টান ক'রে বসে। —হাত পা না ধুয়েই এখানে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি স্বরূপদি, কিছু মনে করো না।

যেন ক্লান্ত দেহের বিশ্রামের সুখে দু'চোখ বন্ধ করে শান্তি। তারপর বলে—আজ তোমাকে একটা গল্পও বলতে পারি আর খবরও দিতে পারি স্বরূপদি।

স্বরূপা—গল্প আবার কিসের?

শান্তি—গল্পটা হলো, তোমার মুড়ি দিয়ে এলাম দাদাবাবুর হাতে।

স্বরূপার মুখটা বেদনার্ত হয়—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো শান্তিদি?

শান্তি গম্ভীর হয়—ঠাট্টা নয় স্বরূপদি, সত্যি। দাদাবাবুকে আজ দেখলাম, আর দাদাবাবুর কথাও শুনলাম। তাই ছুটে এলাম তোমাকে খবর দিতে।

স্বরূপা—কি দেখলে?

শান্তি—দেখলাম দাদাবাবুকে গঞ্জের রাস্তায়, একটা গরুর গাড়ির উপর চালের বস্তা তুলছেন। বড় রোগা হয়ে গিয়েছেন মনে হলো। শুনলাম···।

যেন চোখের তারা দুটো দিয়ে শান্তির দুর্বোধ্য কথাগুলি শুনতে থাকে স্বরূপা। একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের মধ্যে মনটাকে হারিয়ে ফেলে অসহায়ের মত প্রশ্ন করে স্বরূপা—কি শুনলে?

শান্তি—অনেক জংলি মানুষ এসে জমা হয়েছে শিলোড়া ঘাটে। খেতে না পেয়ে আর রোগে মরতে বসেছে মানুষগুলো। তাদেরই জন্য দাদাবাবু একটা সদাব্রত করেছেন।

স্বরূপা—কোথায়?

শান্তি—ঐ ওখানেই, শিলোড়া ঘাটে। সেই জন্যেই গঞ্জে ঘুরে ঘুরে দান নিচ্ছেন দাদাবাবু, চাল ডাল ছাতু, যে যা দিচ্ছে। নিজের হাতেই সব করছেন, আমিও তো সব নিজের চোখে দেখে এলাম, আর নিজের কানে পাঁচজনের কাছ থেকে শুনে এলাম।

বিস্ময়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েও স্বরূপার চেতনা যেন এতক্ষণে একটা ঠাঁই পেয়ে

সুস্থির হবার চেষ্টা করে। বুঝতে চাইছে স্বরূপা, সত্যিই কি গঞ্জের ধুলো পায়ে মেখে তার সামনে বসে শান্তিই কথা বলছে? না, একটা বাচাল স্বপ্ন ঘুমের মধ্যে তার মনের সাধগুলিকে অসহায় পেয়ে ছলনা ক'রে নিচ্ছে?

শান্তি বলে—অনেকেই দিচ্ছে, তাই দেখে আমিও দিয়ে দিলুম গাড়ির উপর চাপিয়ে, মুড়ির ধামা আর বস্তা।

স্বরূপা—তোমাকে দেখতে পেয়েছে?

শান্তি—হ্যাঁ।

স্বরূপা—চিনতে পেরেছে?

শান্তি হেসে ফেলে—আমার মত একটা মানুষকে চিনতে পেরেছে দাদাবাবু, এটা কি ক'রে আমি বুঝবো বল তো স্বরূপদি?

স্বরূপা যেন নিজের মনেই বলে ওঠে—আজই ঠিক চিনতে পেরেছে, আগে দেখলে হয়তো চিনতে পারতো না।

শান্তি উঠে দাঁড়ায়—আমি চলি স্বরূপদি। খবর চাইছিলে, খবর দিয়ে গেলাম। আজ পর্যন্ত যত খবরই দিলাম, কিছুই তোমার ভাল লাগেনি। আজও বুঝতে পারলাম না, খবরটা তোমার খারাপ লাগলো কি ভাল লাগলো।

স্বরূপা—তোমার কিরকম লাগলো বল তো শান্তিদি?

শান্তি—দুঃখীর সেবা করছেন দাদাবাবু, দেখে শুনে আমার মনটা তো হরি হরি করে উঠলো স্বরূপদি। শুনে কার না ভাল লাগবে বল? গোঁসাই বলেছেন, দীনে সেবা করে চরণে যে ধরে, কহেন শ্রীহরি সে হয় আমারি।

মনের ভিতর হঠাৎ যেন একটা দুঃস্বপ্নের রাত্রি ভোর হয়ে গিয়েছে, আলো জেগেছে, আর তারই সঙ্গে জেগে উঠেছে হাজার পাখির কাকলি। মনের এই কলরোল চেপে রাখতে চেষ্টা ক'রে স্বরূপা বলে—এর চেয়ে ভাল খবর আর হয় না শান্তিদি। আমার সব ভাবনা দূর হয়ে গেল।

শান্তি—সত্যি বলছো?

স্বরূপা—হ্যাঁ শান্তিদি।

শান্তি—আর ভাবনা করবে না?

স্বরূপা—না।

শান্তি—আমিও ভাবনা থেকে বাঁচলুম স্বরূপদি, তুমি আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছিলে।

শান্তি চলে যায়। নেড়া-মাথা তিলক-কাটা মুড়িওয়ালি শান্তি।

আর তো নিজেকে একলা মনে হয় না। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এই সন্ধ্যার আশীর্বাদের মত একটা প্রাণ-ভরা নিঃশ্বাস বুকের ভিতর বরণ করতে পারে স্বরূপা। কোথায় শূন্যতা? সকল-পাওয়া আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। পূর্ণ হয়েছে তার জীবনের নিবেদন। স্নান ক'রে এসে আলো জ্বালে স্বরূপা।

আজকের মনের চঞ্চলতাকে চাপা দিয়ে রাখবার শক্তি নেই স্বরূপার, ইচ্ছাও হয় না। ইচ্ছা করে, এখনি ছুটে গিয়ে তাকে একবার দেখে আসতে, কেমন ক'রে এত রোগা হয়ে গেল আর এত মহৎ হয়ে গেল সে? আজ বিশ্বাস করে স্বরূপা, উপলব্ধি করতে পারে, সত্যিই তো. কুশলের ভালবাসার পৃথিবীতেই আজ সে দাঁড়িয়ে আছে। এই তো সেই পৃথিবী, যেখানে আজ পথে পথে মানুষকে ভালোবেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুশল।

রেখা বৌদি চলে যাবার পর থেকে এরমধ্যে স্বরূপার প্রতিদিনের জীবনে কোনদিন একটু ভাল ক'রে সেজে আর একটু সুন্দর হয়ে উঠবার কোন কথা ওঠেনি। বলবারও কেউ ছিল না। আজও বলবার কেউ নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, আজ নিজের থেকেই সাড়া দিয়ে তার জীবনে যেন এসে গিয়েছে, একটু সুন্দর ক'রে সাজবার ইচ্ছা, বাসরঘরে যাবার মন, বরণ মালা গাঁথার হাত। জীবনে এই প্রথম।

একলা ঘরের এই সন্ধ্যায় আজ নির্লজ্জ হয়ে উঠতে ইচ্ছা করে স্বরূপার। ঠাট্টা করার কেউ নেই, তাই লজ্জা করে না আয়নার কাছে মুখ তুলে দাঁড়াতে, রঙীন শাড়ি পরতে, আর উঠোনের দোপাটি খোঁপায় গুঁজতে।

ফুরোতে চায় না ইচ্ছা। ইচ্ছা হয়, জানালায় প্রদীপ রেখে, এই রক্তকরবীর গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পথের দিকে তাকিয়ে। আজ এস তুমি, দস্যু হয়েই এস। আজ তোমাকে ফিরিয়ে দেব না। পূর্ণ ক'রে মিটিয়ে নিও তোমার সব তৃষ্ণা আর অধিকার। কোন বাধা দেব না। আজ তুমি এস একবার, তোমাকে প্রণাম করি।

ঘরের ভিতরেই প্রদীপের দিকে দুই চোখের সুস্মিত দৃষ্টি তুলে নিঃশব্দে যেন অভ্যর্থনার একটি সুন্দর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে জানে না, রাধেশবাবু তখনও মন্দির থেকে ফেরেননি।

বাইরের দাওয়ার উপর এসে উঠলো শান্তি, সঙ্গে বৈজু কামার।

বৈজু কামার একটা চিঠি দেয় স্বরূপাকে। চমকে উঠে চিঠিটা হাতে নেয় স্বরূপা। তারপর পড়তে পড়তে মনটা যেন আবার বিস্ময়ে হারিয়ে যায়।

চিঠি দিয়েছেন মিত্রামাসী—আজ তোমায় আমি ডাকছি স্বরূপা। এস, একটুও দেরি করো না।

ভাবতে চেষ্টা করে স্বরূপা। চিঠিটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। শান্তি প্রশ্ন করে—কিসের চিঠি স্বরূপদি ?

স্বরূপা—মাসিমা ডাকছেন, এখুনি।

শান্তি উৎসাহিতভাবে বলে—যাও তাহ'লে।

স্বরূপা—বাবা এখনও ফেরেননি শান্তিদি।

শান্তি—আমি তো আছি, তুমি যাও।

ফুলবাড়ির সড়কের মোড় থেকে তাড়াতাড়ি হেঁটে তিনটে ল্যাম্পপোষ্ট পার হ'য়ে আনন্দ-সদনে পৌছতে সময় লাগলো না বেশি। এক বছরেরও বেশি হবে, এই বাড়ির দুয়ার থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পর এই বাড়িতে আজ এই প্রথম ঢুকলো স্বরূপা।

হলঘরের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন মিত্রা দেবী। একটি অল্প বয়সের ছেলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দারই উপর।

স্বরূপা বারান্দার উপর উঠতেই মিত্রা দেবী হাত ধরলেন।—এস।

স্বরূপাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন মিত্রা দেবী, হলঘর পার হয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ভিতরের বারান্দায়।

আলো জ্বলছিল বারান্দায়, ধূপের ধোঁয়াও ছিল, কিন্তু তবুও যেন সমস্ত জায়গাটাই শূন্য হয়ে আছে মনে হয়। নিষ্পলক চোখে বারান্দার শেষ প্রান্তের শূন্য বেতের-চেয়ারটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্বরূপা। তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকে।

সেই আনন্দসদন রয়েছে, আলো আছে ধূপও আছে, শুধু বিজয় মেসোমশাই নেই! কিন্তু দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে বেশিক্ষণ কাঁদবার সুযোগ পেল না স্বরূপা, মিত্রা দেবীই আবার হাত ধরে বলেন—সময় বেশি নেই স্বরূপা, এস।

চমকে ওঠে, বুঝতে পারে না স্বরূপা। এত ব্যস্তভাবে কোথায় তাকে নিয়ে যেতে চাইছেন মিত্রামাসি? বিস্মিত হয়ে এবং জিজ্ঞাসুভাবে মিত্রামাসির দিকে তাকায় স্বরূপা।

মিত্রা দেবী বলেন—তুমি সে দিন ঠিকই বলেছিলে স্বরূপা, তোমার কথাই সত্যি হলো।

কিছুক্ষণ চুপ করেন মিত্রাদেবী; স্বরূপার চোখের কৌতূহল আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

মিত্রা দেবী—সত্যিই কুশল একা পড়ে আছে স্বরূপা, ওর জন্যে ভাবনা করবার মানুষ তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

কি যেন বোঝাতে চাইছেন মিত্রামাসি। দ্বিতীয় একজন এসে কুশলের জীবনে যে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, সেই সমস্যা আজ আর নেই। মিত্রামাসির কথাগুলির মধ্যে

একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে মনে হয়। কুশলের জীবনে নবলা নামে যে একটি সুন্দর আবির্ভাবের কাহিনী শুনেছিল স্বরূপা, সে নবলা আজ কোথায় ?

স্বরূপা হয়তো আরও স্পষ্ট ক'রে জানবার জন্যে দু'চোখের চাহনি নিষ্পলক ক'রে তাকিয়ে থাকে মিত্রা দেবীর দিকে। মিত্রা দেবীও স্বরূপাকে যেন একটা আশ্বাস চরম ক'রে জানিয়ে দেবার জন্যই বলেন—আমি যা বুঝছি স্বরূপা, ওর আপন বলতে এখন তুমিই আছ, আর কেউ নেই।

—এস। স্বরূপাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন মিত্রাদেবী, বারান্দা পার হয়ে এসে ঢুকলেন কুশলের ঘরে। শান্তভাবে বলেন—বসো স্বরূপা।

তারপর আরও শান্ত হয়ে বলেন—শিলোড়া ঘাটে একটা সদাব্রত করেছিল কুশল, রাত্তিরে সেইখানেই থাকতো। ফিরতো সকালে। আজ দু'দিন হলো ফেরেনি। এই কিছুক্ষণ হলো অনুপম নামে ঐ ব্রতী ছেলেটি খবর নিয়ে এসেছে, কুশলের কলেরা হয়েছে। এখন সেখানেই আছে।

কুশলেরই টেবিলের দেরাজ টেনে মিত্রাদেবী ত্রিশটা টাকা বের করলেন—এই নাও স্বরূপা, ওর যা আছে তোমার হাতেই সব দিয়ে দিলাম। এখন যা করবার হয় কর। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র চুপ করলেন মিত্রা দেবী। তারপর বললেন—ধরে রাখবার ভার তোমার, কাঁদবার ভারও তোমার। আমি আর কিছু বলতে পারবো না স্বরূপা। সংসার থেকে এবার আমি আলগা হয়ে যেতে চাই। আমি যাই।

মিত্রা দেবীকে প্রণাম করে স্বরূপা। আর একটিও কথা না বলে মিত্রা দেবী শুধু স্বরূপার মাথা ছুঁয়ে চলে যান, সোজা তাঁর পুজোর ঘরের দিকে।

মাথার ভারটা যেন সইতে পারছিল না স্বরূপা। চেয়ারের উপর বসতেই শরীরটা যেন অসহ ব্যথার পেষণে চূর্ণ হবারজন্য এলিয়ে পড়তে চায়। টেবিলের উপর কপাল ঠেকিয়ে দু'হাতে মাথা ধ'রে কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে থাকে স্বরূপা। খোঁপার দোপাটি তখনও একটুও শুকোয়নি, খুলে নিয়ে টেবিলের উপর ফুলটা রেখে দেয় স্বরূপা।

ঘড়ির দিকে তাকায় স্বরূপা। রাত আটটা। কয়েকটি মুহূর্ত শুধু ভাবে। তারপর কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে থাকে।—ভাই রেখা বৌদি, আজ আপনার কাছে একটা দরকারের জিনিস চাইছি। আপনার গাড়িটা একবার চাই, এখুনি। আমি যাচ্ছি তার কাছে।

পুষ্যা নক্ষত্র হতে শীত শিহরণ উৎসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে রাত্রির বাতাসে।

কুশলের ঘরের সব জানালা খুলে দিয়ে আর আলো জ্বালিয়ে রেখে চলে গিয়েছে স্বরূপা, অনেকক্ষণ হলো, শিলোড়া ঘাটের দিকে। চিঠি পাওয়া মাত্র গাড়ি পাঠাতে একটুও দেরি করেননি রেখা বৌদি। অনুপমও ডাক্তার ডেকে আনতে দেরি করেনি। ডাক্তার, অনুপম আর স্বরূপাকে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতেই সেই উচ্চকিত শব্দে উড়ে গেল কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠ।

সে রাত্রির প্রথম যামে মহারাজপুরের আকাশে কোন্ মহালগ্নের ইঙ্গিত দেখতে পেল রূপকথার নীলকণ্ঠ, তা সে-ই জানে। কিন্তু এই রাত্রিটা যে ঠিক অন্য কোন রাত্রির মত নয়, সেটা চারদিকে তাকালেই বোঝা যায়। একটু অসময়েই, একটু আগেভাগে, শব্দহীন হয়ে গিয়েছে মহারাজপুরের রাত্রি, যেন জীবন-মৃত্যুর একটা দ্বন্দ্ব সুরু হবে, আর তার একটা চরম নিষ্পত্তিও হয়ে যাবে এই রাত্রির যে কোন মুহূর্তে। পথ নির্জন হয়ে গিয়েছে, পথের আলোগুলি কুয়াশায় চোখ ঢেকেছে, শুধু মাথা উঁচু ক'রে উঁকি দিয়ে দেখছে ঘড়িঘরের আলোকিত সময়চক্র। সত্যিই তো, একটি মেয়ের সুদীর্ঘদিনের আকুলতা আজ হঠাৎ কী প্রমত্ত অভিসারের লগ্ন লাভ করেছে! ছুটে চলেছে, বাসরঘরে যাবার মন আর মালা পরিয়ে দেবার হাত নিয়ে, এই জীবনের মত চরমভাবে তৈরি হয়ে। এই প্রথম, এবং হয়তো এই শেষ।

কি হয়, কি হয় দেখছে ঘড়ি-ঘর। সুখের স্বপ্নগুলি চলে গেল কোন্ দিকে? দুঃখগুলি কি ধন্য হলো? কার কি হারালো, আর কার কি রইলো? এই অদ্ভুত রাত্রির বিপ্লবে কি থাকবে আর না থাকবে, চোখ মেলে দেখছে ঘড়ি-ঘর।

ঘড়ি-ঘরের সময়চক্র সঙ্কেত জানালো, রাত এগারটা। রাত্রির দ্বিতীয় যাম। তখন মৃত্যুর ছায়া আভাস দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে শিলোড়া ঘাটের একটি খেজুর পাতায় ছাওয়া একচালার ভিতরে একটি মানুষের শিয়রে, যে মানুষ অনেক আশা নিয়ে জীবনকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছ।

ভেদবমি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সংজ্ঞা নেই কুশলের। অসাড় হয়ে পড়ে আছে একটা চাটাইয়ের উপর। ক'জন জংলি মোড়লও বসে আছে একটু দূরে, কুশলের দিকে তাকিয়ে, তাদের সভয় দৃষ্টির মধ্যেও যেন একটা বিস্ময়ের বেদনা ফুটে উঠেছে।

যেন এক সাগর-মোহনার কূলে এসে পৌঁছেছে কুশলের চেতনা। অদ্ভুত তার কলনাদ, দেহের প্রতি শোণিতবিন্দুকে দুর্নিবার টানে টানছে সেই নাদ সমুদ্রে মিলিয়ে যাবার জন্য। ভেঙে গিয়েছে ভূবলয়, সমস্ত জগৎটাই শুধু আকাশ হয়ে গিয়েছে, টানছে কুশলের শ্বাসবায়ুকে ধীরে ধীরে ঐ আকাশে মিশে যাবার জন্য। এরই মধ্যে

এক একবার হেঁচকি তুলে চমকে ওঠে কুশল, অবসন্ন হাতের আঙুলগুলি নড়ে ওঠে, যেন পৃথিবীর মাটিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাইছে। যেতে চায় না কুশল, তার জন্য প্রস্তুতও নয় কুশল।

হঠাৎ এক একবার উৎকর্ণ হয়ে চোখ খুলে তাকায়। কত পদধ্বনি বাজে ভালবাসার পৃথিবীতে, যেন শুনতে পেয়েছে কুশল। যেন দেখতেও পেয়েছে কুশল, ধূলপাহাড়ের মাথার উপর কী মায়াময় মেঘের ছটা, কী সুন্দর রঙীন হয়ে আছে মহারাজপুরের ঐ আমলকি বন। যেতে চায় না কুশল, জীবনের এই পার্থিব মায়ার রূপটুকু ছেড়ে দিয়ে অসময়ে সব সন্ধান সমাপ্ত ক'রে দিয়ে চলে যেতে চায় না। আজই নয়, মিলন উৎসবের মত একদিন মৃত্যুকে কাছে ডেকে এনে তীর্থযাত্রী পথিকের মত হাসতে হাসতে তার হাত ধরে চলে যাবার একটা মস্ত বড় সাধ আছে। তৃষ্ণা আছে, একটি মমতামাখা স্পর্শের তৃষ্ণা।

ঘড়িঘরের সময়চক্রে সঙ্কেত জানায়, তিনটা। রাত্রির তৃতীয় যাম। হঠাৎ সত্যই একটি হাতের মমতামাখা স্পর্শ এসে লুটিয়ে পড়ে কুশলের কপালের উপর।

ভোর হয়। আর শিলোড়া ঘাটের খেজুর পাতার একচালা নয়। সংজ্ঞাহীন কুশলের দেহ তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ হলো গাড়িটা ফিরে এসেছে আনন্দ সদনে। নিজের ঘরেই খাটের উপর শুয়েছিল কুশল। একজন ডাক্তার চলে গেলেন মিত্রা দেবীকে আশ্বাস দিয়ে—আর কোন আশঙ্কা নেই, এখন ভালর দিকে। আর একজন ডাক্তার রয়ে গেলেন, এখনও আছেন হলঘরে ইজিচেয়ারের উপর ঘুমিয়ে। ব্রতী অনুপম ঘুমোতে থাকে ক্লান্ত হ'য়ে বারান্দার বেঞ্চের উপর। রেখা বৌদির গাড়িও চলে গেল স্টার্ট নিয়ে, আজকের মত আর কোন দরকার নেই। মিত্রা দেবী চলে গেলেন অন্য ঘরে। কুশলের কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে স্বরূপা।

চোখ মেলে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারে কুশল, রক্তকরবী ফুটে রয়েছে তার চোখের সম্মুখে। মিথ্যা নয়। কত কাছে রয়েছে তার মুখটা, তার স্পর্শ রয়েছে কপালে কত স্পষ্ট হয়ে।

স্বরূপা বলে—ঘুমোও।

শুনতেও পাওয়া গেল তাকে। মিথ্যা নয়। কুশলের সন্ধানের জীবন সব পরিশ্রান্তি নিয়ে এতক্ষণে যেন একটা নীড়ে এসে পৌঁছেছে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে কুশল।

সকালের রোদ চমকে উঠেছে। ঘড়িঘরের সময়চক্র সঙ্কেত জানায়—ছ'টা। ঘুম-ভাঙা পাখি ছুটেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। শব্দ হচ্ছে ঠুং ঠাং ঠুং ঠাং, বৈজু কামার

বেশ জোরে হাতুড়ি চালিয়ে ঠাণ্ডা লোহা পিটছে নেহাইয়ের উপর। কামরাঙা গাছের নীলকণ্ঠ আবার বাসার বাইরে এসে ডালের উপর বসে, ভোরের রোদে পালক গরম করে।

পুজোর ঘরে যাবার আগে মিত্রা দেবী একবার কুশলের ঘরে ঢুকলেন। চোখ মেলেই শুয়েছিল কুশল। মিত্রা দেবীকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করে কুশল।—স্বরূপা কি চলে গেল মা?

মিত্রা দেবী—হ্যাঁ, কেন?

কেন? মিত্রা দেবীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে অনেকগুলি কথা যেন তৃষ্ণার্তের আকুলতার মত ছটফট ক'রে কুশলের মুখের উপর এসে পড়ে, কিন্তু ফুটে উঠতে পারে না। বলতে গিয়েও কি ভেবে থেমে যায় কুশল। একটা বাস্তব ঘটনার সত্য যেন তার স্মরণে এসে গিয়েছে, যে বাস্তবের কোন সংবাদ রাখেন না মিত্রা দেবী। চলে যাবার জন্যই এসেছিল স্বরূপা, থাকবার জন্য নয়। এসেছিল আনন্দসদনের কাছে একটা সৌজন্যের দায়ে, আর কিছুর জন্য নয়। পৃথিবীতে ঠিক হয়ে গিয়েছে স্বরূপার থাকবার ঘর, আনন্দসদন থেকে অনেক দূরে। ভুলে গিয়েছিল কুশল, এখন সবই মনে পড়ে, এখন তো আর সে সংজ্ঞাহীন নয়।

মিত্রাদেবী আবার জিজ্ঞাসা করেন—কি বলছিলি বল?

কুশল—না, কিছু নয়।

আনন্দসদনের বাগানে শীতার্ত ঘাসের গায়ে সকাল বেলার শিশির অনেকক্ষণ হলো শুকিয়ে গিয়েছে। বেলা হয়েছে। মহারাজপুর সহরের পথে পথে পার্থিব কোলাহল জাগে। জেগে ওঠে জীবিকার অভিযান। ফেরিওয়ালা চলে হাঁক দিয়ে, খঞ্জ ভিখারি চিৎকার করে লাঠি ঠুকে ঠুকে, আর অন্ধ ভিখারি গান গায় সূর্যের দিকে দু'চোখের কোটর তুলে। আদালত রোডের হর্ষ সব চেয়ে বেশি। টুং টাং ঘন্টির শব্দে একটা উল্লাসের প্রবাহ তুলে ছুটে চলেছে রিক্সার দল। চলেছে পৃথিবীর বাদি ও বিবাদি, ফরিয়াদি ও আসামি একই পথে।

বারমেসে নেবু গাছটার কাছে, বাগানের এক কোণে, একটা বেতের মোড়ার উপর বসেছিল কুশল, আধেক রোদে আর আধেক ছায়ায়। নেবু গাছের নতুন কুঁড়ির নিঃশ্বাসে শীতের শুষ্ক বাতাসও মাঝে মাঝে গন্ধমদির হয়ে ওঠে।

যেন বহুদূরের এক দেশ থেকে অনেকদিন পরে ঘরে ফিরে এসেছে কুশল, সেইরকম লাগছে মনটা। সেই দূরদেশে নানা কাজের জেদ আর সাধের মধ্যে জীবনটা বেশ

ব্যস্ত হয়েই ছিল। তাই এই ঘরে ফেরা বিরাম একটা শূন্যতার মতই মনে হয়, বড় ফাঁকা লাগে।

সবই একে একে মনে পড়ে। অনেকটা রূপকথার মতই মনে পড়ে, ব্রঞ্জের গঙ্গার কথা। সে মূর্তি কি এখনও আছে? বিশ্বাস হয় না! চোরের হাতে বন্দী হয়ে এতক্ষণে কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে?

পাঠকজী কি এখনও আছেন? নেই নিশ্চয়, তিনিও হার মেনে চলে গিয়েছেন, কোথায় কে জানে! মিউজিয়ামের মূর্তিগুলি ধরে রাখতে পারেননি তিনি। পারলে, এতদিনে এসে খবরটুকু জানিয়ে যেতেন নিশ্চয়।

শিলোড়া ঘাটের সদাব্রত কি এখনও আছে? সেই দুঃখী প্রাণগুলি কি এখনও কুশলের আশায় বসে আছে? নেই, কেউ নেই। কুশলের দশা দেখে আরও ভয় পেয়ে এবং ভরসা ছেড়ে দিয়ে এতক্ষণে বোধ হয় সবাই পালিয়ে গিয়েছে ধুলপাহাড়ের শালবনের গহনে। অনুপম একবারও দেখা করতে আসেনি। সব চলে গিয়েছে নিশ্চয়, থাকলে একটা খবর দিতেও আসতো। ভেঙ্গে গিয়েছে সাধের সদাব্রত।

মনে পড়ে চাকরিটাও এখন আর নেই। হর ভবনের চতুঃসীমা থেকে সে আজ বহিষ্কৃত। আমলকির জঙ্গলে মাটির গভীরেই লুকিয়ে রইলেন গঙ্গাধর, তাকে খুঁজে বের করা আর হলো না। সব সন্ধানের চেষ্টা হঠাৎ যেন শেষ হয়ে গেল।

স্বরূপা কোথায়? সেই যে চলে গিয়েছে, আর আসেনি। বোধ হয় শেষবারের মতই দেখা দিতে এসেছিল কোন্ এক রাজার মত মানুষের ঘরে চলে যাবার আগে। যেন একটা তন্দ্রার আড়ালে চুপি চুপি এসে তার মাথায় হাত দিয়ে আর মুখের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মত করুণা ক'রে চলে গিয়েছে স্বরূপা।

কিছুই পূর্ণ হলো না, সবই বিফল হয়েছে। বড় ঘটা ক'রে আর জেদ ধ'রে তার নতুন জীবনের সাধগুলি বড় জোরে ছুটতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু দম ফুরিয়ে গেল মাঝ পথেই। কত কিছুই তো করার ছিল, আরম্ভ করাই হলো না। যা আরম্ভ করা গিয়েছিল, তা'ও অসমাপ্ত হয়েই রইল।

মনে মনে এই পরাভবগুলিকেই যেন হিসাব ক'রে দেখছিল কুশল। অন্ধকারের তৃষ্ণা যে পরাভূত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এক বছর আগেই তার জীবনের যত উদ্ধত ঘৃণা আর অহংকার এক একটি আঘাতে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তাতে লাভই হয়েছে, কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আলোকের তৃষ্ণাও কি পরাভূত হয়? হয় নিশ্চয়, নইলে আজ তাকে এভাবে হেরে যেতে হয় কেন? আজ সে তো শ্রদ্ধা দিয়েই ডাকতে আর প্রীতি দিয়ে ধরে রাখতে চাইছে সকলকে।

তবে কেন কল্লোলিতক্লান্তি গঙ্গা অদৃশ্য হয়, শুব্ধ হয় সদাব্রত আর স্বরূপা দূরে সরে যায় ?

কোন যুক্তি খুঁজে পায় না কুশল। জীবনের ঘটনাগুলিকে একেবারে নিয়ম-ছাড়া ও অর্থহীন বলেই মনে হয়। ভাবতে গিয়ে চিন্তাগুলিও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চারদিকের এই খোলা-মেলা বাতাসেও কোন আনন্দের সাড়া পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একটা অদ্ভুত অলস বিষাদ।

শরীরটা তো দুর্বল হয়েই আছে, এখনও জোরে নিঃশ্বাস নিলে বুকটা থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। মনে হয়, এই নিঃশ্বাসটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সে বেঁচে আছে। আর বুকের এই কাঁপুনিটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সবার আগে তাকে একটা চাকুরি খুঁজতে হবে, আর দেরি করলে চলবে না।

দেখতে পায় কুশল, ছোট একটা আঁধি ছটফট ক'রে নাচতে নাচতে আসছে; রাশি রাশি শুকনো পাতা আর ধুলো এসে উড়ে পড়ছে নেবু গাছের এই ছায়া থেকে একটু দূরে, ঐ যেখানে ঘাসের উপর তুলসীর মঞ্জরী ঝরে পড়ে রয়েছে, যেখানে বিজয়বাবু একদিন ভোরের আকাশের সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলে, তার পরেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজের ইচ্ছায় সাধ ক'রে চলে গেলেন। সেদিন তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু আজ মনে হয়, কেউ যেন একটা অকারণ খেলার খেয়ালে তাঁকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল, সে-টান ফিরিয়ে দেবার মত কোন শক্তি ছিল না বিজয় বাবুর, না আছে এই পৃথিবীর দুঃখে পোষা কোন প্রাণের। সব প্রাণের পথের সম্মুখে একটা পরম পরাভব যেন গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

কলেরার মতন এমন একটা মারী রোগের আঘাত থেকে সেও বেঁচে উঠেছে। মনে হয়, কেউ যেন বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই বেঁচে-থাকাটুকু এক দানীর মহিমার দান মনে ক'রে সুখী হতে পারতো কুশল, যদি দেখা যেত যে তার জীবনের সকল শুভ প্রয়াস সফল হতে চলেছে। কিন্তু কই? সফলতার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ঘটনার আড়াল থেকে যেন একটা বেদনাহীন খামকা ইচ্ছা কাজ ক'রে চলেছে, অকারণ মরণ বাঁচন ঘটিয়ে। কখনো দীপ হয়ে আলো জ্বালায়, কখনো ফুৎকার হয়ে দীপ নেভায়। অহংকারের অভিযান ব্যর্থ করে দেয়, আবার সকল সুবিনীত আয়োজনের মঙ্গল ঘটটিও চূর্ণ ক'রে দেয়। ভাল-মন্দের উপর করুণার পার্থক্য করে না, এ একটা পরাক্রম মাত্র, তাকে মহিমা মনে করা যায় না। ভয় করা যায়, কিন্তু নির্ভর করা যায় না।

রাগ হয়, বিদ্রোহ করে ওঠে মন, এবং মমতা জাগে নিজেরই উপর। নিজের জোরে

নিজেকে দাঁড় করাতে হবে, এক পরম পরাক্রমের যত সব নিয়মহীন করুণা আর অকরুণার উপর নির্ভর করে থাকার কোন অর্থ হয় না। বরং মনে হয়, ইচ্ছা করলেই জীবনের জেদগুলিকে নতুন ক'রে ফিরে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর কারও ক্ষতি করতে চায় না কুশল, তবে আর কিসের আক্ষেপ? বেঁচে থাকতে হবে, এবং নিজের কাজের জোরেই বেঁচে-থাকার আনন্দটুকু পেতে হবে।

কাজের কথাগুলিই মনে পড়ে। খোঁজ নিতে হবে, পাঠকজী কোথায় আছেন? অনুপম কি করছে? মূর্তিগুলি সত্যিই চুরি হয়ে গেল না তো? সদাব্রতই বা বন্ধ হবে কেন? তা ছাড়া এখুনি আর একটা কাজ আছে। মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গড় স্কুলে হেডমাস্টারির কাজটা খালি হয়েছে, আজই দরখাস্ত নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই কাজটা চাই, আর দেরি করা চলে না, কারণ দেরাজের ভিতর যা আছে, আর আংটিটা বিক্রি করে দিয়েও সব মিলিয়ে যা হবে, তা'তে দেড়-দুই মাসের মত পেটের খোরাক হয়তো হতে পারে। কিন্তু তার পর?

বাগানের রৌদ্র-ছায়ার মেলা থেকে সরে এসে আবার ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে কুশল।

যখন দরখাস্ত লেখা শেষ হয়, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। বাইরে যাবার জন্য জুতো পায়ে দিয়ে আর চাদরটাকে হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই, যেন একটা আকস্মিক বিস্ময়ের বাধা পেয়ে আবার ফিরে এসে ঘরের ভিতরে বসে থাকে কুশল। হলঘরে একটা প্রবল হাসির উচ্ছ্বাস আর কলরব শোনা যায়, আনন্দসদনের এই এক বছরের ইতিহাসে যা কখনও শোনা যায়নি। বিস্ময়কর বৈকি!

হাসছিলেন রেখা বৌদি।

অনেকক্ষণ হলো এসেছেন রেখা বৌদি। কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, অনর্গল কলরবের মত সব বিবরণ মিত্রা দেবীকে একটানা শুনিয়ে দেবার পর অনেকক্ষণ ধ'রে মিত্রাদেবীর সঙ্গে কতগুলি কাজের কথাও বলেছেন। এবং মিত্রাদেবীর কাছ থেকেও অনেক কথা শুনেছেন, অনেক কথা আদায়ও করেছেন। মিত্রাদেবীকে বিস্মিত হবার সুযোগ দিলেও এক মুহূর্তের মত গম্ভীর হবার সুযোগ দেননি রেখা বৌদি। প্রতি কথার পরে অন্তরার মত খল-খল ক'রে হেসে আনন্দ সদনের হলঘরের শুব্ধ গম্ভীরতা যেন চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন।

রেখা বৌদি বলেন—স্বরূপার কোন দোষ নেই মাসিমা, আমিই ওকে আসতে দিইনি।

মিত্রা দেবী হাসেন—আসেনি ঠিকই, কিন্তু দু'বেলা শান্তিকে পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছে, রোগীর খাবার থেকে শুরু ক'রে আমার পুজোর জন্যে তুলসী সরোবরের জল পর্যন্ত সবই এই ক'দিন স্বরূপাই তো যোগাড় ক'রে পাঠিয়েছে।

রেখা বৌদি—মেয়েটা কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী মাসিমা। আমার কাছে কথা দিয়েছিল, একেবারে চুপ ক'রে থাকবে, তবু দেখছি লুকিয়ে লুকিয়ে···।

বলতে বলতে রেখা বৌদি এগিয়ে এসে একেবারে কুশলের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। তারপর গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বলেন—কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে আর এসব চলতে দেব না মাসিমা।

মিত্রা দেবীর মুখের হাসি আর চোখের দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যা ইচ্ছে হয় কর।

রেখা বৌদি—হ্যাঁ, তাই বলুন। আমি আজ আপনার কাছ থেকে কথা নিতে এসেছি।

মিত্রা দেবী—আমি তো কথা দিয়েছি।

রেখা বৌদি—কিন্তু আর একজন কি বলেন?

কয়েকটি মুহূর্ত রেখা বৌদি উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। তারপরেই যেন ঘরের ভিতরের নিঃশব্দতাকে লক্ষ্য ক'রে বলেন—চুপ ক'রে থাকলে ঠকতে হবে।

দরজার একটা কপাট অল্প একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মিত্রা দেবী ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—স্বরূপার বৌদি জিজ্ঞাসা করছেন কুশল, উত্তর দে।

রেখা বৌদি—আসছে ফাল্গুনেই লগ্ন আছে। আমাদের মেয়েকে যদি পেতে হয়, তবে বেশ স্পষ্ট ক'রেই উত্তর দিতে হবে।

মিত্রা দেবী কুশলের দিকে তাকিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন—বল কুশল।

প্রত্যুত্তরে ঘরের ভিতর থেকে একটা বিব্রত কণ্ঠস্বরের প্রশ্ন শোনা যায়—এটা সবারই ইচ্ছা কি না, তা না জেনে কি ক'রে বলি?

রেখা বৌদি তেমনি আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘটনার রহস্যটাকে একেবারে অনাড়াল ক'রে দিয়ে বলেন—আপনার সেই সবারই কাছ থেকে এই মাত্র ইচ্ছাটা জেনে নিয়ে তবে এসেছি। এখন আপনার ইচ্ছাটাই স্পষ্ট ক'রে বলুন।

কুশল—তাহ'লে আর কি?

রেখা বৌদি—তাহ'লে আসছে ফাল্গুনেই বিয়েটা হবে, এই আর কি।

কুশল—আচ্ছা।

রেখা বৌদির হাসির উল্লাস আর একবার আনন্দসদনের বাতাসে ঝংকার দিয়ে

বেজে ওঠে। বিদায় নিলেন রেখা বৌদি—আজকের মত তাহ'লে আসি মাসিমা। আর একদিন এসে ঘটক-বিদায় নিয়ে যাব।

যাবার জন্য এক পা অগ্রসর হয়েই রেখা বৌদি আবার থামেন। কুশলের ঘরের দরজার দিকে চকিতে তাকিয়ে নিয়ে মিত্রা দেবীকে বলেন—একটা কথা এখন আমি ভিতরের ভদ্রলোকটিকে শুনিয়ে দিয়ে যেতে চাই, কিন্তু আপনি শুনবেন না মাসিমা।

মিত্রাদেবী একটু বিব্রত বোধ ক'রেও শান্তভাবেই হাসতে থাকেন। রেখা বৌদি আর একবার ঘরের ভিতরে লজ্জাবিব্রত এবং বিস্মিত মূর্তিটিকে কল্পনায় লক্ষ্য ক'রে নিয়ে বলেন—ফাল্গুনের লগ্ন আসবার আগেই যে আমাদের মেয়েকে দেখতে পাবেন, এমন বে-আইনী ভরসা আর করবেন না মশাই। দেখবার ইচ্ছে যদি থাকে, তবে নিজের থেকে সেধে ডাকবেন। নইলে স্বরূপা আসবে না, আমাদের মেয়ে এত সস্তা নয়।

এইবার মিত্রা দেবীকে প্রণাম ক'রে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে শান্তস্বরে রেখা বৌদি বলেন—যাই মাসিমা, কিছু মনে করবেন না! আমি এমনিতেই একটু বেশি কথা বলি আর বেশি হাসি। তার ওপর যদি মনটা খুশি থাকে, তাহ'লে তো বুঝতেই পারছেন!

রেখা বৌদিকে বুঝতে কোন ভুল হয়নি মিত্রা দেবীর। যেন কতদিনের চেনা আপন-জন, তেমনি সমাদর ক'রে রেখা বৌদির চিবুক আর মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করলেন।

হর্ন বাজিয়ে চলে গেল রেখা বৌদির গাড়ি। আনন্দ-সদন থেকে তাঁর হাসির উৎপাতটা যেন সোজা দৌড়ে এসে থামলো ফুলবাড়ির রাস্তায় রক্তকরবীর সামনে।—স্বরূপা! স্বরূপা! চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতরে ঢোকেন রেখা বৌদি।

ডাক শুনেই বুঝতে পারে এবং প্রস্তুত হয় স্বরূপা। হয়তো রেখা বৌদির হাসির উৎপাতটা চরম হয়ে দেখা দেবার জন্যই ছুটে আসছে। এই ক'দিন ধরে রেখা বৌদি যেমন তাঁর গাড়ির হর্নের শব্দে তেমনি তাঁর হাসির শব্দে সারা ফুলবাড়ি অঞ্চলেই একটা উৎপাত সৃষ্টি ক'রে আসা-যাওয়া করছেন। কারও জানতে বাকি নেই, কেন তিনি হাসছেন।—এই ফাগুন মাসেই বিয়েটা না ঘটিয়েই আমি ছাড়ছি না। রেখা বৌদির এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছে সবাই। জেনেছে সবাই, কা'র সঙ্গে স্বরূপার বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন রেখা বৌদি। জেনেছেন রাধেশবাবু, জেনেছে শান্তি, জেনেছে পাশের বাড়ির চারুবালা। চারুবালার পিছনের বাড়ির নন্দ মুদির বউ জেনেছে। ফুলবাড়ির সড়কের শেষপ্রান্তে ঐ কুঁড়ে ঘর থেকেও জনরবের গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে নিজেই এসে জেনে গিয়েছে হিরু ছুতোরের পিসি।

এই সব কাণ্ড ক'রে স্বরূপাকে ঘরের ভিতরে এই ক'দিন ধরে একেবারে স্তব্ধ ক'রে বসিয়ে দিয়েছেন রেখা বৌদি। এরই মধ্যে মিত্রা মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে না গিয়ে থাকতে পারতো না স্বরূপা, কিন্তু যেতে পারেনি রেখা বৌদির এই সব উৎপাতের লজ্জায়। মিত্রা মাসিমা একা একা কাজের চাপে কষ্ট পাচ্ছেন, এই সময় অন্তত দিনে একটিবারও তাঁর কাছে যাওয়া উচিত। আরও স্পষ্ট ক'রে কল্পনায় দেখতে পায় স্বরূপা, আনন্দসদনের একটি ঘরের নিভৃতে একজনের চোখের দৃষ্টি আজ যে স্বরূপাকেই খুঁজছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে স্বরূপারই আসা-যাওয়ার সাড়া শোনার জন্য। সেই ঘুমন্ত মুখের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আর নিঃশ্বাসের স্পর্শ নিয়ে. তার মনের কথাটিও যেন সেদিন একেবারে সন্দেহহীন হয়ে জেনে এসেছে স্বরূপা। তবু আর একবার গিয়ে নিজের চক্ষে দেখে আসতে পারেনি। হয় শান্তি গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে, নয় বৈজু এসে খবর দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই খবরে মন ভরে না. উৎকণ্ঠা মেটে না। ছটফট করেছে, রেখা বৌদির উপর রাগও হয়েছে স্বরূপার, কেন রেখা বৌদি এরই মধ্যে একটা জনরব সৃষ্টি ক'রে আনন্দসদনে যাওয়া আসার এই ছোট্ট পথটুকুর মাঝখানে এমন একটা লজ্জার প্রাচীর তুলে দিলেন? লজ্জা করে স্বরূপার, দশ বছর ধরে আনা-গোনায় এত পরিচিত ও পুরনো এই পথটাকেই একেবারে অপরিচিত ও নতুন রকম মনে হয়। অনেকবার চেষ্টা করেছে, তবুও শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি স্বরূপা। পথে পা দিলেই মনে হয়, চারুবালা বোধ হয় আড়াল থেকে দেখছে, হয়তো সাবিত্রী মুখ টিপে হাসছে। এমন ঝঞ্ঝাটের পথে পা না দেওয়াই ভাল।

রেখা বৌদিকে দেখে বুঝতে পারে স্বরূপা, ঐ ঝঞ্ঝাটের পথ হতেই চরম একটা বার্তা নিয়ে তারই দিকে হেসে হেসে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু রেখা বৌদি কিছুদূর এগিয়ে এসেও আবার ফিরে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—শান্তি, শিগগির শুনে যাও।

শুধু শান্তি নয়, ফুলবাড়ির রাস্তার দু'পাশের ঘরগুলি থেকে হঠাৎ যেন একটা ঘটনার সাড়া শুনে একে একে অনেকেই এসে ভিড় করে। রেখা বৌদি ঘোষণা করেন—আসছে ফাল্গুনেই বিয়ে।

শুনে খুশি হয় সবাই। বিজয় ইঞ্জিনিয়ারের ছেলের সঙ্গে রাধেশ বাবুর মেয়ে স্বরূপার বিয়ে, এই ফাল্গুনেই। চারুবালা বলে—আরও আগে হলেই ভাল ছিল, বুড়ো তাহলে ছেলের বউ দেখে আরও আনন্দে সগ্‌গে যেত।

হিরু-ছুতোরের পিসি বলে—এ রকমটা যে হবে, সে সন্দোহ আমার বরাবরই ছিল। যাক, ভালই হলো।

সাবিত্রী বলে—জিত হলো কিন্তু মাসির। কোথায় পেতেন এমন অন্নপূর্ণোর মত মেয়ে অমন বাউণ্ডুলে ছেলের জন্যে ?

শান্তি বলে—হতেই হবে গো। গোঁসাই প্রভু বলেছেন, কৃষ্ণ নিধি পাওয়ে রাই প্রেমার কারণ।

রাধেশবাবু বলেন—অম্বিকার ইচ্ছা !

ঘোষণার কাজটুকু ভাল ক'রে সেরে দিয়ে রেখা বৌদি তাঁর উৎপাতের মূর্তিটাকে এইবার একটু সংযত ক'রে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে গিয়ে স্বরূপার সামনে দাঁড়ান। গম্ভীর ভাবেই বলেন—আমি এখন চলি স্বরূপা, আর যাবার আগে একটা কথা বলে যাই।

স্বরূপা—বলুন।

রেখা বৌদি—এবার থেকে নিজের দর একটু বাড়াতে শেখ স্বরূপা।

স্বরূপা—তার মানে ?

রেখা বৌদি—তার মানে ঐ চাঁদমুখটি আর সস্তা ক'রে দিও না। ভদ্রলোক নিজের থেকে না সাধলে ওবাড়িতে এখন আর দেখা দিতে যেও না।

স্বরূপা—আপনি আর বলবেন না, যা কাণ্ড ক'রে রাখলেন, একবার যে মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাব তার পথ আর রইল না।

রেখা বৌদি—যাবে যাবে, যাবেই তো বন্ধু, এত অভিমান কেন ? ফাল্গুন মাস মানে তো আর দু'টি মাসও নয়, তার পরেই তো……।

স্বরূপার পিঠে জোরে একটা চিমটি দিয়ে নিজের হাসির স্রোতে আর সাফল্যের খুশিতে যেন গড়াতে গড়াতে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন রেখা বৌদি। গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলেন।

রেখা বৌদি আনন্দসদনের অন্তরে হাসির ঝংকার তুলে দিয়ে চলে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি চলে যাবার পরেই আনন্দসদন যেন কিছুক্ষণের মত আনন্দাশ্রু-সদন হয়ে ওঠে।

হলঘরের ভিতরেই নিঃশব্দে চুপ করে অনেকক্ষণ ধ'রে মুখোমুখি বসে থাকে মা ও ছেলে, মিত্রা দেবী ও কুশল। মিত্রা দেবী চোখ দুটো একবার আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কুশল কি বলবে ভেবে পায় না।

কেউ কোন কথা না বলুক, দু'জনেই বুঝতে পারে, আজকের আনন্দটা কেন চোখের জলের ধারা ডেকে আনছে। দু'জনেরই স্মরণ ভ'রে আজ তাঁরই কথাগুলি বেজে উঠছে, যিনি আনন্দসদন নামে এই ইটকাঠের বাড়িটাকেই মন্দিরের মত স্নিগ্ধ

ক'রে রেখেছিলেন। তিনি দেখে গেলেন না, কিন্তু তাঁরই একটি ইচ্ছা আজ পূর্ণ হতে চলেছে।

বাইরে বের হবার জন্য উঠে দাঁড়ায় কুশল। দরখাস্তটা পকেটেই ছিল, মিউনিসিপ্যালিটির অফিসটাও খুব বেশি দূরে নয়; সুতরাং ধীরে ধীরে হেঁটেও পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগলো না।

সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়ে চেয়ারম্যান শ্রীদত্তগুপ্তের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েও দু'টি ঘণ্টা আফিসের বারান্দায় অপেক্ষা করতে হলো। একদল হাস্যমুখ ঠিকাদার ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসবার পর চেয়ারম্যানের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাওয়া গেল। চাপরাসি এসে আহ্বান জানাতেই ভিতরে ঢুকে চেয়ারম্যানের টেবিলের উপর দরখাস্তটা রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল।

দরখাস্তটা পড়ে নিয়ে চেয়ারম্যান একটু চিন্তিতভাবে কুশলের দিকে তাকালেন। —আপনার কোয়ালিফিকেশন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এত বেশি কোয়ালিফিকেশনে কি হবে? ধাঙ্গড় স্কুলের হেড মাস্টারি, মাইনে ষাটটি টাকা, এ কাজের জন্য আপনার কেন এত ঝোঁক হলো?

কুশল—ঝোঁক হয়নি, দরকার হয়েছে।

চেয়ারম্যান—তবে তো আরও ভাবনায় ফেললেন।

কুশল—কেন বলুন তো?

চেয়ারম্যান—এ কাজ আপনি পেলেও বরাবরের জন্য লেগে থাকতে পারবেন বলে ভরসা হচ্ছে না। অন্য কোথাও ভাল প্রসপেক্ট পেলেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চয় চলে যাবেন। আগের হেড মাস্টারটা এই রকমই কাণ্ড করেছে, পাঁচটাকা বেশি মাইনের লোভে রামগড়ে একটা মদের দোকানে কেরানির কাজ নিয়ে চলে গেছে।

কুশল—আমি এটুকু বলতে পারি, যদি অন্য কোনরকম অসুবিধা না হয় তবে শুধু দু'চার টাকা বেশি মাইনের লোভে আমি এ কাজ ছেড়ে চলে যাব না।

চেয়ারম্যান একবার কুশলের মুখের দিকে তাকান। পরমুহূর্তে কি যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন—যাক্, মুখের কথা হলেও আপনি যে এই গ্যারেন্টি দিলেন সেটা স্মরণ রাখবেন, যেন এর অন্যথা না হয়।

বোধ হয় দরখাস্তের উপর মন্তব্য লেখবার জন্যই এক হাতে কলম তুলে নিয়ে হঠাৎ একবার থামেন চেয়ারম্যান। দরখাস্তটাকে উল্টে পাল্টে নাড়া দিতে থাকেন। তারপর বিব্রতভাবে বলেন—কই মশাই, আপনার চরিত্রের সার্টিফিকেট কোথায়?

কুশল—সে সব তো কিছু নেই।

চেয়ারম্যান—না থাকলে চলবে কেন ?

কুশল—কি করতে হবে বলুন।

চেয়ারম্যান—দু'চার জন গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে।

কুশলও বিব্রত বোধ করে। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে নিয়ে বলে—বুঝতে পারছি না, গণ্যমান্য লোক বলতে আপনি কি ধরনের লোকের কথা বলছেন।

চেয়ারম্যান—যারা ভাল ইনকম ট্যাক্স দেয় মশাই, বছরে পাঁচ দশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকার ইনকম ট্যাক্স। কিম্বা গেজেটি অফিসার, ভাল মাইনে যারা পায়। কিংবা, এই ধরুন, সোরাবজী বা মৃগেনবাবুর মত যাঁদের বেশ একটু ভাল প্রতিষ্ঠা আছে সমাজে।

কুশল—এধরনের কোন লোকের কাছ থেকে আমার সার্টিফিকেট পাওয়া সম্ভব নয়।

চেয়ারম্যান বিরক্ত বোধ করেন—তাহলে আমিই বা কি করতে পারি বলুন। অজানা লোকের চরিত্র সম্পর্কে আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না।

আর একবার ভেবে নিয়ে চেয়ারম্যান জিজ্ঞেসা করেন—এর আগে কোথাও চাকরি করেন নি ?

—করেছি।

—কোথায় ?

—সার্ভে অফিসে।

—বাস, তাহলেই তো হলো! সার্ভে অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার রায়ের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন।

—তা সম্ভব নয়।

—কেন ?

—তিনি আমাকে সসপেণ্ড করেছেন।

কুশলের কথা শোনা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে চেয়ারম্যান আতঙ্কিতভাবে একটা ধ্বনি ছাড়েন—ও হরি!

তারপরেই দরখাস্তটা কুশলের হাতের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—একটা অপকর্মের দাগ মিটতে না মিটতে আর একটা……যাক্। এখন সরে পড়ুন, তাহলেই আমি খুশি হব। আর কোন কথা বলবেন না।

কিছু বলবার ইচ্ছা হ'লেও বলে না কুশল। দরখাস্তটা হাতে তুলে নিয়ে

চেয়ারম্যানের ঘর ছেড়ে চলে যায়। বারান্দার সিঁড়ি ধ'রে নেমে আবার পথের উপর এসে হাঁপ ছাড়বার জন্য একবার থামে কুশল। কিন্তু হাঁপ ছাড়বার আগেই পিছনের দিক থেকে কাশতে কাশতে একটা বাধা দিয়ে ব্যস্ত পদশব্দ তুলে এক ভদ্রলোক কুশলের কাছে এসে দাঁড়ান, গলাবন্ধ কোট আর প্যাণ্টালুন। ভদ্রলোক অনুযোগের সুরে বলেন—চট্ ক'রে এরকম একেবারে ভরসা ছেড়ে দিয়ে চলে যান কেন মশাই? ইদিক উদিক একটু উঁকি দিয়ে একটু পরামর্শ খোঁজ করতে হয় তো।

কুশল—পরামর্শ?

ভদ্রলোক—হ্যাঁ।

কুশল—কোথায়?

ভদ্রলোক—আমার কাছে। আমি হেড ক্লার্ক।

নিকেলের ডিবে থেকে বিড়ি বের ক'রে মুখে দেন হেড ক্লার্ক। দু' ঠোঁটের চাপে বিড়ি নাচিয়ে অত্যন্ত প্রশান্ত ভাবে পরামর্শ দেন—অন্তত শ' দুই টাকা যদি এই নগন্যকে দিতে পারেন, তবে আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে দেব, কোন ব্যাটা গণ্যমান্যের সার্টিফিকেট দরকার হবে না।

কুশল—এই পরামর্শ?

হেডক্লার্ক—হ্যাঁ, সঙ্গে টাকাটা থাকে তো এখনি দিয়ে ফেলুন।

হেসে ফেলে কুশল। দরখাস্তটা কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে পথের উপরেই ছড়িয়ে দিয়ে আবার চলতে শুরু করে।

—তাহ'লে একটা ইয়ার্কি দিতে এসেছিলেন! হেড ক্লার্কের মন্তব্যটা কানে শুনতে পেলেও আর পিছন ফিরে তাকায় না কুশল।

চলতে থাকে কুশল, এই পথের ধুলো আর রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে, দূর থেকে আরও দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করে। দেখতে ইচ্ছা করে, কোথায় এর শেষ। জীবিকার দায় আর জীবনের দায়, যেন দু'দিক থেকে টানাটানি করছে। একদিকে প্রত্যাখান, আর একদিকে আহ্বান। এই ধাঁধার ফেরে পড়ে পথের দিশাও যেন মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়।

কতক্ষণ ধরে হেঁটেছে কুশল, তার খবর সে নিজেই জানে না। হুঁশ হয় তখন, যখন পরিশ্রান্ত সূর্যের আলো পশ্চিমের আকাশ রক্তাভ ক'রে তুলেছে।

শিলোড়া ঘাটের চড়াই ধরে চলছিল কুশল। বুঝতে পারে এবং খুশি হয় কুশল, পথ ভুল হয়নি তার, পথের দিশাও হারায়নি, ঠিক পথেই চলে আসতে পেরেছে।

আর একটু অগ্রসর হতেই কুশলের পথ চলার এই ক্লান্তিহীন উৎসাহটা হঠাৎ

যেন একটা ধাক্কা খায়। চোখের দৃষ্টিটাও ক্রমে ক্রমে বেদনাচ্ছন্ন হয়ে আসতে থাকে। সদাব্রতের একচালা দেখা যায়, পাখির কলরবও শোনা যায়। চারদিকে শুকনো শাল পাতা উসখুস করে, তাও শোনা যায়। কিন্তু শোনা যায় না সদাব্রতের কোন সাড়া।

একচালার কাছে পৌঁছেই কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে থাকে কুশল। জংলিরা কেউ নেই। একচালার ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাজিস্ট্রেট আর তাঁর আর্দালি। আর আছেন একজন পুলিশ অফিসার, সঙ্গে কয়েকজন চৌকিদার।

যেন ভয়ে জড়ীভূত, বিমর্ষভাবে একচালার একটি কোণে বসে আছে একা অনুপম। সদাব্রতের সব জিনিস পত্র আর এক কোণে জমা করা রয়েছে। ছেঁড়া কম্বলের একটা বোঁচকা, কতগুলি শূন্য চটের ছালা, হাঁড়ি আর কড়াই, আর একটা ক্যানেস্তারা, তার মধ্যে জালদেওয়া সাগুর জল এখনও টলটল করছে।

কুশলকে দেখেই ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করেন—আপনি কি চান?

জড়ীভূত অনুপম এতক্ষণে যেন একটু সজীব হয়ে আর আত্মরক্ষার ভরসা পেয়ে ব্যগ্রভাবে বলে—উনিই হলেন কুশলবাবু।

ম্যাজিস্ট্রেট—ধন্যবাদ জানবেন কুশলবাবু, আপনারই খোঁজ করছিলাম। আপনি একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করছিলেন, কিন্তু উপায় নেই, আমাকে বাধ্য হয়েই এখানকার জংলিদের ভিড় ভেঙে দিতে হলো।

কুশল—কেন? কি ব্যাপার হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট—সহরের স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা বিপজ্জনক। কলেরা রোগের একটা আড়ত এভাবে সহরের এত কাছাকাছি থাকতে দেওয়া চলে না। তা ছাড়া…।

পকেট থেকে একটা শিশি বের করেন ম্যাজিস্ট্রেট, শিশির ভিতর থেকে স্পিরিট ঢেলে নিয়ে হাত দুটো ধুয়ে ফেলেন। তারপর জীবাণু-শোধিত হাতে অতি সাবধানে আর একটা কৌটা থেকে সিগারেট বের ক'রে মুখে দেন। পুলিশ অফিসার যেন একটা সৌজন্যের আবেগে লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে দেশলাই জ্বালিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের কাছে ধরেন। সিগারেট ধরিয়ে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলেন—তা ছাড়া আপনার এই সদাব্রত-ট্রত হলো একটু অবৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ যাকে বলে একটু আনসায়েন্টিফিক ব্যাপার। এর দ্বারা জংলিদের ক্ষতি করা হয়েছে।

কুশল বিস্মিত হয়—ক্ষতি?

ম্যাজিস্ট্রেট—হ্যাঁ ক্ষতি, যাকে বলে ইনজিওরি, তাই হয়েছে। জংলিদের খিচুড়ি খাওয়ানো, গায়ে কম্বল জড়াতে দেওয়া, কিংবা আধুনিক ওষুধ-টষুধ খাওয়ানো ওদের

পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসব আধুনিক সভ্যতার জিনিষ ওদের ওপর চাপালে ওদের আত্মাকেই মেরে ফেলা হয়। বুঝতে পারছেন আমার পয়েণ্ট, কুশলবাবু।

কুশল—এক বিন্দুও বুঝলাম না।

ম্যাজিস্ট্রেট—সহজে বুঝতে পারবেন না। আমার পয়েণ্ট হলো, নরতত্ত্ব অর্থাৎ যাকে বলে অ্যানথ্রপলজি না জেনে কখ্খনো জংলিদের কোন হিতসাধন করতে আসবেন না, তাহ'লে ভুল হবে।

কুশল—আপনি নিজেকে এত নির্ভুল মনে করছেন কেন?

ম্যাজিস্ট্রেটের গলার স্বর বেশ একটু তপ্ত হয়ে ওঠে—মনে করছি এই কারণে যে, আমি লণ্ডন ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট এবং অ্যানথ্রপলজি ছিল আমার স্পেশাল সাবজেক্ট। যাঁরা এই বিষয়ে অথরিটি, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। জংলি জাতের ভাল মন্দের সমস্যায় আমি তাঁদেরই বৈজ্ঞানিক পরামর্শ নিয়ে থাকি।

আর একবার পকেট থেকে শিশি বের ক'রে হাতের ছড়িটার উপর স্পিরিট ঢেলে রোগের বীজাণু সংহার করেন ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর যেন উদ্বেলিত সমবেদনায় বিহ্বল হয়ে বলেন—একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন কুশলবাবু, জংলি বেচারারা হলো প্রকৃতির দুলাল, অর্থাৎ যাকে বলে নেচারের চাইল্ড।

কুশল হেসে ফেলে, এবং তার কথাগুলিও ঠাট্টার মত শোনায়।—তাই বুঝি ওদের সাত তাড়াতাড়ি একেবারে প্রকৃতির কোলে পাঠিয়ে দিলেন?

ম্যাজিস্ট্রেট বলেন—হ্যাঁ, ঠিক তাই। জঙ্গল ভ'রে নতুন মহুয়া ফলেছে, আমি ঢালা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, ওরা ইচ্ছা মত মহুয়া তুলে খেতে পারবে, কোন ট্যাক্স দিতে হবে না।

পরক্ষণেই যেন কুশলের অস্বাভাবিক হাসির অর্থটা বুঝতে পেরে, কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে ম্যাজিস্ট্রেটও বিদ্রূপ করেন—আমার অর্ডার শোনামাত্র ওরা খুশি হয়ে নাচতে নাচতে চলে গেছে মশাই, আপনার সেবা নেবার জন্যে কেউ বসে থাকেনি। বুদ্ধি থাকে তো এর থেকেই ব্যাপারটা বুঝবেন।

কুশল বিরক্ত হয়ে বলে—আপনি আর আমাকে কিছু বোঝাবেন না। আমি বুঝতে চাই না।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পাথরের উপর ছড়ি ঠোকেন ম্যাজিস্ট্রেট—বুঝতে হবে আপনাকে, নইলে শিলোড়া ঘাটে একশো চুয়াল্লিশ জারি করতে আমি বাধ্য হব।

কুশল—তাহ'লে আমি আপনার একশো চুয়াল্লিশ অমান্য করতে বাধ্য হব।

ম্যাজিস্ট্রেট—অমান্য করবেন মানে? কি করবেন আপনি? মতলব কি আপনার?

কুশল—মতলব হলো, আরও বড় ক'রে আর স্থায়িভাবে এখানে একটা সদাব্রত করবো।

ম্যাজিস্ট্রেট কুশলের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। তারপরেই হেসে ফেলেন—ব্যাপারটাকে একটু সায়েন্টিফিক ভাবে বুঝবার জন্যেই আপনাকে বলছি মশাই। এই সব জংলিরা ঠিক আমার-আপনার মত আরিয়ান কালচারের মানুষ তো নয়, সেই কবেকার অন্ধকার যুগের মানুষ হলো এরা। আপনার এই সব সেবা-টেবার বিরুদ্ধে ওদের রক্তের মধ্যেই একটা বিদ্রোহ আছে। আপনি যত বড়ই সদাব্রত করুন না কেন, ওরা সেবা নিতে আর আসবে না, আসতে পারে না। কাজেই আপনার পক্ষে দুঃখ করারও কিছু নেই।

বলতে বলতে ম্যাজিস্ট্রেট আক্ষেপ ক'রে ওঠেন—যতই করুন না কেন, এই সব প্রগনেথাস্ মুখ, প্ল্যাটিরাইন নাক আর সাড়ে বাহাত্তর সেফালিক ইনডেক্সের উলোট্রিচিগুলো কৃতজ্ঞতারও কোন ধার ধারে না মশাই। ওসব জিনিষ ওদের ব্লাডেই নেই।

একচালার কোণ থেকে জড়ীভূত অনুপম হঠাৎ প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে কি একটা বস্তু তুলে নিয়ে এসে কুশলের সম্মুখে দাঁড়ায়।—ওরা যাবার সময় খুব কেতজ্ঞতা ক'রে গেছে দাদা, এই দেখুন, এই জিনিষটা আপনাকে উপহার দিয়ে গেছে।

চকমকি পাথরের ছোট একটা কুঠার কুশলের হাতে তুলে দেয় অনুপম। কুশল প্রশ্ন করে—কিছু বলে গেছে?

অনুপম—হ্যাঁ, বলে গেছে আবার আসবে।

কুশল—কেন আসবে বলেছে কিছু?

অনুপম—হ্যাঁ, আপনার খোঁজ নিতে, আপনি সত্যি সেরে উঠেছেন কি না, আর বেঁচে আছেন কি না, তাই দেখবার জন্যে ওরা আবার আসবে।

মাথার ওপর হ্যাটটা হাতের চাপে এঁটে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখেন. অস্তোন্মুখ সূর্যের দিকে তাকান। তারপরেই পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলেন—আর এখানে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি বলুন?

পুলিশ অফিসার আরও ব্যস্তভাবে উত্তর দেন—কোন লাভ নেই স্যার।

চলেই গেলেন সকলে; ম্যাজিস্ট্রেট, আর্দালি, পুলিশ আর চৌকিদার।

শিলোড়া ঘাটে অন্ধকার নামে নিবিড় হয়ে। ভেঙে গিয়েছে সদাব্রতের মেলা, আজ সন্ধ্যায় এখানে আর আলো জ্বালবার কোন দরকার নেই। মনটা শোকাহতের

মস্ত বেদনার্ত হয়ে উঠতে চাইলেও হতে দেয় না কুশল। জীবনের সব পরাজয় শান্ত মনেই গ্রহণ করতে চায়।

—এখানেই বসে বসে কি রাত করবেন দাদা ?

অনুপমের কথায় চমক ভাঙে কুশলের।—হ্যাঁ, এখানে এখন রাত ক'রে লাভ নেই, চল।

শূন্য সদাব্রতকে পিছনে রেখে ফিরে যেতে হলো সেই পথেই, যে পথে এগিয়ে এসেছিল কুশল।

একই পথ, কিন্তু রোদ আর ধুলো নেই এখন। পায়ে পায়ে শিশিরে ভেজা শুকনো পাতার স্পর্শ লাগে, পাহাড়ি অন্ধকার যেন চোখের উপর ঘুম টেনে আনে। হরতকি গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ ক'রে জলন্ত জোনাকি ঝরে পড়ছে। ক্লান্ত হয়েও হাঁটতে ভাল লাগছিল কুশলের। তবু ঘাটের নীচে সড়কটার উপর এসে পৌঁছতেই সময় লাগলো দেড় ঘণ্টার উপর।

—আপনার শরীরটা বড় কাহিল হয়ে রয়েছে দাদা।

অনুপমের কথায় এতক্ষণ পরে যেন একটা সুপ্তি ভাঙে কুশলের। বুঝতে পারে, অনুপমের কাঁধের উপর তার একটা হাত পড়ে রয়েছে। অনুপম শক্ত ক'রে কুশলের হাতের কব্জিটা ধরে রেখেছে। এতক্ষণ ধরে অনুপমের কাঁধেই ভর দিয়ে এই পাহাড়ি পথটা পার হয়ে এসেছে কুশল। নিঃশব্দে সমস্ত ভার সহ্য ক'রে এই পাথর ছড়ানো পথটা কুশলকে পার ক'রে নিয়ে এসেছে অনুপম।

কে এই অনুপম ? অনুপমের কোন পরিচয় জানে না কুশল, কোন দিন জিজ্ঞাসা করেনি, জিজ্ঞাসা করবার কথাও মনে পড়েনি। কিন্তু এতদিনে যেন স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়েছে কুশলের, অনুপম নামে অদ্ভুত এক স্বার্থহীন বান্ধবতা কুশলের পাশে থেকে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে।

বড় সড়কে উঠে হাঁটতে আর অসুবিধা হচ্ছিল না কুশলের। অনুপম তবু যেন একটা উদ্বেগ নিয়ে কুশলের দিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখে পথ চলছিল। হঠাৎ একটা হোঁচট লেগে কুশলের দেহটা টলে উঠতেই দু'হাতে কুশলকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরে অনুপম—আপনি আমাকে চিন্তায় ফেললেন দাদা। কি ক'রে এতটা পথ যাবেন ভেবে পাচ্ছি না।

কুশল হেসে হেসে বলে—যেতে পারবো অনুপম, তুমি চিন্তা করো না।

দূরে মহারাজপুর স্টেশন থেকে একটা ট্রেন ছাড়ছে বোঝা যায়। স্টেশনের মাথার উপরে আভাময় উজ্জ্বলতাটুকু ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল। কুশল প্রশ্ন করে—তুমি এখন কোথায় যাবে অনুপম ?

অনুপম—আমি আমার পুরনো লাইনেই ফিরে যাব দাদা।

কুশল—কি কাজ করতে তুমি ?

অনুপম—হকারি দাদা। কখনও শোলার পুতুল, কখনও জলছবি, কখনও বা চটি জুতো। মহাজন যে মাল দয়া ক'রে ধারে দেয়, তাই স্টেশনে ফেরি ক'রে বেচি।

কুশল—এই কদিন তোমাকে কাজ কামাই ক'রে সদাব্রতে খাটতে হয়েছে, তোমার ক্ষতি হলো না তো ?

অনুপম—কিচ্ছু না। আপনার এ লাইনটা তো মন্দ ছিল না দাদা! সারা দিন হকারি ক'রে যা পেতাম তা'তে এক বেলা খিচুড়িটা জুটতো, আর এখানে তো দু'বেলা খিচুড়ি জুটেছে। কিন্তু ভাগ্যি মন্দ, লাইনটাই রইল না তো কি আর করা যাবে ?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলতে থাকে দু'জনে। বরাকর রোডের দিক থেকে একটা গালা বোঝাই মোটর লরি ছুটে এসে চলে গেল সিটির দিকে। কুশল বলে—দুঃখ করো না অনুপম।

—না দাদা, দুঃখটুঃখ আমার কিছু নেই। তবে ঐ রিসড়ের মামি মাঝে মাঝে চিঠি লিখে দু'চার টাকা চেয়ে বসে, কিন্তু টাকা পাঠাতে পারি না, তাই মনটা একটু ছোট হয়ে যায়, এই যা।

রাত মন্দ হয়নি। পথের একটা মোড়ের কাছে এসে দু'জনেই একবার থামে। এখান থেকে নিউ মহারাজপুরকে নিকটেই দেখা যায়, শীতরাত্রির মন্থর ধোঁয়া আর কুয়াশার একটা ঘেরাটোপের ভিতরে যেন গুটিসুটি হয়ে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। মোড়ের উপরই কাঠের গুমটির ভিতর থেকে ঘড়ঘড় নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। বেচারা পাহারাওয়ালা! ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে।

অনুপম বলে—আমি এবার কেটে পড়ি দাদা, আমারও ঘুম পাচ্ছে।

কুশল—কোথায় যাবে ?

অনুপম—স্টেশনে।

কুশল—বললে যে ঘুমোবে ?

অনুপম—তার জন্যেই তো···।

কি যেন বলতে গিয়ে প্রথমে হেসে ফেলে অনুপম, তার পর একটু লজ্জিত ভাবে বলে—আমার একটা কেরোসিন কাঠের বেঞ্চি আছে দাদা, মুসাফিরখানায় হালুইকরের দোকানের সামনে রেখে দিয়েছি। এখন ফিরে গিয়ে বেঞ্চিটাকে হালুইকরের উনুনের কাছে টেনে নিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুম জমাবো।

অনুপমের একটা হাত চেপে ধরে কুশল—অনুপম।

—বলুন দাদা।

—ঐ শিলোড়া ঘাটের জংলিদের জন্য আমি একটা সদাব্রত করবো, আরও বড় ক'রে।

—বড় ভাল হয় দাদা, তাহ'লে হকারি ছেড়ে দিয়ে এই লাইনেই চলে আসি। পরের উবগার করা যাবে, নিজের পেটটাও চলে যাবে।

—কিন্তু রিসড়ের মামিকে দু'চার টাকা পাঠাবে কি করে?

কিছুক্ষণের মত কি যেন ভাবতে থাকে অনুপম, এই পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা পথ খুঁজছে তার জীবনের একটা অভিমান।

তারপরেই, যেন শত দুঃখেও অবিকার তার জীবনের সব দুঃসাহসের জোরে আশান্বিত হয়ে অনুপম জোর গলায় বলে—তার'ও উপায় একটা বের করতেই হবে, ভেবে দেখি।

কুশল—ভেবে দেখ। আর আমি যখন ডাকবো তখন...।

অনুপম—তখনই আমি চলে আসবো, বিশ্বাস করুন দাদা।

—এস। অনুপমের হাত ছেড়ে দেয় কুশল। সড়ক ছেড়ে দিয়ে মেঠো পথে আরও ঘন কুয়াশাঘোরের ভিতর নেমে পড়ে অনুপম, আর তাকে দেখা যায় না।

যেন কুশলের পথ-চলা ক্লান্তি দূর ক'রে আর মনের ভিতর একটা নতুন দুঃসাহস ভরে দিয়ে চলে গেল অনুপম। জীবিকার দায় বড় দুঃখ দেয় জীবনকে। কৃপণ জীবিকা বড় বিদ্রূপ করে জীবনকে; পিছনে ধরে রাখতে থামিয়ে দিতে আর পথ-ছাড়া করে দিতে চায়। তবু উপায় বের করতেই হয়, হার মানলে চলে না। আর কিছুক্ষণ পরে, হালুইকরের উনানের উত্তাপটুকু গায়ে জড়িয়ে মাঘ রাত্রির শীতে পথের কুকুরের ভাগ্য নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে অনুপম, তবু রিসড়ের মামিকে দু'চার টাকা পাঠাবার জন্য স্বপ্নের মধ্যে উপায় খুঁজবে। অনুপমের কথা মনে পড়লে আনন্দ-সদনের অভাবগুলিকে অভিমানের বিলাস বলেই মনে হয়।

চলতে থাকে কুশল। কাগজে জড়ানো চকমকি পাথরের কুঠারটা হাতেই রয়েছে। আর রয়েছে তারায় ভরা আকাশ মাথার উপর, সম্মুখে অন্ধকার। বেশ লাগে। এই অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে যেন ইতিহাসের প্রথম নায়কের মত আজ একটা অভিনয় ক'রে চলেছে কুশল।

পিচ-মাখানো ক্রস রোড। কালো কঠিন ও মসৃণ, এবং সুপ্রশস্ত। অনেক দূরে এগিয়ে চলে এসেছে কুশল, যেন একটা অনুভবের আবেগে কয়েকটা মিনিটের মধ্যে

অতি দূরাতীত জীবনের জন্মভূমি থেকে একেবারে বর্তমানের কোলে। এখান থেকে আর একটু দূরে, ঐ জামগাছটার কাছ থেকেই আরম্ভ হয়েছে সুরকির সড়ক। তার চেয়ে আর একটু দূরে সার্ভে অফিসের নিমকুঞ্জকে আর চেনা যায় না, অন্ধকারের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছে। কিন্তু সেখানেই তো রয়েছে কল্লোলিতকান্তি গঙ্গা, একা একা, তার গঙ্গাধরের আশায়। সত্যিই আছে কি? কে জানে, শিলোড়া ঘাটের সদাব্রতের মত ঐ মিউজিয়ামেরও মূর্তির ভিড় হয়তো শূন্য হয়ে গিয়েছে।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায় কুশল, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে থাকে। কারণ, সুরকির সড়কে ঐ নিরাকার অন্ধকারের মধ্যেই একটা আগুন জ্বলছে দেখা যায়। ঘুমন্ত মহারাজপুরের বুকে এত রাত্রেও কেউ একজন জেগে রয়েছে তাহ'লে।

কিসের আগুন? কে জ্বেলেছে? কোন্ প্রয়োজনে? প্রশ্নগুলি চঞ্চল হয়ে কুশলের মনের ভিতরেই একটা ভরসার আবেগ চঞ্চল ক'রে তোলে। মনে হয়, আর কেউ নয়, পাঠকজীই জেগে রয়েছেন। এক দুর্দান্ত প্রহরীর নিদ্রাহীন চোখের সতর্ক দৃষ্টি আগুন হয়ে জ্বলছে।

প্রসন্নতায় ভরে ওঠে মন। জীবনের ভিতরে ও বাহিরে তাকিয়ে প্রত্যাখ্যানের কোন চিহ্ন খুঁজে আর পায় না। এখন একবার হিসাব করলেই তো দেখা যায়, আজকের পথের ধূলোয় মাত্র একটি দিনের অভিযানের শেষে অনেকগুলি উপহার নিয়ে সে ঘরে ফিরছে। অনুপমের মত ব্যথার বান্ধবের অঙ্গীকার, এই প্রাক্-ইতিহাসের কৃতজ্ঞতার কুঠার, আর ঐ নিরাকার অন্ধকারে জ্বলন্ত আলোক-শিখার আশ্বাস।

হল ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। মিত্রা দেবী জেগে বসে রয়েছেন কুশলের প্রতীক্ষায়। ঠিক আলোকটার নীচেই দেয়াল ঘেঁষে মেজের উপর একটা আসনে বসে রয়েছেন, আর বই পড়ছেন।

নিশ্চিন্ত মনে বই পড়তে পারছিলেন না মিত্রা দেবী। মাঝে মাঝে বইয়ের উপর থেকে চোখ তুলে নিয়ে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে। উৎকর্ণ হয়ে শোনবারও চেষ্টা করছিলেন, ফটক খোলার কোন শব্দ যদি শোনা যায়।

ভুলতে পারছিলেন না মিত্রা দেবী, সদ্য রোগ থেকে উঠে দুর্বল শরীর নিয়ে বের হয়ে গিয়েছে কুশল। মাত্র সাতটা দিন হলো, পেটে একটু পথ্য পড়েছে, এখনও

ভাল ক'রে হাঁটবার মতও গায়ের জোর পায়নি, তবু বের হয়ে গিয়েছে কোথায় কোন্ পাহাড়-বনে ঘুরে বেড়াতে কে জানে! এই অবুঝ ছেলের মনের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। শুধু আজই নয়, চিরটা কাল এমনি ক'রে জ্বালিয়ে···।

আজ আর রাগ না হয়ে পারে না মিত্রা দেবীর। দরজার দিকে বৃথা একবার ক্ষুব্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে, তার পরেই শান্ত হবার চেষ্টা করেন। পাতা উলটিয়ে যোগ-বাশিষ্ঠের অন্য একটা অধ্যায় খুঁজে বের করেন, পড়তে থাকেন।

কিন্তু ঠিক মন দিয়ে পড়তে পারেন না। বড় অস্বস্তি বোধ হয়। শুধু কুশলের জন্য এই চিন্তাকুল প্রতীক্ষার জন্য নয়। যেন দ্বন্দ্ব বেধেছে আনন্দসদনের মায়ের মনে আর আনন্দসদনের পুজোর ঘরের সাধিকার মনে। সংসার থেকে আলগা হবার সাধে আর সংসারের সঙ্গে লেপটে থাকা মায়ার দায়ে। মিত্রা দেবীর মন চাইছে, সব দায় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পুজোর ঘরের জীবনে ঢুকে পড়তে। কিন্তু কুশল যেন আজও অবুঝ ছেলেমানুষ হয়ে মিত্রাদেবীকে চাইছে ধরে রাখতে, যত স্নেহ উৎকণ্ঠা আর মমতার মা ক'রে রাখতে।

মাঝরাত্রি পার হয়ে গিয়েছে, আজকের এই বিনিদ্র উদ্বেগের ভার নিয়ে কুশলের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থেকে বুঝতে পারেন মিত্রাদেবী, বড় বেশি জ্বালাচ্ছে এই ছেলে।

হঠাৎ ফটকের দরজায় শব্দ বেজে ওঠে। ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে হলঘরের ভিতরে ঢুকে মিত্রা দেবীকে দেখতে পেয়েই কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল।

—তুই কি ভেবেছিস? রাগ করেই বলেন মিত্রা দেবী। কোন উত্তর না দিয়ে কুশল শুধু মিত্রাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মায়ের মুখের এই ছবিটি যেন অনেকদিন হলো কোথায় লুকিয়েছিল, আজকের ঘটনায় সেই ছবিটি বিস্মরণের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে।

—এমন ভয়ানক ব্যামো থেকে সেদিন মাত্র সেরে উঠেছিস, পেটে মাত্র একটু চিঁড়ে-সেদ্দ পড়েছে, চলতে গেলে পা কাঁপে, তবু এমন বে-আক্কেলের মত কাণ্ড করছিস কেন?

কুশল—কি করলাম মা?

মিত্রা দেবী—বেরিয়েছিস সেই দুপুরে, আর ফিরে এলি মাঝরাত পার ক'রে? ধাড়ি হয়েছিস, তবু আজ পর্যন্ত তোর ছেলেমানুষি গেল না।

হাসতে থাকে কুশল। দেখতে ভাল লাগছে মা'র মুখের এই রূপ, শুনতে ভাল লাগছে মা'র কথার ধমকগুলি। বহুদিন অতীতের সেই হারিয়ে-যাওয়া ছেলেমানুষি

প্রাণটা যেন মা'র কথার ধমকে নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। অবুঝ অবাধ্য দুরন্ত ছেলে, মায়ের রাগ ভাঙ্গাবার কৌশলটাও ভাল ক'রেই তার জানা আছে।

একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মিত্রা দেবীর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কুশল।—তুমি মিছামিছি এত চিন্তা করছো মা। এই দেখ কি নিয়ে এসেছি।

চকমকি পাথরের কুঠারটা মিত্রাদেবীর চোখের সামনে তুলে দেখায়, যেন স্কুলের স্পোর্টে ফার্স্ট হবার গৌরবে একটা প্রাইজ পেয়ে সগর্বে সেই প্রাইজ মাকে আজ দেখাচ্ছে কুশল।—এই দেখ, জংলিরা যাবার সময় আমাকে উপহার দিয়ে গেছে।

মিত্রা দেবী হেসে ফেলেন—চল, খাবি চল।

খেতে বসেও আজ কলরব করে কুশল।—শিলোড়া ঘাটে আমি জংলিদের জন্য বড় ক'রে একটা সদাব্রত করবো মা।

মিত্রা দেবী—ভালই তো, তবে বেশি তাড়াহুড়ো করিস না।

কুশল—সার্ভে অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে অন্যায়ভাবে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমিও ছাড়বো না, শেষ পর্যন্ত লড়বো।

মিত্রা দেবী—যা করবি, মন মেজাজ শান্ত রেখে করিস।

কুশল—ধাঙ্গড় স্কুলে হেডমাস্টারির কাজটা খালি ছিল, কিন্তু চেয়ারম্যান আমার দরখাস্ত গ্রাহ্যই করলো না।

মিত্রা দেবী—তার জন্যে আক্ষেপ ক'রে লাভ কি? অন্য একটা কাজের চেষ্টা কর।

কুশল—হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে।······আর ধর যদি কোথাও চাকরি না পাই, তবুও পরোয়া করি না। ষ্টেশনে শোলার পুতুল ফেরি ক'রে বেচবো।

মিত্রা দেবী আবার হেসে ফেলেন—ছেলে যে বড় সাহসী হয়ে উঠেছে দেখছি!

খাওয়া শেষ হয়, তবু বসে থাকে কুশল, একটার পর একটা যেমন-ইচ্ছা প্রসঙ্গ তুলে মায়ের কাছে যেন তার সব ছেলেমানুষি দম্ভ দুঃসাহস আর আশার কথা কলরব ক'রে বলতে চায়, থামতে চায় না।—আমলকির জঙ্গলটা একটা তীর্থের মত জায়গা মা, অনেকগুলি শিবের মূর্তি আমিই খুঁজে বের করেছি। কিন্তু গঙ্গাধরটাকেই পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ গঙ্গাটা এদিকে মিউজিয়ম ঘরে একা একা···।

মিত্রা দেবী—নে হয়েছে, আর গল্প করতে হবে না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে চোখমুখ বসে গেছে, শুয়ে পড় গিয়ে। নইলে, নারায়ণ না করুন, যদি শরীরটা আবার খারাপ হ'য়ে পড়ে···।

কুশল উঠে দাঁড়ায়—ভালই হবে, তোমাকে আবার জ্বালাতে পারবো।

মিত্রা দেবী—আমাকে জ্বালাবার তোর এত শখ কেন ?

কুশল—জ্বালাবো বৈ কি, নইলে পুজোর ঘরে সটকে পড়বে তুমি।

ছেলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকেন মিত্রা দেবী। চোখ দুটো তাঁর আরও মায়াময় হয়ে ওঠে। স্নেহোদ্বেল স্বরে বলেন—না রে বাবা, ওসব আর করিসনি, আমাকে ভালয় ভালয় আলগা হ'তে দে।

কুশল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে থাকে, মা'র মুখটা আজ যেন একটা ভারমুক্ত মনের পুলকে নন্দিত হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে ভালয় ভালয় আলগা হতে পারবেন, এই আশার বার্তা আজই তাঁর কাছে এসে পৌছেছে। আজই দুপুরে এসেছিলেন রেখা বৌদি নামে এক মহিলা, যিনি তাঁর হাসিখুশির উচ্ছলতা দিয়ে আনন্দসদনের প্রাণটাকে হাসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কেন এসেছিলেন তিনি, সবই মনে পড়ে কুশলের।

মিত্রা দেবী হলঘরে ঢুকে তাঁর যোগবাশিষ্ঠ তুলে নিয়ে আসেন, তারপর উপর-তলার ঘরের দিকে চলে যান। শুনতে পায় কুশল, মিত্রা দেবী নিজের মনেই বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন—স্বরূপা আসছে, আর আমার কোন ভাবনা নেই, সব দায় বুঝবে স্বরূপা।

যখন নিজের ঘরে ঢোকে কুশল তখন বুঝতে পারে, ক্লান্ত হয়েছে খুবই। রুগ্ন শরীরে নেহাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় এতক্ষণ ছুটোছুটি করতে পেরেছে, নইলে পারতো না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাতের গভীরতাও বুঝতে পারে, কিন্তু তবু চোখে যেন ক্লান্তি আসছে না। মনটা রাতের পাখির মতই নিদ্রাহারা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠছে।

আবার নতুন ক'রে মনে পড়ে। প্রত্যাখ্যান কই ? আকস্মিকের উপহারে একে একে জীবনটা যে সত্যিই ভরে উঠছে। স্বরূপা আসবে, আনন্দসদনের ঘরের বাতাস এই প্রতিশ্রুতির স্পর্শে আজ পুলকিত হয়ে উঠেছে। দশ বছর ধরে যার পায়ের শব্দ এবাড়ির প্রতিটি ইঁট-পাথরের কাছে চেনা হয়ে আছে, সে-ই আসবে প্রথম অভ্যাগতার মত, একেবারে অচেনা অজানা নবমধুরার মত।

জানালাটা খুলে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল। বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখা যায় না। আলো-আঁধারের উপর কুয়াশাগুলিকে অদ্ভুত দেখায়, নিস্তব্ধ রাতের স্বপ্নগুলি যেন গলে গলে ছড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকে, ঐ তো আর কতই বা দূরে, ফুলবাড়ির রাস্তার রক্তকরবী। এখনি তো তার কাছে যাওয়া যায়। ইচ্ছা করে, এই স্বপ্নরাজ্য হাতড়ে হাতড়ে তাকে আজ আবিষ্কার করতে, জীবনে এই প্রথম তার ঘুম ভাঙিয়ে প্রশ্ন করতে—কেন আসছো ?

হ্যাঁ, লোভ হয় বৈ কি? উৎসবের দীপালোকে পৃথিবীর সকল চক্ষুর সম্মুখে আর ক'দিন পরেই যে আসবে কুশলের জীবনে, তাকে আজ গোপনে দেখা দিয়ে একবার বিব্রত করতে ইচ্ছা হয়। চিরকালের মত জীবনের পাশে পাশে যাকে আপন ক'রে পাওয়া যাবে, তাকে একবার এই স্বপ্নরাজ্যের ক্ষণিকার রূপে এখনি গিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে, লোভও হয় কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না কুশল।

আর একটু পরেই বোধ হয় ভোর হবে। শুনতে পাওয়া যায়, দূরে পার্কের কদমগাছের মধ্যে একটা রাতের পাখি শিস দিয়ে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

জানালা বন্ধ ক'রে দেয় কুশল। দেরাজের ভিতর থেকে চিঠির কাগজ আর একটা খাম বের ক'রে টেবিলের উপর রাখে। লিখতে থাকে।

"তোমার রেখা বৌদির হাসি আজ আমার ভয় ভেঙে দিয়ে গেল। তাই তোমাকে চিঠি লিখতে পারছি।

"চিঠি নয় স্বরূপা, আমার মন আজ তোমার হাত ধরে ডাকছে, এস। একটি বছর ধরে আমার পৃথিবীতে কত ঝড় এল আর গেল, কত অন্ধকার পুড়লো, কত অহংকার ভাঙলো, আর ফুটে উঠলো শুধু একটী রক্তকরবী কত সুন্দর হয়ে, সে গল্প শুনতে কি ইচ্ছা হয় না তোমার?

"চিরকাল তো নিজের থেকেই এসেছ। আজ আমার ডাক শুনে একটিবার সময় ক'রে এস। দেখতে চাই তোমাকে। কেন? তা বলতে পারবো না।"

•

ঘুমিয়ে পড়ার আগে যার কথা একেবারেই মনে হয়নি, ঘুম ভাঙবার পর আজ হঠাৎ তারই কথা মনে পড়ে নবলার।

তাই তো, কোথায় গেল সেই লোকটা? গেল তো গেলই, কোন খবর আর পাওয়া গেল না।

আয়া ঢুকলো ঘরে। রোজই যেমন আসে, কপাল টিপে দিয়ে নবলার ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু আয়ার কাজ বাঁচিয়ে দিয়ে আজ নিজের থেকেই জেগে বসে আছে নবলা। আয়া এসে শুধু মশারি খোলে আর বিছানা তোলে। মুখ ধোওয়ার জন্য গরম জলের ফ্লাস্ক টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চলে যায়।

সেই লোকটাও তো বড় বড় কথা বলতো, আর বড় বড় স্বপ্ন দেখতো। আজ এখন কি করছে লোকটা? বেঁচে আছে কি না, তাই বা কে জানে?

একা একা ঘরের ভিতরে বসে কতগুলি পুরনো দিনের কথা নতুন ক'রে আজ বারবার মনে পড়ে নবলার।

তবে কি এতদিন পরে সেণ্ট ডেনিসের প্রাক্তনা ছাত্রী নবলার মনেও রিসার্চ করার স্পৃহা জাগলো ? নইলে মাঘ মাসের এত বড় একটা হিমেল রাত্রি ঘুমের আরামে পার ক'রে দিয়ে জেগে ওঠার পর, আজকের স্বপ্নগুলিকে ভুলে গিয়ে, অনেকদিন আগের কথাগুলিকে স্বপ্নের মত ভাবতে ইচ্ছা করে কেন ? কেন জানতে ইচ্ছা করে, এক বছর অতীতে দেখা একটি পিয়ালের নীচে সেই ছায়াটি কি এখনও আছে ?

মুখ ধোওয়া হয়ে যায়। খানসামাও ছোট চা নিয়ে আসে। চা খেয়ে সাজ বদল করে নবলা। একটা আসমানি ক্রেপের শাড়ি প'রে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

লোকটা শুধু লোভীর মত তাকিয়ে থাকতো এই মুখের দিকে, যেন একটা স্বর্গের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু বড় দুর্বল ছিল লোকটা। বড় বড় কথা শুনতে ভালবাসতো, আর তেমনি বড় বড় কথা ব'লে মন ভোলাতো। একটি বারের মতও কোন কথার প্রতিবাদ করলো না, ভ্রূকুটি করলো না। যদি করতো, তাহ'লে হয়তো···।

জানালার কাচে রোদ পড়েছে বোঝা যায়। কাচের গায়ের কুয়াশা গলে গিয়ে জল হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সাদা ফ্ল্যানেলের একটা জামপার প'রে ঘরের বাইরে এসে ব্যালকনির উপর দাঁড়াতেই দেখতে পায় নবলা, প্রভাতী রোদে ঝলমল করছে হ্যাপিমুকের ঝাউ আর পপলার।

দিনের হ্যাপিমুক আর রাত্রের হ্যাপিমুকে তফাৎ অনেক, রাত্রিগুলি যেন নিরাবরণ লজ্জা ও ভীরুতার মধ্যে আর্তনাদ চেপে নিঃশব্দে হাঁসফাস করে, আর দিনগুলি হেসে ওঠে হো হো ক'রে।

সত্যিই হো হো ক'রে হাসছিলেন মৃগেনবাবু। নীচে লনের উপরেই মিষ্টি রোদে চায়ের টেবিল ফেলা হয়েছে। নন্দা দেবী বসে আছেন, মৃগেনবাবুও বসে আছেন। বনমালী দাঁড়িয়ে আছে কাছেই, তার হাতে নন্দা দেবীর মেরিনো পশমের ওভারকোট আর প্ল্যাস্টিকের ছোট হাত-ব্যাগটিও আছে।

নবলার অস্তিত্বও যেন ভেঙে দু' ভাগ হয়ে রয়েছে আজ। একটা রয়েছে মনের ভাবনায়, আর একটা রয়েছে হ্যাপিমুকের কোলে। ভাবনাগুলি নীরব ক'রে দিতে চায় নবলাকে। হ্যাপিমুক চায় আরও মুখর ক'রে দিতে। ভাবনাগুলি তাকে থামিয়ে দিতে চায়, হ্যাপিমুক চায় আরও ঠেলে এগিয়ে দিতে। মনের মধ্যে একটা অবাস্তব কল্পনা, আর চোখের সামনে বাস্তব হ্যাপিমুক, নবলার অন্তরাত্মা আজ দুই হাতছানির দ্বন্দ্বে প'ড়ে যেন তাকিয়ে দেখছে, একবার এদিকে আর একবার ওদিকে।

সে মানুষটির কিন্তু জেদ আছে বেশ। তাকে আর ডাকা হয়নি, সেও আর এলই না। কিন্তু সত্যিই কি মানুষটা এখনও প্রতীক্ষা করছে, ডাক আসবে বলে ? এবং

যদি তা'ই হয়, তবে? তবে আর একবার তাকে কাছে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করতে তো পারা যায়, সত্যিই কি সে ভালবাসে নবলাকে? ভাবতে ভাল লাগে, জানতে ইচ্ছা করে, কিন্তু...।

কিন্তু কি হবে সেই পিয়ালের ছায়াকে আর স্মরণ ক'রে? ভালবাসার কোন স্মৃতি পড়ে নেই সেখানে, পড়ে আছে একটা ভয়ংকর ভুলের স্মৃতি। পিয়ালছায়ার সব স্নিগ্ধতাকে অশ্রদ্ধা ক'রে মধ্যাহ্নের রৌদ্রজ্বালাকে জীবনে আহ্বান করেছিল দু'জনেই। একটা সুখের লোভ আর একটা সুখের লোভের হাত ধরেছিল। সেখান থেকেই তো যত ভুলের আরম্ভ।

নন্দা দেবীর গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের হয়ে ঝাউয়ের পাশে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাতে থাকে। বাগানে মার্বেলের পরিগুলিকে মোম ঘ'ষে চকচকে করার জন্য এগিয়ে আসছে মালী, ছোট কাঠের সিঁড়িটি হাতে নিয়ে।

ভুল করেছিল দু'জনেই। তাই বোধহয় আজ লোভ হয় নবলার, আর একবার পিয়ালের ছায়ার সুযোগ পেতে, নতুন ক'রে সেখান থেকেই ভুলভাঙার ব্রত আরম্ভ করতে। আর একবার কাছে ডেকে নিয়ে মনের সাধে ধমক দিয়ে তাকে শুনিয়ে দেওয়া যায়—এবার ং'কে ভালবেসে সুখী হও, সুখকে ভালবেস না।

কিন্তু কা'কে কথা শোনাতে চায় নবলা? কোথায় সে? এই বাড়িরই দুয়ার থেকে একটা নতুন গাড়ির হর্নের শব্দে তাড়িত হয়ে সেদিন অন্ধকারের মধ্যে সরে গেল সেই মানুষটা। পর মুহূর্তে তাকে আর দেখা গেল না। আজ এতদিন পরে, এত দেরি ক'রে আবার ফিরে তাকিয়ে লাভ কি? এ ছাই আবোল তাবোল চিন্তার কোন অর্থ হয় না।

চারদিকে এবং নীচের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে নবলা, বেশ বেলা হয়েছে। মা বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হয়েই রয়েছেন। বাবার হাতে একটা ফাইলও রয়েছে, তিনিও বোধ হয় এখনি সিমেণ্টের সোরাবজীর সঙ্গে বের হবেন। কাজের সাড়ায় উৎফুল্ল ও রোদে ঝলমল এই হ্যাপিহুকের মধ্যে শুধু নবলাই বা কেন একটা গুমোট হয়ে ঘুরে বেড়াবে আসর-ছাড়া হয়ে, একা একা ব্যালকনির উপর?

দেহে ও মনে সাড়া জাগিয়ে তরতর ক'রে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসে নবলা। সোজা একেবারে চায়ের আসরে গিয়ে বসে, হাসির উচ্ছ্বাস ছড়ায়।

নন্দা বলেন—ধন্যি তোর ঘুম। আজকাল একেবারে প'ড়ে প'ড়ে শীতের সাপের মত শুধু ঘুমোচ্ছিস।

শীতের ভয়ে নবলা একবার শিউরে উঠেই বলে—কে জানতে গেল, আজকাল

এখানে রোদের মধ্যে চায়ের টেবিল পড়ছে। জানলে কি আর ঘরে বসে থাকতাম ?

নন্দা দেবী তাঁর হাতঘড়ির দিকে একবার তাকান। এখনি বের হতে হবে তাঁকে। মার্কেটে যাবার আগে প্রথমে একবার যাবেন চারু আর্ট স্টুডিওতে। ক'দিন থেকে রোজই সকালে একবার পোজে বসতে হচ্ছে, চারু পেন্টারকে দিয়ে একটা বড় সাইজের প্রোট্রেট করাচ্ছেন নন্দা দেবী!

মৃগেনবাবুও একবার তাঁর পকেটঘড়ি বের ক'রে সময় দেখেন, সোরাবজী হয়তো এসে গিয়েছেন এতক্ষণে।

এই উৎকণ্ঠার মধ্যে এসে গেল খাবার সমেত বড় চা। মৃগেনবাবু একটা বিস্কুট চিবিয়ে তিন চুমুকে চা শেষ করেন। নবলা আস্তে আস্তে আয়েস ক'রে চা খায়। আর নন্দা দেবী খান খুবই সাবধানে ও ভয়ে ভয়ে, ঠোঁটের রং বাঁচিয়ে।

নন্দা হাসতে হাসতে বলেন—দেবী তোকে ঠাট্টা ক'রে একটা নাম দিয়েছে।

নবলা হেসে ভ্রূকুটি করে—কি নাম দিয়েছে বল তো ?

নন্দা—তোর নাম দিয়েছে রাগিনী দেবী। আজকাল রাগ ক'রে একেবারে ওপরে উঠে বসেই রয়েছিস, নীচে নামিস না, তাই।

নবলা—উনিও তো একটি লজ্জাবতায়। মিছিমিছি, কোন কারণ নেই, তবু একেবারে যেন লজ্জায় মুখটি ঢেকে আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন।

মৃগেনবাবু হো হো ক'রে হেসে ওঠেন—রাগ আর লজ্জা, যত সব বাজে জিনিস নিয়ে তোরা রয়েছিস। আমি বেশ আছি আমার এই হিসেবটি নিয়ে, সব চেয়ে খাঁটি আর কাজের জিনিসটি!

মৃগেনবাবু তাঁর হাতের ফাইলের উপর মৃদু মৃদু টোকা দিয়ে হাসতে থাকেন।

নন্দা বলেন—মরতে আমারই শুধু কোন ঝঞ্ঝাট নেই। রাগ করতে ভুলে গেছি, লজ্জা-টজ্জারও ধার ধারি না, আর হিসেব ক'রে চলতেও পারি না।

তিনজনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠেন। শীতের একটি সুন্দর প্রভাতে, যেন হ্যাপিহুক নামে একটি ক্লাবে তিনজন সুপ্রসন্ন লাইফ-মেম্বার এক সঙ্গে হাসতে থাকেন। সব চেয়ে আগে হাসি থামিয়ে আর পকেটঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যান মৃগেনবাবু। সিমেন্টের সোরাবজী নিশ্চয় এতক্ষণে এসে বসে আছেন হলঘরে।

নন্দা দেবীও তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকান। নবলা আচমকা প্রশ্ন করে—আচ্ছা মা, সেই লোকটা কোথায় গেল ?

নন্দা দেবী—কোন্ লোকটা ?

নবলা—সেই যে আগে প্রায়ই আসতো, কুশল।

নন্দা—সে তো সার্ভে অফিসেই এতদিন কাজ করছিল।

নবলার চোখের ভুরু দুটো যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে থরথর ক'রে ওঠে—সার্ভে অফিসে?

নন্দা—হ্যাঁ।

নবলা—সেখানে আবার কি কাজ করছিল?

নন্দা—কেরানি টেরানির কাজ।

কাচের পেয়ালার হঠাৎ ভাঙনের শব্দের মত ঝংকার দিয়ে নবলা হেসে ওঠে—শেষে এই দশা হয়েছিল!...এখন কি করছে?

নন্দা—তা জানি না। তবে এখন আর সার্ভে অফিসে নেই। দেবী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে অবাধ্যতার জন্য। কি একটা অবিশ্বাসের কাজ ক'রে অফিসে একটা গোলমালও বাধিয়েছে কুশল।

নবলা—তাই নাকি? লোকটা ঐরকমই ছিল। তুমি তো জান না সে খবর, আমিও একদিন সোজা ঘরের ভেতর থেকে ডেকে নিয়ে ওকে একেবারে গেট পার ক'রে দিয়েছিলাম।

বলতে বলতে নবলার হাসি-ভরা চোখ দুটো জলে ধোওয়া কাচের মত ঝক ঝক করতে থাকে।

বনমালীর কাছ থেকে হাত-ব্যাগটা নিয়ে চিরুনি বের করেন নন্দা দেবী। ব্যাগের আয়নার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে চিরুনি বুলিয়ে কপাল ও কানের কাছে চুলের ঢেউ দুটো আর একটু তুলে দেন।

নিজের পেয়ালায় আবার চা ভর্তি ক'রে নিয়ে নবলা বলে—লোকটা ভিখিরি টিখিরি হয়ে গেছে বোধ হয়।

প্রসঙ্গের মধ্যে বনমালী হঠাৎ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলে—না, সেরকম কিছু নয়।

নবলা আশ্চর্য হয়ে বনমালীর দিকে তাকায়—তুমি ওর খবর জান না কি বনমালী?

বনমালী—হ্যাঁ, তবে বিশেষ কিছু নয়। ফুলবাড়িতে আমার এক কুটুম আছে, তার কাছেই কিছু কিছু শুনেছি।

নবলা—ভদ্রলোকটা এখন কি করছে জান?

বনমালী—জংলিদের জন্য একটা সদাব্রত করেছেন।

নবলার চোখ দুটো আতঙ্কিত হয়—এ আবার কেমন কাজ? সোসাইটি ছেড়ে দিয়ে শেষে জংলি হয়ে গেল লোকটা?

বনমালী—জংলিদের সেবা করতে গিয়ে কলেরাও হয়েছিল।

নবলা চমকে ওঠে—কি ভয়ানক কথা বলছো বনমালী!

বনমালী—কিন্তু বেঁচে গেছেন।

নবলা যেন হাঁপ ছাড়ে—যাক, খুব বেঁচেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে নবলা। তারপর যেন একটা ধিক্কার দিয়ে বলে—কিন্তু বেঁচে থেকেই বা করছে কি? এমন ক'রে জীবনটাকে নামিয়ে দিয়ে কি লাভ হলো?

বনমালী এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। নবলা এইবার চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বনমালীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—আর কোন খবর জান না?

বনমালী লজ্জিতভাবে হাসে—শুনেছিলাম, বিয়ে করছেন।

—বিয়ে? চমকে উঠে, হাসি ছুটিয়ে আর বিদ্রূপ ক'রে নবলা যেন খবরটাকে চূর্ণ ক'রে দিতে চায়—এর মধ্যেই আবার বিয়ে? সুখের যে শেষ নেই দেখছি!

নন্দা দেবীও হেসে ফেলেন, হাতঘড়ির দিকে তাকান। নবলা হাসি থামালেও মুখের উপর যেন সেই হাসির একটা লালচে জ্বালার আঁচ ফুটে ওঠে। কিন্তু প্রশ্ন থামাতে পারে না। যেন একটা উগ্র কৌতূহলের বিকারে প'ড়ে ছটফট ক'রে ওঠে নবলা।—কা'কে বিয়ে করছে জান?

বনমালী—ফুলবাড়ির একটি মেয়েকে।

নবলার চোখ দুটো হতভম্ব হয়ে গেলেও ঘটনাকে যেন স্বীকার করতে চায় না।—ফুলবাড়ির মেয়ে মানে কি?

নবলার কৌতূহল সমাপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না। কি একটা পরম জ্ঞাতব্য আছে, যা না জানা পর্যন্ত বোধ হয় শান্ত হতে পারবে না নবলা। আজ এই মুহূর্তে যেন সব চেয়ে বড় দুঃসাহসে প্রলুব্ধ হয়ে উঠতে চাইছে নবলা। এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি, ইচ্ছা করলে আজই সেই পথভ্রান্তকে ডাক দিয়ে প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। তাহ'লে ফুলবাড়ির বাধা মিথ্যা হয়ে যেতে কতক্ষণ?

নবলা—কেমন মেয়ে? দেখতে কেমন? কি করে মেয়েটা? তুমি দেখেছ? চেন নাকি ওদের?

নবলার এতগুলি প্রশ্নের উপদ্রব থেকে সহজে বাঁচবার জন্যই বোধহয় বনমালী সংক্ষেপে উত্তর দেয়—ভাল মেয়ে।

নবলা বিরক্ত হয়ে ওঠে—ভাল মানে কি? কি রকম, কিসের মেয়ে?

বনমালী সসংকোচে বলে—এই আমাদেরই মত গরীব ঘরের মেয়ে।

আর জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। নবলার সব কৌতূহলের বিলাস বনমালীর কথার একটি আঘাতে যেন ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। লোকটা পালিয়ে গিয়ে এরই মধ্যে একেবারে ভিন্ন একটা পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছে, আর, একটা পাথরের মূর্তিকে জীবনের স্বপ্ন ক'রে ফেলেছে। গরীব ঘরের মেয়ে, ওরকমের পাথুরে মূর্তিকে হারিয়ে দেখার সাধ্যি নেই কোন রঙিন ফানুসের।

লোকটা বোকা নয়, দুর্বল নয়, ঠিক সময়মত সামলে নিয়েছে। বিশ্বাস করেনি রঙিন ফানুসের প্রতিশ্রুতিকে, অপেক্ষায় থাকেনি ডাক আসবে বলে। শূন্য করেও রাখেনি নিজেকে, এরই মধ্যে তৈরি ক'রে ফেলেছে তার ভালবাসার ঘর, তার মধ্যে একটি প্রদীপও এসে গিয়েছে আলোয় মধুর হয়ে। বেঁচে গেছে লোকটা, সার্থক হয়েছে জীবন।

চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে আবার টেবিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে নবলা, আর নন্দা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন ঘৃণাভরা অস্বস্তিতে ছটফট ক'রে হেসে ফেলে।— শুনলে তো মা, লোকটা কি রকম ব্যর্থ হয়ে গেল!

নন্দা দেবী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতে বলেন—একটা কথা তো শুনিসনি নবলা। হিলের ওপর শুকতারা নামে পরেশবাবুদের বাড়িটা আমি কিনেছি।

নবলা কৃতার্থভাবে হাসে—বেশ হলো, খুব সুন্দর বাড়িটা।

নন্দা—ও বাড়িতেই উঠে যাব।

নবলা—খুব ভাল হবে মা।

চায়ের আসর ছেড়ে চলে যাবার আগে নন্দা দেবী নবলাকে ব্যস্তভাবে অনুযোগ করেন—আজকাল পিয়ানোতে একেবারেই হাত দিস না কেন, কি করছিস তুই?

নন্দা দেবী ওঠেন। নবলাও উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।—শুকতারাতে কবে উঠে যাব মা?

নন্দা বলেন—আজ-কালের মধ্যেই।

নন্দা দেবী তাঁর অপেক্ষমান গাড়ির দিকে চলে যেতেই নবলাও উৎফুল্ল হয়ে নিজের মনের আবেগে দু'পাশের টব থেকে ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বারান্দার দিকে চলে যায়।

পিছনে তাকিয়ে আর কিছু দেখবার নেই, সবই মুছে গিয়েছে। পুরনো কথা আর শোনবার মত কিছু নেই, শোনা শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু এগিয়ে যেতে হবে আর উপরে উঠতে হবে।

সিঁড়ির কাছে এসে কয়েকটি মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নবলা।

মনে হয়, সারা জীবনের ছুটে-চলা নেশার সব উগ্রতা আজ একটা মরণ-অবসাদের মত হয়ে তার প্রাণের উপর চেপে বসেছে। চলবার আর শক্তি নেই। অবসন্নভাবে রেলিং ধ'রে ধ'রে যেন জোর ক'রে নিজেকে টেনে টেনে উপরে ওঠাতে থাকে নবলা।

ফ্ল্যানেলের জামপারটা গা থেকে খুলে ফেলতেই শরীরটা যেন হালকা হয়ে ওঠে, একটা ভার ঘুচে যায়। ক্রেপ-ভয়েল-মসলিনের বোঝায় ভারাক্রান্ত এই জীবনে নবলা নামে একটি মেয়ের সত্তা চাপা পড়ে গিয়েছে। এই বোঝা দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, একটা কালপেড়ে মোটা শাড়ি পরে, কপালে কুঙ্কুমের টিপ লাগিয়ে আর মোটা বিনুনি ক'রে খোঁপা বেঁধে যদি হ্যাপিনুকের এই নবলাকে একেবারে আটপৌরে ক'রে দেওয়া যায়, তবে এই জীবন হালকা হয়ে উঠতে পারে বৈকি। তবেই তো পৃথিবীর চক্ষুগুলি তাকে দেখতে ভুল করবে না, একটা মেয়ের জীবনকে একটা রঙিন ফানুস ব'লে ভুল ক'রে শুধু দু'দণ্ডের হাততালি দিয়ে উল্লাস করবে না।

আয়া ঢোকে ঘরে। টেবিলের উপর স্টোভ জেলে জল ভরা একটা ফ্ল্যাগন চড়িয়ে দিয়ে যায়। প্রতিদিনের নিয়ম মত এখন ষ্টিমের ভাপ লাগিয়ে মুখ ধোওয়ার সময় হয়েছে নবলার।

জল ফোটে, ফ্ল্যাগনের ঢাকা খুলে দিয়ে চোখে মুখে ষ্টিমের ভাপ লাগায় নবলা। জোরে চোখ ঘষে আর মোছে। জীবনে এই প্রথম। এমন ক'রে চোখ ঘষতে হবে কখনও কল্পনা করতে পারেনি নবলা। বোধ হয়, আজ এই ভুল চোখ দুটোকে বদলে দিয়ে সত্যি সত্যি দু'টি মেয়েলি চক্ষু পেতে চাইছে নবলা, যেন আর দেখতে চিনতে ও বুঝতে ভুল না হয়, নিজেকে এবং পৃথিবীকেও।

তবে আর দ্বিধা কেন? ফ্ল্যাগনের বাষ্প আর চোখের বাষ্প এক হয়ে মিশে পুরনো দৃষ্টি মুছে দিয়েছে, পথ দেখতে পেয়েছে নবলা, তবে আর মুক্ত হয়ে যেতে কতক্ষণ? শক্ত হ'য়ে আর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায় নবলা।

সে-রাতে গেটের পপলার ভয়ানক অন্ধকার তুলে ভয় দেখিয়েছিল, তাই হ্যাপি-নুকের কয়েদির আত্মা পালিয়ে যেতে পারেনি। দিনের হ্যাপি-নুক ঝলমল করছে আলোকে, কোন অন্ধকারের ভ্রূকুটি আর পথরোধ ক'রে নেই। মৃগেনবাবু বাড়িতে নেই, নন্দা দেবী বাড়িতে নেই। এই মুহূর্তে সোজা নেমে গিয়ে একেবারে গেট পার হয়ে আটপৌরে পৃথিবীর মধ্যে চিরকালের মত মিশে যেতে আর বাধা কোথায়?

চঞ্চল হয়ে ওঠে নিশ্বাস, দুর্দম হয়ে ওঠে লোভ, আকুল হয়ে ওঠে দুঃসাহস। চকিতে একবার জানালার দিকে তাকিয়ে, পরমুহূর্তে সোজা নেমে চ'লে যাবার জন্য সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় নবলা।

কিন্তু এক পা'ও এগিয়ে যেতে পারলো না নবলা। দেখতে পায়, সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠছে আয়া। আলমারি খুলে বাদামি রঙের একটি জামদানি ব্লাউজ ও তোয়ালে বের করে আয়া। ক্রিম সেন্ট পাউডার ও রুজের একটা নতুন সেটও বের ক'রে ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখে। একটা টুল টেনে নিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে দিয়ে আয়া ডাক দেয়—মিস বাবা।

ডাকছে হ্যাপি-হুক, প্রতিদিনের নিয়মিত ঠিক সময়টিতে সমাদরের প্রতিধ্বনি তুলে নবলাকে সুন্দর হবার জন্য আহ্বান করছে।

ঘরে ঢোকে বনমালী, কাচের পেয়ালায় ভাইটামিনভরা মণ্ট ভর্তি ক'রে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে চলে যায়। যত্ন করছে হ্যাপি-হুক, প্রতিদিনের নিয়মিত ঠিক সময়টিতে।

কাচের পেয়ালায় হ্যাপি-হুকের ভাইটামিনভরা যত্ন এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়ে নবলা। তারপর সরে গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার কাছে। প্রতিদিনের নিয়মমত সকাল ন'টার সাজটা পরে। প্রসাধন করে, কোন খুঁত রাখে না। কোন ত্রুটি হয় না ভুরুর উপর শেড দিতে আর ঠোঁট দুটি লালচে ক'রে নিতে। আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই হ্যাপি-হুকের আদরের মেয়ে নবলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তারপর?

তারপর আর কি? হয় পিয়ানোর ঝংকার হয়ে উঠতে হবে, নয় শুকতারার আলো হয়ে ফুটে উঠতে হবে। একটা কিছু তো হতেই হবে। থেমে থাকতে পারে না নবলা, নেমে যেতেও পারে না। এবং, আপাতত কতগুলি হালকা হালকা বই পড়া ছাড়া হ্যাপি-হুকের জীবনে আর কোন কাজ খুঁজে পায় না নবলা।

ভুতুড়ে হিংসা আর সংসারদ্রোহীর দুঃসাহস যেন আজ রাতে শিবভারতের রূপ চুরি করার জন্য সার্ভে অফিসের আঙিনার ঘন অন্ধকারে প্রস্তুত হয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে জোন্সের ট্রাক আর লোকজন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায় এক হাতে শেরির গেলাস, আর এক হাতে তামাকের পাইপ নিয়ে ঘুরে ফিরে কাজ তদারক করে, নির্দেশ দেয়। মিউজিয়াম ঘরের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে এসে ট্রাকের উপর চাপানো হতে থাকে চটের কাপড় জড়ানো বামদেব বীরভদ্র আর কল্লোলিতকান্তি গঙ্গা। মাথায় ও গলায় পশমের কম্ফর্টার জড়িয়ে কেরানিবাবু অত্যুগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। ব্যবস্থা হয়েছে, তিনিই যাবেন ট্রাকের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত, একেবারে জোন্সের গুপ্ত আড়তে মূর্তিগুলি পৌঁছে দিয়ে আসতে।

আর দেখা যায়, সত্যি সত্যিই একটা আলোকও যেন প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নিম্নকুঞ্জের অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য রেখে, একটা আগুনের আলো। সার্ভে অফিসের ফটকের বাইরে, একটু দূরে, সুরকির সড়কের ঠিক মাঝখানে শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে আলো তৈরি ক'রে নিয়ে রামায়ণ পড়ছেন পাগলা পাঠকজী।

জোন্সের ট্রাক গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে ফটক পার হয়। তার পরেই গতি দ্রুত করার জন্য উর্ধ্বশ্বাস টেনে আর একটু অগ্রসর হতেই যেন বাতাসের মধ্যেই একটা ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে আচমকা স্তব্ধ হয়ে যায়। রাস্তার মাঝখানেই আগুন জ্বলছে, আর রামায়ণ পড়ছে পাগলা দারোয়ানটার মতই দেখতে একটা জীব। পথের এপাশে বা ওপাশে, কোনদিকেই পালিয়ে পার হয়ে যাবার মত জায়গা নেই।

এই অভাবিত বাধার প্রথম ধাক্কাতেই ট্রাকের ড্রাইভার আর লোকজন সরে পড়লো ভয় পেয়ে সবার আগে। ট্রাকটাকে পথের উপরই ফেলে রেখে সবাই গিয়ে ঢুকলো সার্ভে অফিসের ফটকের ভিতর। তার পর কেরানিবাবুও পালিয়ে এলেন, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁপলেন কিছুক্ষণ, রাগে কিংবা ভয়ে, কে জানে! মাঝে মাঝে গলা উঁচু ক'রে দেখতে থাকেন, কী ভয়ানক শক্ত হয়ে বসে আছে পাগলা দারোয়ানটা, আগুনখেকো দানবের মত!

দাঁড়িয়ে থাকে ট্রাক। লোভ উৎকোচ আর হিংস্রুটে বুদ্ধির রথকে অচল ক'রে রেখে দিয়ে বসে আছেন পাঠকজী। অচল ক'রে রাখবেন, যতক্ষণ না ভোর হয়, যতক্ষণ না লোকচক্ষু জাগ্রত হয়, আর হাজার হাজার লোক এসে হল্লা ক'রে দেবতা চুরির এই ষড়যন্ত্রকে হাতে হাতে ধরে ফেলে।

কিন্তু কেরানিবাবুও ততক্ষণ কাঁপুনি থামিয়ে আবার সাহস সঞ্চয় ক'রে ফেলেছেন। ট্রাকের ড্রাইভার আর লোকজনকে সাহস দিয়ে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলেন। হঠাৎ ভয়ে পালিয়ে যাওয়া লজ্জা কাটিয়ে এইবার যেন আক্রোশ তুলে এগিয়ে আসে সবাই, আবার ট্রাকের উপর উঠে বসে।

পথ খুঁজছে ট্রাক, মাঝে মাঝে চাপা হুংকারের মত সরোষে ট্রাকের হর্ন বাজে, তার পরেই পাঠকজীর উপর ঢিল পড়তে থাকে। কিন্তু পাঠকজী বসে থাকেন অনড় হয়ে। চলে যাবার পথ খোলা পায় না জোন্সের ট্রাক।

রাতের অন্ধকার যত ফিকে হয়ে আসে ততই ঝুপ ঝাপ ক'রে আরও বেশি ঢিল এসে পড়ে পাঠকজীর উপর। ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, অফুরান অনবরত ঢিল। পাঠকজী তবু অবিচল থাকেন। শেষ পর্যন্ত রাত্রিটাই শেষ হয়ে গেল, কাকের রবও শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা ঢিল যেন শেষ আক্রোশ নিয়ে ছুটে এসে লাগলো

পাঠকজীর কানের কাছে, চামড়া ফেটে গিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্তও ফুটে উঠলো। তবু বসে থাকেন পাঠকজী, একেবারে অনড় হয়ে, যেন একটা কঠিন বর্ম গায়ে জড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছেন, অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারছেন ভুতুড়ে ঢিলের আঘাত।

ফরসা হয়ে উঠলো পুবের আকাশ। হতাশায় আক্ষেপ ক'রে আর ধিক্কার দিয়ে ট্রাকের ইঞ্জিনটা যেন গর্জন ক'রে উঠলো। ব্যর্থ তস্করের মত ধীরে ধীরে পিছু হেঁটে সার্ভে অফিসের কম্পাউণ্ডের ভিতর আবার ফিরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো মূর্তি বোঝাই ট্রাক।

সকাল হয়, সূর্যের আলোতে আর পাখির ডাকে জেগে ওঠে মহারাজপুর। পাঠকজীর রাতের পাহারাও শেষ হয়। রামায়ণ বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ান, সকাল বেলার সূর্যকে দু'হাত তুলে প্রণাম জানান।

এই ক'দিন ধ'রে রোজই সারারাত এইভাবে পথের উপর আগুন জেলে পাহারা দিয়েছেন পাঠকজী, আর রোজই পাহারা দিতে দিতে সকাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু চোরের দেখা পাননি। আজই পাওয়া গেল, তাই সকাল হয়ে গেলেও আজ আর পথ ছেড়ে নড়তে চান না পাঠকজী। আশঙ্কা হয়, রাতের তস্কর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেও আজ আরও ভয়ানক আক্রোশ নিয়ে দিনের আলোতেই এই পথ দিয়ে লুঠের জিনিষ নিয়ে চলে যাবে।

দু'একজন ক'রে ভোরের পথচারী মানুষ কৌতূহলী হয়ে পাঠকজীর কাছে এসে দাঁড়ায় আর বিস্মিত হয়। কেন, কিসের জন্য পথের উপর এই ছাই আর আগুনের পাশে রামায়ণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাঠকজী? তাঁর কানের কাছে রক্তের দাগ কেন?

পাঠকজী বলেন—একটু অপেক্ষা কর ভাই, এখানে থাক, কাজ আছে। গঙ্গাজী আর শিবজীর মূর্তি চুরি করার জন্য লোক ঢুকেছে ওখানে। কেউ বাধা না দিলে এখুনি নিয়ে পালিয়ে যাবে।

বেলা একটু বাড়ে, লোকের ভিড়ও বাড়তে থাকে। হঠাৎ বড় সড়কের দিক থেকে হর্ন বাজিয়ে একটা ট্যাক্সি সবেগে ছুটে এসে ভিড়ের কাছে দাঁড়ায়। পাঠকজী উল্লসিত হয়ে ট্যাক্সির কাছে এগিয়ে গিয়ে ভিতরের উপবিষ্ট ভদ্রলোকের দিকে হাত তুলে অভিবাদন জানান।—আপনি কোথা থেকে আসছেন মহারাজ?

ভদ্রলোক—দিল্লী থেকে।

পাঠকজী—সার্ভে অফিসের কাজ তদন্ত করতে?

ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করেন—হ্যাঁ, কেন?

পাঠকজী—কিছু না মহারাজ, রামজীর ইচ্ছা, আপনি ঠিক সময়মত এসে পড়েছেন!

জনতা দু'পাশে সরে গিয়ে ট্যাক্সিকে পথ ক'রে দেয়। ট্যাক্সি ছুটে গিয়ে, ফটক পার হয়ে সার্ভে অফিসের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

জনতাও দাঁড়িয়ে থাকে। আরও লোক এসে ভিড় জমিয়ে তোলে। পাঠকজীর কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে জনতা। হল্লা করে, ঢিল হাতে নিয়ে তৈরি হয়—দেখি কার সাধ্যি আছে এই পথ দিয়ে মূর্তি নিয়ে সরে পড়তে পারে।

আবার পাঠকজীর কথাতেই আশ্বস্ত হয়ে জনতা হাতের ঢিল ফেলে দেয়, শান্ত হয়, আর গভীর উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে সার্ভে অফিসের দিকে তাকিয়ে থাকে। তদন্ত অফিসার এসে গিয়েছেন, এখনই একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে। সেই চরম সংবাদটা জেনে নিয়ে তবে জনতা চলে যাবে, তার আগে নয়।

প্রতিদিনের নিয়মমত আজও দেখা যায়, কোদাল কাঁধে কুলির দল এবং সার্ভে-য়ারেরাও সাইটের দিকে চলে গেল, মেঠো পথ ধরে আমলকির জংগলের দিকে। বেলা বাড়ে, সুরকির পথে ধুলোর ঘূর্নি ওঠে, কিন্তু জনতা সরে না।

হঠাৎ হল্লা ক'রে জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে, অনেকে হাতে ঢিল তুলে নিয়ে দাঁড়ায়। পাঠকজী বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে থাকেন সার্ভে অফিসের ফটকের দিকে। দেখা যায়, ট্রাক আবার সগর্বে হর্ন বাজিয়ে ফটক থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসছে।

ঢিল মেরে থামাতে হলো না, ভিড়ের কাছে এসে যেন আপনা-আপনি থেমে গেল ট্রাক। একেবারে ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিয়ে চু'প করে দাঁড়িয়ে রইল। জনতাও ট্রাকের চারদিক ঘিরে চিৎকার করে—যেতে দেব না, মূর্তি চুরি করে নিয়ে পালাতে দেব না।

কিন্তু ট্রাকের উপরে সত্যিই কোন মূর্তি ছিল না।

শুকনো পাতা ঘাস আর নানা রকম জঞ্জালের স্তূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ট্রাক। পাঠকজী বললেন—এই জঞ্জালের ভিতরেই মূর্তি লুকানো আছে।

জনতা চিৎকার করে - নিশ্চয় আছে। এখুনি টেনে সব বের ক'রে ফেল। বের কর! বের কর।

সার্ভে অফিসের দিক থেকেও ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে ট্রাকের কাছে থামলেন, তদন্ত অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেবী রায় ও কেরানিবাবু।

তদন্ত অফিসার পাঠকজীর দিকে ভ্রূকুটি তুলে তাকালেন। দেবী রায় বলে—ওরই কথা বলেছি আপনাকে। সুপারভাইজর কুশল আর এই দারোয়ান, দুজনে মিলে

ষড়যন্ত্র ক'রে ঐ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে। তার ওপর আরও নানারকম অপবাদ রটিয়ে একটা হাঙ্গামা বাধাবার জন্যে দিনরাত এখানে ঘোরাফেরা করছে। আপনি এখন স্বচক্ষে দেখে নিয়ে···।

তর্জনী তুলে তদন্ত অফিসার পাঠকজীকে প্রশ্ন করেন—কি চাও? এখানে ভিড় করছো কেন?

পাঠকজী—মিউজিয়ামের মূর্তিগুলি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মহারাজ।

তদন্ত অফিসার—কোথায় মূর্তি?

পাঠকজী—এই ট্রাকের মধ্যেই রয়েছে, ঐ সব জঞ্জালের ভিতর লুকানো আছে।

তদন্ত অফিসার—বেশ, বের কর মূর্তি।

বলা মাত্র জনতা ট্রাকের উপর লাফ দিয়ে উঠে উৎসাহের সঙ্গে জঞ্জাল ঠেলে মাটিতে ফেলতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতার উৎসাহ নিভে আসতে থাকে। ঝুপ ঝাপ ক'রে এক একটি ঠেলায় ট্রাকের উপর থেকে জঞ্জাল মাটিতে পড়ে। সব জঞ্জাল সরানো হয়ে যায়, ট্রাকের পাটাতন দেখা যায়। কিন্তু কোন মূর্তির চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

জনতার মুখের চেহারা মূর্খ অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে; পাঠকজীর মুখ ম্লান হয়ে যায়, দেবী রায় হাসে, কেরানিবাবুর চশমার কাচ ঝিকঝিক করে, এবং তদন্ত অফিসারের ভ্রূকুটি উগ্র হয়ে ওঠে।

হাতের ষ্টিক তুলে তদন্ত অফিসার পাঠকজীর দিকে হুংকার ছাড়েন—বদমাস কোথাকার।

পাঠকজীর বিচলিত অদৃষ্টের পরিণাম স্পষ্ট ক'রে দেখবার আগেই অপ্রস্তুত জনতা নিজের বোকামির লজ্জায় ছত্রভঙ্গ হয়ে আর ব্যস্ত হয়ে সরে পড়ে। তদন্ত অফিসার তাঁর হাতের ষ্টিক দিয়ে পাঠকজীর পিঠের উপর সজোরে একটা খোঁচা দিয়ে বলেন—খবরদার, আর যদি কখনও এসেছ কি পুলিশ ডেকে চালান ক'রে দেব।

পাঠকজী বলেন—রামজীর ইচ্ছা।

পিঠের উপর আর একটা খোঁচা পড়তেই পাঠকজী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে চলতে থাকেন। সুরকির সড়ক ছেড়ে মাঠের উপর নেমে পড়েন, যেন নিরুদ্দেশের মত সব পথের আশা হারিয়ে খোলা মাঠের শেষপ্রান্তে ঐ দিগ্বলয়ের দিকে চলে গেলেন।

হাঁপ ছাড়েন তদন্ত অফিসার।—কি কাণ্ড! মানুষও যে এমন মিথ্যাবাদী হয়, আমি দেখে শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি মশাই।

সত্যই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন তদন্ত অফিসার। একটা সাব-অর্ডিনেট যে তার উপরওয়ালার বিরুদ্ধে এরকম একটা মিথ্যা অভিযোগ সাজাবার দুঃসাহস করতে পারে, কল্পনাও করতে পারেননি তিনি। মিউজিয়াম আর অফিস ঘর থেকে সুরু ক'রে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলো আর কেরানিবাবুর ঘর পর্যন্ত তন্ন তন্ন তল্লাস ক'রেও কোন ভয়ানক রকম সুন্দর গঙ্গা বা বামদেব টেব কিছুই দেখতে পাননি তদন্ত অফিসার। একটা ভুয়া লিস্ট পাঠিয়ে খল সুপারভাইজারটা সবাইকে কি বিড়ম্বনাই না দিল!

আবার অফিসে ফিরে যান সকলে। তদন্ত অফিসার উৎসাহিতভাবে বলেন—আমি দিল্লী গিয়েই সোসাইটিকে রিপোর্ট দেব সুপারভাইজারটাকে অবিলম্বে ডিসমিস ক'রে দেবার জন্য।

আর একটা হাঁপ ছাড়েন তদন্ত অফিসার—যাক, ভাগ্যি ভাল, খুব সময়মত এসে পড়েছিলাম, তাই বদমাস দুটোর চক্রান্তটা স্বচক্ষে দেখে একেবারে হাতে হাতে ধরতে পারা গেল। আমার সন্দেহের একটা দিক খোলসা হয়ে গেল মিস্টার রায়।

হাতের নোট-বইয়ের কয়েকটা পাতা নাড়াচাড়া ক'রে তার পরেই একটু গম্ভীর হন তদন্ত অফিসার।—এখন আর একটা দিক খোলসা হয়ে গেলেই আমার হয়ে গেল।

দেবী রায়ের নিশ্চিন্ত মনের প্রসন্নতা হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খায়, চোখের দৃষ্টি সতর্ক হয়ে ওঠে।

তদন্ত অফিসার বলেন—এই এক বছর ধরে হরভবনের কাজের জন্য সোসাইটির টাকা তো কম খরচ হয়নি, তবু দেখছি কতগুলি ভাঙা হাঁড়ি কুঁড়ি ছাড়া নতুন কোন মূর্তি ওঠেনি, মিউজিয়ামটা একেবারে পুওর হয়ে রয়েছে। কেন এমন হচ্ছে, এর একটা কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হবে। এ ছাড়া, কাজের দিক দিয়ে কতদূর কি করেছেন, তারও একটা বিবরণ দেবেন।

দেবী রায়—অবিশ্যি দেব।

তদন্ত অফিসার—হ্যাঁ, অনুগ্রহ ক'রে বলুন, এ বিষয়ে আপনার যা বলবার আছে।

দেবী রায়—এখুনি শুনতে চান?

তদন্ত অফিসার—হ্যাঁ, এখুনি বলুন মিস্টার রায়, কারণ…।

বলতে গিয়ে তদন্ত অফিসার কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করেন, যেন তাঁর সৌজন্যে বাধছে।—কারণ, আপনার বক্তব্যগুলিও নির্ভুল কিনা সেটা এখুনি একবার সাইটে গিয়ে সব কিছু স্বচক্ষে দেখে আর পাঁচজনের কাছ থেকে জিজ্ঞেসা করে, অর্থাৎ একটু যাচাই ক'রে নিতে হবে তো।

দেবী রায়ের চোখে উদ্বেগ প্রখর হয়ে ওঠে—আর পাঁচ জন বলতে আপনি কা'দের বলছেন ?

তদন্ত অফিসার—সার্ভেয়ার বলুন বা কুলির দল বলুন, এই ধরণের লোক যারা সাইটে কাজ করছে।

গম্ভীর হয়ে তদন্ত অফিসার একটু দুঃখিত স্বরে বলেন—তদন্তের কাজটাই বড় খারাপ মিস্টার রায়, আগে থেকেই সকলকে একটা সন্দেহ ক'রে নিয়ে কাজ করতে হয়।

দেবী রায় হাসে—বুঝতে পেরেছি, সকলকে মানে আমাকেও সন্দেহ ক'রে আপনাকে আরও তদন্ত করতে হবে।

তদন্ত অফিসার তাঁর উচ্চপদস্থ ভঙ্গীটুকু অবিচল রেখে, এবং একটু জোর দিয়েই বলেন—ঠিকই ধরেছেন আপনি। এটাই হলো নিয়ম, এবং আসল কথা হলো, আমি আমার তদন্তের কোন খুঁত রাখতে চাই না। যা'তে সোসাইটির কাছে একটা নিভু'ল রিপোর্ট দিতে পারি, তারই জন্য সাইটে গিয়ে সার্ভেয়ার আর কুলিগুলোকে একটু সওয়াল ক'রে আমার এই সন্দেহটার হেস্তনেস্ত করতে চাই।

কথা শেষ ক'রে তাঁর এই তদন্তকরী রূঢ়তাকে হালকা করার জন্য জোরে হাসতে থাকেন তদন্ত অফিসার। বিব্রত বোধ করে দেবী রায়। কেরানিবাবুর মুখের দিকে তাকায়, পকেট হাতড়ে তামাকের পাইপটা বের করে। যেন ভাববার মত সময় খুঁজছে দেবী রায়। ভাবতে হচ্ছে, কারণ দেবী রায়ের বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা কুলিদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে যাচাই ক'রে দেখতে চায় এই তদন্ত অফিসার। গরু-ঘোড়ার মত সত্যবাদী ঐ কুলিগুলো কি বলবে, তা'ও কল্পনা করতে পারে দেবী রায়। অনেক কিছুই দেখবে শুনবে আর জানবে তদন্ত অফিসার, যা এতক্ষণ ধরে এত চেষ্টায় একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য ক'রে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এই গোঁয়ার অফিসার তার সন্দেহের আর একটা দিক ভয়ানক ভাবেই খোলসা ক'রে নিয়ে···তার পর কি যে করবে, কল্পনা করতে গিয়ে দেবী রায়ের মনটা বিচলিত হয়ে ওঠে। ভাবতে থাকে, কিন্তু কয়েকটা মহূর্ত মাত্র। তার পরেই দেবী রায়ের ভাবনাটাই যেন নিজের দুঃসাহসের আনন্দে হেসে ওঠে।

হেসে ফেলে দেবী রায়—আপনাকে সব কিছুই একেবারে স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে শুনিয়ে আর জানিয়ে দেবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। কিন্তু তার জন্যে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে মাত্র একটা দিন সময় দিতে হবে।

তদন্ত অফিসার—কেন বলুন তো ?

দেবী রায় হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে বলে—আজ আমার জন্মদিন এবং জন্মদিন ব'লেই আমার নিকট-আত্মীয়ের মত কয়েকজন···আরও স্পষ্ট করেই বলতে পারি···আমার নিকটতমা হবেন এইরকম একজন আজ আমাকে নেমন্তন্ন করে বসে আছেন, হয়তো অপেক্ষায় রয়েছেন। এখুনি যদি একবার না যাই তাহ'লে···যাক সে সব কথা। আগে কাজের কথা শেষ করি। বলুন, হরভবন আর মিউজিয়ামের কাজের সম্বন্ধে আপনি কি জানতে চান ?

তদন্ত অফিসার হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান, লজ্জিতভাবে বলেন—এঃ, আপনি আমাকে বড় অপ্রস্তুত করলেন মশাই।

দেবী—কেন, কি হলো ?

তদন্ত অফিসার—যান, নেমন্তন্নে যান। আপনার জীবনের এমন একটা শুভদিনে আপনাকে আটক করে রাখব, আমাকে এরকম একটা হার্টলেস বলে মনে করবেন না।

ব্যস্তভাবে হেঁটে অফিস ঘরের বাইরে এসে কেরানিবাবুর দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করেন তদন্ত অফিসার, একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবার জন্য। দেবী রায় বাধা দিয়ে বলে—থাক, ট্যাক্সি ডাকতে হবে না। গরীবের বাপের দেওয়া একখানা ছ্যাকরা গাড়ি আছে, চলুন, আমিই পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে।

গ্যারেজ থেকে টু-সিটারটি বের করার পর দেবী রায় জিজ্ঞাসা করে—কোথায় উঠেছেন আপনি ?

তদন্ত অফিসার—ডাক বাংলোতে।

দেবী রায়—তা বেশ করেছেন। আসামীর বাড়িতে তো হাকিম অতিথি হতে পারে না, নইলে বলতাম এ দু'দিন আমার এখানেই থেকে যান।

তদন্ত অফিসার আর দেবী রায়ের সম্মিলিত হাসির শব্দ চমকে উঠতেই টু-সিটারও স্টার্ট নেয়।

একেবারে স্পষ্ট করে দু'চোখ দিয়েই দেখলেন, দু'কান দিয়েই শুনলেন এবং মনে-প্রাণে জেনে ফেললেন তদন্ত অফিসার।

স্যামুয়েল ম্যানসন নামে মহারাজপুরের এক সুন্দর হর্ম্যের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা মিশনের মিস্টার জোন্সকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য আয়োজন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছার উপহার নিয়ে এমন একজন ভারতপ্রেমিক সদাশয় করে

থেকে স্টেশন ক্লাবের নিভৃতে পড়ে রয়েছেন, তার খবর মহারাজপুরের কালচার্ড সমাজের কেউ জানতেন না। হঠাৎ দেবী রায়ের নিমন্ত্রণপত্র পড়ে ব্যাপারটা জানতে পেরে একটু লজ্জিত হয়ে যেন নিজেদের এই অজ্ঞতার ত্রুটি দু'গুণ সৌজন্য দিয়ে পুষিয়ে দেবার জন্য শ্যামুয়েল ম্যানসনের সংবর্ধনা সভায় আজ ভিড় করেছেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীদত্তগুপ্ত দেবী রায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং অপরাধও স্বীকার করেছেন, কারণ, তাঁর মতে মিস্টার জোন্সের মত এমন একজন আন্তর্জাতিক সজ্জনকে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকেই একটা বিশেষ সংবর্ধনা জানানো উচিত ছিল। যাই হোক, ত্রুটি যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে, আজ তাই তিনি নিজের থেকেই যেচে এই সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

তদন্ত অফিসারকেও আসতে হয়েছে, দেবী রায়ের অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাঁকে এই সভায় প্রধান অতিথি হতে হয়েছে।

প্রথমে আপত্তি করেছিলেন তদন্ত অফিসার, কিন্তু দেবী রায়ের কাছে যখন শুনলেন যে, মহারাজপুরের পাব্লিক তাঁকে চায়, সবারই ইচ্ছা এই সহরের নতুন অতিথি, দিল্লী থেকে আগত পরম শ্রদ্ধেয় তদন্ত অফিসারকে সভার প্রধান অতিথি করতে হবে, তখন আর ডাক বাংলোর নিভৃতে চুপ করে ব'সে থাকতে পারলেন না। পাব্লিকের অনুরোধ রক্ষা করার জন্যই তিনি এসেছেন।

ডায়াসের উপর বসেছিলেন শ্রীদত্তগুপ্ত তাঁর অনুপ্রাণিত মূর্তি নিয়ে, জোন্স বসেছিলেন লজ্জাবিড়ম্বিতভাবে, আর তদন্ত অফিসার বসেছিলেন হতভম্ব হয়ে। এই সভার সকল উদ্যোগের পিছনে উৎসাহের মূলাধার রূপে যে রয়েছে, সেই দেবী রায়ই শুধু দীন ভলান্টিয়ারের মত কাজ ক'রে ঘুরতে থাকে। একবার এদিকে এসে কতগুলি চেয়ার টানাটানি ক'রে একটা সারি সাজিয়ে দিয়ে যায়। তারপর একটা হারমনিয়ম দু'হাতে তুলে নিয়ে এসে ডায়াসের উপর রেখে দেয়। এক একবার সভাগৃহের বাইরে দ্বারপ্রান্তে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকে দেবী রায়, অভ্যাগতদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে ভিতরে নিয়ে আসে।

ডায়াসের উপর আর যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা হলেন বিশিষ্ট কালচার্ড। সিমেণ্টের সোরাবজী, কয়লার চৌধুরী, সুদর্শন হোসিয়ারীর নরেশ ব্রাদার্স চার ভাই, রিটায়ার্ড সেসন জজ কৃষ্ণনাথ বাবু। তা ছাড়া, এই সহরের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যরূপে দু'জন যাঁরা মাত্র ক'দিন আগে কলকাতা থেকে এসেছেন, সেই বিখ্যাত স্যার সুধাসিন্ধু ও লেডি ভানুমতীও ছিলেন।

ডায়াসের নীচে প্রথম সারিতে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা সকলেই কমবেশি কিছু না কিছু ইনকম ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। যথা ডাক্তার সমাদ্দার, বার লাইব্রেরির সভাপতি রতন চট্টরাজ, ও শুক্তি সিনেমা হাউসের গাঙ্গুলি—যাঁর সঙ্গে তিনটি নাতি নাতনিও ছিল। এবং পিছনের সারিতে ছিল সেণ্ট ডেনিসের একদল ছাত্র। একেবারে পিছনের বেঞ্চগুলিতে বেশি ভিড় ছিল না। ফাঁকা ফাঁকা ভাবে বেঞ্চগুলির এখানে ওখানে দুটি একটি ক'রে নোংরা আলোয়ান অথবা ছেঁড়া চাদর সংকুচিত ভাবে বসেছিল।

মিস্টার জোন্সের গলায় মালা দিল সিনেমা গাঙ্গুলির নাতনি। হারমনিয়ম বাজিয়ে অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাইলো শ্রীদত্তগুপ্তের ছেলে আর মেয়ে। 'মহারাজপুরের আত্মা' নামে একখানা তৈলাঙ্কন, পত্রহীন একটা শালগাছের ছবি, মিস্টার জোন্সকে উপহার দিলেন মহারাজপুরের জনগনের তরফ থেকে রতন চট্টরাজের আর্টিস্ট ভাই পূর্ণেন্দু চট্টরাজ।

সভাপতি শ্রীদত্তগুপ্ত বললেন—ফুল লুকিয়ে থাকলেও তার সুগন্ধ লুকিয়ে থাকতে পারে না। মিস্টার জোন্স লুকিয়ে থেকে মহারাজপুরকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে তাঁকে ধরে ফেলেছি।

বক্তার পর বক্তা উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার জোন্সের প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানালেন। মিস্টার জোন্স তাঁর বক্তৃতায় সলজ্জভাবে বললেন—মহারাজপুরের এই সঙ্গীতের আবেদন, মহারাজপুরের ফুলের মালার এই সুগন্ধ আর মহারাজপুরের আত্মার এই ছবি চিরকাল আমার স্মৃতির সাথী হয়ে থাকবে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করেন মিস্টার জোন্স, তার পরেই তাঁর কণ্ঠস্বর ভাবোদ্বেল হয়ে ওঠে—আর থাকবে একজনের স্মৃতি। আপনাদের মহারাজপুরের আত্মার বন্ধু মিস্টার রায়ের কথাই আমি বলছি, যিনি মহারাজপুরে ঐতিহাসিক গৌরব কত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে উদ্ধার ক'রে চলেছেন, যিনি দেশে ও বিদেশে অনেক লোভনীয় পদ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিয়ে শুধু ভারত ইতিহাসের সেবার জন্য মহারাজপুরে পড়ে রয়েছেন, যিনি দুহাতে অকৃপণ ভাবে নিজের ব্যক্তিগত অর্থ হরভবনের কাজের জন্য বিলিয়ে দিচ্ছেন। তাই আমি সবার আগে, স্কলার দেবী রায়, কালচারের চ্যাম্পিয়ান দেবী রায় ও নিঃস্বার্থ দেবী রায়ের উদ্দেশে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

সভাপতি শ্রীদত্ত গুপ্ত ঘোষণা করলেন—মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় স্কুলের জন্য শ্রীদেবী রায় এক হাজার টাকা এবং মিস্টার জোন্স হরভবনের কাজের জন্য এক হাজার টাকা দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ডায়াসের উপরে এবং নীচে এক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পর পর উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার জোন্সের প্রতি অগাধ শুভেচ্ছা এবং শ্রীদেবী রায়ের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানালেন।

শেষে উঠলেন তদন্ত অফিসার। বিচলিত স্বরে বললেন—স্বচক্ষে যা দেখলাম এবং স্বকর্ণে যা শুনলাম, তারপর আমার আর কিছু বলবার নেই। শুধু এইটুকুই বলে যেতে চাই যে, আমি দিল্লী ফিরে গিয়ে সোসাইটির কাছে এমন রিপোর্ট দেব যে হরভবনের কাজের জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য ডবল ক'রে দিতে বাধ্য হবেন।

স্যার সুধাসিন্ধু ও লেডি ভানুমতি সবার আগে করতালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাগৃহের সকল হাতে তালি বেজে উঠলো। শেষ হলো সভা।

প্রায় পঞ্চাশটি বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসারিত কর মর্দন ক'রে শুভেচ্ছা মিশনের মিস্টার জোন্স চলে গেলেন। দেবী রায়ের করও কম মর্দিত হলো না।

সভাগৃহ শূন্য হতেই, ম্যানসনের কেরানিকে হলভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দেবী রায় বাইরে এসেই দেখতে পায়, তদন্ত অফিসার তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

দেবী রায়কে দেখতে পেয়েই তদন্ত অফিসার তাঁর ছ'চোখে শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টি তুলে এবং ব্যগ্রভাবে এগিয়ে এসে দেবী রায়ের হাত ধরলেন—আমি কাল সকালেই দিল্লী রওনা হয়ে যাচ্ছি মিস্টার রায়।

দেবী রায়—সে কি! আপনার তদন্তের কাজ যে এখনও বাকি আছে।

তদন্ত অফিসার দেবী রায়ের হাতটা শক্ত ক'রে চেপে ধরেন—লজ্জা দেবেন না মিস্টার রায়। যা জানতে চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশিই জানা হয়ে গেছে, আর জানবার কিছু নেই।

লজ্জা পেয়েছেন তদন্ত অফিসার। সমস্ত মহারাজপুর দেবী রায়ের মত যে প্রতিভা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে বন্দনা করছে, তারই সম্পর্কে একটা জঘন্য সন্দেহ নিয়ে তদন্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি। হাঁপ ছাড়েন তদন্ত অফিসার—যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

ট্যাক্সি ডেকে ডাকবাংলোর দিকে চলে যান তদন্ত অফিসার।

ম্যানসনের ফটকও জনশূন্য। টু-সিটারের স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে একবার চারদিকে তাকায় দেবী রায়, সফলকাম কৃতীর গর্বোৎফুল্ল দৃষ্টি। জয় হয়েছে, দেবী রায়ের পরিকল্পনা জয়যুক্ত হয়েছে। জয়ী হবার জন্যই এসেছে সে পৃথিবীতে। তার জীবনের পথ অবাধ ক'রে নিয়ে ছুটে চলে যাবার দুঃসাহস তার আছে। সত্য-মিথ্যার জুজুর ভয়ে কাতরপ্রাণ শিশুর মত এই মূর্খ সংসারকে টু-সিটারের চার চাকায় মাড়িয়ে

ছুটে চলে যেতে আনন্দ আছে। পৃথিবীটাই তো একটা স্টেশন ক্লাব, আর জীবনটা কতগুলি রাত্রির উৎসব। বাকি সবই মিথ্যা।

দেবী রায়ও আর দেরি করে না। একটানা আবেগে দৌড়ে চলে যায় টু-সিটার স্টেশন ক্লাবের দিকে।

প্রথমে বার-ঘর। এক বোতল শেরি এক ঘণ্টার মধ্যেই চার চুমুকে শেষ ক'রে দিয়ে জয়দৃপ্ত মূর্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ায় দেবী রায়, একটুও পা টলে না। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে যেন খুঁজতে থাকে দেবী রায়।

হ্যাঁ, সেও আছে। দেখতে পায় দেবী রায়, বার-ঘরের আর এক প্রান্তে একটা টেবিলের পাশে একা একাই বসে আছে নেশায় বিবশ দেহভার নিয়ে, হোটেলওয়ালী মিসেস মেরেডিথের মেয়ে মিস ভেরা মেরেডিথ। শ্যাম্পেনের গেলাসে হাত রেখে অভিমানবিধুর ভুরু তুলে ভেরা তাকিয়ে আছে দেবী রায়ের দিকে। এগিয়ে যায় দেবী রায়।

—ভেরা ডিয়ার, আজ আমি ভিক্টোরিয়াস, জিতে গেছি আমি। আজ আমি তোমাকে স্বর্গ প্রমিস করতে পারি।

—স্বর্গ চাই না হার্ট-অব-হার্ট, ছোট্ট একটি ড্যাগার চাই, যেন আত্মহত্যা করতে পারি সেদিন, যেদিন তুমি সন্ধ্যা ছটার পরেও আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলে যাবে।

—এবার থেকে কখনও ভুল হবে না সুইটার-দ্যান-দি-সুইটেস্ট!

গেলাসের তলায় শ্যাম্পেনের থিতানিটুকু এক চুমুকে শেষ ক'রে দিয়ে ভেরা বলে—তবে এখুনি চল।

—কোথায়?

—জুয়েলার ঠাকুরদাসের দোকানে।

—কেন?

—এই তো কিছুক্ষণ হলো নিজের চক্ষে দেখে এসেছি, ঠাকুরদাসের দোকানের শো-কেশের মধ্যে সাজানো রয়েছে ছোট্ট একটী সোনার ড্যাগার, তার হাতলের ওপর বিউটিফুল একটি ডায়মণ্ডের অক্টাগন। আমার নেকলেসের পেনড্যাণ্ট হবে এই ড্যাগার। এখুনি চাই আমার, চল কিনে দেবে।

—আজ নয় লাভলি, কাল নিশ্চয় কিনে দেব।

—প্রমিস করছো?

—প্রমিস করছি।

হাত এগিয়ে দেয় ভেরা, হাত ধরে দেবী রায়। তারপর বল-ঘর। জীবনের সব সাফল্য আর জয়ের উল্লাস নৃত্য ক'রে ওঠে। নেচে নেচে ক্লান্ত হয় না দেবী রায়, ক্লান্ত হতে দেয় না ভেরাকে। রাত্রি গভীর হতে থাকে।

সে রাতে দেবী রায়ের নেশার ঘুম হয়তো এমন অসময়ে ভাঙতো না, কিন্তু ভেঙে গেল, কারণ বাংলোর বারান্দার উপরে উঠে ত্রস্তস্বরে কেরানিবাবু বার বার ডাকছিলেন —স্যার, স্যার, উঠুন স্যার।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভেরার হাত ছেড়ে দিয়ে স্টেশন ক্লাবের নাচঘর থেকে বাংলোতে ফিরেছে দেবী রায়। ফিরে এসে শরীরটাকে অসাড়ভাবে একটা সোফার উপর ফেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে। কেরানিবাবুর চিৎকারে ধড়ফড় ক'রে জেগে ওঠে, তবু বুঝতে পারে না কিছুই। শুধু মনে হয়, একটা হিংস্র জন্তু যেন তাকে হত্যা ক'রে একটা কুয়োর গভীরে ফেলে দিয়েছে। সব চেয়ে বেশি চোট লেগেছে মাথায়, তাই মাথাটা একেবারে তুলতে পারা যাচ্ছে না।

পর মুহূর্তে বুঝতে পারে দেবী রায়, নিজের ঘরে শোফার উপরেই বসে আছে সে। শিকল-বাঁধা অ্যালসেশিয়ান অস্থির হয়ে ডাকছে, তার সঙ্গে শব্দ মিশিয়ে কেরানি বাবুর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর থেকে থেকে চিৎকার হয়ে বেজে উঠছে—স্যার, শিগগির একবার উঠে আসুন স্যার।

নেশা ভেঙে যায়, সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দেবী রায়। পা কাঁপে, জীবনে এই বোধ হয় প্রথম। কিন্তু কেন? বুঝে উঠতে পারে না। জানালা দিয়ে শুধু দেখা যায়, শেষ রাত্রির ফিকে জ্যোৎস্না কুয়াশার সঙ্গে মিশে কেমন যেন থমথমে হয়ে গিয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু ভয়াল দৃশ্য চোখে পড়ে না। কিন্তু কেরানিবাবু তবু বড় বেশি ভয়ার্তস্বরে বার বার ডেকে চলেছেন।

বারান্দায় এসে দাঁড়ায় দেবী রায়।—কি ব্যাপার কেরানি বাবু, এত রাত্রে ডাকাডাকি করছেন কেন?

কেরানি বাবু—ভয়ানক ভয় করছে স্যার।

দেবী রায়—ভয়? কেন?

কেরানি বাবু—কালো মতন কি একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে স্যার।

দেবী রায়—কোথায়?

কেরানি বাবু—কুয়োর কাছে।

চমকে ওঠে দেবী রায়, বুকের ভিতরটা ক্ষণিকের মত শিউরে ওঠে। তার পরেই

সামলে নিয়ে দেবী রায় কেরানি বাবুকে আশ্বস্ত করে—ও কিছু নয়, আপনার চোখের ভুল কেরানি বাবু।

কেরানি বাবু আশ্বস্ত হন না—কিন্তু আমার কাণেরও কি ভুল হবে স্যার? স্পষ্ট শুনতে পেলাম··।

দেবী রায়—কি?

কেরানি বাবু—কুয়োর ভেতরটা থেকে থেকে বেজে উঠছে ভয়ানক শব্দ ক'রে। কে যেন ঢিল ফেলে ফেলে কুয়োর ভেতরটাকে পরীক্ষা করছে স্যার।

আর একবার চমকে ওঠে দেবী রায়। তার পরেই ঘরের ভিতরে সবেগে ছুটে যায়। গোটা চারেক বুলেট পকেটে ফেলে, বন্দুক আর টর্চ নিয়ে আবার বাইরে এসে বলে—চলুন, একবার দেখে আসি।

সার্ভে অফিসের কম্পাউণ্ডের চারদিকে টর্চের আলো ফেলে আর ঘুরে ফিরে সন্ধান করে দেবী রায় ও কেরানিবাবু। অফিস ঘরের আশে পাশে, মিউজিয়ম ঘরের চারদিকে, কিন্তু কোথাও কালো-মতন কোন কিছুর চিহ্ন পাওয়া যায় না। কুয়োর কাছে এসেও দেখা গেল, কিছুই নেই। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকলে দেখা যায়, ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে নিমগাছগুলি শুধু কালো-মতন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—একবার কুয়োর কাছে টর্চের আলোটা ফেলুন স্যার, পায়ের দাগ-টাগ দেখা যেতে পারে।

কেরানি বাবুর অনুরোধে কুয়োর চারদিকে টর্চের আলো ফেলতেই হাত কেঁপে ওঠে দেবী রায়ের; কেরানিবাবুও আতঙ্কিত স্বরে বলেন—ঐ যে পায়ের দাগ রয়েছে স্যার।

কুয়োর কাছে ভেজা মাটির উপর মোটর ট্রাকের চাকার গভীর দাগটার আশে-পাশে এলোমেলো ভাবে কতকগুলি পায়ের দাগ ছড়িয়ে রয়েছে। একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ার যেন এই চাকার দাগ ধরে গন্ধে গন্ধে শিকার সন্ধান করতে এসে আবার ফিরে চলে গিয়েছে। তারই পায়ের টাটকা দাগ দেখা যায়। সত্যিই একটা খাঁটি জানোয়ারের পায়ের দাগ হলে দুশ্চিন্তা করার কিছু ছিল না, কিন্তু ঐ দাগ যে বুনো জন্তুর চেয়েও ভয়ানক কোন মানুষের পায়ের দাগ বলে মনে হয়।

বন্দুকটা শক্ত মুঠোয় হিংস্রভাবে চেপে ধরে দাঁড়ায় দেবী রায়, ঘাতকের মতন। অসহ্য প্রতিহিংসার তৃষ্ণা নিয়ে, চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে, গলার স্বর চেপে আস্তে আস্তে আরও কঠোর ভাবে বলে—আপনি টর্চটাকে চারদিকে ঘুরিয়ে সার্চ করুন কেরানি বাবু। দেখতে পেলেই জন্তুটাকে আমি এক গুলিতে ফিনিশ ক'রে দেব।

দাঁতে দাঁত ঘষে, পকেট থেকে বুলেট বের ক'রে বন্দুক লোড করে দেবী রায়।

অনেকক্ষণ ধরে কম্পাউণ্ডের থমথমে ফিকে জ্যোৎস্নাকে উত্যক্ত ক'রে টর্চের আলো এদিক ওদিক তল্লাসি ক'রে ফিরতে থাকে। কিন্তু বৃথা। কেউ নেই, কিছুই নেই, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। দেবী রায়ের বন্দুকলগ্ন শক্ত মুঠির হিংস্রতা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে থাকে। বিরক্ত হয়ে বলে দেবী রায়—কিছু নয়, ওসব কিছু নয়, চলুন।

কেরানি বাবু—আমার কিন্তু একা থাকতে ভয় করছে স্যার।

দেবী রায়—চলুন, আমার ঘরে শুয়ে থাকবেন।

দু'জনে বাংলোয় ফিরে আবার বারান্দার উপরে উঠতেই শেষ রাত্রির চাঁদটাও ডুবে গেল। শিকল খুলে অ্যালসেশিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে দেবী রায় ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার আশ্রয়ে ঘুমোতে থাকে। আর কেরানি বাবু কুঁকড়ে পড়ে থাকেন সোফার উপর, ঘুমোবার চেষ্টা করেন।

দেবী রায়ের ঘুম হয়তো বেশ একটু দেরি করেই ভাঙতো, কিন্তু তার আগেই ভেঙে গেল, কারণ কেরানি বাবু আবার আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

ভোর হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, লালচে রোদের ঝলক এসে লেগেছে ইউক্যালিপটাসের মাথায়। কেরানিবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলোর বারান্দায়, এবং দূরের কুয়োটার দিকে তাকিয়ে শ'কিতভাবে কাঁপছিলেন। মাঝে মাঝে তার চেয়ে বেশি কম্পিতস্বরে ডেকে ডেকে দেবী রায়ের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছিলেন—স্যার, শিগগির উঠে পড়ুন স্যার।

দেবী রায়ের ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্ত হয়ে, আর তামাকের পাইপটা হাতে নিয়ে দেবী রায় বাইরে এসে দাঁড়াতেই কেরানি বাবু বলেন—ঐ দেখুন, কি ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেছে স্যার।

দেখতে থাকে দেবী রায়, চোখ মুছে দৃষ্টিশক্তিটাকে ভাল ক'রে জাগিয়ে নিয়ে স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পায়, তদন্ত অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন কুয়োর কাছে। তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে পাগলা দারোয়ান পাঠকজী। জন সাতেক কুলি দড়ি-দড়া সিঁড়ি আর লোহার কাঁটা নিয়ে কাজ করছে। কুয়োর ভিতর থেকে একটি একটি ক'রে মূর্তি তোলা হচ্ছে। অনেকগুলি মূর্তি এরই মধ্যে তোলা হয়ে গিয়েছে, কুয়োর পাশেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এখান থেকে দৃশ্যটাকে আর ঘটনাটাকে খুবই স্পষ্ট ক'রে দেখা যায়।

শেষ রাত্রির সেই কালো-মতন আবির্ভাবের রহস্যটা এখন কল্পনায় বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে পারে দেবী রায়। ঐ তো সেই কালোমতন জানোয়ারটা, এখন

সামলে নিয়ে দেবী রায় কেরানি বাবুকে আশ্বস্ত করে—ও কিছু নয়, আপনার চোখের ভুল কেরানি বাবু।

কেরানি বাবু আশ্বস্ত হন না—কিন্তু আমার কাণেরও কি ভুল হবে স্যার? স্পষ্ট শুনতে পেলাম..।

দেবী রায়—কি?

কেরানি বাবু—কুয়োর ভেতরটা থেকে থেকে বেজে উঠছে ভয়ানক শব্দ ক'রে। কে যেন ঢিল ফেলে ফেলে কুয়োর ভেতরটাকে পরীক্ষা করছে স্যার।

আর একবার চমকে ওঠে দেবী রায়। তার পরেই ঘরের ভিতরে সবেগে ছুটে যায়। গোটা চারেক বুলেট পকেটে ফেলে, বন্দুক আর টর্চ নিয়ে আবার বাইরে এসে বলে—চলুন, একবার দেখে আসি।

সার্ভে অফিসের কম্পাউণ্ডের চারদিকে টর্চের আলো ফেলে আর ঘুরে ফিরে সন্ধান করে দেবী রায় ও কেরানিবাবু। অফিস ঘরের আশে পাশে, মিউজিয়ম ঘরের চারদিকে, কিন্তু কোথাও কালো-মতন কোন কিছুর চিহ্ন পাওয়া যায় না। কুয়োর কাছে এসেও দেখা গেল, কিছুই নেই। টর্চ নিভিয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকলে দেখা যায়, ফিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে নিমগাছগুলি শুধু কালো-মতন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—একবার কুয়োর কাছে টর্চের আলোটা ফেলুন স্যার, পায়ের দাগ-টাগ দেখা যেতে পারে।

কেরানি বাবুর অনুরোধে কুয়োর চারদিকে টর্চের আলো ফেলতেই হাত কেঁপে ওঠে দেবী রায়ের; কেরানিবাবুও আতঙ্কিত স্বরে বলেন—ঐ যে পায়ের দাগ রয়েছে স্যার।

কুয়োর কাছে ভেজা মাটির উপর মোটর ট্রাকের চাকার গভীর দাগটার আশে-পাশে এলোমেলো ভাবে কতকগুলি পায়ের দাগ ছড়িয়ে রয়েছে। একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ার যেন এই চাকার দাগ ধরে গন্ধে গন্ধে শিকার সন্ধান করতে এসে আবার ফিরে চলে গিয়েছে। তারই পায়ের টাটকা দাগ দেখা যায়। সত্যিই একটা খাঁটি জানোয়ারের পায়ের দাগ হলে দুশ্চিন্তা করার কিছু ছিল না, কিন্তু ঐ দাগ যে বুনো জন্তুর চেয়েও ভয়ানক কোন মানুষের পায়ের দাগ বলে মনে হয়।

বন্দুকটা শক্ত মুঠোয় হিংস্রভাবে চেপে ধরে দাঁড়ায় দেবী রায়, ঘাতকের মতন। অসহ প্রতিহিংসার তৃষ্ণা নিয়ে চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে, গলার স্বর চেপে আস্তে আস্তে আরও কঠোর ভাবে বলে—আপনি টর্চটাকে চারদিকে ঘুরিয়ে সার্চ করুন কেরানি বাবু। দেখতে পেলেই জন্তুটাকে আমি এক গুলিতে ফিনিশ ক'রে দেব।

দাঁতে দাঁত ঘষে, পকেট থেকে বুলেট বের ক'রে বন্দুক লোড করে দেবী রায়।

অনেকক্ষণ ধরে কম্পাউণ্ডের থমথমে ফিকে জ্যোৎস্নাকে উত্যক্ত ক'রে টর্চের আলো এদিক ওদিক তল্লাসি ক'রে ফিরতে থাকে। কিন্তু বৃথা। কেউ নেই, কিছুই নেই, কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। দেবী রায়ের বন্দুকলগ্ন শক্ত মুঠির হিংস্রতা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসতে থাকে। বিরক্ত হয়ে বলে দেবী রায়—কিছু নয়, ওসব কিছু নয়, চলুন।

কেরানি বাবু—আমার কিন্তু একা থাকতে ভয় করছে স্যার।

দেবী রায়—চলুন, আমার ঘরে শুয়ে থাকবেন।

দু'জনে বাংলোয় ফিরে আবার বারান্দার উপরে উঠতেই শেষ রাত্রির চাঁদটাও ডুবে গেল। শিকল খুলে অ্যালসেশিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে দেবী রায় ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার আশ্রয়ে ঘুমোতে থাকে। আর কেরানি বাবু কুঁকড়ে পড়ে থাকেন সোফার উপর, ঘুমোবার চেষ্টা করেন।

দেবী রায়ের ঘুম হয়তো বেশ একটু দেরি করেই ভাঙতো, কিন্তু তার আগেই ভেঙে গেল, কারণ কেরানি বাবু আবার আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

ভোর হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, লালচে রোদের ঝলক এসে লেগেছে ইউক্যালিপটাসের মাথায়। কেরানিবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলোর বারান্দায়, এবং দূরের কুয়োটার দিকে তাকিয়ে শংকিতভাবে কাঁপছিলেন। মাঝে মাঝে তার চেয়ে বেশি কম্পিতস্বরে ডেকে ডেকে দেবী রায়ের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছিলেন—স্যার, শিগগির উঠে পড়ুন স্যার।

দেবী রায়ের ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্ত হয়ে, আর তামাকের পাইপটা হাতে নিয়ে দেবী রায় বাইরে এসে দাঁড়াতেই কেরানি বাবু বলেন—ঐ দেখুন, কি ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেছে স্যার।

দেখতে থাকে দেবী রায়, চোখ মুছে দৃষ্টিশক্তিটাকে ভাল ক'রে জাগিয়ে নিয়ে স্পষ্ট ক'রেই দেখতে পায়, তদন্ত অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন কুয়োর কাছে। তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে পাগলা দারোয়ান পাঠকজী। জন সাতেক কুলি দড়ি-দড়া সিঁড়ি আর লোহার কাঁটা নিয়ে কাজ করছে। কুয়োর ভিতর থেকে একটি একটি ক'রে মূর্তি তোলা হচ্ছে। অনেকগুলি মূর্তি এরই মধ্যে তোলা হয়ে গিয়েছে, কুয়োর পাশেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এখান থেকে দৃশ্যটাকে আর ঘটনাটাকে খুবই স্পষ্ট ক'রে দেখা যায়।

শেষ রাত্রির সেই কালো-মতন আবির্ভাবের রহস্যটা এখন কল্পনায় বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে পারে দেবী রায়। ঐ তো সেই কালোমতন জানোয়ারটা, এখন

পাগলা দারোয়ানের মূর্তি ধ'রে তদন্ত অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। মোটর ট্রাকের চাকার দাগ শুঁকে শুঁকে নিশাচর শ্বাপদের মত কোন্ ফাঁকে এসে কুয়োর গভীরে লুকিয়ে-রাখা মূর্তিগুলির সন্ধান নিয়ে চলে গিয়েছে। ভোর হতে না হতেই ডাক-বাংলো থেকে তদন্ত অফিসারকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে, ঐ কালো-মতন জন্তুটা ছাড়া আর কে?

কেরানি বাবু শূন্য দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করেন—আমি কোথায় যাই বলে দিন স্যার।

দেবী রায় ধমক দিয়ে বলে—চুলোয় যান, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

তবু বারান্দার মেজের উপরেই জীর্ণ বৃষকাষ্ঠের মত যেন আধখানা দেহ নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন কেরানি বাবু। মাঝে মাঝে দু'চোখের কাচখণ্ড ঝাপসা হয়ে উঠতে থাকে।

একটা আরাম চেয়ার টেনে নিয়ে তার উপর প্রশান্তভাবে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে থাকে দেবী রায়। চাকর চা দিয়ে যায়, চা খাওয়া হলে পাইপ ধরায়, তারপর মুখ ভ'রে ধোঁয়া ছাড়ে দেবী রায়।

পর্যবেক্ষকের মত একটা গম্ভীর ভঙ্গী ধরে কুয়োর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে দেবী রায়। মূর্তিগুলি সবই তোলা হয়ে গিয়েছে। এইবার তদন্ত অফিসার কেরানি বাবুর ঘরটা তল্লাসি করতে ঢুকলেন। বের হয়ে এলেন চাবির তাড়া হাতে নিয়ে। মিউজিয়াম ঘরের দরজা খুলছেন তদন্ত অফিসার। কুলিরা মূর্তিগুলিকে এক এক ক'রে নিয়ে এসে মিউজিয়াম ঘরের ভিতর ঢুকছে আর বের হয়ে আসছে। কুয়োতলার কাছে আর কোন মূর্তি নেই। মিউজিয়াম ঘরের দরজায় তালা বন্ধ ক'রে তার উপর সিলমোহর করলেন তদন্ত অফিসার। অফিস ঘর আর কেরানিবাবুর ঘরের দরজার তালাও সিল করা হলো। পাগলা দারোয়ানের সঙ্গে বোধ হয় একটা পরামর্শ করছেন তদন্ত অফিসার। এগিয়ে আসছে সবাই, এই দিকেই। পাইপের ছাই ফেলে দিয়ে আবার নতুন ক'রে তামাক ভ'রে পাইপ ধরায় দেবী রায়।

বাংলোর বারান্দার উপর এসে উঠেই তদন্ত অফিসার দেবী রায়ের দিকে ক্রূরদৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপরে কেরানি বাবুর দিকে ভ্রূকুটি তুলে তাকালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নোট বুকের পাতা ছিঁড়ে দুটি কাগজে দুটি অর্ডার লিখলেন তদন্ত অফিসার। একটা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন দেবী রায়ের দিকে, আর একটা কেরানি বাবুর দিকে—সসপেণ্ড করলাম, আপনাদের দু'জনকেই।

আরাম চেয়ারে বসেই মুখ ভরে ধোঁয়া ছেড়ে কাগজে লেখা অর্ডারটা একবার পড়ে দেবী রায়। তারপরেই হাতের মুঠোর চাপে কাগজটাকে দুমড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

তদন্ত অফিসারের দৃষ্টি ক্রূরতর হয়ে ওঠে।—আপনি এই মুহূর্তে বাংলো খালি ক'রে দিয়ে চলে যান। বাংলোর দরজা সিল করবো।

দেবী রায়—আমি যাব না। আপনি এখন যেতে পারেন।

তদন্ত অফিসার—কি বললেন ?

দেবী রায়—আপনি আমাকে সংপেণ্ড করতে পারেন না মশাই। তদন্তে এসেছেন তদন্ত ক'রে চলে যাবেন, আর সোসাইটিকে রিপোর্ট দেবেন। এর বেশি কিছু করবার ক্ষমতা আপনার নেই।

তদন্ত অফিসার—যদি পুলিশে এজাহার দিই, তাহলে ?

দেবী রায়— তাহ'লে তাই করুন। পুলিশও আইনমত যা করবার তাই করবে। তার বেশি কিছু করবার ক্ষমতা পুলিশেরও নেই।

তদন্ত অফিসারের কণ্ঠস্বর বিদ্রূপে রূঢ় হয়ে ওঠে।—আপনি খুব বুদ্ধি রাখেন রায় সাহেব, এবং বুঝেছেন ঠিকই। আইনগুলিই তো দুনিয়ার যত দুর্বলতা। আইন দিয়েই আইন কাঁচিয়ে দেওয়া যায়, বে-আইনিদের পক্ষে এই মস্ত একটা সুবিধা। তাই না ?

দেবী রায় চোয়াল শক্ত ক'রে তদন্ত অফিসারের দিকে তাকায়—কথা বাড়াবেন না, যান পুলিশে যান।

তদন্ত অফিসারের চোয়ালও কড়মড় ক'রে বেজে ওঠে—আপাতত পুলিশের কাছে যাব না মিস্টার রায়, কারণ, তা'তে আপনার বড় সুবিধা হবে মনে হচ্ছে।

দেবী রায়—তাহলে কি করতে চান ?

তদন্ত অফিসার—আমি এই পাঠকজীকে এখুনি লোক ডাকতে বলবো। সব ব্যাপার শুনে নিয়ে মহারাজপুরের লোকেরাই একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাক।···বলুন রাজি আছেন ?

চকিতে পাঠকজীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় দেবী রায়। ঐ একটা মূর্তিমান বে-আইন, পৃথিবীর নিয়ম কানুনের কোন ধার ধারে না। শেষ রাত্রির দিকে জ্যোৎস্নার মধ্যে কালোমতন হয়ে ঘুরে বেড়ায়, গন্ধ শুঁকে শুঁকে সব গোপনতার সন্ধান নিয়ে যায়, আগুন জেলে পথ আটক ক'রে একটা অনড় প্রতিজ্ঞা হয়ে বসে থাকে, ইঁট মারলেও বিচলিত হয় না, রামজীর নামে হাঁক দিয়ে লোক জড়ো করে, আর পর মুহূর্তে শত শত মূর্খের আক্রোশ ছুটে আসে জোন্সের ট্রাক চূর্ণ করতে। এই ধূর্ত প্রতিশোধের মূর্তিটা যদি লোক ডাকে, তবে ? তবে মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে মীমাংসা ক'রে দিয়ে যাবে একশো পাঁচশো বা এক হাজার

বে-আইনি আক্রোশের জীব। দেবী রায়ের বুকের ভিতরটা হঠাৎ থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে। একবার চকিতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এই অসহায়তার মধ্যে কাউকে যেন খোঁজ করে দেবী রায়, কিন্তু বুঝতে পারে, কেউ নেই। কখন কোন ফাঁকে এই দুর্ঘটনার আসর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন কেরানিবাবু। চিৎকার করে ওঠে দেবী রায়—দয়াল!

আড়াল থেকে বের হয়ে আসে দেবী রায়ের চাকর দয়াল—কি বলেন হুজুর?

দেবী রায়—আমার বাক্স বেডিং আর বন্দুক গাড়িতে তুলে দাও।

পুরো দুটি মিনিটও আর দেরি করেনি দেবী রায়। বাক্স বন্দুক বেডিং কুকুর আর দয়ালকে নিয়ে আহত বন্য পশুর মতই সবেগে চলে গেল দেবী রায়। সার্ভে অফিসের ফটক পার হয়ে, সুরকির ধুলো উড়িয়ে।

হাঁপ ছাড়েন তদন্ত অফিসার। হ্যাট খুলে মাথা চুলকে নিয়ে যেন একটু স্বস্তিলাভ করেন। তারপরেই সাগ্রহে পাঠকজীর একটা হাত ধরে বলেন—কিছু মনে করবেন না পাঠকজী। মানুষ যে এমন মিথ্যাবাদী হতে পারে, আর এত ভয়ানক প্যাঁচ খেলতে পারে, দেখে শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি মশাই!

বাংলোর দরজায় তালা লাগিয়ে এবং সিলমোহর দিয়ে তদন্ত অফিসার বলেন—এখন এখানে সব কাজ আপাতত বন্ধ রইল পাঠকজী, শুধু আপনি রইলেন। সোসাইটির অফিসে আজ-কালের মধ্যেই সব রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব, তারপর দেখি কি অর্ডার আসে। আপনি আগের মতই পাহারা দিতে থাকুন, আমি আপনাকে অ্যাপয়েণ্ট করলাম।

হাত জোড় করেন পাঠকজী—রামজীর ইচ্ছা।

মহারাজপুরের জীবনটাই একেবারে বদলে গিয়েছে, এমন কোন দৃশ্য অবশ্য দেখা যায় না। তবু কতগুলি পরিবর্তন দেখা যায়, মাত্র এই কয়েকটা দিনের মধ্যেই, যা দেখে মনে হতে পারে যে, ছোট-ছোট ভাঙা গড়ার নিয়তি যেন মহারাজপুরের সত্য-মিথ্যার হিসাব নিতে আরম্ভ করেছে। ছোট ছোট ঘটনা। কেউ উধাও হয়ে যায়, কেউ বা উপরে উঠে যায়। কেউ পায় নতুন ঠাঁই, কেউ বা আবার পুরনো ঠাঁই ফিরে পায়।

উধাও হয়েছে আন্তর্জাতিক জোন্স। তদন্ত অফিসার আর পুলিশ একবার স্টেশন ক্লাবে সন্ধান নিতে এসেছিলেন। ক্লাব হোটেলের ম্যানেজার বললেন—জোন্স চলে গিয়েছে মধ্য-এশিয়ার কোন্ একটা দেশে, শুভেচ্ছার মিশন নিয়ে।

পুরনো ঠাঁই ফিরে পেয়েছেন পাঠকজী। সন্ধ্যা হলে শব্দহীন সার্ভে অফিসের বিরাট কম্পাউণ্ডের এক কোণে মাটির ঘরের সম্মুখে একটা প্রদীপ জ্বলে। কেউ নেই, শুধু যেন এক প্রহরীর চোখের আলো জেগে আছে, এবং তারই জন্য নিমকুঞ্জের অন্ধকার ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে না।

নতুন ঠাঁই পেয়েছে দেবী রায়। হ্যাপিমুকে যারা ছিল তারা এখন আর সেখানে নেই, সেখানে এসেছে দেবী রায়। হ্যাপিমুকের গ্যারেজে একটা টু-সিটার আর গাড়িবারান্দার ছায়ায় একটা অ্যালসেশিয়ান নতুন আশ্রয়ের স্বাচ্ছন্দ্যে সারাদিন বসে বসে ঝিমোতে থাকে।

আরও উপরে উঠে গিয়েছেন মৃগেনবাবু আর নন্দা দেবী, এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নবলা। কতগুলি ভাগ্যবন্ত প্রাণ উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলে এসেছে হ্যাপিমুক ছেড়ে হিলের উপর শুকতারার মার্বেল ভবনে। নীচের রাস্তা থেকে অনেক উপরে শুকতারা। রাস্তার দু'পাশে সেগুন গাছের মাথাগুলি যখন সন্ধ্যার প্রথম ছোঁয়ায় অস্পষ্ট হয়ে আসে, পরিশ্রান্ত কাকের দল উড়ে এসে বাসা খুঁজতে থাকে, তখন শুকতারার দোতলায় নবলার ঘরের জানালায় ডুবন্ত সূর্যের শেষ আভাটুকু রঙীন হয়ে থাকে। ঝংকার জাগে নবলার পিয়ানোতে। তার পরেই হর্ষ জাগে চায়ের আসরে।

শুকতারার চায়ের আসরের রূপটাও একটু নতুন রকমের। চেয়ারগুলি নিকেলের, সিট আর পিঠ ভেলভেট দিয়ে মোড়া। টেবিলটা হলো প্রকাণ্ড একটা কাচের তক্তা, শিশু কাঠের তৈরি চারটে বাইসনের শিঙের উপর বসানো। চায়ের পাত্রগুলি রুপোর।

আজও ঠিক সময়েই প্রস্তুত হয়েছে শুকতারার চায়ের আসর। সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে আর অলো জ্বলে উঠেছে। একজন মগ বাবুর্চি দাঁড়িয়েছিল টেবিলের কাছে, কোমরে ন্যাপকিন জড়িয়ে। আর টেবিলের উপর ছিল ফ্ল্যানেলের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা উষ্ণ টি-পট।

চায়ের আসরে প্রথম এসে বসলেন নন্দা দেবী। তার পর এল নবলা। মগ বাবুর্চি টি-পটের ঘেরাটোপ তুলতেই নন্দা দেবী বাধা দিয়ে বলেন—থাম, সাহেব আসুক, তারপর।

আসতে দেরি হচ্ছিল মৃগেনবাবুর। নন্দা দেবী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন —ভদ্রলোকের স্মৃতিবিভ্রম হলো না কি ?

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হলো, তবু মৃগেন বাবুকে আসতে দেখা গেল না। নন্দা দেবী বাবুর্চিকে বলেন—যাও, অফিসঘরে গিয়ে সাহেবকে বলে এস, আমরা বসে আছি।

বাবুর্চি গিয়ে খবর দিয়ে ফিরে এসেই টি-পটে হাত দিল। এবং দেখা গেল, মৃগেন বাবুও ধীরে ধীরে আসছেন, বারান্দার উপর দিয়ে, দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

অতি সাধারণ ও সস্তা একটা সুতির চাদর দিয়ে মাথাসুদ্ধ ঢেকে যেন একটু বিষণ্ণভাবে আসছিলেন মৃগেনবাবু, যেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে আসছেন। কাশছেনও মাঝে মাঝে। বিশেষ কোন অসুখ হয়েছে কি না বোঝা যায় না, কিন্তু রোগীর মতই দেখাচ্ছিল তাঁকে। তা ছাড়া, একদিনের মধ্যেই বড় বেশি বুড়িয়ে গিয়েছেন মনে হয়।

মৃগেনবাবু এসে চায়ের আসরে বসতেই নন্দা দেবী বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেন—এ কি?

মৃগেন বাবু—কেমন একটু জ্বরভাব বোধ করছি। তা ছাড়া……।

মৃগেনবাবুর কথা শেষ না হতেই নন্দা দেবী যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠেন—তাহলে কি তুমি ওখানে যাওনি?

মৃগেনবাবু—না।

নন্দা—কেন?

মৃগেনবাবু—শুনলেই তো, আজ কেমন একটু জ্বরভাব বোধ করছি।

গভীর বিরক্তি কুঁচকে ওঠে নন্দা দেবার বড় ক'রে আঁকা দুই কালো ভুরুর প্রান্তে। —আশ্চর্য করলে, জীবনে কোনদিন কোন কাজের সময় জ্বরভাব দেখলাম না, শুধু এই কাজটার বেলায় যত জ্বরভাব।

মৃগেন বাবু—হ্যাঁ, আশ্চর্যেরই ব্যাপার। হঠাৎ শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ হতে লাগলো।

মগ বাবুর্চি চা পরিবেশন ক'রে খাবার আনতে চলে যায়। চায়ের কাপ কাছে টেনে নিয়ে নন্দা দেবী কয়েকটা মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকেন, তারপরেই ম্রিয়মান মৃগেনবাবুকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বেশ জোর দিয়ে বলেন—ও জ্বরভাব কিছু নয়। যাও, আর দেরি করো না, এখনি গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে চলে এস।

মৃগেন বাবুও চায়ের কাপ কাছে টেনে নিয়ে এবং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেন—পারবো না, ও কাজটা করতে আমাকে আর বলো না।

নন্দা দেবীর চোখ দুটো তীব্র বিস্ময়ে চমকে ওঠে।

মৃগেন বাবুর কণ্ঠস্বরেও একটু তীব্রতার আভাস ছিল। একটা বিদ্রোহ যেন তাঁর অন্তরাত্মার গভীর হতে অনেক বাধা ঠেলে কোন মতে ফুটে উঠতে পেরেছে। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম। নন্দার অনুরোধকে এই ভাবে এত স্পষ্ট ক'রে তুচ্ছ

করতে তিনি যে পারেন এবং তুচ্ছ করবার দুর্ভাগ্য কখনও যে তাঁর হবে, এমন আশঙ্কা কোনদিন কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যেও তাঁর ছিল না। তবু তাই আজ সত্য হলো।

নন্দা দেবীর পক্ষে তো আরও অবিশ্বাস্য। তাই তাঁর চোখের দৃষ্টিতে অভাবিত বিস্ময় আরও গভীর হয়ে ওঠে—এ কি অদ্ভুত রকমের কথা বলছো তুমি?

মৃগেন বাবু—অদ্ভুত হলেও সত্যি, ও কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

নন্দা—কেন সম্ভব নয়?

মৃগেন বাবু—আমার কেমন বাধছে।

নন্দার চোখের দৃষ্টি এইবার শাণিত হয়ে ওঠে—বাধছে?

সহসা উত্তর দিতে পারেন না মৃগেনবাবু। নন্দার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং চুপ ক'রে রইলেন। কিসে বাধছে, তা বোধ হয় তিনি নিজেই জানেন না। কেন না, এই একটি প্রশ্নকেই তো চাপা রেখে তাঁর সুদীর্ঘ চেষ্টার ইতিহাস এতদূর চলে এসেছে। আজ হঠাৎ কেমন ক'রে বলতে পারবেন, কিসে বাধছে?

বোধ হয় প্রশ্নটাকে এখানেই চাপা দিতে চান মৃগেনবাবু। অনুরোধের সুরেই বলেন—থাক, এসব কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি?

নন্দা—তুমিই তো কথা বাড়াচ্ছো, নতুন নতুন কথা, যা কখনও তোমার মুখে শুনিনি।

মৃগেনবাবু বিব্রতভাবে বলেন—মোটকথা হলো, এ কাজটা করতে আমার কেমন ভয় করছে, চেষ্টা করলেও বোধহয় পেরে উঠবো না।

নন্দা দেবী যেন একটা বিদ্রূপের ধ্বনি শুনতে পেয়ে চমকে ওঠেন—ভয় করছে? তোমার?

মৃগেনবাবু—অন্যায় কাজ করতে সবারই ভয় হয়!

প্রায় চিৎকার করে ওঠেন নন্দা দেবী—অন্যায় কাজ? তার জন্যে আবার ভয় হচ্ছে তোমার? আশ্চর্য, সবই আশ্চর্য!

মৃগেনবাবু—তুমি এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন?

নন্দা দেবী—তুমি আশ্চর্য করে দিচ্ছ, তাই। একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে বিপদ থেকে বাঁচাবে, তার জন্যে আজ হঠাৎ তোমার বাধছে, ভয় হচ্ছে, আরও কত কি হচ্ছে কে জানে।

রোগীর চোখের মত বিষণ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টিটাও ক্ষণিকের মত প্রখর হয়ে ওঠে,

সোজা নন্দাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃগেনবাবু বলেন—তোমার জন্তে যা করতে পারি, পরের জন্তেও কি আমাকে তাই করতে হবে?

নন্দা দেবী—পরের জন্তে মানে? দেবীকে তুমি পর মনে করছো?

উত্তর দেন না মৃগেনবাবু। প্রশ্নটার ভয়ংকর রূঢ়তায় তাঁর উত্তর দেবার স্পৃহাটাই বোধহয় স্তব্ধ হয়ে যায়। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ ক'রে বসে থাকেন, তার পরেই চায়ের পেয়ালা কাছে টেনে নেন এবং শান্ত ও নির্বিকারভাবে চা খেতে থাকেন। একটু কঠিনই দেখায় তাঁকে, যেন এতদিন পরে তাঁর চিরকালের প্রতিবাদহীন কাদাটে জীবনটা হঠাৎ একটা পাথুরে মেরুদণ্ড লাভ ক'রে ফেলেছে।

দৃশ্যটা সহ্য করতে পারেন না নন্দা দেবী—উত্তর দিচ্ছ না কেন?

মৃগেনবাবু—কাজটা বড় কঠিন, পেরে উঠবো না।

নন্দা দেবী—তদন্ত অফিসারটার হাতে হাজার কয়েক টাকা ধরিয়ে দিয়ে আসবে, যেন দেবীর বিরুদ্ধে কোন খারাপ রিপোর্ট না দেয়, এই তো সামান্য একটা কাজ। এটাই হলো কঠিন কাজ?

মৃগেনবাবুর চা খাওয়া শেষ হয়েছে। উঠে দাঁড়ান। নন্দার কথাগুলি যেন আদৌ তাঁর কাণে পৌছয়নি। সুতির আলোয়ানটা দিয়ে আর একটু ভাল ক'রে তাঁর জরভাবগ্রস্ত শরীরটাকে জড়াতে থাকেন।

নন্দা দেবীর চোখের দৃষ্টি জ্বলতে থাকে, তার চেয়ে বেশি ক'রে জ্বলে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর।—রত্না ব্যাঙ্ককে ডুবিয়ে দিতে কঠিন লাগেনি? সরকারি কনট্রাক্টগুলো ঘুসের জোরে আদায় করতে কঠিন লাগছে না? দলিল জাল করে পাগলা তিনকড়ি-বাবুকে মামলায় হারিয়ে দিয়ে হ্যাপিহ্যুকের মত বাড়ি বাগিয়ে ফেলতে······।

ঠুং ক'রে একটা শব্দ হয়, নবলার হাতের পেয়ালা ডিসের গায়ে হঠাৎ ঠোকর খেয়েছে। নন্দা দেবীর এক একটি কথার আঘাতে যেন কঠিন রহস্যের ঝাঁপি ভেঙে একটা সৌভাগ্যের সোনার কাঠির কাহিনী মুখর হয়ে বের হয়ে পড়েছে। দু'কান ভরে শোনবার জন্তই চা খাওয়া থামিয়ে সুস্থির হয়ে বসে থাকে নবলা।

নন্দাদেবী কিন্তু কাহিনীর সবটুকু আর শেষ করতে পারলেন না, কারণ তিনি থেকে থেকে বড় বেশি কেঁপে উঠছিলেন, এবং মৃগেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছিলেন।

মৃগেনবাবুর নির্বিকার মুখের উপর একটা হাসির ছায়া শিউরে উঠলো মনে হয়। কোন দিকে না তাকিয়ে, তাঁর রোগীর মত মূর্তিটাকে যেন শেষবারের মত হাসিয়ে নিয়ে, চায়ের আসর ছেড়ে চলে গেলেন মৃগেনবাবু। নন্দা তেমনি চুপ ক'রে শুধু

তাকিয়ে রইলেন। দেখছিলেন, তাঁর জলন্ত ধিক্কারগুলিকে যেন ঠাট্টা ক'রে একটা বিদ্রোহের হাসি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

নবলাও একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে, মৃগেনবাবু চলে যাচ্ছেন। ওঁরই নাম মৃগেনবাবু, নবলার বাবা। এতদিন ধরে যেন চুরি-করা রাজপোষাক গায়ে দিয়ে একটা ছদ্মমূর্তি ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন পৃথিবীতে। আজ ধরা পড়ে গিয়েছেন, তাই চলে যাচ্ছেন সস্তা সুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে, একটা ভাগ্যহীন রিক্ত ও বঞ্চিতের মূর্তি।

নন্দা দেবীর দিকেও একবার তাকিয়ে দেখে নবলা। হীরকান্বিতা এক নারীর মূর্তি। যেমন তাঁর কানের দুলের হিরা দুটো, তেমনি তাঁর চোখ দুটো ঝকঝক করছে, তার উপর আরও প্রখর আলো ফেলেছে বিদ্যুতের বাতি।

পর মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নবলা. শিশুকাঠের বাইসনের চোখ দুটোর দিকে তাকায়। মনে হয় এই শুব্ধ ও শান্ত কাঠের চোখ দুটোই ভাল, তার মধ্যে কোন যন্ত্রণা নেই।

আনমনা হয়ে বসে থাকে নবলা, রুপোর পেয়ালায় চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। এইবার যেন নিজের দিকেই তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে নবলা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। হারিয়ে গিয়েছে তার নাম ধাম পরিচয়, সব কিছু। এই বাড়ি গাড়ি আর অলংকারের সমারোহ, সবই এক বঞ্চকের সিঁদেলি দুঃসাহসের জোরে রাতারাতি জেগে উঠেছে। বহু মিথ্যায় তৈরি একটা উপকথা। আর সেই উপকথারই মধ্যে এক মিথ্যা রাজকন্যা সেজে বসে আছে নবলা, রুপোর পেয়ালা ছুঁয়ে।

আনমনাভাবেই হঠাৎ হেসে ফেলে নবলা। তার পরেই উঠে দাঁড়ায়।

নন্দা দেবী বলেন—তোর আবার কি হলো? উঠছিস কেন?

একটা অন্ধ ভোমরা গুঞ্জন ক'রে কোথা থেকে উড়ে এসে বিদ্যুতের বাতিটার উপর বসে, পর মুহূর্তে টুপ করে টেবিলের উপর পড়ে যায়। ঝলসে গিয়েছে ভোমরার পাখা। নবলা আরও জোরে হেসে ফেলে।

নন্দা বলেন—খাবার না খেয়েই উঠছিস কেন?

নবলা—খাবার খাব না।

নন্দা—কেন?

নবলা—ইচ্ছে করছে না।

নন্দা দেবী ভ্রূকুটি করেন—ইচ্ছে করতে হবে, অবাধ্যতা করো না।

কিন্তু নবলা বোধ হয় এই ভ্রূকুটি দেখতেই পায়নি, এবং কথাগুলিও কানে

পৌঁছয়নি। চায়ের আসরের সব ঝকঝকে দৃশ্যগুলিকে যেন তুচ্ছ ক'রে নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে নবলা।

ট্রে'র উপর খাবারের স্তূপ সাজিয়ে মগ বাবুর্চি এসে টেবিলের কাছে দাঁড়ায়।

—ওরে বাবা! খাবারগুলির দিকে তাকিয়ে হেসে হেসেই শিউরে ওঠে নবলা, মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়, তার পরেই চায়ের আসর ছেড়ে চলে যায়।

আবার জ্বলে ওঠে নন্দা দেবীর চোখের দৃষ্টি। শুধু দেখতে থাকেন, তাঁর ভ্রূকুটিকে ঘৃণা ক'রে একটা সামান্য মেয়ের অবাধ্যতা কেমন হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে।

খাবার খেতে পারলেন না নন্দা দেবীও। মগ বাবুর্চি খাবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ফিরে এসে আবার টেবিল পরিষ্কার ক'রে চলে গেল। তবু চুপ ক'রে বসে রইলেন নন্দা দেবী, অনেকক্ষণ ধরে, শুকতারার চারদিকে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠলো।

নন্দা দেবীর গাড়ি সান্ধ্য অভিযানের জন্য ফটকের কাছেই দাঁড়িয়েছিল, প্রস্তুত হয়ে, অনেকক্ষণ ধরে। বৃথা সময় পার হয়ে যাচ্ছে, তবু উঠে যেতে পারছিলেন না নন্দা দেবী, যেন নিশ্চল হয়ে গিয়েছেন। সারা জীবন ধরে নিজের ইচ্ছার আনন্দে পথ চলতে চলতে, আর উপরে উঠতে উঠতে আজ যেন হঠাৎ একটা বাধা পেয়ে থমকে গিয়েছেন। বাধা দিল তারাই, যারা এতদিন তাঁরই মুখের হাসির জন্য হেসেছে, তাঁরই শখে শৌখীন হয়েছে, তাঁরই প্রাণে প্রাণ পেয়েছে, এবং তাঁরই আকাঙ্খার ইঙ্গিতে একটা পাতকুয়ো-ওয়ালা মলিনমূর্তি ত্রিশটাকা ভাড়ার বাড়ি থেকে এত উঁচুতে এক মার্বেল ভবনে উঠে আসতে পেরেছে।

চুপ ক'রে বসে থাকলেও, মনের ভিতর এই রুদ্ধ অভিমানের জ্বালাটা সহ্য করতে পারছিলেন না নন্দা দেবী। স্বামী মুখ ফিরিয়ে হেসে হেসে চলে গেল, মেয়ে হাসতে হাসতে মুখ ফিরিয়ে নিল। কেন? এমন ভয়ানক ভাবে তুচ্ছ করার মত আর বিদ্রূপ করার মত কি দেখলো ওরা এই মুখের দিকে তাকিয়ে?

দু'হাতে মুখ ঢাকা দেন নন্দা দেবী, ছটফট ক'রে ওঠেন, তাঁর উত্তপ্ত চোখ দুটোর মধ্যে হঠাৎ যেন কতগুলি কাঁকরের কুচি এসে পড়েছে।

ঘরে কেউ নেই, তবু মুখ লুকোতে চাইছেন নন্দা দেবী, যেন এই নির্জন ঘরের দেয়ালগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে এবং সমস্ত পৃথিবী উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে।

বেশিক্ষণ নয়, শান্ত হয়ে গেলেন নন্দা দেবী। হাতব্যাগ খুলে চিরুনি বের করলেন। হাতব্যাগের আয়নার দিকে তাকিয়ে, মাথার এদিক ওদিকে চিরুনি ঘুরিয়ে, পাউডারের পাফটাও কপালের উপর একবার বুলিয়ে নিলেন। তারপরেই উঠে

দাঁড়ালেন, যেন এতক্ষণ পরে তিনিও সব চক্ষুলজ্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রতিজ্ঞাটা ফিরে পেয়েছেন।

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ঘর ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান নন্দা দেবী। তারপরেই বারান্দা থেকে নেমে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। থেমে থাকতে পারেন না নন্দা দেবী। বুঝতে পেরেছেন, এখন থেমে গেলেই তাঁর সব শূন্য হয়ে যাবে। পর হয়ে যাবে দেবী, তাহ'লে যে তার এই সুখসুন্দর জীবনটাই একেবারে উৎসবহীন ও অলংকারহীন হয়ে যাবে, এবং সেই সঙ্গে মূল্যহীন হয়ে যাবে শুকতারার এই বৈভব।

ফটকের কাছে প্রতীক্ষমান গাড়ির ভিতরে গিয়ে উঠে বসলেন নন্দা দেবী। বেশ জোরে শব্দ ক'রে স্টার্ট নিল গাড়ি। যেন শুকতারার দুই কক্ষের নিভৃতে দু'টি ক্ষুদ্র বিদ্রোহকে তুচ্ছ ক'রে নন্দাদেবীর বিদ্রোহ বেপরোয়া আবেগে ছুটে চলে গেল। আবার নিস্তব্ধ হয় শুকতারার মার্বেল ভবন।

বড় বেশি নিস্তব্ধ। শুকতারার দুটি কক্ষে দুটি বিদ্রোহীর প্রাণ তখন শুধু মুসড়ে পড়ছে, আর ছটফট করছে, কিন্তু শব্দ ক'রে উঠতে পারছে না।

লনের পূর্বদিকে আইভি লতা দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা যে ছোট দালানটা, তারই একটা ঘর হলো মৃগেনবাবুর অফিস ঘর, আর একটা হলো শোওয়ার ঘর। ঘন সন্ধ্যার নিস্তব্ধতার মধ্যে অফিস ঘরে আলো জ্বলছে শুধু, বাইরে থেকে এর চেয়ে বেশি কোন সজীবতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অফিস ঘরের ভিতরে বস্তুহীন ছায়ার মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন মৃগেনবাবু, টেবিলের দিকে তাকিয়ে। কাগজপত্র এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে টেবিলের উপর, এখনও ফাইল করা হয়নি। কিন্তু আজ আর গুছিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন না মৃগেনবাবু। ক্যাশবুকটা খোলা পড়ে রয়েছে। আজকের তারিখের জমা আর খরচগুলি সবই লেখা হয়েছে, কিন্তু ব্যালেন্সটা টানা হয়নি। তবু হাতে কলম তুলে নিতে পারেন না মৃগেনবাবু। ইস্পাতের সুকঠিন সিন্দুক-আলমারিটা টেবিলের পাশেই রয়েছে এবং তাঁর জামার পকেটের ভিতর চাবির তাড়াটাও ভারি হয়ে রয়েছে। তবু তার এত সাধের ঐ ইস্পাতের তৈরি লক্ষ্মী-মন্দিরের কপাট খুলতে আজ আর ইচ্ছা করে না, আগ্রহ হয় না ক্যাশ মিলিয়ে রাখতে। চেয়ারের উপর নতুন কুশন পেতে দিয়ে গিয়েছে বনমালী, তবু বসতে পারেন না। অফিস ঘরটাই যেন আজ তাৎপর্য হারিয়েছে।

শুধু তাই নয়। এত দূর এগিয়ে এসেছেন যে পথে, সেই পথটাই যেন হঠাৎ

ফুরিয়ে গিয়েছে মনে হয়। আর এগিয়ে যাবার উপায় নেই, এবং এগিয়ে যাবার কোন অর্থও হয় না। যাকে সুখী করার জন্য তিনি এই টাকার তপস্যায় কায়মনঃ উৎসর্গ ক'রে এসেছেন, তাকেই দুঃখ দিতে হলো আজ। তবে আর কেন, কিসের জন্য?

প্রশ্নটা যেন মৃগেনবাবুর বুকের ভিতর মেঘের চাপা আওয়াজের মত গুমরে ওঠে—কেন কিসের জন্য? ধড়ফড় ক'রে ওঠে বুকটা, আলোটা আবছা মনে হয়। টেবিলের কাগজপত্রের দিকে আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে থাকলেও কিছু দেখতে পান না। বুঝতে পারেন মৃগেনবাবু, শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে, খুব তেষ্টাও পেয়েছে। শুধু বুঝতে পারেন না, ডাক্তার ডাকা উচিত হবে কি না।

দেয়ালে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেন মৃগেনবাবু, কারণ শরীরটা যেন হঠাৎ ভয়ে বার কয়েক শিউরে উঠলো। আজ যেন প্রথম তাঁর মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারছেন মৃগেনবাবু। আজকের এই অসুস্থতাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাঁকে, ভিতরটা যে শূন্য আর বাহিরটা যে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। শরীর ভেঙে আসছে, ভেঙে আসছে প্রাণটাও। অনেক বয়সও যে হয়েছে। তাঁর কর্মিষ্ঠ জীবনের মূর্চ্ছাহত অবসাদের সুযোগ পেয়ে অস্তিমের একটা ছায়ারূপ এসে যেন নিঃশব্দে প্রশ্ন করছে—কেন, কিসের জন্য?

পকেটের ভিতর থেকে চাবির তাড়াটা বের ক'রে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেন মৃগেনবাবু, যেন ভাগ্যের কাছে কাজের ইস্তফা জানিয়ে দিলেন। ও চেয়ারের উপর বসবার শক্তি আর নেই, ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স টানবার কোন স্পৃহা নেই, ক্যাশ মিলিয়ে দেখবার কোম আগ্রহ নেই। অফিস ঘরের ভিতর-দরজা পার হয়ে ধীরে ধীরে এসে ঢুকলেন তাঁর শোওয়ার ঘরে।

একটা তক্তপোষ, তার উপর ছোট একটা বিছানা, অর্থাৎ তোষকের উপর আধময়লা একটা চাদর পাতা এবং শিয়রে একটা শিমুল তুলোর বালিশ, এক টুকরো শালুর কাপড় দিয়ে ঢাকা। সুতির চাদরে জড়ানো মৃগেনবাবুর রোগার্ত মূর্তিটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে শুয়ে পড়লো বিছানার উপর। অস্বস্তি বোধ হয়, হাঁসফাঁস করতে থাকেন, তবু কাউকে ডাকতে পারছিলেন না মৃগেনবাবু। কারণ, বুঝতে পারছিলেন না, কা'কে ডাকবেন, এবং এই অবস্থায় কাকে ডাকতে হয়।

দোতলার একটি কক্ষেও আলো জ্বলে। অনেকক্ষণ ধরে অস্বস্তির জ্বালায় একবার এ-জানালার আর একবার ও-জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নবলা। জ্বরভাবের জন্য নয়। যেন তার জন্ম-পরিচয় আজ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে, এতদিন ধরে যে পরিচয়

বিশ্বাস ক'রে নিজেকে সুন্দর করতে আর সাজিয়ে রাখতে পেরেছিল নবলা। কিন্তু আজ আর পারা যায় না, কারণ শুকতারার মেয়ে হয়ে থাকবার একমাত্র গর্বটাও মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। অদ্ভুত এক ডাকাতির গল্প আজ নিজের কানে শুনতে পেয়েছে নবলা। দাদুর সম্পত্তি নয়, বাপের কারবারি প্রতিভা নয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর করুণা নয়—বহু মানুষের জীবনকে নিঃস্ব ক'রে পথের ধুলোয় বসিয়ে দিয়ে একটা ভয়ানক অর্থলোলুপ ইতিহাস নবলাকে শুকতারার এই দোতলায় তুলে নিয়ে এসেছে।

চায়ের আসর থেকে চলে এসে এতক্ষণের মধ্যে একবারও সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেনি নবলা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখতে পারেনি, কৌচের উপর বসতে পারেনি। শুধু এ-জানালার আর ও-জানালার কাছে ছুটে ছুটে গিয়ে যেন বাইরের বাতাস খুঁজেছে।

বোধ হয় সত্যি সত্যি মুক্তি খুঁজছে নবলা, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বিদ্রোহটা শুধু ছটফটই করছে, কিন্তু মরিয়া হয়ে চিৎকার ক'রে উঠতে পারছে না।

শুকতারার জানালায় দাঁড়িয়েই হঠাৎ শুনতে পাওয়া যায়, স্টেশনের দিক থেকে তীব্র বাষ্প-বাঁশির শব্দ ভেসে আসছে। দেখতেও পাওয়া যায়, লেভেল ক্রসিং-এর ওপারে ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের ইঞ্জিন এক জোড়া লালচক্ষু তুলে দূর স্টেশনের দিকে তাকিয়ে আছে। সিগন্যাল খুঁজছে, নইলে এগিয়ে যেতে পারছে না।

কি যেন মনে পড়ে গেল নবলার। ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এসে বারান্দার কার্পেটের উপর দাঁড়ায়, তারপরেই চিৎকার ক'রে ডাকতে থাকে—বনমালী! বনমালী!

নীচের বারান্দা থেকে বনমালী সাড়া দেয়—যাই দিদিমণি।

মিত্রাদেবীর কাছে অনেকক্ষণ ধরে অনেক গল্প শোনা আর অনেক গল্প বলা হলো স্বরূপার। তার পর গল্প থামিয়ে যোগবাশিষ্ঠের দশটি পৃষ্ঠাও পড়া শেষ করলো স্বরূপা। মেজের উপর আসন পেতে, দু'চোখ বন্ধ ক'রে, অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন মিত্রাদেবী। জানালা দিয়ে তখন অস্তোন্মুখ সূর্যের শান্ত রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে হলঘরের ভিতর। ধীরে সন্ধ্যাও এগিয়ে আসে। মিত্রাদেবী চোখ খুলেই বলেন—এখন আমি উঠি স্বরূপা, পুজোর ঘরে বাতি দিতে হবে।

পুজোর ঘরে চলে যান মিত্রাদেবী। স্বরূপাকেও বাড়ি ফিরে যেতে হবে, কিন্তু যেতে পারে না। চলে গেলে যেন একজনের একটা আকুল প্রতীক্ষাকে ব্যথা দিয়ে চলে যাওয়া হবে। চলে যাবার সামর্থ্যও খুঁজে পায় না স্বরূপা। এই শূন্য হলঘরের

বাতাস যেন কঠিন হয়ে এবং অনেকদিন পরে স্বরূপাকে আজ একা পেয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, বন্দিনীর মত অনড় ক'রে। যার কাছে দেখা দিতে এসেছে, তারই সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। কোথায় কোন্ ঘরে আছে, এবং সত্যিই ঘরে আছে কি না, কিছুই জানে না স্বরূপা। খোঁজ নিতেও পারেনি। খোঁজ নেবেই বা কি ক'রে? তাই শুধু চুপ ক'রে একেবারে অচল হয়ে থাকতে হয়, অথচ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারা যায় না। দুর্বহ এক লজ্জার ভার তার চোখের দৃষ্টি আর বুকের শ্বাসবায়ু প্রতি মুহূর্তে ক্লান্ত ক'রে ফেলছে। যেন জোর ক'রে নিজেকে একটু সচল করার জন্যই সুইচ টিপে আলো জ্বালে স্বরূপা।

পর মুহূর্তে আর চোখ তুলে তাকাবারও উপায় থাকে না স্বরূপার। ঘরের অদৃশ্য বাতাস নয়, কল্পনাও নয়, সত্যি সত্যিই দু'টি হাত অলক্ষ্যে এসে হঠাৎ বন্দী ক'রে জড়িয়ে ধরেছে স্বরূপাকে। শিউরে ওঠে স্বরূপা, মাথা হেঁট করতে গিয়ে খোঁপার দোপাটি খসে পড়ে যায় মেজের উপর!

এতদিনে যেন বহু সন্ধানের পর, দুটি পরিশ্রান্ত সত্তা পথের দু'দিক থেকে এসে একই পান্থশালার আলোকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, আর হঠাৎ দেখার আনন্দে শান্ত হয়ে গিয়েছে।

একেবারে শান্ত। দেয়ালের উপর দু'টি ছায়ার নিবিড় সান্নিধ্য একেবারে নিশ্চল হয়ে আছে, দু'জনের মাঝখানে একটা বাতাসের রেখাও আর ব্যবধান হয়ে নেই।

যদিও চোখের দৃষ্টিটা একটু ঝাপসা হয়ে ওঠে কুশলের, তবুও ঐ ছায়ার দিকে তাকিয়ে আজ একেবারে স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে, যেন দশবছরের একটা জেদকে, ভালবাসার একটা নীরব তুফানের মূর্তিকে সে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। ধরে রাখার অধিকার আর শক্তি এসেছে তার জীবনে, এতদিনে। দাবি করে না, জোর করে না, পথ রোধ করে না, পথের পাশের ফুলবনের মত সুরভিত হয়ে পড়ে থাকে যে ভালবাসার মন, তারই একটা রূপকে যেন বক্ষোলগ্ন ক'রে রেখেছে কুশল। কি কঠিন আর অপার্থিব, অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ব'লে মনে হয়েছিল এই মূর্তিকে! কিন্তু সে-ই তো আজ দুর্লভার ছদ্মবেশ ছেড়ে দিয়ে এতদিনে এসে ধরা দিয়েছে একটি সাধারণ মেয়ের লাজুক শরীর আর অলাজুক মনের মধুরতা হয়ে।

—স্বরূপা।

কুশলের ডাক কানের কাছে বেজে উঠলেও মুখ তুলতে পারে না স্বরূপা। তার চোখের দৃষ্টি পড়েছিল কুশলের পায়ের দিকে। যেন মনে পড়ে গিয়েছে স্বরূপার

ঐ পায়ের কাছে তার একটা দেনা রয়ে গিয়েছে, যে-দেনা সেদিন শোধ করতে পারেনি, প্রণাম না ক'রেই দুয়ার থেকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল কুশলকে।

শান্তস্বরে এবং অনুনয়ের মত সুরে স্বরূপা বলে—ছাড়, প্রণাম করতে দাও।

কুশল—প্রণাম তো চিরকালই ক'রে এসেছ।

স্বরূপা—আজ নতুন ক'রে আমার প্রণাম নাও।

কুশল—নতুন ক'রে কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর জানে স্বরূপা, কিন্তু জানাতে পারে না। পুরনো অভ্যাসের জন্য নয়, লৌকিকতার নিয়ম রক্ষার জন্য নয়, তার জীবনের দাবিটাই যে এতদিন পরে প্রণাম হয়ে নেমে পড়বার সুযোগ পেয়েছে। এত শক্ত হয়ে আর এত সোজা হয়ে এতদিন চলে চলে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে জীবন। আজ একেবারে নীচু হয়ে আর ছোট্টটি হয়ে একটা আশ্রয়ের কাছে এই জন্মের মত নিজেকে ছেড়ে দিতে চায় স্বরূপা। নইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সমর্পণ পূর্ণ না হলে যে জীবনের তৃপ্তি পূর্ণ হয় না। আগের জীবনে আর আজকের জীবনে তফাৎ আছে অনেক। যে প্রণাম ছিল আবেদন, তাই আজ নিবেদন হয়ে উঠবার লগ্ন লাভ করেছে। নতুনতর এই পরিণামের কাছে প্রণামও নতুন হয়ে উঠবে বৈকি। কিন্তু সে কথা আজ আবার বুঝিয়ে বলতে হবে কেন ? তার জন্য প্রশ্ন কেন ?

উত্তর দিতে পারে না স্বরূপা। কিন্তু কুশলের জীবন যে আজ ঐ প্রশ্নেরই উত্তর শুনে পরম আশ্বাস পাওয়ার জন্য ইচ্ছা করেই প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে। জানতে চায় কুশল, নতুন ক'রে প্রণাম করার কথা ওঠে কেন ?

আবার প্রশ্ন করে কুশল—আমাকে ভালবেসেছ, তাই না ?

স্বরূপা—না, তার জন্য নয়।

কুশল—তবে ?

স্বরূপা—তুমি ভালবেসেছ, তাই।

দেয়ালের উপর দুটী সন্নিবদ্ধ ছায়া আবার কয়েকটি মুহূর্তের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রণামের সুযোগ পাওয়ার আগে হেঁটমুখ তুলতে হয় স্বরূপাকে, সরিয়ে নেবার সামর্থ্য পায় না, ইচ্ছাও হয় না। রাঙা হয়ে ওঠে সারা মুখ, খোঁপা থেকে আরও কয়েকটা দোপাটি খসে পড়ে মেজের উপর। সত্যি সত্যিই তার প্রণামের জীবনকে একেবারে নতুন ক'রে দেবার জন্যই যেন ভোরের আকাশপ্রান্তের মত একটি উৎসুক পিপাসার স্পর্শ এসে উষ্ণ ক'রে দিয়েছে তার ওষ্ঠাধর।

কুশলকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়েই স্বরূপা একবার দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকায়, তারপরেই দরজার দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—আমি যাই।

কুশলের সান্নিধ্যকে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার জন্য নিশ্চয় নয়, এই অনুভবের নিবিড় বেষ্টনী থেকে যেন একটু ছাড়া পেতে চায় স্বরূপা। অকস্মাৎ রাত্রি ভোর হয়ে যাবার মত জীবনটা যেন বড় বেশি-হঠাৎ একেবারে বদলে গেল। আজকের সন্ধ্যাটা যে এমন একটা ঘটনার উপহার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল, কল্পনাতেও মনে করেনি স্বরূপা। ধারণা হয়নি, কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে তার এতদিনের আকুলতার মীমাংসা এমন ক'রে হয়ে যাবে। নিজের মনটাকেও যে আর চেনা যায় না। রাতের নদীতে স্নান ক'রে পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার মত, পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে ভোরের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে থাকার মত তৃপ্তিভরা মন। ভয় পেয়ে নয়, লজ্জা পেয়েও নয়, এই নতুন মনটাকে নিয়ে একটু একলা হতে চায়, নিজেকে একটু সামলে রাখার মত শক্তি পেতে চায় স্বরূপা, অন্তত আজকের মত।

স্বরূপার একটা হাত ধরেই রেখেছিল কুশল।—কোথায় যাবে?

স্বরূপা—বাড়ি।

কুশল—এখুনি?

স্বরূপা—হ্যাঁ।

কয়েকটি মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকে কুশল। তার পর বলে—চল পৌঁছে দিয়ে আসি, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

একলা হওয়া গেল না, ছাড়া পাওয়া গেল না। দাঁড়িয়ে থাকলেও না, চলে গেলেও না। চুপ ক'রে আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা। কুশলও যে আজ সঙ্গে যেতে চাইতে পারে, সঙ্গে যাবার পথ এমন ক'রে খুলে যাবে, একথাও কল্পনায় আসেনি স্বরূপার। ঘটনাগুলি যেন আজ কল্পনাকেও ছাড়িয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন হয়ে যাচ্ছে।

কুশলের মুখের দিকে দু'চোখ তুলে তাকায় স্বরূপা, যেন দু'টি চক্ষুভরা নিষ্পলক আগ্রহ, তার মধ্যে একতিলও লজ্জা নেই, কুণ্ঠাও নেই। জীবনে এই প্রথম।

স্বরূপা ডাকে—এস।

টান পড়ে কুশলের হাতে, কত স্পষ্ট ক'রে! শুধু চোখের দৃষ্টি আর মুখের কথায় নয়, নিজের হাতেই তাকে আজ কাছে টেনে নিতে পারছে স্বরূপা, পৃথিবীর অন্ধকার যাকে তার চোখের উপর থেকে সরিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন। সব বাধা সরে গিয়ে, অন্ধকার হেরে পালিয়ে গিয়ে, আজ স্বরূপাকে বিজয়িনী হবার

সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ ব্যর্থ হতে দেয় না স্বরূপা। প্রাপ্য উপহার নিজের হাতে জোর ক'রে কাছে টেনে নিতে সে আজ পারছে। নিজের দাবি এভাবে নিজের জোরেই পূর্ণ ক'রে তুলতে আনন্দ আছে, গর্বও আছে। এই গর্বটুকু সকল অনুভব দিয়ে উপভোগ করতে ভালই লাগে স্বরূপার। হাতে-হাত-ধরা পথচলার জীবন শুরু হবে এই ক্ষণে।

কুশল হাসে—এ কি করছো, স্বরূপা? একটুও ভয় করছে না?

স্বরূপা হাসে—একটুও না।

কুশল—লজ্জা?

স্বরূপা—একেবারেই না। পথের মানুষ আজ তাকিয়ে দেখুক, ফুলবাড়ির একটা মুখ্‌খু মেয়ের হাতের জোর কারও চেয়ে কম নয়।

হলঘরের আলোকের সান্নিধ্য ছেড়ে দু'জনেই এগিয়ে যায়। বাইরের বারান্দায় পা দেবার আগেই দরজার কাছে এসে কুশল আবার হঠাৎ একটা প্রশ্ন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে—আমার গল্প তো কিছুই শুনলে না স্বরূপা!

স্বরূপা—শুনতে দিলে কোথায়?

কুশল—তাহ'লে শোন, এখন যেও না।

স্বরূপা—শুনে কাজ নেই।

কুশল—শুনতে ইচ্ছে হয় না?

স্বরূপা—না?

কুশল—কেন?

স্বরূপা—শোনা হয়ে গেছে।

কথা শেষ ক'রে কুশলের দিকে চকিতে তাকিয়ে হেসে ফেলে স্বরূপা। কিন্তু কুশলের চোখের দৃষ্টি যেন এই প্রশ্ন ও উত্তরের সংঘাতে এরই মধ্যে একটু বিস্মিত ও বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল। যেন সেই আগের মতই অবুঝ হয়ে আছে স্বরূপা। যাকে নিজের হাতে আজ কাছে টেনে নিচ্ছে স্বরূপা, তার নতুন পরিচয় কিছু জানে না। জানবার জন্য কৌতূহলও নেই। সন্দেহ করে না, প্রশ্ন করাও ছেড়ে দিয়েছে স্বরূপা। কিন্তু পুরনো ধারণা আর কল্পনা দিয়ে আগের মতই আজও এভাবে নিজেকে তুষ্ট ক'রে রাখলে নিজেকেই যে প্রবঞ্চিত করবে স্বরূপা। জানে না স্বরূপা, কুশলের পরিচয় যে পালটে গিয়েছে এই এক বছরের মধ্যেই। তার জীবনের এই নতুন পরিচয় কতটুকু ভাল লাগবে স্বরূপার? একটুকও ভাল লাগবে কি? কিছুই বুঝতে চায় না, অথচ নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যেতে চায় স্বরূপা; কিন্তু এই অবুঝের আনন্দ যে ভয়ানকভাবে

ভেঙে যাবে, বুঝতে পারবে যে মুহূর্তে। কুশলের নতুন পরিচয় তখন সইতে পারবে কি স্বরূপা ?

বোধ হয় স্বরূপার এই হাসির উচ্ছ্বাস আর প্রসন্নতা একটু চমকে দিয়ে মোহ ভেঙে দেবার জন্য, কঠিন বাস্তবের নতুন পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই কুশল বলে—শুনেছ, ব্যাঙ্ক ডুবে গিয়ে আমাকে ভিখিরি ক'রে দিয়েছে, আর পঁচাশি টাকা মাইনের একটা যে চাকরি করছিলাম তাও হারিয়েছি ? জান, চরিত্রের সার্টিফিকেট নেই বলে কোথাও চাকরি পাচ্ছি না ?

স্বরূপা—সেসব জানি না।

কুশল—তাহলে আর কি জেনেছ ?

স্বরূপা—জেনেছি, তুমি একটি গঙ্গার দেখা পেয়েছ, আর গঙ্গাধরকে খুঁজছো। এর বেশি কিছু জানবার দরকার নেই।

আশ্চর্য হয়ে কুশল স্বরূপার মুখের দিকে তাকায়—তুমি কোথায় শুনলে এ-কথা ?

স্বরূপা আবার হেসে ফেলে—মাসিমার কাছে।

দুর্বোধ্য রহস্যটা যেন চূর্ণ হয় এতক্ষণে। ঝড়ো বাতাসের হঠাৎ ছোঁয়ায় শুকনো পাতার স্ফূর্তির মত সব গম্ভীরতা যেন চূর্ণ হয়ে উড়ে যায় হাসি হয়ে। হেসে ফেলে কুশল।

হাসির রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই কুশলের চোখে পড়ে বারান্দার এক প্রান্তে অন্ধকারটা যেন একটু বেশি ঘন হয়ে আছে। অন্ধকারটা একটু নড়ে উঠলো ব'লে মনে হয়। কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

কুশল ডাকে—কে ?

সাড়া শোনা যায়—আমি বনমালী।

—বনমালী ? কি ব্যাপার ? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে কুশলের কণ্ঠস্বর যেন আর্তনাদের মত বেজে ওঠে।

বনমালীই এগিয়ে আসে। কুশলের হাতে একটা চিঠি তুলে দিয়ে আবার সরে যায়। যেন ইচ্ছা ক'রে আবার সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে বনমালী, উত্তর নিয়ে যাবার প্রতীক্ষায়।

হঠাৎ বিচলিত হয়ে উঠলেও, পরক্ষণেই শক্ত হয়ে ওঠে কুশল। শান্ত ও নির্বিকার মনের অবহেলা দিয়ে চিঠিটা খোলে। প্রথম কয়েক ছত্র পড়েই চোখ সরিয়ে নেয়, চিঠিটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, আর পড়তে পারে না। গাছের কোটরে নিজের

বাসায় বিষধরের ফণার ছায়া দেখতে পেয়ে পাখি যেমন চমকে ওঠে আর ছটফট করে, তেমনি চমকে ছটফট ক'রে ওঠে কুশল। ব্যাকুল হয়ে ডাক দেয়—স্বরূপা।

স্বরূপা—কি ?

কুশল—আমার কাছে থাক স্বরূপা !

আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে ওঠে স্বরূপার মন। কুশলের হাতে হাত দিয়ে বলে—কাছেই তো রয়েছি।

বিপন্ন ও অসহায়ের মত দেখায় কুশলকে। বুঝতে পারে স্বরূপা, কুশলের হাতটা যেন কেঁপে উঠলো একবার। স্বরূপা বলে—ভেতরে চল।

"আজ অন্ততঃ তোমার কাছে অহংকার করবার মত আমার আর কিছু নেই। জানতে পেরেছি, কেমন ক'রে আমি হ্যাপিস্থকের চেয়েও উপরে এই শ্বেতপাথরের শুকতারার উপরতলায় উঠে এলাম, আর তুমি বসে পড়লে পথের ধুলোর উপর। আমার পিয়ানোতে যে রত্না ব্যাঙ্ক থেকে চুরি-করা টাকার ঝংকার বাজে, সে কাহিনী আমি জানতাম না। বিশ্বাস কর।

"তোমাকে আর কি বিশ্বাস করতে বলবো ? হ্যাঁ, বিশ্বাস কর, আজ তোমার কথাই মনে পড়ছে বারবার। রঙীন স্বপ্নের পিছনে বড় জোরে দৌড়ে ছুটেছিলাম, আজ বুঝেছি, নিশির ডাক ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। ভাগ্য আমার বড় জোরে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে কুশল।

"দোষ আমার ঠিকই। ভাল ক'রে শিক্ষিত হতে আর বড় হতে গিয়ে শুধু বড় বড় সুখ আর অহংকারকেই ভালবাসতে শিখলাম। কিন্তু এই ভয়ংকর ভুলে তুমিই তো আমাকে সাহায্য করেছ সব চেয়ে বেশি, সব চেয়ে আগে। তুমিই তো আমার প্রথম। এই অভিযোগ অস্বীকার করতে পার ?

"তুমি আমাকে কোনদিন সাবধান ক'রে দাওনি, বাধা দাওনি, প্রতিবাদ করনি। ভালবাসতে পারতাম তোমাকে, নিশ্চয়, কিন্তু তুমিই সে সুযোগ আমাকে দাওনি ! আমার চেয়ে আমার অহংকারগুলিকে বেশি ভালবেসে, আমার পথ-বিপথ গোলমাল ক'রে দিয়ে, আমাকে একটা মিথ্যার রাজ্যে ফেলে দিয়ে তুমি সরে পড়লে।

"আরও একটা কথা জানতে পেরেছি। তুমি আজ আর আমার ডাকের অপেক্ষায় নেই। তুমি পথ পেয়ে গিয়েছ, সুখী হতে চলেছ, সবই শুনেছি।

"তাই প্রশ্ন করতে চাই, আমার কি হবে ? আমাকে সুখী হবার পথটুকু না

ধরিয়ে দিয়ে, তুমি কি একা একা সুখী হবে? সে অধিকার কি তোমার আছে? ভুল করবার সময় তুমি ছিলে, ভুল ভাঙবার সময় কি তুমি থাকবে না?

"সুখী হবার কথা বললাম বটে, কিন্তু জানি না সুখ কা'কে বলে? সুখ কেমন ক'রে পাওয়া যায়, তা'ও জানি না। কিন্তু শান্তি তো পাওয়া যায়। একটু সাধারণ দয়ামায়ার মধ্যে, ছোট ছোট আশীর্বাদের মধ্যে, মানুষের কাছে একটু ভালবাসা পেয়ে আর ভালবেসে শান্তি পেতে চাই কুশল। কিন্তু কেমন ক'রে পাওয়া যাবে এই শান্তি? তোমার কাছে আজ এই প্রশ্নই করতে চাই।

"শুকতারার কয়েদী হয়ে থাকতে পারছি না কুশল। পৃথিবীর মেয়ে হ'য়ে একটা আটপৌরে আনন্দের ঘরে থাকবার মত জায়গা পেতে চাই। কেমন ক'রে পাব, বলতে পার?

"যেতে পারি তোমার কাছে। আমার লজ্জা বেদনা আর অপমানের গল্পগুলি বলতে পারি তোমাকে, যদি আজ কথা দাও যে, তুমি আমার জায়গা খুঁজে বের ক'রে দেবে।

"আজ নতুন ক'রে কথা দাও আমাকে, নইলে জোর পাচ্ছি না। তুমি কথা দিলে, শুকতারার ফটক আমাকে আটক ক'রে রাখতে পারবে না।

"তোমার কাছ থেকে কথা পাব, এই আশায় রইলাম।—নবলা।"

কুশলের কাছে লেখা নবলার চিঠি। কুশলের ঘরের টেবিলের উপর খোলা পড়ে রয়েছে চিঠিটা, যদিও পড়া হয়ে গিয়েছে। কুশল পড়েছে, স্বরূপাও পড়েছে। টেবিলের এপাশে বসে থাকে কুশল চুপ ক'রে মেজের দিকে তাকিয়ে, আর স্বরূপা দাঁড়িয়ে থাকে টেবিলের ওপাশে, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

কাগজে লেখা একটা চিঠি মাত্র। কিন্তু দেখে মনে হয়, যেন মস্তবড় একটা মাটির চর হঠাৎ দেখা দিয়ে দু'ভাগ ক'রে দিয়েছে মিলিত জীবনের একটি নদীকে, ছিন্ন দুটি ছোট জলরেখার মত। একটি চরের এদিকে, এবং আর একটি ওদিকে। ঢেউ নেই, কল্লোল নেই, কারও সঙ্গে কারও সম্পর্কও যেন নেই।

নবলার চিঠির প্রথম দু'ছত্র পড়ে ভয় পেয়েছিল কুশল, সে ভয় এখন আর নেই। কারণ, চিঠির সবটা পড়া হয়ে গিয়েছে, বার বার দু'বার।

ঠিক ভয় নয়, আকস্মিকের এই ক্রূরতার কৌতুক দেখে যেমন বিস্মিত তেমনই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল কুশলের মন। সে আকস্মিক যেন বাসর ঘরের দ্বারেই আগুন ধরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে চাইছে, দুটি মিলনাকুল প্রাণের মধ্যে ফাঁকি আছে কি না। কে আগে পালায় এবং কে পরে, অথবা দুজনেই মরে কি না, কেউ কাউকে ছাড়তে না পেরে।

ভাবতে গিয়ে কুশলের সমস্ত চিন্তাগুলিই অশান্ত হয়ে ওঠে। আকস্মিকের এই কুটিল বিদ্রূপ তুচ্ছ করার মত শক্তি পেতে চায়।

হ্যাঁ, শক্তি পেতে চায় কুশল। কারণ নবলার চিঠিটা বড় শক্ত। ভয় না করলেও, নিজেকে একটু অসহায় মনে না ক'রে পারে না কুশল। পড়া মাত্র এই চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি, সরিয়ে রাখতেও পারেনি। টেবিলের উপর এখনও প্রশ্ন তুলে খোলা পড়ে আছে চিঠিটা, আর বাইরে বসে আছে বনমালী উত্তর নিয়ে যাবার প্রতীক্ষায়।

নবলার চিঠি, এ'ও যেন একটা নবাবিষ্কৃত মূর্তির পরিচয় আর ইতিবৃত্ত, অতীতের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে ধুলোবালির বাধা ঠেলে এতদিন পরে আপনা থেকেই বের হয়ে এসেছে। এই মূর্তির নামটা পুরনো, কিন্তু রূপটা নতুন। সুখস্বপ্নের এক লাস্যময়ী মূর্তি যেন যাতনার সমাধি থেকে রূপান্তরিত হয়ে উঠে এসেছে, সব অহংকার হারিয়ে। এই মূর্তির চোখে জল আর নিশ্বাসে বেদনা আছে। মাথা হেঁট ক'রে আছে, মাটির দিকে তাকিয়েছে, পথ খুঁজছে আর ঠাঁই চাইছে এই মূর্তি।

উত্তর দিতে হবে নবলার চিঠির, কিন্তু উত্তরটা যেন রূঢ় না হয়। মাত্র এই মমতা-প্রবণ একটা ইচ্ছা ছাড়া কুশলের চিন্তায় দুর্বলতা বলতে আর কিছু ছিল না। এমন কোন রূঢ়তার আঘাত তুলে দেখা দেয়নি নবলার চিঠি। মাত্র একটা বেদনার কাহিনী এসেছে কুশলের কাছে সাহায্যের দাবি নিয়ে। উত্তরে শুধু জানিয়ে দিতে হবে, কতটুকু সাহায্য করা সম্ভব। এই মাত্র, এর বেশি কিছু নয়।

কথা বলার জন্যই একবার স্বরূপার মুখের দিকে তাকায় কুশল, কিন্তু তখনও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বরূপা। কি বলবে বুঝতে না পেরে, আনমনার মত নবলার চিঠিটার দিকেই তাকিয়ে বসে থাকে কুশল।

অন্যদিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু স্বরূপাকে দৃষ্টিহারার মতই দেখায়। আকস্মিক এই আঘাতের রূপ দেখে যতটা ভয় পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি লজ্জা পেয়েছে স্বরূপা। যতটা বেদনা পেয়েছে, বিস্মিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি। জীবনে আজ প্রথম, এই তো মাত্র কিছুক্ষণ আগে বিজয়িনীর মত নিজের দাবিকে নিজের হাতের কাছে টেনে নিয়েছিল স্বরূপা। হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা উল্টো টান এসে হাত ছাড়িয়ে দিল। ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না, এগিয়ে গেলেই ধরা যায় না। কাছে পেলেও যে কাছে ধরে রাখা যাবেই, এ বুঝি পৃথিবীর নিয়ম নয়।

আজ এই মুহূর্তে আনন্দসদনের এই কক্ষে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের মত আনমনা হয়ে, আর নিষ্পলক দু'টি চোখের দৃষ্টি দিয়ে অনেক দিন আগে একটা ঘটনার

দিকে যেন তাকিয়েছিল স্বরূপা। দিনটা ছিল পৌষ সংক্রান্তি, মা শুয়েছিলেন বিছানার উপর তাঁর রোগশীর্ণ শরীর নিয়ে। শোলার পুতুলের মত রক্তহীন সাদা ও এইটুকু একটা শরীর। ডাক্তার এসে দেখে চলে যেতেই মা তাঁর হাত থেকে সোনার রুলি দুটো খুলে স্বরূপার হাতে পরিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ স্বরূপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মা, তারপর বললেন—আমি শিগগির চলে যাব স্বরূপা, আমার জন্যে কাঁদিস না। একথা শোনামাত্র কেঁদে উঠে মা'র একটা হাত চেপে ধ'রে বলেছিল স্বরূপা—আমি তোমায় যেতে দেব না। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই, মা'র হাতটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল স্বরূপাকে, কারণ মা সত্যিই চলে গেলেন। একটি ছোট মেয়ের দাবিকে তুচ্ছ ক'রে জগৎ সংসারের নিয়মটা সেদিন কি আনন্দ পেয়েছিল কে জানে?

কিন্তু বোধ হয় তার পর থেকে আর ভুল করেনি স্বরূপা। দাবি করার সাহস আর আসেনি জীবনে। চেষ্টা করার নামে জগৎ সংসারের নিয়মগুলিকে ঘাঁটাতে পারেনি। যতই লোভী হয়ে উঠুক মন, যতই আকুল হয়ে উঠুক ইচ্ছাগুলি, স্বরূপা শুধু সহ্য করতে শিখেছে, চেষ্টা ক'রে হাত বাড়িয়ে উপহার নিতে শেখেনি। এই শিক্ষার ব্যতিক্রম হয়নি কখনও, হয়েছে আজ প্রথম। হাত বাড়িয়ে উপহার নিতে গিয়েছিল স্বরূপা, কিন্তু নিতে পারা গেল না। চেষ্টা করতে গিয়ে হেরে গিয়েছে, এই লজ্জা থেকে এই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে যেতে চায় স্বরূপা।

এভাবে হার মেনে লজ্জা পেত না স্বরূপা যদি নবলার ঐ চিঠিকে ঘৃণা করতে পারতো। কিন্তু দু'টি জলভরা চোখের নিবেদন হয়ে এসেছে ঐ চিঠি। কে জানে কিসের জন্য দুঃখ পেয়ে অনুতাপের জ্বালায় জীবনের সব ভুলের খাদ পুড়িয়ে দিয়ে শুধু সোনাটুকু আরও খাঁটি ক'রে নিয়ে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছে, নবলা নামে এক সুখের উপকথার মেয়ে। কত খাঁটি আর কত কঠিন ক'রে তুলেছে নবলা তার দাবিকে। এই দাবির কাছে দশবছরের আকুলতার দাবিকেও কত ক্ষুদ্র মনে হয়। আলেয়া হয়ে নয়, নতুন প্রদীপের আলো হয়েই ফিরে এসেছে নবলা। বুঝতে পারে স্বরূপা, এই আবির্ভাবের পথে বাধা দেবার শক্তি তার নেই, বাধা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। বড়কে বড় ব'লে মেনে নিয়ে, ভালকে ভাল বলে স্বীকার ক'রে নিয়ে, এবং তার জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে হবে স্বরূপাকে।

সরে যাওয়া আর দাবিহীন হয়ে আড়ালে পড়ে থাকা, শুধু এভাবে সহ্য করা ছাড়া আর কোন নিয়ম জানে না স্বরূপা এবং আজও তারই জন্য প্রস্তুত হয়ে সে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজই প্রথম বুঝতে পারে স্বরূপা, সহ্য করা কত কঠিন! ইচ্ছা করে না, এই

হার মেনে সরে যাওয়ার জীবন আর সহ্য করতে। এখনি এই ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দুঃসাহসে নির্লজ্জ হয়ে সামনের ঐ হেঁটমুখ মানুষটার গলা দু'হাতে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরে যদি বলা যায়—আমি সরে যাব না, কার সাধ্যি আমাকে সরায় ?

কিন্তু নতুন ক'রে আবার ভুল করে না স্বরূপা, অশান্ত কল্পনায় দাবিটাকে আর দুঃসাহসী হয়ে উঠতে দেয় না। দাবি করতে হবেই বা কেন ? আদালতে গিয়ে মামলার জোরে কেউ কেউ যেমন দাম্পত্য অধিকার আদায় করে, এরকম জোরের দাবিও তেমনি অর্থহীন।

তবে, সত্যিই কি সরে যেতে হবে ? তাকে হাত ধরে আপন ক'রে রাখার মত কামনার সব দায় যে নিয়েছে জীবনে, সেই মানুষের মনটাও কি ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ?

কুশলের মুখের দিকে তাকায় স্বরূপা। দেখতে পায় স্বরূপা, নবলার চিঠিটার দিকে যেন সমব্যথীর মত মমতাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে কুশল।

স্বরূপা বলে—আমি যাই।

চমকে ওঠে কুশল - তুমি যাবে কোথায় ?

স্বরূপা—আমি যাব আমার বাড়িতে।

কুশল হেসে ফেলে—আমিও যে তোমার সঙ্গে যাব স্বরূপা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

স্বরূপা—তুমি যেতে পারবে ?

কুলশ—তোমার সন্দেহ হচ্ছে ?

উত্তর দেয় না স্বরূপা। কুশলই আবার বলে—তোমারই সামনে এই চিঠির উত্তর লিখে দিচ্ছি স্বরূপা, একটু বসো।

স্বরূপা—না, আমি চলে যাই, তারপর উত্তর দিও।

কুশল—কেন ?

স্বরূপা—আমি থাকলে চিঠির উত্তর ভুল হতে পারে। যা লেখা উচিত তা হয়তো লিখতে পারবে না।

কুশল—আমাকে এতটা দুর্বল মনে করছো কেন স্বরূপা ?

বেশ স্পষ্ট ক'রে এবং দৃঢ় স্বরে কথাগুলি বলে কুশল। একটা প্রতিবাদের সুরও মিশে আছে তার মধ্যে, অগাধ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান মানুষের প্রতিবাদ।

স্বরূপা লজ্জিত হয়—তুমি দুর্বল হবে কেন ? আমি দুর্বল ব'লেই বলছি। হয়তো তোমার লেখায় কোন বাধা দিয়ে ফেলবো, এই ভয় হয়।

কুশলের গলার স্বর মমতায় নিবিড় হয়ে ওঠে—তুমিই বা কেন দুর্বল হবে স্বরূপা? কি এমন কঠিন সমস্যা যে তোমাকে আজ ভয় পেতে হবে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কুশল, এগিয়ে এসে স্বরূপার হাত ধরে। কুশলের হাতের উপরেই কপালটা নামিয়ে দেয় স্বরূপা, যেন মাথার ভার আর সহ্য করতে পারছিল না। এবং মুহূর্তের মধ্যে কুশলের হাতটা স্বরূপার চোখের জলে প্লাবিত হয়ে যায়।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরে মাথা তুলে শান্ত ভাবেই স্বরূপা বলে—না, ভয় পাচ্ছি না। তুমি চিঠির উত্তর দাও।

টেবিলের দেরাজ থেকে কাগজ টেনে বার করে কুশল এবং উত্তর লিখতেও আর দেরি করে না।

"তুমি লিখেছ—আমি যদি কথা দিই, তবে তুমি শুকতারার ফটক পার হয়ে চলে আসতে পারবে। ভুল করছো নবলা। পথ যে খোঁজে, তার মন এইরকম সর্ত ক'রে চলে না। শুকতারার ফটক যদি পার হয়ে আসতে পার, তবেই আমি কথা দিতে পারি।"

ছোট্ট চিঠি, লিখতে হাত কাঁপেনি কুশলের। লেখা শেষ হওয়া মাত্র আর দেরিও করে না। বনমালীকে ডাক দেয়। চিঠি নিয়ে, নমস্কার জানিয়ে চলে যায় বনমালী।

স্বরূপা উঠে দাঁড়ায়। —আমি যাই।

কুশল—চল।

স্বরূপা—তুমি কোথায় যাবে?

কুশল—তোমার সঙ্গে।

স্বরূপা—না।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে কুশল স্বরূপার দিকে। এই কিছুক্ষণ আগের সেই অশ্রুকোমল স্বরূপা হঠাৎ প্রস্তরমূর্তির মত এত কঠিন হয়ে উঠলো কেন?

বিব্রত বোধ করে কুশল—তুমি কি আমার কোন অন্যায় দেখলে?

স্বরূপা—না।

কুশল—তবে?

স্বরূপা—তোমার ক্ষতি করতে চাই না, তাই সরে যেতে চাই।

কুশলের চোখের দৃষ্টি বেদনার্ত হয়ে ওঠে—তুমি সরে থাকবে?

স্বরূপা—তা ছাড়া আমার আর কি সাধ্যি আছে?

কুশল—সরে থাকতে পারবে ?

স্বরূপা—তা জানি না, জোর ক'রে কিছু বলবার সাহস আমার ফুরিয়ে গেছে।

কুশল—তবে কেন বলছো এসব কথা ?

স্বরূপা—সরে থাকতে চাই, শুধু এইটুকুই বলেছি। বলা উচিত মনে করি।

কুশলের চোখের বেদনার্ত দৃষ্টিও একটু তীব্র হয়ে ওঠে—তুমি দেবী নও স্বরূপা।

স্বরূপা—সে কথাটা তুমিই যে বার বার ভুলে যাও কুশল। আমি তো জানি, আমি একটা মেয়ে মানুষ মাত্র। আমার লোভ আছে, খুঁত আছে, ভয় আছে। তাই সরে থাকতে চাই, যেন তোমার পথের বাধা না হয়ে উঠি।

কুশল—আমার পথটা কি ?

স্বরূপা—তুমি নিখুঁত হবে, জীবনের সব অভিযোগের মীমাংসা ক'রে দেবে, যেন কোন ক্রুটি তোমাকে সংসারে কারও কাছে ছোট না ক'রে দিতে পারে। তুমি মহৎ হয়েছ, আরও মহৎ হবে। নবলা আজ দুঃখে পড়ে উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইছে, তুমি সাহায্য করবে। এই তো তোমার পথ ?

কুশল—আর, তোমার পথ ?

স্বরূপা—আমার পথ আমার মনে। শুধু খোঁজ ক'রে জানবো যে তুমি ভাল আছ, তোমার ক্ষতি হয়নি, সুখী হয়েছ, শান্তি পেয়েছ।

কুশল—তুমি যেমন আমাকে তেমনি নিজেকে ভুল বুঝেছ স্বরূপা।

স্বরূপা—হতে পারে কুশল, নিজেকে নির্ভুল মনে করবার সাহস আমার নেই। হয়তো তোমার কথাই সত্যি, জোর ক'রে কিছু বলতে পারি না।

কুশল—এভাবে সরে থাকলে, তোমার মনের পথটাই কি চিরকাল ঠিক থাকবে স্বরূপা ?

স্বরূপা—হয়তো থাকবে না। চিরকালের দোহাই দিয়ে জোর ক'রে কিছু বলবার শক্তি আমার নেই।

আতঙ্কিত ও আহতের মত চেঁচিয়ে ওঠে কুশল—সত্যি বলছো স্বরূপা ? এই কি তোমার মনের কথা।

স্বরূপা—কোন মিথ্যা তোমার কাছে বলবো না কুশল। সংসারে এসে অল্প বুদ্ধি নিয়ে শুধু এইটুকুই তো দেখলাম যে, জোর করার কোন অর্থ হয় না। শুধু ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ণ করা বা না-করা আর এক জনার হাত।

কুশল—তুমি কি স্বপ্নেও ধারণা করতে পার, তোমার এ জীবনে আমি ছাড়া আর কেউ এসে তোমাকে আপন ক'রে নিয়ে গেল ?

স্বরূপা—অসম্ভব নয়। এই ধারণার জন্যে স্বপ্ন দরকার হয় না কুশল। তোমার আমার চোখের সামনেই তো এমন অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে।

শান্তভাবে চোখের তারা দুটো সুস্থির ক'রে তাকিয়ে থাকে কুশল। স্বরূপার কথার হেঁয়ালি থেকে একটা সুস্পষ্ট অর্থ এতক্ষণে ফুটে উঠেছে।

কুশল বলে—আমি নবলাকে শুধু একটা কথা দিয়েছি স্বরূপা, তার বেশি কিছু নয়। অতীতকে আমি ডেকে আনছি না, মিটিয়ে দিতে চাইছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে কুশল। তারপর বলে—এক কথায় অপমান ক'রে নবলার চিঠির উত্তর দিয়ে অতীতকে মিটিয়ে দেওয়া যেত স্বরূপা, তাই করলে কি ভাল হতো ?

স্বরূপা—কখনও না। তোমার মত মানুষের পক্ষে তা সাজে না।

কুশল—তবে ?

স্বরূপা—তোমাকে দোষী করছি না কুশল। আমার পক্ষে যা সাজে আমি শুধু সেই কথাই বলেছি।

কুশল—কি সাজে তোমার পক্ষে ? সরে থাকা ?

স্বরূপা—হ্যাঁ।

কুশল—এ শুধু আমাকে শাস্তি দেওয়া।

স্বরূপা—শাস্তি দিতে চাই তোমাকে, এমন অপবাদ দিও না কুশল।

মুখ ঘুরিয়ে নেয় স্বরূপা, কুশলই আবার এগিয়ে এসে স্বরূপার চোখের সামনে হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়ায়। হাত ধ'রে বলে—তবে কি চাও ? পরীক্ষা করতে ? সুযোগ দিতে ? আবার পথ ভুল করি কি না, তাই দেখতে ?

স্বরূপা—দেখতে চাই, তুমি সুখী হয়েছ।

কুশল—তাই দেখতে পাবে।

বিদায় নেবার জন্যই প্রস্তুত হয় স্বরূপা। কুশলকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ায়।

কুশল বলে—আবার আসছো তো ?

উত্তর দেয় না স্বরূপা। কুশল বুঝতে পারে, উত্তর দিতে পারবে না স্বরূপা।

স্বরূপার চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি তুলে, তার হাসিমুখের প্রতিজ্ঞাটাকেই আবার নিজের অবিচল মনের জোরে উচ্চারণ করে কুশল—তুমি জান যে তুমি আসবে না। কিন্তু আমি জানি, আমিই তোমাকে নিয়ে আসবো। সেদিন তোমার ভুল ভাঙবে স্বরূপা।

স্বরূপার হাত আগেই ছেড়ে দিয়েছিল কুশল। কুশলের ঘর ছেড়ে চলে যায়

স্বরূপা। হলঘরে আলো জ্বলছিল তখনও, পার হয়ে চলে যেতে কোন অসুবিধা হলো না।

'শিবভারতের রূপ'—অনেকগুলি অধ্যায় লেখা হয়ে গিয়েছে, লেখা এখনও চলছে, কবে শেষ হবে তা'ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কুশল।

অনেকদিন পরে আবার লেখা নিয়ে বসেছে কুশল। নানারকম ঘটনায় বাধা, সময়ের অভাব আর বেদনাক্ত চিন্তার অস্বস্তি সত্ত্বেও কুশলের রিসার্চের কাজটাও এগিয়েছে অনেকখানি। হরভবনের মিউজিয়ামে দীপালোকিত এক সন্ধ্যায় শিলা-মূর্তির চোখে আর মুখে যার আভাস দেখতে পেয়েছিল, বৈকালী সূর্যের আলোকে প্রসন্ন আমলকির জঙ্গলে একদিন মাটি বাতাস আর লতাপাতার গন্ধে যার সাড়া অনুভব করেছিল, পলাশতলায় ভেজা ঘাসের উপর যার বেদনা নিষ্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিল, তারই রূপতত্ত্ব লিখছে কুশল।

প্রথম কয়েকটা অধ্যায় হলো, হরভবন নামে প্রাচীনকালের এক সমাধিস্থ জনপদের পরিচয়। কিন্তু পরের অধ্যায়গুলি যেন আরও গভীরে চলে গিয়েছে। ইতিহাসের রূপ পার হয়ে রূপের ইতিহাসে, শিলা ছেড়ে প্রাণে। ইতিহাসের ছাত্র কুশলের রিসার্চ যেন অধ্যায়ের পর অধ্যায় পার হয়ে শেষ পর্যন্ত এক রূপসন্ধানী শিল্পীর অভিযানের বিবরণ হয়ে উঠেছে।

ঘুমটা শেষ রাতে হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে, এবং বৃথা আর ঘুমোবার চেষ্টা না ক'রে উঠে বসেছে কুশল। আলো জ্বেলেছে, জানালাগুলি খুলে দিয়েছে। টেবিলের দেরাজ থেকে নতুন একটা খাতা টেনে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছে। ভেজা কুয়াশার এক একটা স্তবক জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢুকছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে আলো। তবু লিখতে থাকে কুশল, যতক্ষণ না সকাল হয়ে আর পুব আকাশের প্রান্ত থেকে কাঁচা রোদের ঝলক এসে লুটিয়ে পড়ে খাতার উপর। আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার লিখতে থাকে কুশল।

"—দেখতে পেয়েছি, প্রাণময় সংসারে সত্যের রূপ কত সুন্দর। হরভবনের প্রাচীন ভাস্কর অনেক দেবিকা ও নায়িকার মূর্তি গড়ছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন মূর্তির সন্ধান পেলাম না যার চোখে সহসুন্দর দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। কিছুটা অবশ্য দেখতে পাওয়া যায়, মিউজিয়ামের বাইশ নম্বরের দেবিকা মূর্তির মধ্যে। অদ্ভুত একরকমের ধোঁয়াটে রঙের পাথর দিয়ে তৈরি এই মূর্তিটা। উপরের পালিশ প্রায় সবই ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় চুনামাটির একটা স্তরের উপর পড়েছিল এই মূর্তি।

তবে মুখটা বিকৃত হয়নি, তার মধ্যে বিশেষ ক'রে চোখ দুটো একেবারে অক্ষত। চৌধুরি সাহেবের রিপোর্টে ভূমি দেবী নামে একটি মূর্তির উল্লেখ রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে সহস্রসুন্দর আবেদন ফুটে রয়েছে, এই বাইশ নম্বরের মূর্তিটিই বোধ হয় ভূমি দেবী।

"—যে শুধু বেদনা সহ্য করে, অথচ তার জন্য ক্ষোভ রাখে না, অভিযোগ করে না, প্রতিবাদ করে না, কত সুন্দর হয়ে ওঠে সে মানুষের রূপ। তার চোখের দৃষ্টি জ্যোৎস্নালোকের মতই উত্তাপহীন, আর প্রাণটা বেলাভূমির মত, সমুদ্রতরঙ্গের আঘাত বুক পেতে শুধু সহ্য ক'রেই সে ধন্য হয়ে আছে।

কলম থামিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকায় কুশল। বাগানের উপর দিয়ে টেলিগ্রাফের যে তারের লাইনটা পার হয়ে গিয়েছে, তারই গায়ে শিশিরের ফোঁটাগুলি ঝিকঝিক করছে পোখরাজের দানার মত। মুখর পাখির দল হুটোপুটি ক'রে উড়ে এসে বসছে তারের উপর, পাখার ঝাপটায় আর নখের আঁচড়ে শিশিরের পোখরাজগুলি জল হয়ে ঝরে পড়ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার লিখতে থাকে কুশল।

"—জীবনের ভুলের বেদনায় জ্বলে-পুড়ে প্রায়শ্চিত্ত সেরে মানুষ আবার নির্ভুল হবার জন্য যখন পথ খোঁজে, তখন কত নতুন আর সুন্দর হয়ে ওঠে তার রূপ। হরভবনের দু'নম্বর ট্রেঞ্চে প্রাচীন মন্দিরমণ্ডপের যে একটা অংশ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে উৎকীর্ণ এক নায়িকার মূর্তিতে এই রূপের পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায়। সরোবরের জলে অর্ধনিমজ্জিতদেহ এক স্নানার্থিনী নায়িকার নাগপাশবদ্ধ মূর্তি, তার দু'চোখের সমস্ত দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুলতা। ক্ষমা চায়, মিনতি জানায়, সাহায্য খোঁজে—সব অহংকার শেষ ক'রে দিয়ে শুধু আকুল হয়ে দাবি করে একটুকু শান্তির ঠাঁই। এই অসহের রূপও কত সুন্দর। তার চোখের দৃষ্টি দীপশিখার মত। জ্বালা আছে, উত্তাপ আছে, তবু আলোকটা স্নিগ্ধ। তার প্রাণটা মেঘের মত, খুঁজছে শীতল বাতাসের করুণা। বিদ্যুৎ হানবার জন্য নয়, বরষার ধারা হয়ে নেমে পড়ার জন্য।

"—এই দুই রূপের মধ্যে তুলনায় কোন্‌টি সুন্দরতর তা বলা যায় না। কারণ সমুদ্রের বেলাভূমি আর বৈশাখী মেঘের মধ্যে রূপের তুলনা হয় না, যে যার নিজের নিজের রূপে সুন্দর হয়ে আছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে, এই দুই রূপের মধ্যে সংসারের কাছে মমতার দাবি কে বেশি করতে পারে, তবে বলা যায় ..।"

কি বলা যায়? নিরুত্তর হয়ে থেমে থাকে কুশলের কলম, লেখা আর এগোয় না।

রূপতত্ত্বটা যেন বড় কঠিন একটা প্রশ্নের কাছে এসে ঠেকে গিয়েছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা বোধ হয় এই অধ্যায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা যাবে না। নতুন অধ্যায় আরম্ভ করতে হবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে কুশল, এখন আর নতুন অধ্যায়ের লেখা আরম্ভ করা যাবে না, কারণ অন্য কাজ আছে এবং সময়ও হয়েছে।

অন্য কাজ মানে চাকরির চেষ্টা। আজ যেতে হবে একবার নরেশ ব্রাদার্সের অফিসে। যে কোন একটা কাজের জন্য ইচ্ছা জানিয়ে দরখাস্ত করেছিল কুশল। দরখাস্তের উত্তরটা এসেছে।

নরেশ বাবুরা একদিন বিজয় বাবুর কাছ থেকেই বিনাসুদে টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, এবং সে ব্যবসা আজ বড় হয়ে স্যামুয়েল সাহেবের ব্যবসাকেও গরিমায় ছাড়িয়ে যেতে চলেছে। যদিও সে বহুদূর অতীতের কথা, তবুও কুশলকে বোধ হয় চিনতে পেরেছেন তাঁরা এবং একটা কাজ দিতে রাজিও হয়েছেন। নরেশ ব্রাদার্সের অভ্র বিভাগে স্টোর মুহুরির কাজ—মাইনে পঞ্চাশ টাকা! বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই জানিয়েছেন নরেশ ব্রাদার্সের নরেশ বাবু—বাজারের যা অবস্থা এবং লোকসান এত বেশি যে এর চেয়ে বেশি মাইনের কোন কাজ দেবার সামর্থ্য তাঁদের নেই। শুধু স্বর্গীয় বিজয় বাবুর কথা স্মরণ ক'রে বাধ্য হয়েই তাঁরা কুশলের জন্য এই ব্যবস্থাটা করেছেন, নইলে বর্তমানে স্টোর মুহুরিও কোন দরকার তাঁদের ছিল না।

নরেশ ব্রাদার্সের করুণার পরিমাণ দেখে অভিমান করার সময় ছিল না কুশলের, সে প্রশ্ন তুলবার প্রয়োজনও নেই। যে কোন একটা খাটুনি খেটে, বিনিময়ে কয়েকটা টাকা পেয়ে তাকে নিরন্নতা থেকে শুধু বাঁচতে হবে। কারণ, বাঁচবার প্রয়োজন আছে।

ঘর ছেড়ে বের হয় কুশল এবং মাত্র আনন্দসদনের গেট পর্যন্ত গিয়েই একটা বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। পাঠকজী এবং তাঁর সঙ্গে হ্যাট মাথায় এক ভদ্রলোক গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকছিলেন।

বিস্মিত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল কুশল, কিন্তু তার আগে পাঠকজীই ছুটে এসে কুশলের হাত ধরলেন।—রামজীর ইচ্ছায় সব ঠিক আছে কুশল বাবু, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

হ্যাট মাথায় ভদ্রলোক বলেন—আপনি আমায় চেনেন না। আপনার কাছ থেকেই কমপ্লেন পেয়ে সোসাইটি আমাকে তদন্ত করতে পাঠিয়েছে।

কুশল—তদন্ত করা কি হয়ে গেছে?

চেঁচিয়ে হাসতে থাকেন তদন্ত অফিসার—হয়েছে, হয়েছে, খুব ভাল করেই হয়েছে। মূর্তিগুলি বেঁচেছে, মিউজিয়ামের দরজা সিল করে দিয়েছি, কেরানি বেটাকে তাড়িয়েছি, পাঠকজীকে অ্যাপয়েণ্ট করেছি।…আর কি শুনতে চান?

হ্যাট খুলে মাথা চুলকে নিয়ে তদন্ত অফিসার বলেন—তা হ'লে আরও শুনুন।… চুরি ধরা পড়েছে, একটা চোরকেও তাড়িয়েছি।

তারপরেই মাথায় হ্যাট চেপে দিয়ে গম্ভীর হতে গিয়েই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তদন্ত অফিসার।—দেবী রায়কে সসপেণ্ড করেছিলাম, তারপর ডিসমিস করিয়েছি এবং বাংলো থেকে বের করেও দিয়েছি। এর পর ডেভিলটাকে মামলায় ফেলে উচ্ছন্ন ক'রে দেব, তবে আমার নাম ইউ পি দত্ত, যার বাবার নাম ডাকাত-মারা দত্ত, নিবাস সুধন্যপুর, জেলা রাজসাহি।

কুশল বলে—ভেতরে আসুন।

তদন্ত অফিসার শান্ত ভাবেই বলেন—হ্যাঁ চলুন, আপনার কাছেই তো এসেছি, একটা দুরূহ সমস্যায় পড়েছি বলে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আপনিই বা কি ক'রে কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন।

কুশলের সঙ্গে এগিয়ে এসে হলঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর বসলেন তদন্ত অফিসার। কুশল বসে আর একটা চেয়ারে। পাঠকজী দাঁড়িয়ে রইলেন, তদন্ত অফিসার আর কুশলের বার বার অনুরোধ সত্বেও চেয়ারে বসতে রাজি হলেন না পাঠকজী।

পকেট থেকে নোটবুক আর কয়েকটা চিঠি বের করলেন তদন্ত অফিসার।—সমস্যা হলো, মিউজিয়মটার গতি কি হবে? সোসাইটি সাবধান হয়ে গেছে এবং দুঃখ করেই অর্ডার দিয়েছে, মিউজিয়ামকে একটা ট্রাস্টের হাতে তুলে দিতে। এসব চুরি ডাকাতির ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেছে সোসাইটি, এত টাকা খরচ করতে ওরা আর রাজি নয়। শুধু ট্রাস্টের যারা কাজ করবে তাদের হাত খরচা হিসাবে প্রতি মাসে দু'শো টাকা সাহায্য দিতে রাজি আছে সোসাইটি।

কুশল—সোসাইটিকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।

তদন্ত অফিসার—দোষ তো দেওয়াই যায় না, বরং আমাদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত।

কথা শেষ ক'রেই আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তদন্ত অফিসার।—মানুষ জাতেরই বদনাম করে ছাড়লো ঐ বেটা দেবী রায়।

কুশল—যা হবার হয়ে গেছে, এখন মিউজিয়ামটা যাতে থাকে, আর হরভবনের অনুসন্ধানের কাজটাও চলতে থাকে, অনুগ্রহ ক'রে এইরকম একটা ব্যবস্থা করুন।

তদন্ত অফিসার—হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করতে এসেছি। বলুন, আপনি ট্রাস্ট গঠন করার ভার নিতে রাজি আছেন?

কুশল—আমি রাজি আছি।

তদন্ত অফিসার—মনে রাখবেন, মাসে দু'শো টাকার বেশি সাহায্য দেবে না সোসাইটি। এরই ভেতর আপনাকে সব খরচ চালিয়ে নিতে হবে।

কুশল—তাই চালিয়ে নেব।

তদন্ত অফিসার—কিন্তু হরভবনের স্তূপ খুঁড়বার খরচা পাবেন কোথায়?

কুশল—হাত পাতবো মানুষের কাছে। যা পাওয়া যাবে তাই নিয়েই কাজ চালাবো।

তদন্ত অফিসার—হাত পাতলে এসব কাজে টাকা দেবে, এরকম মানুষ আছে আপনাদের মহারাজপুরে?

কুশল—আছে, তাদের সাহায্যেই তো আমার সদাব্রত চলছিল এতদিন।

তদন্ত অফিসার—তারা কারা?

কুশল—এই সব সাধারণ মানুষ, যারা সেরকম শিক্ষিত নয়, আর পয়সাওয়ালাও নয়।

তদন্ত অফিসারের চোখের দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং বেশ উল্লসিত ভাবেই বলেন—আপনার কথা শুনে বড়ই আনন্দ হলো কুশল বাবু। সাহস আছে, আত্ম-বিশ্বাসের জোর আছে আপনার, আমি এই রকমই আশা করছিলাম আপনার কাছ থেকে। কিন্তু......।

বলতে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন তদন্ত অফিসার। মস্ত বড় একটা চিঠির টাইপ-করা অক্ষরগুলি মন দিয়ে পড়তে থাকেন। বোধ হয় সোসাইটির চিঠি। পড়তে পড়তে তদন্ত অফিসারের মুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। একটু হতাশ ভাবেই বলেন—কিন্তু এর মধ্যে একটা ফ্যাকড়া আছে কুশলবাবু, সেই জন্যেই বলতে লজ্জা পাচ্ছি।

কুশল—আপনি বলুন, লজ্জা করবেন না।

তদন্ত অফিসার—আপনি তো ট্রাস্ট গঠন করবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকার একটা ফাণ্ড আছে দেখাতে হবে, তবেই ট্রাস্টের হাতে মিউজিয়ামের ভার ছেড়ে দেবে সোসাইটি।

চমকে ওঠে কুশল। হঠাৎ একটা বিদ্রূপের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। আবার ত্রিশ হাজার টাকা। সেই আকস্মিকের খামকা ইচ্ছার খেয়াল এতক্ষণের আশার আয়োজন এক মুহূর্তে চূর্ণ করে দেবার জন্য দাবি জানিয়েছে ত্রিশ হাজার টাকা, তারই কাছে যার টেবিলের দেরাজে এক হাজার পয়সাও এখন বোধ হয় নেই।

কুশল বিব্রতভাবে প্রশ্ন করে—প্রথমেই এত টাকার দরকার হবে কিসে?

তদন্ত অফিসার—মিউজিয়ামের জন্য একটা নতুন বাড়ি তৈরি করার মত টাকা ট্রাস্টের হাতে আছে, মাত্র এইটুকু দেখতে পেলেই ট্রাস্টের হাতে মিউজিয়াম ছেড়ে দেবে সোসাইটি।

কুশল—নতুন বাড়ি তৈরি করতে হবে কেন?

তদন্ত অফিসার—সার্ভে অফিসের কোন ঘরে আর মিউজিয়াম রাখা চলবে না। গবর্নমেণ্ট নোটিশ দিয়েছে সোসাইটীকে, ওখানে গবর্নমেণ্টের কৃষি অফিস বসবে গ্রো-মোর-ফুডের জন্য।

শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের মত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল কুশল। ত্রিশ হাজার টাকার দাবি যেন নতুন ক'রে একটা পরীক্ষার মূর্তি ধরে ভয় দেখাতে আর বিদ্রূপ ক'রে দমিয়ে দিতে এসেছে কুশলকে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে কঠিন হয়ে ওঠে কুশলের মুখটা, যেন আকস্মিকের এই বিদ্রূপের আঘাত চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা জাগছে বুকের ভিতর। যেন আজ নিজের উপর ডাকাতি ক'রে একেবারে ফুরিয়ে যেতেও প্রস্তুত আছে কুশল, তবু এই পরীক্ষার কাছে হার মানতে চায় না।

তদন্ত অফিসার ব্যথিতভাবেই বলতে থাকেন—কোন ব্যবস্থা না হলে, শেষ পর্যন্ত মূর্তিগুলিকে দিল্লীর এশিয়া মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিতে হবে, সোসাইটির তাই অর্ডার।

কুশল বাধা দিয়ে বলে—না।

তদন্ত অফিসার কৌতূহলী হয়ে তাকান—কি বলছেন?

কুশল—আমি এখনি আসছি, একটু অপেক্ষা করুন।

তদন্ত অফিসার—আসুন, আসুন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষায় চুপ ক'রে বসে থাকতে হলো না তদন্ত অফিসারকে। পাঠকজীর সঙ্গে দু'একটা অবান্তর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু শেষ হবার আগেই কুশল ফিরে এসে ঢুকলো হলঘরে।

কুশল বলে—ত্রিশ হাজার টাকা দেবার সামর্থ্য আমার নেই মিস্টার দত্ত। পরের

কাছ থেকে দান নিয়ে এত টাকা যোগাড় করে উঠতে পারবো কি না, তাও জানি না। কতদিনে যোগাড় করা সম্ভব হবে, তাও বলা যায় না।

তদন্ত অফিসার—সেই জন্যেই তো আমি হতাশ হয়ে প্রথমেই আপনাকে বলে নিয়েছি যে……।

কুশল—ত্রিশ হাজার টাকার চেয়ে বেশি দামের একটা বাড়ি যোগাড় ক'রে দিলে চলবে কি?

তদন্ত অফিসার—চলবে বৈকি, বাড়ির জন্যেই তো টাকার কথা বলা হয়েছে।

কুশল—তাহ'লে দিন আমার ওপর মিউজিয়মের ভার, আমি ট্রাস্ট গঠন করবো।

তদন্ত অফিসার—বাড়ি?

কুশল—এই তো বাড়ি।

তদন্ত অফিসার—আপনার এই নিজের বাড়ির কথা বলছেন?

কুশল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তদন্ত অফিসার—আর কারও আপত্তি হবে না? অন্য কোন অংশীদার নেই তো?

কুশল—কোন অংশীদার নেই। এই বাড়ি দান করতে একমাত্র যাঁর কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া দরকার, তাঁর কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে এসেই বলছি।

তদন্ত অফিসার—তিনি কে?

কুশল—আমার মা।

তদন্ত অফিসার—কিন্তু এর পর মা আর ছেলের গতি কি হবে? তাঁরা থাকবেন কোথায়?

কুশল—বাগানটা রয়েছে, বাগানে গোটাচারেক পাকা ঘরও আছে। না হয়, গোঁসাইপাড়ার গলিটলি কোথাও গিয়ে একটা ঠাঁই ক'রে নিতে হবে।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে নিজেকে যেন সংযত ক'রে রেখেছিলেন তদন্ত অফিসার। এইবার একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে কুশলকে বুকে জড়িয়ে ধরেন—শত ধন্যবাদ জানবেন কুশলবাবু, আমার শত কোটি প্রণাম জানাবেন আপনার মাকে। মানুষ যে আজকালকার দিনেও এমন মহৎ হয়, দেখেশুনে আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মশাই, আঃ!

পাঠকজী নিজের মনেই আস্তে আস্তে বলে ওঠেন—রামজীর ইচ্ছা!

সত্যি সত্যি ডাকাত-মারা দত্তের ছেলে ইউ পি দত্তের কড়া অফিসারি মনটা যেন এতক্ষণের উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার পর আনন্দে একেবারে জুড়িয়ে গিয়েছে। হলঘরের ভিতরেই অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরা করেন, তারপর শান্ত হয়ে আবার চেয়ারের

উপর বসেন তদন্ত অফিসার ইউ পি দত্ত।—আঃ, আমি এখুনি গিয়ে উকিল পাঠিয়ে দিচ্ছি দলিল পত্র তৈরি করার জন্য, যাতে দু'একদিনের মধ্যে অর্থাৎ শুভস্য খুব শীঘ্রং ক'রে ট্রাষ্ট রেজিস্টারি করা হয়ে যায়।

তার পরেই গলার স্বর নামিয়ে কুশলের কানের কাছাকাছি মুখ নিয়ে এসে তদন্ত অফিসার বলেন—আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে মশাই, কারণ বড় লজ্জাকর একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।

কুশল—বলুন!

তদন্ত অফিসার—দোহাই আপনার, মহারাজপুরের কোন কালচার্ড হোমরা-চোমরাকে ট্রাস্টের মধ্যে ঢোকাবেন না। এমন লোক নেবেন যার কোন চালচুলো নেই, অথচ মনটা খাঁটি।···আছে এরকম লোক?

কুশল কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়—আছে।

তদন্ত অফিসার উঠে দাঁড়ান এবং হাঁপ ছাড়েন—বাস, এইবার নিশ্চিন্ত মনে একটানা বার ঘণ্টা ঘুমোতে পারবো কুশলবাবু।

হেসে ফেলে কুশল। তদন্ত অফিসার প্রায় চিৎকার ক'রে বলেন—হাসবেন না মশাই, এইবার সোসাইটির কাছে গর্ব ক'রে কিরকম রিপোর্টটি যে ছাড়বো, তা আপনি বুঝতে পারছেন না।···চলি এবার।

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তদন্ত অফিসার। পাঠকজীও বিদায় নিলেন। আর বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না পাঠকজী। কারণ তিনি মিউজিয়ামের বদ্ধ দরজার সামনে একজন রাখালকে পাহারায় বসিয়ে রেখে এসেছেন, এখুনি ফিরে গিয়ে সে-বেচারাকে ছুটি দিতে হবে।

নির্জন হলঘরের ভিতরে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিল কুশল, কিন্তু মনের ভিতরে একটা আনন্দ কলরব ক'রে উঠতে চাইছিল। যেন একটা দেনার দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে কুশলের জীবন।

জীবনে সফলতার আনন্দ এমন ক'রে কখনও অনুভব করেনি কুশল। এইখানে বসে, মনে মনে এই সাফল্যগুলিকে এক কঠিন সংগ্রামের ফলাফলের হিসাবের মত এখন মিলিয়ে দেখতে পারে কুশল। পরাভূত হয়ে পালিয়ে গিয়েছে যত ভুতুড়ে হিংসা, জীবনদ্রোহীর হীনতা আর লুণ্ঠকের লোভ। রক্ষা পেয়েছে কল্লোলিতকান্তি গঙ্গা। পাঠকজী ফিরে পেয়েছেন তাঁর পাহারার আনন্দ, হরভবনের মূর্তিরা আর ক'দিন পরেই এসে আশ্রয় নেবে এই আনন্দসদনের প্রতি কক্ষের ভিতরে।

গঙ্গাধরকে অন্বেষণের সুযোগ আর দায় আরও অবাধ হয়ে ফিরে আসছে কুশলের

জীবনে। এমন কি জীবিকার জন্যও নরেশ ব্রাদার্সের করুণার দুয়ারে গিয়ে আর দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছাগুলি দাবিগুলি আর প্রতিজ্ঞাগুলি—জীবনের এক অবিচলিত চেষ্টার ইতিহাস আজ পূর্ণ হয়ে উঠেছে, জয়ে ও সাফল্যে।

স্নানাহার সেরে আবার যখন নিজের ঘরে গিয়ে বসে কুশল, তখন মধ্যাহ্ন পার হয়ে গিয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকায়। দূরের একটা কৃষ্ণচূড়ার রিক্ত ডালপালায় সবুজের সাড়া ফুটেছে, শেষ মাঘের বাতাসের শীতার্ত্ততা ফুরিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ, তার জীবনের পরীক্ষাগুলি তাকে যতদূর রিক্ত করার ক'রে দিয়ে শেষ মাঘের বাতাসের মতই এখন যেন হার মেনে ফুরিয়ে যেতে চলেছে নিজের থেকেই। তাই আজকের আনন্দগুলিকে চিনতে ভুল করে না কুশল। আকস্মিকের সব আঘাতকে তুচ্ছ করা, আর নিজের জোরে নিজেকে জাগিয়ে-রাখা ও পথ-চলার জীবনে যা প্রাপ্য ছিল, তাই একে একে উপহার হয়ে আসতে আরম্ভ করেছে।

হাতের কাছে এখন কোন কাজ ছিল না কুশলের। দেরাজ থেকে আবার খাতাটা টেনে বার করে। রূপতত্ত্বের নতুন অধ্যায়টা এখন লিখতে আরম্ভ করা যেতে পারে।

লিখতে বসেই অন্যমনস্ক হয়ে যায় কুশল। মনে পড়ে যায় এমন কতগুলি কথা, যেগুলি আজকের দিনের ঘটনার চাঞ্চল্যে এতক্ষণ যেন মনের তলায় থিতিয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে মনে পড়ে; আর একটা পরীক্ষা যে প্রশ্ন তুলে সম্মুখেই রয়েছে, এখনও তার সমাধান হয়নি।

আজকের আনন্দের মধ্যে একটা যে শূন্যতা ফাটলের মত রয়ে গিয়েছে, এতক্ষণে যেন স্পষ্ট ক'রে বুঝতে আর দেখতে পায় কুশল। মনের গভীর থেকেই একটা বিষণ্ণতা উঠে এসে এই আনন্দের গায়ে যেন বেদনার মত বিঁধছে। এরকম হতো না, যদি স্বরূপা আজ অবুঝ হয়ে দূরে সরে না থাকতো। এতগুলি সুসংবাদ আর সফল ইচ্ছার আনন্দ যেন স্বরূপা কাছে নেই বলেই পূর্ণ হয়ে উঠতে পারছে না। ভুল বুঝেছে স্বরূপা, কিন্তু একদিন তার ভুল ভাঙবে, যেদিন কুশলই গিয়ে তার হাত ধরে ডাক দিয়ে বলবে—এবার চল। দেখলে তো তোমার ভয় কত মিথ্যা, তোমার দূরে সরে থাকা কত বড় ভুল। আমার মনে দাগ থাকলে তোমার কাছে আসতাম না। তোমারই জন্য, তোমাকে নিশ্চিন্ত মনে আপন ক'রে নেবার জন্য, অতীতের সব গ্রন্থি ছিন্ন ক'রে, মুক্ত হয়ে, আমার ভালবাসার দাবিতে কোন খুঁত না রেখে তোমাকে আজ আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

খাতাটা হাতের কাছে রেখেও কতক্ষণ যে অন্যমনস্ক হয়েছিল কুশল, তাও সে

জানে না। ভাবনাগুলি আর একবার যেন নিজের থেকেই চমকে ওঠে। খাতাটা দেরাজের ভিতর আবার রেখে দেয় কুশল।

বুঝতে পারে কুশল, আজকের আনন্দের মধ্যে আর একটা শূন্যতা যেন মুখঢাকা দিয়ে রয়েছে, তাই এতক্ষণ বুঝতে পারা যায়নি। এই শূন্যতা এখনি ঘুচে যেতে পারে, যদি এই মুহূর্তে শুনতে পাওয়া যায় যে, শুকতারার ফটক পার হতে পেরেছে নবলা। পথ পেয়ে গিয়েছে, পৃথিবীর মেয়ে হয়ে একটা আটপৌরে আনন্দের ঘরে ঠাঁই পেয়েছে নবলা।

আনন্দটা পূর্ণ না হোক, আত্মবিশ্বাসে আজ পূর্ণ হয়ে আছে কুশলের মন। নবলাকে পথ ব'লে দেবার আর স্বরূপাকে পথে ডেকে আনবার শক্তি তার আছে, কারণ সে আজ বহু দুঃখের মূল্য দিয়ে পাওয়া নিজের পথে শক্ত হয়ে আর নির্ভুল হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে।

মাত্র এই দু'টি ইচ্ছা। শিল্পীর তুলিকার শেষ দু'টি টান মাত্র বাকি আছে। এইটুকু পূর্ণ হলেই শেষ হলো ছবি আঁকার কাজ, আর ছবিটিও পূর্ণ হয়ে গেল। কোন ত্রুটি আর রইল না কোথাও। তারপর রূপতত্ত্বের নতুন অধ্যায়টা লিখতে এমন ক'রে কোন প্রশ্নের বাধায় আর থমকে থাকতে হবে না।

কিন্তু আর কত দেরি? মনের বিশ্বাসটা অবিচল, কিন্তু কুশলের আগ্রহটা আজ যেন থেকে থেকে একটু বেশি চঞ্চল হয়ে উঠছে। এই প্রতীক্ষা আর সহ্য করতে হবে কতদিন? কবে আসবে মীমাংসার সুযোগ? কবে শুকতারার ফটক পার হতে পারবে নবলা?

প্রশ্নগুলি একটু উতলা হয়েই উঠতে চাইছে এবং মনেও পড়ে কুশলের, তাকে তো চলে আসতে বলা হয়নি, একটা যুক্তির কথা তুলে আহ্বানের কার্পণ্য করেছে কুশল। চিঠির উত্তরটা একটু মমতাহীন হয়েছে। যে অসহায় হয়ে সাহায্য চাইছে, তাকে তো সোজাসুজি এই উৎসাহ আর আশ্বাসটুকুই দেওয়া উচিত ছিল—শুকতারার ফটক পার হয়ে চলে আসতে দেরি করো না নবলা। পথ খুঁজছো যখন, তখন পথ পেয়েই যাবে। আমি বলে দিলে পাবে, না বলে দিলেও পাবে। আমি যেমন আমার পথ পেয়েছি, তুমিও তেমনি তোমার পথ পাও, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে আজ অস্বীকার করতে পারে না কুশল, নবলার অভিযোগটা একেবারে মিথ্যে নয়। নবলার জীবনের প্রথম ভুলে সাহায্য করেছে কুশল নিজেরই ভুলভরা আকাঙ্ক্ষার কতগুলি উদ্দাম স্বপ্ন উপহার দিয়ে। একজনের

ক্ষতি ক'রে দিয়ে পালিয়ে-আসা অপরাধীর মত মনে হয় নিজেকে। যদি অভিযোগ না করতো নবলা, যদি আজ তার বিপথের সুখেই আত্মহারা হয়ে থাকতো নবলা, তবে কোন অনুশোচনার স্পর্শ লাগতো না কুশলের মনে। কিন্তু নবলা আজ বুঝতে পেরেছে যে, তার ক্ষতি হয়েছে। তাই তো এই ক্ষতির দায় এসে পড়ছে কুশলের উপর, অস্বীকার করতে পারছে না কুশল। নবলার বিপক্ষে বলবার মত অনেক যুক্তি আছে। প্রমাণও করা যায় যে, নবলাই ভুল করেছে আগে, আর দোষ করেছে বেশি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? সে দোহাই দিয়ে কুশল তার কম-ভুলের অপরাধগুলিকে ক্ষমা ক'রে দিতে পারছে না।

জীবনের অপমান হতে সরে যেতে পেরেছে নবলা, এইটুকু জানতে পারলেই মুক্তি পায় কুশল। যেন ক্ষতি না হয় নবলার। উর্ধ্বলোকের একটা পাথুরে শুকতারার অপরূপা নায়িকা হয়ে নয়, যেন পৃথিবীর মেয়ের মত সহজসুন্দর হয়ে একটা শান্তির আশ্রয় পায় নবলা। নইলে কুশলের শান্তির জীবনে অলক্ষ্যে একটা কাঁটা বিঁধবে সর্বক্ষণ, স্বরূপার হাত ধরতে বুকটা কেঁপে উঠবে।

একেবারে বিনা স্বার্থে নয়, স্বরূপার সঙ্গে একটি ভালবাসার ঘরে নিশ্চিন্ত মনে বেঁচে থাকার জন্যই কুশলের অন্তরাত্মা আজ কামনা করে—ভাল হোক নবলার, পথ পেয়ে যাক নবলা। ভালবাসা লাভ করুক নবলা, বেঁচে থাকুক পৃথিবীর একটা শান্তি আর সম্মানের ঘরে নিশ্চিন্ত হয়ে।

আর একবার চমকে ওঠে কুশল। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকে। বাইরের বারান্দায় কেউ যেন এসেছে, পায়ের শব্দ শোনা যায়। ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় কুশল। না, নবলা নয়, বনমালীও নয়। অপরিচিত এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

ভদ্রলোক বলেন—আমি উকিল, তদন্ত অফিসার মিস্টার দত্ত আমাকে পাঠিয়েছেন।

কুশল বলে—নমস্কার, আসুন।

দেবী বলেছে সে চলে যাবে, মহারাজপুরে পড়ে থাকবার আর কোন অর্থ হয় না। বলেছে তারই কাছে, দেবীর এই অভিমানের অর্থ মনে প্রাণে যে বুঝতে পারে।

এই মহারাজপুরকে চিরকালের মত আপন ক'রে নেবার আশা করেছিল দেবী রায়, চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু মহারাজপুর বোধ হয় তাকে আপন করতে চায় না। তাই বুঝতে পেরেছে দেবী রায়, এবং সেই কথা বলেও দিতে পেরেছে নন্দা দেবীকে

—এই পাথুরে মহারাজপুরে আর যাই কিছু থাকুক না কেন, কিন্তু হৃদয় নামে কোন জিনিস এখানে নেই।

লজ্জাও করছে দেবী রায়ের, হ্যাপিনুক নামে এই বাড়িতে থাকতে। শত হোক, তবু তো পরের বাড়ি। দেবী রায় অবশ্য স্বীকার করেছে নন্দা দেবীর কাছে, সে নিজে এ-বাড়িকে পরের বাড়ি মনে করেনি, এবং মনে করলে সে এখানে উঠে আসতো না। কিন্তু যাদের বাড়ি তারা তো দেবীকে পর মনে করে। অনেক অপমান আর নিষ্ঠুরতা করেছে মহারাজপুর, দেবী রায় তবু সব ভুলে গিয়ে এই একটা সুখের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে যে, এই মহারাজপুরে এমন কয়েকজন সুন্দর মানুষ রয়েছে, যাদের সে চিরকালের আপন-জন ব'লে মনে করে। তাদের ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হবে দেবী রায়ের, তবু না গিয়ে উপায় নেই।

হ্যাপিনুকের ফটকে দাঁড়িয়ে আজই এই সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে নন্দাদেবীর কাছে অকপটভাবে তার অভিমানের বেদনা এবং বিদায়ের অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়েছে দেবী। নন্দাদেবীর সহযাত্রী হয়ে একই গাড়িতে আজ আর বেড়াতেও গেল না দেবী। কি হবে আর এই দু'দিনের অন্তরঙ্গতাকে চিরকালের জিনিস মনে ক'রে? অনর্থক মনটাকে একটা মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে?

প্রত্যুত্তরে কোন কথা বলতে পারেননি নন্দা দেবী। শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছেন, তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হ্যাপিনুকের ফটক থেকেই ফিরে এসেছেন শুকতারায়। তাঁর গাড়িটাও শেষ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্যারেজের ভিতরে গিয়ে একলা পড়ে রয়েছে গতিহারা হয়ে, যেন পথে বের হবার নিত্য আনন্দের উৎসাহ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

দেবী চলে যাবে, এমন দুর্ঘটনা কল্পনা করতেও যে বুকের ভিতরটা শূন্য হয়ে যায়, নহবতের সানাই থেমে গেলে যেমন আর সব বাজনা সুরহারা হয়ে গিয়েছে ব'লে মনে হয়। সান্ধ্য শুকতারার আলোকিত লনের উপর উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে থাকেন নন্দা দেবী, তেপান্তরে হারিয়ে-যাওয়া সঙ্গীহীন হরিণীর মত। মনে হয় পৃথিবীতে আজ তিনি এতদিন পরে সত্যিই একলা হয়ে গেলেন। যারা আপন-জন ছিল তারা বিদ্রোহ ক'রে সরে রয়েছে, এবং যাকে আপন করলেন সেও ছেড়ে যাচ্ছে। সহ্য করতে কষ্ট হয় নন্দা দেবীর।

চোখে পড়ে, মৃগেনবাবুর অফিসঘরে আলো জলছে না। দোতলার দিকে তাকিয়েও দেখতে পান, নবলার ঘরেও আলো নেই। শুকতারার আলো নিভিয়ে দেবার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার

আহ্বান করছে দুটো ছোট ছোট বিদ্রোহ। একটার নাম নবলা, আর একটার নাম মৃগেনবাবু। আজ এতদিনের পরে ওদের প্রাণে আর ধর্মে কত কিছু বাধছে আর কতরকম ভয় করছে। চোখের উপর এই দৃশ্যও সহ্য করতে হবে, এমনই দুর্বল আর ব্যর্থ হয়ে গিয়েছেন কি তিনি?

তাঁর সুখের শুকতারাকে যেন চূর্ণ করার জন্যে জেগে উঠছে এক একটি ঘটনা। দেবী যদি চলে যায়, দেবী যদি পর হয়ে যায়, দেবী যদি চোখের উপর না থাকে, তবে আর রইল কি? শুকতারার জীবনকে অধন্য ক'রে দিয়ে, তাঁর জীবনের চরমোৎসবের আত্মহারা আনন্দগুলিকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে যেন এক জাগ্রত বিগ্রহ চলে যাবে।

আলোকিত লনের পাশে একটা ফুলগাছের ছায়ালিপ্ত অন্ধকারের কাছে সরে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন নন্দা দেবী। চোখের উপর রুমাল চাপেন। তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূপ্রান্তের দু'টি সুচারু কালো-রেখার টান ধেবড়ে যায়। বাষ্পভরা দুটি চোখের দুর্বলতাকে যেন শাসন করার জন্যই ঠোঁটের উপর দাঁত চাপেন। রুজ মাখানো ঠোঁটের লালিমা গলে যায়, চিবুকের উপর রঙের ছোপ লাগে, আলো পড়লে রক্তের ছোপের মত দেখায়।

মার্বেলের শুকতারার আঙিনায় ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে এক ভাগ্যপটীয়সী নারী যেন নতুন ক'রে সংকল্পের শপথ গ্রহণ করছে। ভেঙে পড়তে প্রস্তুত নয়, হার মানতে রাজি নয়, বরং দু'হাতে জোর ক'রে দমিয়ে দিতে হবে ঐ দুটি বেয়াড়া বিদ্রোহকে, আর বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরি ঐ অভিমানকে। তাঁর ইচ্ছা দিয়ে গড়া এই সুখের উপনিবেশকে ছন্নছাড়া হয়ে যেতে দেবেন না। চোখের লজ্জা থেকে শুরু ক'রে এই বয়সের রক্তের লজ্জা পর্যন্ত, সব দুর্বলতার বাধা জয় ক'রে যেখানে এসে আজ দাঁড়িয়েছেন, সেখান থেকে সরে যেতে পারেন না নন্দা দেবী। এখন সরে-যাওয়া মানে মরে যাওয়া, কিংবা লখিয়া জমাদারনির মত দু'কূল-হারানো আর বুক-চাপড়ানো কান্না কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়া।

নীচের সড়কেই একটা মাটির ঘরে থাকে নেশার মানুষ লখিয়া জমাদারনি। আজ সকালেই ঘটি-বাটি যা ছিল সব বেচে দিয়ে পয়সা যোগাড় ক'রে দু'হাঁড়ি তাড়ি কিনে নিয়ে এসে খেতে বসেছিল লখিয়া। দুর্ভাগ্য, হঠাৎ ঘটি-বাটির জন্য শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে এক ঠেলা দিয়ে পরিপূর্ণ তাড়ির হাঁড়ি দুটো ভেঙে দিয়েছে লখিয়া। তারপর থেকে বুক চাপড়ে কান্না আরম্ভ করেছে। ঘটি-বাটি গেল, নেশার আশাও কাদা হয়ে গেল। ফটকের কাছে দাঁড়ালে এখনও শোনা যায়, নীচের সড়কে একটা অন্ধকারের কুণ্ড থেকে উপরে ভেসে আসছে মূর্খ লখিয়ার কান্না।

নিজেও সরবেন না, কাউকেই সরে যেতে দেবেন না নন্দা দেবী। মূর্খ লখিয়ার মত ভুল ক'রে হাতের কাছের পানপাত্র চূর্ণ হতে দেবেন না। এই সুন্দর শুকতারার যা'কে যেখানে তিনি সাজিয়ে রেখেছেন যেমনভাবে, তাকে ঠিক তেমনভাবেই সেখানে সেজে থাকতে হবে। এর এক তিল নড়চড় হতে দেবেন না। শুকতারার জীবনে উৎসব এনে দিয়েছে যে দেবী রায়, তা'কেও সরে যেতে দেবেন না। দেবীকে চিরকালের মত আপন ক'রে নিয়ে চোখের কাছেই ধরে রাখতে হবে।

ফুলগাছের ছায়ানিবিড় অন্ধকার থেকে যেন মনে মনে শপথ গ্রহণ ক'রে বের হয়ে এলেন এবং এগিয়ে চললেন নন্দা দেবী। লন পার হয়ে এসে উঠলেন অফিস ঘরের বারান্দায়। সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। তারপর ঢুকলেন অফিস ঘরের ভিতরে এবং সুইচ টিপলেন।

আলো জ্বলা মাত্র অফিস ঘরের শূন্যতাটাই যেন চমকে উঠলো এবং নন্দা দেবী কিছুক্ষণের মত যেমন বিস্মিত তেমনই সন্ত্রস্ত হয়ে চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। বোধ হয় আশা করেছিলেন তিনি, অফিস ঘরের ঐ চেয়ারটার উপরেই নিঃশব্দে এক বিদ্রোহীর মূর্তি বসে আছে। কিন্তু চেয়ার শূন্য। চাবির তাড়াটাও টেবিলের উপর পড়ে আছে। কাগজ পত্র সবই এলোমেলো। এবং আরও আতঙ্কিত হ'য়ে দেখতে থাকেন, খোলা ক্যাশবুকের পাতায় পুরনো তারিখের জমা খরচ লেখা রয়েছে, ব্যালেন্স পর্যন্ত টানা হয়নি। অনেকদিন ধরে হিসাব লেখা হয়নি।

মৃগেন বাবুর হিসাব লেখা থেমে গিয়েছে, এমন অদ্ভুত কাণ্ডও কি সম্ভব? তাহলে যে শুকতারার ঐশ্বর্যের ইতিহাসই থমকে যাবে। কিন্তু অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই, স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছিলেন নন্দা দেবী, এক শান্ত তপস্বী যেন তার চিরকালের আরাধ্যের বিরুদ্ধে হঠাৎ বিদ্রোহ ক'রে তপস্যা ছেড়ে চলে গিয়েছে।

আশঙ্কায় অস্থির হয়ে, এক টুকরো ঝড়ের মূর্তির মত সবেগে অফিস ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন নন্দা দেবী এবং সুইচ টিপলেন।

বিছানার উপর শয়ান একটা মানুষ, সুতির চাদরে গা-ঢাকা মৃগেন বাবু চোখ বন্ধ রেখেই বলেন—এক গেলাস জল দাও বনমালী।

—বনমালী নয়, আমি।

ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলেন মৃগেন বাবু। রুজের রং-এর ছোপ যেন রক্তের ছোপ, নন্দা দেবীর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মৃগেন বাবু —ও কি? কি হয়েছে তোমার?

নন্দা—আমার কিছু হয়নি। তোমার কি হয়েছে বল ?

মৃগেনবাবু—আমারও সেরকম কিছু···অর্থাৎ সিরিয়াস কিছু হয়নি।

নন্দা—তবে অফিসঘরের এ দশা কেন ?

মৃগেন বাবু—আর পেরে উঠছি না।

নন্দা—কি পেরে উঠছো না ?

মৃগেন বাবু—এই সব হিসেব টিসেব, কাজ কারবার ছুটোছুটি, সোরাবজীর সঙ্গে রোজ একটা ক'রে বখরা নিয়ে ঝঞ্ঝাট···এ আর পারা যায় না।

নন্দা—তার পর ?

মৃগেন বাবু—তারপর যে কি হবে, সেটাও ভেবে উঠতে পারছি না। তুমিই ভেবে চিন্তে একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

নন্দা—তার মানে এবার থেকে অফিসঘরে ক্যাশবুক নিয়ে হিসেব লিখবো আমি ? ফাইল হাতে নিয়ে সোরাবজীর সঙ্গে হাটেবাজারে আর মাঠেঘাটে ছুটোছুটি করবো আমি ?

মৃগেন বাবু—আহা, আমি কি তাই বলছি ? তোমার খুব বিশ্বস্ত অর্থাৎ যাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, এই রকম কারও হাতে কারবারের ভার যদি দিয়ে ফেলতে পার, তবে আমি একটু রেস্ট পাই, কারণ আমার রেস্টের খুবই দরকার হয়েছে।

মৃগেন বাবুর মুখের দিকে নিষ্কম্প দীপশিখার মত দৃষ্টি তুলে নন্দা বলেন—আমি একটা কথা বলছি শোন।

মৃগেন বাবু—বল।

নন্দা—ওঠ।

মৃগেন বাবু—কেন বল তো ?

নন্দা— ওঠ।

মৃগেন বাবু—আমি জানতে চাই···।

নন্দা—ওঠ, ওঠ, ওঠ, আর আমাকে অপমান করো না। আমার ক্ষতি করলে তুমি সুখী হবে না।

বলতে বলতে নন্দা দেবীর নিষ্কম্প দৃষ্টিটা যেন ঝড়ের ঝাপটা লেগে কাঁপতে থাকে, সিক্ত হয়ে ওঠে চোখ। তাঁর কথাগুলি যেন দুঃসহ ক্ষোভে অস্থির হয়ে মৃগেন বাবুর মনের উপর মাথা খুঁড়ে মরতে চাইছে।

ব্যস্ত হয়ে, বিচলিত হয়ে এবং ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ান মৃগেন বাবু—কি বলছিলে বল।

নন্দা—এস আমার সঙ্গে।

মৃগেন বাবু আর এক মুহূর্তও দ্বিধা না ক'রে বল্লেন—চল।

দরজা পার হয়ে অফিস ঘরে ঢুকেই নন্দা দেবী আঙুল তুলে শূন্য চেয়ারটাকে দেখিয়ে দিয়ে মৃগেন বাবুকে বলেন—বসো।

চেয়ারের উপর বসলেন, এবং বসেই হেসে ফেললেন মৃগেন বাবু—মাত্র এই সামান্য একটা ব্যাপারের জন্য তোমার এতটা অস্থির হবার কোনই দরকার ছিল না। আমাকে একটু বুঝিয়ে বললেই…।

নন্দা—একশো বার অস্থির হব, আরও বেশি ক'রে হব, যদি আর কখনও অফিস ঘরের এদশা দেখেছি।

আরও বেশি ক'রে হাসতে থাকেন মৃগেন বাবু। নন্দা দেবী বলেন—চাবির তাড়া ওভাবে ফেলে রেখেছ কেন?

হাত বাড়িয়ে খপ ক'রে চাবির তাড়াটা হাতে তুলে নেন মৃগেন বাবু।—তা'তে আর কি হয়েছে, আমি এখুনি সব ক্যাশ গুণে আর মিলিয়ে রাখছি।

নন্দা—কদিনের হিসেব লেখা বাকি রয়েছে দেখছি।

মৃগেন বাবু—এখুনি সব হয়ে যাবে।

টেবিলের উপর থেকে হাত দিয়ে ছোঁ মেরে একটা কলম তুলে নিলেন মৃগেন বাবু, এবং ক্যাশবুকটাকে বুকের কাছে টেনে আনলেন, হিসাব লেখার জন্য।

শান্ত ভাবে বসে থাকেন নন্দা দেবী এবং খুশি হয়েই দেখতে থাকেন, মৃগেন বাবু সত্যি সত্যি হিসাব লিখতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। তার পরেই দুঃখিত স্বরে নন্দা বল্লেন—একটা দুঃখের খবর আছে।

কলম থামিয়ে মৃগেন বাবু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করেন—দুঃখের খবর?

নন্দা—হ্যাঁ, মহারাজপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে দেবী।

মৃগেন বাবু—কি ভয়ানক দুঃখের কথা। কিন্তু কেন, দেবী হঠাৎ এভাবে……।

নন্দা—মনে হয়, আমাদের ওপর দেবী অভিমান করেছে।

মৃগেন বাবু—কিন্তু আমরা তো এমন কিছু করিনি যার জন্যে দেবীর মনে কোন আঘাত লাগতে পারে।

নন্দা—তবু ভুল বুঝেছে দেবী। ওর ধারণা, আমরা ওকে পর মনে করি।

মৃগেন বাবু আক্ষেপ করেন—কি ভয়ানক মিথ্যে সন্দেহ!

নন্দা—এই মিথ্যে সন্দেহ নিয়ে দেবী যদি চলে যায়, তা'হলে…।

মৃগেনবাবু প্রবলভাবে আক্ষেপ করেন—তা'হলে আমরাই যে মিথ্যে হয়ে

যাব। সে হতে পারে না, কখনই না, ওভাবে দেবীকে চলে যেতে দেওয়া উচিত হবে না।

মৃগেন বাবু আরও উৎসাহে কলম চালিয়ে হিসাব লিখতে থাকেন, সজীব সুস্থ স্বাভাবিক মৃগেন বাবু। নন্দা দেবীও উৎসাহিতভাবে বলেন—যেতে তো দেওয়াই হবে না, উল্টো ধরে নিয়ে এসে একেবারে চোখের সামনে রাখতে হবে।

মৃগেন বাবু যেন হঠাৎ চমকে ওঠেন। কলম থামিয়ে এবং মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি বললে ?

নন্দা—দেবীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমরাই ওর আপন জন, তা'হলে আর অভিমান করবার কোন কারণ থাকবে না।

মৃগেন বাবু—হ্যাঁ, আমিও ঠিক এই কথাটাই মনে মনে ভাবছিলাম।

নন্দা—মনে মনে বেশি ভেবে আর লাভ নেই, আর সময়ও নেই, যা করবার ক'রে ফেলতে হবে।

মৃগেন বাবু—করে ফেল, একটুও দেরি করো না। আর, আমাকে কি করতে হবে বলে দাও।

নন্দা হাসেন—তোমাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু দরকারি কাজের সময় জরটর ক'রে বসো না, তাহ'লেই হবে।

হো হো ক'রে হেসে ওঠেন মৃগেন বাবু। নন্দা দেবীও হাসিমুখে অফিস ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যান।

রেস্ট পেলেন না, তার জন্য এখন দুঃখ করার সময় নেই মৃগেন বাবুর, দরকারও নেই। ক'দিনের হিসাব লেখা বাকি পড়ে রয়েছে, লিখে ফেলতে হবে। ক'দিন সোরাবজী এসে দেখা না পেয়ে ফিরে চলে গিয়েছে, খবর পাঠিয়ে তাকে আজই একবার আনতে হবে। কারবার ক্ষান্ত হতে পারে না, টাকা রোজগার করতেই হবে, কারণ, নন্দা সুখী হবে। নন্দাই যদি দুঃখিত হয়, তাহলে আর কি নিয়েই বা থাকবেন এবং এই কাজের জীবনের শেষ পালাটুকু সহ্য করবেন কিসের জোরে ?

নন্দার হাসিমুখ আবার দেখতে পেয়েছেন মৃগেন বাবু। অন্য কেউ-তো নয়, প্রায় পঁচিশ বছর আগে, শাঁখের অবিরল শব্দের মধ্যে, উৎসরের এক আঙিনায়, এক মোহমধুর লগ্নে তাঁর জীবনের প্রথম শুভদৃষ্টির আবিষ্কার সেই সুস্মিত নারীমূর্তিরই চোখে আজ জল দেখা দিয়েছিল, ব্যর্থ হতে বসেছিল তাঁর জীবনের সংকল্প। বেঁচে গিয়েছেন, চরম ব্যর্থতা থেকে বেঁচে গিয়েছেন মৃগেনবাবু, তাঁর পঁচিশ বছরের পুরনো সংকল্প রক্ষা পেয়েছে, নন্দার মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন।

শুধু বুকের ভিতরে বাঁ দিকে একটা বেদনা হাঁসফাঁস করছে মনে হয়, তেষ্টাও পেয়েছে। বনমালীকে ডাকতে হবে এখনি, তা ছাড়া আর কাকেই বা ডাকবেন?

কিন্তু আগে হিসাব লেখাটা শেষ হোক, তারপর। কলম হাতে তুলে ক্যাশবুকটাকে আবার বুকের কাছে টেনে নিয়ে হিসাব লিখতে থাকেন মৃগেন বাবু, এবং মাঝে মাঝে সিন্দুক-আলমারি খুলে এক একটা থলি বের ক'রে গুনতে থাকেন—চেক, নোট টাকা আর রেজকি।

"বুঝেছি, তোমার সন্দেহ আছে, শুকতারার ফটক পার হয়ে চলে যাবার শক্তি আমার আছে কি না। তবু ভাল, আমার মনটাকে সন্দেহ ক'রে কিছু লেখনি। আমার দুঃখগুলিকেও বোধ হয় বিশ্বাস করতে পেরেছ। কিন্তু যতটা দুর্বল আমাকে তুমি মনে করেছ, ততটা দুর্বল আমি নই কুশল। ইচ্ছে করলে, এই সব বড়মানুষি জঞ্জাল এই মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে......।"

এর বেশি আর লিখতে পারেনি নবলা। ইচ্ছাটা আর লিখে জানিয়ে লাভ কি? সব সুখের জঞ্জাল এখনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সব দুর্বলতার ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত ক'রে দিয়ে চলে যেতেই তো পারা যায়।

অসমাপ্ত চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, আর আলো নিভিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ হলো একেবারে প্রস্তুত হয়েই আজ দাঁড়িয়েছে নবলা, ঘরের বাইরে কার্পেট-ঢাকা বারান্দায়, পাশেই নেমে যাবার সিঁড়ি।

জীবনে আজ প্রথম একটা ব্যতিক্রম, সাজতে ভুলে গিয়েছে নবলা। পায়ে স্যাণ্ডেল পর্যন্ত নেই। সাজের মধ্যে মিলের একটা কালো-পাড় সাদা শাড়ি, আর খয়ের রঙের মোটা ছিটের ব্লাউজ। চুলে চিরুনির আঁচড় পড়েছে সামান্যই। ক্রিম-ছাড়া অবিন্যস্ত চুলের গুচ্ছ ঘাড়ের উপর কুণ্ডলী ক'রে জড়ানো। আংটি দুটো খুলে টেবিলের উপরেই ফেলে রেখে দিয়েছে নবলা, গলার হারটা ঝুলছে আয়নার হুকে। শুধু প্ল্যাটিনামের চুড়ি কয়েকটা এখনও হাতে রয়েছে, বারান্দার রেলিং-এর সঙ্গে ঘষা লেগে মাঝে মাঝে বেজে উঠছে ভীরু বেদনার ক্ষীণ নিক্কণের মত।

চুড়িগুলি হাত থেকে খুলে নিয়ে আবার ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায় নবলা। অন্ধকারের মধ্যেই বিছানার দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফিরে এসে আবার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে কার্পেট-ঢাকা বারান্দায়। আবার অস্থির হয়ে ওঠে। নীচের তলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—বনমালী।

বনমালীর প্রত্যুত্তর শোনা যায় না। সিঁড়ির অন্ধকার ঠেলে একটা ছায়ামূর্তি উপরে উঠে আসে। নবলা বলে—এখুনি একটা গাড়ি ডেকে দাও বনমালী।

—কেন?

ছায়ামূর্তির কণ্ঠস্বর শুনেই নবলার সারা দেহের শোণিত যেন ভয়ে চমকে ওঠে।

সুইচ টিপে বারান্দার আলো জ্বেলে দেয় ছায়ামূর্তি। নবলার চোখের দৃষ্টিটা এইবার আরও সন্ত্রস্ত হয়ে কেঁপে ওঠে। নন্দা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তোমার এ কি চেহারা হয়েছে মা?

নন্দা বলেন—কিছু হয়নি, তোর কি হয়েছে বল?

একটু আশ্বস্ত হয়ে নবলা বলে—আমার কিছু হয়নি।

নন্দা—তবে এরকম ছোটলোকের মত মূর্তি ধরেছিস কেন?

নবলার চোখের দৃষ্টি একটু কঠিন হয়ে ওঠে। ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়—মন্দ কি?

নন্দা—রীতিমত মন্দ। খুবই কুৎসিত, বোকামি আর পাগলামি।

হেসে ফেলে নবলা। নন্দা দেবীর ভ্রূভঙ্গীও একটু কঠোর হয়ে ওঠে।—হাসবার কথা নয় নবলা। ভুল ক'রে নিজের সর্বনাশ করো না।

নবলা গম্ভীর হয়।—কি ভুল করলাম? আর, সর্বনাশেরই বা কি দেখলে?

নন্দা—সবই দেখছি। যখন কুলি-মজুরনিদের মত মোটা শাড়ি পরবার শখ হয়েছে, তখন ভুল করবারই কি বাকি আছে আর সর্বনাশ হতেই বা কত দেরি?

নবলা—তাহ'লে কি করতে হবে আমাকে?

নন্দা—যা করলে তোমাকে মানায় তাই করতে হবে।

নবলা—কি মানায় আমাকে?

নন্দা—আমাদের মত ঘরের মেয়েকে যা মানায়, তাই।

নবলা হঠাৎ বলে ফেলে—কিছুই মানায় না।

দপ ক'রে জ্বলে ওঠে নন্দা দেবীর চোখের দৃষ্টি।—কি বললি?

নবলা বলে।—তুমি কিছুই ঠিক ক'রে বলতে পারছো না, আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝিয়ে দেন নন্দা দেবী—তুমি ছোট ঘরের মেয়ে নও নবলা, আর, যে তোমাকে ভালবাসে সে-ও ছোটঘরের ছেলে নয়।

মোটা শাড়ির আঁচলটা শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে নবলা। মিথ্যামুখরিত একটা—

কৌতুকের আঘাতে নবলার সমস্ত সত্তাটাই যেন যন্ত্রণাক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —কে ভালবাসে আমাকে?

নবলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন নন্দা দেবী; কোন কথা বলেন না, তার পরেই শান্ত স্বরে বলেন—ভেতরে চল, তারপর বলছি।

নবলার ঘরের ভিতরে ঢুকে নন্দা দেবীই আবার স্যুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝকে ক'রে হেসে ওঠে প্রকাণ্ড আয়নাটা। কৌচের উপর বেশ একটু শক্ত হয়ে বসলেন নন্দা দেবী, চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চেহারাটাও একবার তদন্ত ক'রে নিলেন। অন্ধকারটা দূর হয়েছে, কিন্তু বিদ্রোহের চিহ্নগুলি ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। আয়নার হুকে একটা সোনার হার, টেবিলের উপর দুটো আংটি আর বিছানার উপর প্লাটিনামের চুড়িগুলি ছড়িয়ে রয়েছে।

নবলাও দাঁড়িয়ে থাকে এই ঘরেই একটা নিঃশব্দ আসবাবের মত। পালঙ্কের চার কোণে মশারির খুঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে আবলুস কাঠের চারটে মিনার, তারই একটাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে নবলা। দরজার রেশমি পর্দাটা উড়ছে ফুরফুর ক'রে, ফাল্গুনের প্রথম বাতাস বইতে শুরু করেছে।

নবলার দিকে তাকাতেই নন্দা দেবীর ভ্রূভঙ্গী আবার কঠিন হয়ে ওঠে, এবং কণ্ঠস্বরে কোন দুর্বলতা না রেখেই বলেন। —জানিস, দেবী তোকে ভালবাসে ব'লে ডাক্তার সমাদ্দারের মেয়ে কত হিংসে করে?

সেই ভাবেই মুখ-ফেরানো মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নবলা বিরক্ত হয়ে যেন ধিক্কার দেয়।— মানুষও এমন মিথ্যে মিথ্যে হিংসে করতে পারে, ছিঃ!

নন্দা—কি মিথ্যে?

নবলা—তুমি অন্য কথা জিজ্ঞেসা কর মা।

নন্দা—আমি কোন কথা জিজ্ঞেসা করতে আসিনি, এসেছি একটা কথা জানিয়ে যেতে।

নবলা—তাই বল।

নন্দা—বিয়ের দিন ঠিক ক'রে ফেলেছি।

নবলা—কার বিয়ে?

নন্দা—তোমার।

নবলা—আমার বিয়ে? কার সঙ্গে?

নন্দা—যার সঙ্গে হওয়া উচিত, দেবীর সঙ্গে।

নবলা—তুমি অন্য কথা বল মা।

নন্দা—অন্য কোন কথা নেই, এই একটি কথা ছাড়া। তুমি পাগলামি ক'রে এতগুলো মানুষের জীবনের ক্ষতি করতে পারবে না।

নবলা—কার ক্ষতি।

নন্দা—দেবীর ক্ষতি,…… আমার ক্ষতি।

নন্দা দেবীর গলার স্বরটা যেন কেঁপে উঠলো, কথাগুলির সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসের সুর মিশে রয়েছে। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নন্দা দেবীর মুখের দিকে তাকায় নবলা, এবং বিমূঢ়ের মত দেখতে থাকে। নন্দা দেবীর চোখে যেন একটা আবেদন ছলছল করছে।

নবলার বিমূঢ়তাকে আরও চমকে দিয়ে নন্দা দেবী বলেন—দেবী তোকে ভালবাসে, আমাকেও ভালবাসে, কিন্তু তাতে হয়েছে কি ?

চলতি সংসারের বাইরে থেকে একেবারে নতুন একটা প্রশ্ন সোজা সম্মুখে চোখ তুলে প্রশ্ন করছে, তাতে হয়েছে কি ? বিবেকভীরু পৃথিবীর সব দুর্বলতা আর দীনতার চক্র থেকে একটা অনিয়মের জোরে ভাগ্য যাদের বাইরে চলে গিয়েছে, অনেক উপরে উঠে গিয়েছে যাদের সাধ সংস্কার আর আকাঙ্ক্ষা, তাদের ভালবাসার নিয়মগুলি যে নতুন রকম হয়ে যাবেই। নীচের সড়কের দু'পাশে খাপরা-ছাওয়া কুটীরের জগতে মানুষের প্রাণগুলি যে নিয়মে সুখ আর তৃপ্তি খোঁজে, সে নিয়ম চলতে পারে না হিলের উপরে মার্বেলের এই অট্টালিকায়। মিথ্যা বলেননি নন্দা দেবী, নবলাও মিথ্যা মনে করে না।

কিন্তু শুনতেও যে বুকটা কেঁপে ওঠে। এই নতুন নিয়মের দীক্ষা স্বীকার ক'রে নিতে প্রস্তুত নয় নবলা। এত বড় অসাধারণ হয়ে উঠবার স্পৃহা আজ আর তার নেই। নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর তাকিয়ে দেখে নবলা। যেন বর্ষার বন্যাপাগল দামোদরের একটা ভয়ানক জলের ঘূর্ণির কাছে দাঁড়িয়ে আছে নবলা, নন্দা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে কোন সাড়া দিতে গেলেই পা পিছলে পড়ে যাবে, আর তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উত্তর দেয় না নবলা। ঝরনার জলে বন্য আগুনের প্রতিচ্ছবি দেখে হরিণ যেমন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়, জল খেতে পারে না, নন্দা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে সেই রকমই ভয় পেয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয় নবলা। নন্দাদেবীর দৃষ্টিটা ঝরনার মত ছলছল করলেও, তার মধ্যে যেন একটা আগুনের ছায়া রয়েছে।

কিন্তু নবলার এই মুখ-ঘুরিয়ে-নেওয়া নিরুত্তরতা গ্রাহ্যই করলেন না নন্দা দেবী।

শুকতারার ভালবাসার নিয়মগুলিকে যেন আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ক'রে দিয়ে বলেন।—তুই ভালবাসিস দেবীকে, আমিও ভালবাসি, তাতেই বা হয়েছে কি ?

যেন ভালবাসার এক নতুন দেশের বর্ণনা করছেন নন্দা দেবী। পৃথিবীর ধুলো থেকে অনেক উপরে মেঘলোকের মত এক ভালবাসার দেশ, যেখানে বজ্র বিদ্যুৎ বাতাস আর বারিকণা একসঙ্গে মেশামেশি ক'রে রয়েছে, কখন কে কা'কে বিনাশ করে কোন ঠিক নেই। কিন্তু তাতেই বা হয়েছে কি ? তাই তো উর্ধ্বস্তরের ভালবাসা। কিন্তু নবলার মন যে আজ আর মেঘলোকের দিকে তাকিয়ে নেই। একটু সাধারণ দয়ামায়ার মধ্যে, ছোট ছোট আশীর্বাদের মধ্যে একটা পার্থিব আশ্রয় খুঁজছে নবলা। নন্দা দেবীর প্রশ্ন শুনে নবলার মনটা শুধু ঘিন ঘিন ক'রে ওঠে, উত্তর দিতে পারে না।

উত্তর শোনবার জন্যও মোটেই ব্যস্ত নন নন্দা দেবী। তিনি এসেছেন নবলাকে নিরুত্তর ক'রে দেবার জন্য, যেন সব প্রতিবাদ বিদ্রোহ আর অবাধ্যতা ছেড়ে দিয়ে শুকতারার মেয়ে হয়ে ফুটে থাকতে পারে নবলা। তিনি জানেন, শুকতারার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকলেও আজ অনেক নীচে নেমে গিয়েছে নবলার মন। তাই এক একটি কথায়, কখনও ধাক্কা দিয়ে, কখনও লজ্জা দিয়ে এবং কখনও বা দুঃসাহস দিয়ে নবলাকে এক এক ধাপ ক'রে উপরে তুলে নিতে চাইছেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ান নন্দা দেবী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে শুকতারার এক বেপরোয়া আকাঙ্ক্ষার মর্ম্মকথা ঘোষণা করেন।—আমরা যাকে ভালবাসি, যে আমাদের ভালবাসে, তাকে নিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছেমত আনন্দ নিয়ে থাকবো। তা'তে পৃথিবীর কোন্ হিংসুটের বুক ফাটছে আর কোন্ মুখ্‌খু হাভাতে নিন্দে করছে, তা আমরা গ্রাহ্য করবো কেন ?

শুকতারার ভালবাসার তত্ত্বে আর কোন অস্পষ্টতা নেই, ব্যাখ্যা ক'রে দিতে পেরেছেন নন্দা দেবী। একটা গাছে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার চারদিকে জঙ্গলের ছেলে আর মেয়েরা যেমন নেচে নেচে আনন্দ করে, শুকতারার ভালবাসার রূপও সেইরকম। একজনকে ঘিরে একটা সম্মিলিত নৃত্যোৎসব। দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু···।

নবলার মনের কিন্তুকে যেন বাধা দিয়েই নন্দা দেবী বলেন—দেবী তো যে-সে একটা লোক নয়। বাপের এক ছেলে, বাপের সম্পত্তিও অঢেল। এরকম দশটা শুকতারা দেবীর বাবা কিনতে পারে।

নবলার কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে ওঠে।—তাতে আমার কি ?

নন্দা দেবী—তোরই তো সব। আমার যা কিছু আর দেবীর বাবার যা কিছু, সবই তো তোর হবে নবলা। বোকা পাগলের মত মিছিমিছি চেঁচাস কেন ?

চুপ ক'রে থাকে নবলা। নন্দা দেবীর কথার এক একটি ধমক নবলার সত্তাকে রাগ লজ্জা ও উদ্‌ভ্রান্তির এক একটা ধাপ পার ক'রে দিয়ে এইবার মাণিক্যখচিত একটা ধাপে এনে ফেলেছে। বিপুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী হয়ে এইখানে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নবলা, যদি ইচ্ছা করে। এবং ইচ্ছা করতে কার না লোভ হয় ?

কিন্তু কি হবে লোভ ক'রে ? প্রশ্ন করার শক্তি এখনও ফুরিয়ে যায়নি নবলার, তাই এখনও নিজের মনের দিকে তাকিয়ে নীরবে জিজ্ঞাসা করতে পারে নবলা। সোনার শিকলে বাঁধা থাকলেই কি বনহরিণের মন শান্ত হয় আর শান্তি পায় ?

নন্দা দেবী বলেন।—আমাদের সুখ সৌভাগ্য নিয়ে আমরা যে যার মনের মত আর ইচ্ছেমত যেমন খুশি তেমনি থাকবো।

নবলার প্রশ্নটাকে যেন চূর্ণ ক'রে দিলেন নন্দা দেবী। কে বললে সোনার শিকলে বাঁধা থাকতে হবে ? বাঁধন ব'লে কিছু নেই। শুকতারার সুখের জীবন এক নতুন স্বপ্নের ইশারা দিয়ে নবলাকে ডাকছে। সুখ কা'কে বলে বুঝতে পারা যায়, নন্দা দেবী স্পষ্ট ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। অজস্রের মাঝখান থেকে খুশি মত তুলে নিতে পারা যাবে মন যা চায়, ইচ্ছা মতই মিটিয়ে দিতে পারা যাবে এই দেহের তৃষ্ণার্ত শোণিত যা চায়, মনের মত ক'রে ভরে দিতে পারা যাবে এই রূপ যা চায়, সোনাতে আর হিরেতে। লজ্জা থাকবে না, ভয় থাকবে না—মাত্রা থাকবে না, বাধা থাকবে না, অবাধ স্বেচ্ছার উৎসব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত···।

এত স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেবার পর এবং এত ভাল ক'রে বুঝবার পরেও, নবলার মনে একটা দুর্মর প্রশ্ন যেন চূর্ণ হয়েও এখনও মাথা তুলে জেগে উঠতে চায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে ? যেমন শুকতারার ভালবাসার তত্ত্বে তেমনি সুখের তত্ত্বেও কোন অস্পষ্টতা নেই, অনিশ্চয়তাও নেই। চোখের সামনেই রয়েছে, এক পা এগিয়ে গেলে এবং হাত বাড়িয়ে দিলেই ধরা যায়। কিন্তু এই সুস্পষ্টকে এবং সুনিশ্চিতকে যেন এখনও সন্দেহ করছে নবলা, সন্দেহ করার শক্তি এখনও আছে। জানতে চায়, শেষ কোথায় ? এবং সত্যিই কোন শেষ আছে কি ?

কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নন্দা দেবী। শান্তভাবে আস্তে আস্তে অথচ অতি দৃঢ় পদক্ষেপে আয়নাটার কাছে এগিয়ে গেলেন, হুকে ঝোলানো সোনার হারটাকে তুলে নিয়ে নবলার দিকে তাকালেন।

নবলার শেষের প্রশ্নটাকে যেন গলা টিপে নিরুত্তর ক'রে দেবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে

দাঁড়িয়েছেন নন্দা দেবী। বুক কেঁপে ওঠে নবলার। নিঃশ্বাসের বাতাসে যেন একটা মরু-ঝড়ের ধাক্কা লেগেছে, এবং একটা আগুনের হলকা ছুটে এসে লেগেছে চোখের উপর। আঁচল দিয়ে ছ'চোখ চেপে ধরে নবলা।

নন্দা দেবী কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াতেই চোখের উপর থেকে চাপা আঁচল সরিয়ে নিয়ে নবলা মুখ তুলে বলে—না।

নন্দা—কিসের না?

নবলা—তুমি জোর ক'রে এসব জিনিস আমার ওপর চাপিও না।

নন্দা—এ রকম ভুল করতে নেই নবলা।

নবলা—কি ভুল দেখলে?

নন্দা—এই যে বনমালীদের ঘরের মেয়ের মত অলক্ষুনে সাজ ক'রে রয়েছ, এর চেয়ে ভয়ংকর ভুল আর কি হতে পারে?

নবলা—অলুক্ষনে কি দেখলে?

নন্দা—অলুক্ষনে বৈকি, তোমার সব শখ রুচি আর ইচ্ছা যে ডুবতে চলেছে, তারই লক্ষণ।

নবলা—ডুবতে যাবার কি দেখলে?

নন্দা—সবই দেখছি, দেখাতে আর কি বাকি রেখেছিস? যেন একটা বেহদ্দ দরিদ্রের বাড়িতে বাসন মাজতে, হাঁড়ি ঠেলতে, আর কাঁথা কাচতে চলেছিস, ছি ছি ছি……।

আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠে নবলা। নন্দাদেবীর কথাগুলি যেন নবলার মনের গোপনে সাজানো একটা কল্পনার ফুলমালঞ্চকে খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে দিল, ওটা একটা আস্তাকুঁড় মাত্র। দূর থেকে মূর্খের মোহ নিয়ে তাকিয়ে দেখলে যাকে আটপৌরে আনন্দের ঘর ব'লে মনে হয়, কাছে গেলেই দেখা যাবে, একটা অক্ষম দরিদ্রের কতগুলি আহত ক্ষুধাতৃষ্ণার কাতরানির ঘর।

মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায় নবলা। চোখ ছুটো ঝাপসা হয়ে উঠতে চাইছে কেন, বুঝতে পারে না। বোধ হয় তার কল্পনার ফুলমালঞ্চ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তাই। দরজার রেশমি পর্দাকে পতাকার মত উড়িয়ে হু হু ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকছে ফাল্গুনের বাতাস। নবলার চোখের বাষ্প শুকিয়ে যায়।

শুকনো চোখের দৃষ্টি তুলে এই ঘরের দরজার বাইরে, শুকতারার ঐ ফটকের বাইরে, অনেক দূরে যে সংসার আছে, তারই পরিচয় যেন কল্পনায় সন্ধান করছে নবলা। সত্যিই কি সেখানে রূপ নেই, গর্ব নেই, উৎসব নেই? তবে কি মনের

ভুলে আবার একটা নতুন মিথ্যাকেই স্বপ্ন ক'রে তোলা হয়েছে ? একটা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ভবিতব্যের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে নবলা, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না। কুশল লিখেছে, শুকতারার ফটক পার না হয়ে গেলে নাকি কিছুই আগে বোঝা যাবে না।

নন্দা বলেন—এসব ব্যাপার শুধু থিয়েটারেই সম্ভব নবলা, সত্যি সত্যি সম্ভব নয়। গল্পে এসব চলে, জীবনে চলে না। তোদের সেণ্ট-ডেনিসের বার্লিন-ফেরত প্রফেসর সদানন্দ ঘোষের কি দশা হয়েছে, খবর রাখিস কিছু ?

নবলা জিজ্ঞাসুভাবে তাকায়—কি হয়েছে সদানন্দ বাবুর ?

নন্দা দেবী—মস্ত এক জার্মান মার্চেণ্টের মেয়ে ভালবেসে বিয়ে করেছিল সদানন্দকে, বার্লিনে যখন পড়তো সদানন্দ। মেয়েটাকে দেখেছিস কখনও ?

নবলা—হ্যাঁ দেখেছি, ওর পিয়ানো বাজনাও শুনেছি।

নন্দা দেবী—আমি ওর হাতের রান্না খিচুড়ি পর্যন্ত খেয়েছি, যা কোন বাঙালি বাড়ির বউও অমন চমৎকার ক'রে রাঁধতে পারে না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তারপর থিয়েটার ফুরিয়েছে।

নবলা—তারপর কি হয়েছে ?

নন্দা—চলে গেছে সদানন্দের জার্মান বউ, ডুয়ার্সের এক চা-বাগানের ইংরেজ সাহেবকে বিয়ে করেছে। দু'শো টাকা মাইনের বাঙালি মাস্টারের ঘর কতদিন সহ্য করবে জার্মান মার্চেণ্টের মেয়ে ? পৃথিবীটা তো আর সত্যি সত্যি রামায়ণ-মহাভারত হয়ে যায়নি, জীবনটাও বেঙ্গমা-বেঙ্গমির গল্প নয়। রাজকন্যেরা রাখাল ছেলের গলায় সত্যি সত্যি বরণমালা পরিয়ে দেয় না। দিলেও শেষ পর্যন্ত···।

জীবনটা রামায়ণ-মহাভারত ক'রে তুলতে গেলে শেষ পর্যন্ত যা হবে, তার মধ্যে আর কোন হেঁয়ালি নেই। সব প্রশ্নের দাবি আর দ্বন্দ্বকে একেবারে প্রাঞ্জল ক'রে মীমাংসা করে দিয়েছেন নন্দা দেবী। এবং কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ও প্রসন্নভাবে সোনার হারের ক্লিপটা খুঁটে খুঁটে খুলতে থাকেন, নবলার গলায় পরিয়ে দেবার জন্য।

নবলার অন্তরাত্মাও যেন একটা পথের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র বাকি আছে। বেছে নিতে হবে একটা পথ, ডাইনে অথবা বামে। হয় গলা বাড়িয়ে দিতে হবে, নয় এই মুহূর্তে সরে দাঁড়াতে হবে।

দরজার উপর রেশমি পর্দা ছটফট করছে। মুখ ঘুরিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় নবলা। চোখের তারা দুটো সুস্থির হয়ে থাকে।

চমকে ওঠে নবলা। এতক্ষণে যেন চোখে পড়েছে নবলার, শুকতারার স্ফটিকের বাইরে বড় অন্ধকার, বড় অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জগৎ। তার মধ্যে কোথায় কোন্ ফুলমালঞ্চের কাছে একটা মাটির প্রদীপ জলছে, এই কল্পনাকে শুধু বিশ্বাস ক'রেই কি ঐ অন্ধকারে এগিয়ে যেতে পারা যাবে? পদে পদে পরীক্ষা আর সর্ত পার হয়ে সেখানে কি পৌঁছানো যাবে? পৌঁছে গিয়েও যদি দেখা যায়—ফুল নয়, মালঞ্চ নয়, একটা দীনদরিদ্রের গেরস্থালির আস্তাকুঁড়, তবে? যদি ফিরে আসতে হয়? যদি ফিরে আসতেই না পারা যায়?

ভয় পায় নবলা, এমন ভয় জীবনে কখনও পায় নি। ছটফটও করতে পারে না, বিচলিত হবার শক্তি নেই, যেন হিমপ্রপাতের মত একটা শীতাক্ত শিহরণের স্রোত তার চেতনা ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে।

খট ক'রে ক্লিপের শব্দ বেজে ওঠে, নন্দা দেবী নবলার গলায় পরিয়ে দিলেন সোনার হার। আনমনা হয়ে হাত দিয়ে হারের লকেটটা শক্ত ক'রে চেপে দাঁড়িয়ে থাকে নবলা।

একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নন্দা দেবী। বিছানার উপর ছড়ানো প্লাটিনামের চুড়িগুলো তুলে নিয়ে নবলার হাতের কাছে এগিয়ে দেন—প'রে নে···আর আংটিগুলো যেন কোথায় রয়েছে দেখলাম?

নবলা—ঐ তো টেবিলের ওপর রয়েছে।

নন্দা—প'রে ফেল, আঙুল কখনো সোনা-ছাড়া ক'রে রাখবি না।

দরজার রেশমি পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে চলে যাবার আগে একবার থামেন নন্দা দেবী। ব্যস্তভাবে বলেন—এখুনি সাজ বদল ক'রে পিয়ানোতে বস গিয়ে।

সকাল থেকেই কর্পূর জলছে পিতলের একটা থালার উপর, আনন্দসদনের হলঘরের বারান্দায়। কারণ, বিজয় ইঞ্জিনিয়ারের আনন্দসদন আজ ইতিহাসের এক মূর্তি-নিকেতনে পরিণত হয়েছে। আজ হরভবন মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবস।

ফাল্গুন চলে যাচ্ছে, এখনও চলে যায়নি। দূর ধুলপাহাড়ের শালবন মর্মরিত ক'রে আর মহারাজপুরের পার্কের সব গাছ নতুন পাতা ও ফুলের কুঁড়িতে ভরে দিয়ে যে বাতাস বইতে শুরু করেছে ক'দিন থেকে, তারই সাড়ায় পুলকিত হয়ে উঠেছে জলন্ত কর্পূরের শিখা, আজ সকাল থেকেই। সমস্ত দিনটাই সুরভিত হয়ে আছে।

সার্ভে অফিসের বিরাট গুদামঘর থেকে সমস্ত মূর্তি সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আনন্দসদনে উপরতলার আর নীচতলার প্রত্যেক ঘরেই হরভবনের যত মূর্তি আর

ঐতিহাসিক সংসার-সামগ্রী সবই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ব্রঞ্জের গঙ্গা দাঁড়িয়েছে হলঘরের ঠিক মাঝখানে দরজার দিকে মুখ ক'রে। দেখলে মনে হয়, দূর পথের দিকে তাকিয়ে আছে গঙ্গা, কেউ আসবে বলে। পদ্মখচিত দু'টি সৌধস্তম্ভের খণ্ড বাইরের দরজার দু'পাশে রাখা হয়েছে। তারই একটির উপর রয়েছে পিতলের থালাটা, কর্পূর জলছে তার উপর।

চাল-চুলো বলতে সত্যিই কিছু নেই, এইরকম তিনজন মানুষ এই মূর্তিনিকেতনের ট্রাস্টি হয়েছে—কুশল পাঠকজী এবং আর একজন, তার নাম হলো অনুপম, যাকে কুশলই এই ক'দিন আগে, সূর্য উঠবার আগেই স্টেশনের মুসাফিরখানার একটা কেরোসিন কাঠের বেঞ্চির উপর অঘোর ঘুমের আরাম থেকে জাগিয়ে তুলে ডেকে নিয়ে এসেছে।

তিন ট্রাস্টিই কাজ করছে, তিন রকম কাজ, এবং এই কাজের আবেগে গত সাত দিনের মধ্যে কেউ সাতটি ঘণ্টা ঘুমিয়েছে কি না সন্দেহ। প্রত্যেকটি মূর্তির রূপতত্ত্ব আর পরিচয় নিজের হাতেই এক একটা কাঠের ফলকে রঙ দিয়ে লিখে লিখে মূর্তি-গুলির পাশে রেখে দিয়েছে কুশল। পাঠকজী বের হয়েছেন প্রতিদিনই, ভোর থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত পথে পথে ঘুরেছেন পিতলের থালার উপর কর্পূর জেলে নিয়ে, দান সংগ্রহ করতে। পথে পথে হাঁক দিয়েছেন পাঠকজী—দেবতাকে লিয়ে দান করো, তনমন জীবন ধন্য করো! আধুনিক মহারাজপুরের মনে একটা অতি পুরাতন মহাকাব্যের সুর যেন বিচিত্র অনুভব ছড়িয়ে চলে যায়। সাত দিনের মধ্যে মহারাজ-পুরের এমন আর কেউ বাকি রইল না, যে পাঠকজীর এই হাঁক শুনতে না পেয়েছে।

অনুপমের উৎসাহ আরও মাত্রাছাড়া। এই মূর্তিগুলিকে যেন শিলোড়াঘাটের সদাব্রতেরই দুঃখী মানুষগুলির মত মানুষ ভেবেছে অনুপম। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গরম জল আর সোডা নিয়ে মূর্তিগুলিকে ধোয়া-মোছা করেছে। আর, আজ যে সমস্ত আনন্দ-সদনকেই এত সুন্দর ক'রে ফুল আর পাতা দিয়া সাজানো হয়েছে, এটাও অনুপমের কীর্তি। কোথা থেকে রাশি রাশি ফুল আর পাতার বোঝা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসেছে অনুপম, এবং ফটক থেকে আরম্ভ ক'রে ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত নানা ছাঁদের ফুল ও পাতার স্তবক আর মালা দিয়ে সাজিয়ে বাড়িটাকেই একটা উৎসবের সাজ পরিয়ে দিয়েছে।

এই মূর্তিনিকেতনের আশেপাশে এবং এ'কোণে আর ও'কোণে, এক একটা ঠাঁই ক'রে নিয়েছে তিন ট্রাস্টি। কুশল আর মিত্রাদেবী, আনন্দ-সদনের ছেলে আর মা ঠাঁই নিয়েছে বাগানের দু'টি টালি-ছাওয়া ঘরে, তুলসী কুঞ্জটা একেবারে ঘরের

দরজার সম্মুখেই। পাঠকজীর লোটা কম্বল আর রামায়ণ ঠাঁই নিয়েছে সিঁড়িতলার ছোট জায়গাটিতে। শক্ত শক্ত ইটের ঘর আর ঘরের দেয়াল সহ্য করতে পারে না অনুপম, তাই সে ইচ্ছা করেই তার কেরোসিন কাঠের বোঁঞ্চটিকে রেখেছে আনন্দ-সদনের একেবারে পিছনে, কাঠের খুঁটোর উপর দাঁড়-করানো উঁচু একচালার নীচে, যেখানে অনেকদিন আগে বিজয় ইঞ্জিনিয়ারের ঘোড়া-গাড়িটা থাকতো।

সকাল থেকে দর্শকের আগমন আরম্ভ হয়েছে আনন্দ-সদনে, থামলো গিয়ে সন্ধ্যা হবারও কিছু পরে। আশ্চর্যের বিষয়, মহারাজপুরের গণ্যমান্যেরা কেউ আসেনি, কালচার্ড সমাজেরও কেউ নয়। স্যামুয়েল ম্যানসনের জনসভায় অথবা সেণ্ট ডেনিসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাদের দেখতে পাওয়া যায়, তারা কেউ আসেনি, যদিও কুশল মহারাজপুরের ছোট বড় সব এসোসিয়েসনের সদস্যদের নামপঞ্জী দেখে দেখে প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট পদস্থ গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নকে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়েছিল।

এসেছে বেশির ভাগ গোঁসাইপাড়ার আর ফুলবাড়ি অঞ্চলের লোক—ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি অনেকেই। এসেছে স্টেশনের কুলির দল। গঞ্জ থেকে এসেছে যত দোকানি আর ফেরিওয়ালা। একদল মালকাটা কয়লা-মজুর আর কন্যা-পাঠশালার মেয়েরাও এসেছে। এমন কি মিলিটারি ছাউনি থেকে গোলন্দাজ সেপাইদের একটা দলও এল, খালি পায়ে ও খালি মাথায়। মিউজিয়াম দেখা শেষ হবার পর জলন্ত কর্পূরের তাপ হাত দিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে সবাই তালে তালে পা ফেলে চলে গেল। অভ্যাগত জনতার দানে পিতলের থালাটার উপর পয়সা সিকি দুয়ানির একটা স্তূপও জমে উঠেছে।

আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, জংলিদের একটা দল দূর ধুলপাহাড়ের শালবনের গহন থেকে যেন এই প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব পূর্ণ করে তোলার জন্যই চলে এসেছে আপনা থেকেই; কারণ, কোন নিমন্ত্রণের ডাক ওদের কাছে পৌঁছয়নি। ওরা এসেছিল শুধু কুশলের সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং কুশলকে দেখতে। ঘুরে ফিরে মিউজিয়ামের মূর্তিগুলিও দেখে নিয়ে, তারপর মাদল আর বাঁশি বাজিয়ে নেচে নেচে কিছুক্ষণের মত আনন্দসদনকে উল্লসিত ক'রে ওরা চলে গেল।

হরভবন মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবস, কিন্তু কুশলের মনে হয়, আজ তারই জীবনের প্রতিষ্ঠা দিবস। একে একে পূর্ণ হয়ে উঠছে তার যত আশা আর অঙ্গীকার। তার অপরাহত চেষ্টার ইতিহাস আজ সফলতার আনন্দে কীর্তিময় হয়ে উঠেছে। হারিয়ে যায়নি মহারাজপুরের মানসী ঐ ব্রঞ্জের গঙ্গা। ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গা, সুস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে দূর ও নিকটের সব আগমন-পথ ধন্য ক'রে। পাঠকজী

আর অনুপমের মত মানুষ এসেছে তার অন্তরের আত্মীয় হয়ে, সতীর্থ হয়ে ; গঙ্গাধরের অন্বেষণে কুশলের দুই কর্মসহচর হয়ে দুটি অদ্ভুত শক্তিধর। নিজের মনটাকেও এত প্রসন্নভাবে কোনদিন পায়নি কুশল, জীবনে এই প্রথম।

তাহ'লে আর বাকি রইল কি ? বাকি আছে মাত্র আর দুটি অঙ্গীকার পূর্ণ করার কাজ, তাহ'লেই এই প্রতিষ্ঠা দিবসের সার্থকতাও বর্ণে বর্ণে পূর্ণ হয়। এই জ্বলন্ত কর্পূরের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই তার সযত্নে রচিত জীবনের এই সুন্দর ছবিটিকে শেষ দু'টি তুলির টান দিয়ে নিঁখুত ক'রে দিতে হবে। তাহ'লেই তো পূর্ণ হবে প্রতিষ্ঠা।

এই ছবির একটি জায়গায় অতীতের একটা বর্ণাবলেপ পড়ে আছে অকারণে, মুছে দিতে হবে একটি সাদার টান দিয়ে। আর, অকারণে সাদা হয়ে আছে যে জায়গাটা, ভরে দিতে হবে রঙের টান দিয়ে। প্রস্তুত হয়ে, যেন শেষ পরীক্ষার আসন্ন মূহূর্তটির জন্যই প্রতীক্ষায় ঘুরে বেড়াতে থাকে কুশল। উপরতলা থেকে নীচতলা, এ-ঘর থেকে ওঘর, হলঘর থেকে বারান্দা, তারপর আরও এগিয়ে আনন্দসদনের খোলা ফটক পর্যন্ত, যেখানে অনুপম আজ ঝাউপাতা দিয়ে একটা সিংহদ্বার তৈরি ক'রে রেখেছে।

মহারাজপুরের কত শত জানা আর অজানা মানুষকে আজ নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়েছে কুশল, শুধু একজনকে ছাড়া, স্বরূপাকে। ভুল ক'রে নয়, ইচ্ছা করেই। পৃথিবীর মধ্যে মাত্র যে একজনকে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে পারে না কুশল, তাকে আজ কার্ড পাঠিয়ে লৌকিকতার দাবিতে ডেকে আনবার কথা নয়। ওটা তো তার জীবনের প্রতিজ্ঞার কথা। আজকের সন্ধ্যাশেষের যেকোন একটি মুহূর্তে নিজের থেকেই এগিয়ে যাবে কুশল। রক্তকরবীর ছায়া পার হয়ে, একটি সরে-থাকা সহাস্যসুন্দর মূর্তিকে হাত ধরে এই প্রতিষ্ঠার উৎসবে নিয়ে এসে তার সব ভয় ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু যেতে পারছে না কুশল, কারণ এখনও এই সন্ধ্যাটা সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটিকে মুক্ত ক'রে দিচ্ছে না। কারণ, একটা মীমাংসার দায় থেকে এখনও মুক্তি পায়নি কুশল। কারণ, নবলা এখনও আসেনি, আসবার কথা আছে।

কোন সংবাদ আসেনি, কেউ বলে যায়নি যে আনন্দসদনের এই পরিণামরমণীয় দিবসে কতগুলি জীবনের প্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে শুকতারার মেয়ের মন। কুশলের চিঠির কোন প্রত্যুত্তরও আসেনি নবলার কাছ থেকে। নবলার আসবার কথা আছে, এটা কুশলেরই মনের কথা। একটা মাত্র যুক্তি এই যে, নবলার নামে একখানা কার্ড পাঠিয়েছে কুশল।

প্রতীক্ষা করছে কুশল। ভুল ক'রে নয়, ভয় ক'রে নয়, বিদ্রূপ করবার জন্য নয়, কিংবা তার সকল সাফল্যের উৎসব গর্ব ক'রে দেখাবার জন্য নয়। পৃথিবীর একজন অসহায়ের উপর শুধু একটু মমতার জন্য। এই আহ্বান শুধু নবলাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া—দেরি করতে নেই, পথ পেতে হলে দ্বিধা ক'রে বসে থাকতে নেই। এস তুমি, তোমাকে পথের সন্ধান জানিয়ে দেব। তুমি শান্তি পাও, আমিও মুক্তি পাই।

ঝাউপাতার সিংহদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আনমনার মত কিছুক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে কুশল, তারপরেই যেন আচমকা অপ্রস্তুত হয়ে মুখ ফিরিয়ে ফিরে আসে হলঘরের দিকে।

শোলার পুতুলে ভর্তি থলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে অনুপম সামনে এসে দাঁড়ায়। —আমি একটু ঘুরে আসি দাদা।

কুশল—কোথায় যাচ্ছ ?

অনুপম—ইসটিসনে।

কুশল—কেন ?

অনুপম—কিছু মাল বেচে আসি। ডাউন এক্সোপ্রেসটাকে ভাল ক'রে হাঁকতে পারলে বিক্রি মন্দ হয় না দাদা।

কুশল—এত খাটুনির পর আবার বের হবে ? একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হতো না ?

অনুপম—বিশ্রামের কোন দরকার নেই দাদা। গরিবের জীবনটাই তো একটা এক্সোপ্রেসের ইঞ্জিন, কয়লা ফুরোলে তবে বিশ্রাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে অনুপম বলে।—আপনার আনন্দসদনের লাইনে চলে এসে বড় নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি দাদা। দু'বেলা খিচুড়িটা যখন এখানে জুটে যাচ্ছে, তখন ফালতু সময়ে একটু হাঁক-হকারি ক'রে দু'চার টাকা যা হবে তার সবই এবার থেকে রিসড়ের মামিকে পাঠিয়ে দিতে পারবো। এতদিনে আমি যেন মোক্ষ পেলুম দাদা।

আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে অনুপম—আসি দাদা।

কুশল। —এস।

কাজের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে মোক্ষপ্রাপ্তির আনন্দ নিয়ে বের হয়ে গেল অনুপম।

অনেক তারা ফুটেছে আকাশে। মিত্রাদেবী চলে গিয়েছেন গোঁসাই পাড়ায় কীর্তন শুনতে। পাঠকজিও চলে গেলেন তুলসী সরোবরে স্নান করতে। ভরা-সন্ধ্যার পৃথিবীটা যদিও শান্ত হয়ে আসছে তবু ক্লান্তি মানছে না এখনও। কিন্তু ক্লান্ত বোধ করে কুশল। হলঘরের বারান্দাতেই একটা বেতের মোড়া নিয়ে এসে বসে।

জলন্ত কর্পূর শেষ হয়ে যেতে আর বড় বেশি বাকি নেই। মুহূর্তগুলি যেন ক্ষয় হয়ে চলেছে। আর একটু পরেই ঘনিয়ে আসবে রাত্রি। ত্রিযামা রাত্রিও ক্ষয় হয়ে যাবে, তারপরেই প্রখর দিন। কুশলের অন্তরাত্মার মধ্যে একটা ফাঁকি রেখে দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই উৎসব-পুলকিত প্রতিষ্ঠার দিবস।

চেষ্টা করেও চিন্তাগুলিকে সুস্থির করতে পারছিল না কুশল। ব্যস্তভাবে বারান্দা থেকে নেমে আবার ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। বোধ হয় তার এই ব্যাকুলতাই হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, কিংবা দিকভ্রান্ত হয়েছে তার চোখের দৃষ্টি।

ফটকের বাইরে পথের ওপাশে তখন বৈজুর কামারশালায় তপ্তলোহার ফুলকি ছুটছে হাতুড়ির এক একটা আঘাতে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে কুশল। পথের অন্ধকার থেকে যেন কতগুলি আগুন-রাঙা প্রশ্নের ফুলকি ছিটকে এসে লাগছে তার চোখে আর মুখে। কার জন্য এই প্রতীক্ষা? কে বললে নবলা আসবে? আজকের সকাল থেকে আকাশ-বাতাসের কোন শব্দে নবলার আসবার প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত হয়নি। নিজের মনের কল্পনা দিয়ে, ইচ্ছা ক'রে আর সাধ ক'রে এই প্রতীক্ষা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতীক্ষা করতে ভাল লাগছে, তাই কি?

কুশলের বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আর্তনাদ ফুটে উঠতে চায়—তবে কি ভুল হলো আবার?

না, ভুল নয়। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চায় কুশল, ভুল হয়নি তার। নবলার প্রতীক্ষা করতে ভাল লাগছে, কারণ নবলার ভাল চাইছে সে! পৃথিবীর সবারই ভাল চাইছে কুশল। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু নবলা এসে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কি এইভাবে অনন্তকাল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? এ কোন্ সর্তে বাঁধা পড়ে গেল তার জীবনের অঙ্গীকার?

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না কুশল। তার আত্মবিশ্বাসগুলি যেন কেঁপে উঠেছে, দুঃসাহসগুলি লজ্জা পেয়েছে, ভীরু হয়ে পড়ছে প্রতিজ্ঞাগুলি। মনে হয়, সেই ভয়ানক পরাক্রান্ত আকস্মিক আবার কৌতুকের বজ্র হেনেছে, তার প্রতিষ্ঠাদিবসের সব উৎসব চূর্ণ করার জন্য।

কৌতুকই বটে, বড় নির্মম কৌতুক! কারণ, চেষ্টা করার সুযোগটুকুও আজ আর নিজের হাতে নেই, নবলা নামে একজন পরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার হাতে চলে গিয়েছে।

না আসুক নবলা, আসবার দরকার নেই। পিতলের থালার ঐ জলন্ত কর্পূর শেষ হবার আগেই শেষ-জানা জেনে নিতে চায় কুশল, পথ পেয়ে গিয়েছে নবলা।

তাহলেই তো অতীতের একটা গ্রন্থিবদ্ধ অভিযোগ শেষ হয়ে যায়। তার পরেই এগিয়ে যেতে পারবে কুশল, ঐ ফটক থেকে পর পর তিনটি ল্যাম্পপোস্ট পার হয়ে ফুলবাড়ির রাস্তায় এক রক্তকরবীর কাছে।

পথ পেয়ে গিয়েছে নবলা, এই বিশ্বাসটুকু না পাওয়া পর্যন্ত নিজেরই প্রতিজ্ঞার পথে এগিয়ে যেতে পারছে না কুশল। এগিয়ে যাবার অধিকার খুঁজছে কুশল, যেন উত্তর দিতে পারে, স্বরূপা যখন প্রশ্ন করবে, কি হলো নবলার? যেন মাথা হেঁট না ক'রে স্বরূপার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলতে পারে কুশল—চেয়েছিলাম নবলার ভাল হোক, ভাল হয়েছে নবলার। সব ভালয় ভালয় মিটে গিয়েছে। ভালরই জয় হয়েছে পৃথিবীতে। তাই তো এসেছি, অতীত আর বর্তমানের কোন অমীমাংসার দাগ জীবনে না রেখে, নিশ্চিন্তমনে তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে।

কিন্তু চেষ্টা করার পথ খুঁজে পায়না কুশল, না তার মনের মধ্যে, না তার চোখের সম্মুখে। অথচ কী দুঃসহ এই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা! তার প্রতিষ্ঠার আনন্দ আজ কোন্ এক কিরাতের জালে জড়িয়ে-পড়া পাখির মত ডানা ঝাপটে শুধু ছটফট করছে, কিন্তু মুক্তি পাচ্ছে না। শুধু ছুটে একবার ঘরের ভিতর যায় কুশল, বড় এক ঢেলা কর্পূর নিয়ে এসে থালার উপর রেখে জেলে দেয়। যেন এই সন্ধ্যাটাকে যেকোন কৌশলে ধরে রাখতে চায় কুশল, আর শুধু জানতে চায়, নবলা পথ পেয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যাটা মাত্র শেষ হয়েছে, একতারার লনের উপর একটা বিরাট রঙীন সামিয়ানার নীচে উৎসবও শেষ হয়েছে, এইতো কিছুক্ষণ আগে।

বিয়ে হয়ে গিয়েছে নবলার। বিয়ের রেজিস্ট্রার চলে গিয়েছেন সবার আগে, তারপর গিয়েছেন অন্যান্য নিমন্ত্রিতের দল। দেবী রায়কে আর নবলা রায়কে উপহারে আর অভিনন্দনে সুদীর্ঘ ও সুখী জীবন দান ক'রে সুসজ্জিত গণ্যমান্যের দলও ভোজের আসর থেকে তৃপ্তোদর হয়ে চলে গিয়েছেন; হিলের উপর থেকে তাঁদের মোটরকারের একটা ঝরনা গড়িয়ে গিয়েছিল এই তো কিছুক্ষণ আগে, এখন আর দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত শুধু দাঁড়িয়েছিল কেটারার্স র‍্যাটারি এণ্ড কোম্পানির একটা ভ্যান। কনট্রাক্ট অনুযায়ী বিশ রকম খাদ্য ও পানীয় সমেত ভূরিভোজের আনন্দ পরিবেশন ক'রে বয় আর বাটলারের দল সব বাসনপত্র আর সরঞ্জাম ভ্যানের ভিতর তুলে নিয়ে চলে গেল।

শুধু যায়নি সেণ্টডেনিসের কয়েকজন প্রাক্তনা, নবলার কলেজ-বান্ধবী কয়েকজন। নবলার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও গল্প করছিল তারা, সামিয়ানার নীচে বিরাট আসরের

একদিকে রঙ্গমঞ্চের মত দেখতে একটা জায়গায়। উঁচু তক্তপোষের উপর গালিচা পেতে এই উচ্চাসনটি তৈরি করা হয়েছে, পাতাবাহার টব দিয়ে ঘিরে। বিদ্যুতের বাতি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পাতার এক একটি গুচ্ছের ভিতর, আলোর রংটা গোলাপি। তারই মাঝখানে বসেছিল নবলা, একপাশে পিয়ানো, আর এক পাশে টেবিল, সম্মুখে হাস্যমুখী বান্ধবীর দল। টেবিলের উপর উপহারের স্তূপ। হরেক রকমের 'গিফ্‌ট ফর মিস্টার এণ্ড মিসেস্ রায়' এবং 'শ্রীমান দেবি রায় ও শ্রীমতী নবলা রায়ের সম্মিলিত জীবনের উদ্দেশে অজস্র শুভেচ্ছা।'

হেনা মুনসি বলে – খুব দেখালি নবলা, ওয়াণ্টার স্কটের নভেলকেও হার মানালি।

নবলা হেসে ভ্রূকুটি করে—নিন্দে করছিস বোধ হয়।

হেনা—এমন একগুঁয়ে প্রেমের নিন্দে করতে পারে কোন্ মুখপুড়ি ?

অহল্যা সাইগল বলে—সত্যি নবলা, সেই-যে হাত ধরলি তো ধরলিই, একেবারে চরম করে ছাড়লি। আমি সেদিনই বলেছিলাম ধীরাকে, আজ থেকে মিস ইণ্ডিয়ার হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেসা ক'রে দেখ।

ধীরা পল বলে—সত্যি ভাই, একটুও বাড়িয়ে বলেনি অহল্যা! আমি অবিশ্যি বিশ্বাস করতে পারিনি যে একদিনের চোখে-দেখা প্রেম এতদূর গড়াবে। ···যাক, খুব ভাল লাগলো দেখে।

নবলা—এত ভাল কি দেখলি ?

ধীরা পল—দেখলাম তোরা রোমিও জুলিয়েটের চেয়েও এক ডিগ্রি ওপরে।

নবলা—তার মানে ?

ধীরা পল—তার মানে, এমন সুন্দর পেয়ার ক'টা দেখা যায় ? প্রেম করলি, অথচ মরলিও না, আর দিব্যি মিলনটাও হলো।

হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে হেনার দলও চলে গেল শুভরাত্রি জানিয়ে। বাইরের লোক আর কেউ নেই। এতক্ষণে একটু ঘরোয়া হবার সুযোগ পায় নবলা, এবং সামিয়ানার নীচে আলোকে-আলোকে ঝলসানো আসরের চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।

কোথাও কেউ নেই। মৃগেনবাবু নেই, দেবী রায়ও নেই, শুধু আসরের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছিলেন নন্দা দেবী, আর মগ বাবুর্চি নতুন ক'রে একটা টেবিলে খাবারের সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখছিল। ঘরোয়া খাবারের টেবিল, চারটে চেয়ার ফেলা হয়েছে, শুকতারার বাপ মা মেয়ে আর জামাইয়ের জন্য।

গোলাপি আলোকের কুঞ্জ থেকে বের হয়ে নেমে আসে নবলা। খাবারের

টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে এবং কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেসা করে—আর সব কোথায় গেল ?

নন্দা উত্তর দেন—ওরা রয়েছে অফিসঘরে।

নবলা—এসময় আবার অফিসঘরে কেন ?

নন্দা—দেবীর সঙ্গে কারা যেন দেখা করতে এসেছে। তাদেরই সঙ্গে আলাপ করছে ওরা।

নবলা—এখানে না এসে অফিস ঘরে কেন ?

নন্দা—গেস্ট তো নয়, এখানে কি ক'রে বাইরের লোককে বসানো যায় ?

ঘরোয়া খাবারের টেবিলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নন্দাদেবী একটু বিরক্তভাবে বলেন—লোকগুলিরও কাণ্ডজ্ঞান নেই, সময়-অসময় বোধ নেই, কাজের কথা নিয়ে জ্বালাতে এসেছে মানুষকে তার বিয়ের দিনে !

টেবিল সাজানোর কাজও সম্পূর্ণ হয়ে যায়, মগ বাবুর্চি নির্দেশের প্রতীক্ষা করে, খাবার আনবে কি না। নন্দা দেবী বলনে—একটু অপেক্ষা কর, ওরা আসুক।

অনাহূত আগন্তুকদের উদ্দেশে আর একবার কটুক্তি করলেন নন্দা দেবী এবং দেখতে পেলেন ফুলগাছের আড়াল দিয়ে আলগোছে যেন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে বনমালী। আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন নন্দা দেবী এবং চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—বনমালী।

বনমালী আস্তে আস্তে হেঁটে এসে সামনে দাঁড়ায়। গায়ে গেঞ্জি, তা'ও আবার আধ-ময়লা, এবং কাঁধে একটা গামছা। বিয়ের দিনে পরবার জন্য নতুন জামা-কাপড় দেওয়া হয়েছিল বনমালীকে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেসব কিছুই সে পরেনি। শুকতারার এই সুন্দর উৎসবের আসর থেকে যেন একটু দূরে দূরে আর বাইরে বাইরে ভীরু কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে বনমালী। সেই দুপুরে তাকে একবার গ্যারেজের কাছে গাছতলায় ঘাসের উপর ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছিলেন নন্দা, আর দেখতে পেলেন এখন। শুকতারার পরিবারের ইতিহাসে এত বড় একটা কাজের দিনে একেবারে হাত-পা গুটিয়ে যেন চুপ মেরে গিয়েছে বিশ-বছরের চাকর। বনমালীর মূর্তি দেখে রাগ চাপতে পারলেন না নন্দা।—একবার তাকিয়ে দেখ নবলা, কে বলবে ওকে শুকতারার চাকর ? কাঁধে গামছা ফেলে যেন মড়া পোড়াতে চলেছে।

এই ভর্ৎসনায় বিচলিত হয় না বনমালী, নিরুত্তর হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দাই আবার ধমক দিয়ে জিজ্ঞেসা করেন।—শুনলাম, কারা যেন দেখা করতে এসেছে ?

বনমালী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দা—ওরা কারা ?

বনমালী—নেমন্তন্নের লোক নয়।

নন্দা—তা জানি। ওরা কোত্থেকে এসেছে আর কেন এসেছে, তাই জিজ্ঞেসা করছে।

বনমালী—তা জানিনে।

নন্দা ধমক দে'ন—তা জানবে কেন ? বিশ বছর কাজ করছো কি না, তাই কাজের দায়িত্ব কিছু জানতে ইচ্ছে করে না, শুধু দিন দিন গবেট হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বনমালী কাঁধের গামছা হাতে তুলে নিয়ে কপালের ঘাম মোছে। নন্দা দেবী তাঁর কণ্ঠস্বর একটু শান্ত ক'রে নিয়ে বলেন—যাও, খোঁজ করে এসে বল, বাইরের লোক-গুলোর চলে যেতে কত দেরি আছে।

বনমালী—বাইরের লোকজন চলে গেছে।

নন্দা—চলে গেছে ? তবে ওঁরা কোথায় ?

বনমালী—কর্তাবাবু অফিস ঘরের বাইরে বসে আছেন।

নন্দা—জামাইবাবু কোথায় ?

বনমালী—সে গেছে বাইরে।

নন্দা ভ্রূকুটি করেন এবং চোখ দুটো জলে ওঠে—সে মানে ? আজ পর্যন্ত ভাষা শিখলে না ইতর কোথাকার ? কা'কে কি বলতে হয় ভুলে গেছ ?

বনমালী বলে—উনি গেছেন বাইরে।

রাগ সামলে নিয়ে আবার নিজেকে শান্ত করতে কিছুক্ষণ সময় লাগে নন্দা দেবীর। তার পরেই জিজ্ঞাসা করেন।—কোথায় বেরিয়েছে দেবী ?

বনমালী—তা জানিনে ?

নন্দা—তুমি সরে পড়, তোমাকে জিজ্ঞেসা করা বৃথা।

নন্দা দেবীর কথা শেষ হওয়া মাত্র আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে হনহন ক'রে হেঁটে চলে গেল বনমালী। নন্দা দেবীও অস্থির হয়ে উঠলেন।—তুই একটু বসে থাক নবলা, আমিই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি, দেবী কোথায় গেল।

নবলা—আমি এখানেই আছি, তুমি যাও।

নন্দা—কি কাণ্ড বল দেখি ! আমরা এখানে বসে আছি হাঁ ক'রে, উনি বসে আছেন অফিস ঘরে চুপটি মেরে, এদিকে দেবী চলে গেল বাইরে ! অথচ কেউ একটা খবরও পাঠায় না, কাউকে জিজ্ঞেসা করেও কোন খবর পাওয়া যায় না। যেমন এ বাড়ির কর্তা তেমনি এবাড়ির চাকর। একজন অদ্ভুত, আর একজন কিম্ভুত।

বিরক্তভাবে বলতে বলতে এবং উদ্বেগে বিচলিত মন নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন নন্দা দেবী।

নবলাও ভাবে, এরকম একা একা হাঁ ক'রে বসে থাকার চেয়ে পিয়ানোর উপর একটু হাত ফেরালেই তো ভাল হয়। একটা সোনাটা, অথবা একটা চটুল কনসার্টোর দু'একটা স্ট্যাঞ্জা বাজিয়ে এই নিঝুম সন্ধ্যাটাকে কতগুলি মধুর শব্দের ঝংকারে জাগিয়ে রাখলে মন্দ কি? খাবার টেবিলের কাছ থেকে উঠে গিয়ে গোলাপি আলোকের কুঞ্জের ভিতরে গিয়ে আবার রঙীন হয়ে বসে থাকে নবলা, পিয়ানোতে হাত দেয়।

আইভি লতায় ঢাকা সবুজ অফিসঘরের বারান্দায় একটা ছোট টেবিল এবং তার চারদিকে কতকগুলি চেয়ার। একটি চেয়ার ছাড়া বাকি সব চেয়ারগুলিই খালি। শুধু বসেছিলেন মৃগেনবাবু। একটা বর্ণহীন একমেটে মূর্তির মত, উপর দিকে মুখ তুলে, ঘূর্ণমান পাখাটার দিকে তাকিয়ে। টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজপত্রও পড়েছিল।

দেবী কোথায় গেল? প্রশ্ন করতে করতে যেন একটা উৎকণ্ঠার ঝড়ের মত উপস্থিত হলেন নন্দা দেবী।

মৃগেনবাবুর একমেটে মূর্তিটাও চমকে ওঠে এবং সাড়া দেয়।—বাইরে গেছে।

নন্দা—তুমি যেতে দিলে কেন?

টেবিলের উপর কাগজপত্রগুলির দিকে ইঙ্গিত ক'রে মৃগেনবাবু বলেন—না যেতে দিয়ে উপায় কি?

নন্দা দেবী বিরক্তভাবে কাগজপত্রগুলির দিকে তাকিয়ে বলেন—এগুলো আবার কি?

মৃগেনবাবু—নানারকম পাওনার তাগিদ আর দাবি, আরও কত কি হাবি-জাবি, সব একসঙ্গেই জুটেছে।

নন্দা বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করেন।—কিসের পাওনা আর দাবি, কার কাছে? কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি!

বলতে বলতে টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে কৌতূহলী হয়ে নন্দা জিজ্ঞাসা করেন—এটা কি?

মৃগেনবাবু—দেবীর নামে একটা সমন, আদালতের লোক এসে এখুনি জারি করে গেল।

নন্দা—সমন?

মৃগেনবাবু—হাঁ, দেবীর বিরুদ্ধে মামলা এনেছে দিল্লীর সেই সোসাইটি, যাদের সার্ভিসে ছিল দেবী। সোসাইটির টাকার অপচয় হয়েছে, মিউজিয়ামের মূর্তিগুলির ক্ষতি হয়েছে, আরও নানারকম বিশ্রী বিশ্রী অভিযোগ।

নন্দা দেবী রাগ করেন।—এই সবই হলো সেই বজ্জাত তদন্ত অফিসারটার কীর্তি। আমি তখুনি তোমাকে কত ক'রে বললাম যে হাতে কিছু ধরিয়ে দিয়ে লোকটাকে একটু ভদ্রস্থ ক'রে দাও। কিন্তু তুমি তো সেসব কিছু আর করলে না, হঠাৎ কি যে মতিচ্ছন্ন হলো তোমার!

মৃগেনবাবু অনুতপ্তভাবে বলেন—যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর পুরনো কথা টেনে লাভ কি? আসল কথা হলো…।

নন্দা—আসল কথা হলো, দেবীকে বাঁচাতে হবে।

মৃগেনবাবু—হবেই তো, আমি এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, কি করা যায়।

নন্দা—তদন্ত অফিসারটার নামেই পাল্টা একটা জুয়াচুরির মামলা দায়ের ক'রে দাও।

উৎসাহিতভাবে মৃগেনবাবু বলেন—এটা মন্দ বলনি!

নন্দা—তুমি যত তাড়াতাড়ি পার…।

মৃগেনবাবু—তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, রাতটা পেরিয়ে যাক, আমি কালই সকালে ধীরাজ উকিলের কাছে গিয়ে পরামর্শ নিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

আশ্বস্ত হন নন্দা দেবী, এবং হাত বাড়িয়ে আর একটা কাগজ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এটা কি!

মৃগেনবাবু—স্টেশন ক্লাবের বিল, দেবীর কাছে পাওনা।

নন্দা—কত টাকা?

মৃগেনবাবু—চার হাজার টাকা।

চার হাজার! বিস্মিত হয়ে, কিংবা অবিশ্বাস ক'রে, খামের ভিতর থেকে বিলটা বের ক'রে নিয়ে পড়তে থাকেন নন্দা দেবী এবং আরও গভীর অবিশ্বাসে চেঁচিয়ে ওঠেন—টয়লেট গুড্‌স্, তার দাম মোট চার হাজার টাকা! দেড়মাসের মধ্যে চার হাজার টাকার সাবান আর সেন্ট মেখেছে দেবী? এ কি বলে জোচ্চোরগুলো।

মৃগেনবাবু—কার কথা বলছো?

নন্দা—তোমাদের ঐ স্টেশন ক্লাব।

মৃগেনবাবু একটু সাবধানে হাসেন।—তুমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারনি। আসলে তো টয়লেট গুডস্ নয়, স্টেশন ক্লাবের কেরানি বলে গেল…।

নন্দা—আমি জানি, ওটা হলো মদের দামের জন্য বেনামা বিল। তার জন্য তোমার এত কায়দা ক'রে হাসবার দরকার নেই।

মৃগেনবাবু চুপ করেন। নন্দাই আবার নিজের উৎসাহে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেন। —আমি জানি, দেবী এক আধটু শেরি-টেরি পছন্দ করে। কিন্তু দেড় মাসে চার হাজার টাকার শেরি খেতে পারে না দেবী। খামখেয়ালী দেবীকে একটু ফুর্তির অবস্থায় পেয়ে মিথ্যে মিথ্যে ভাউচার সই করিয়ে নিয়েছে ক্লাবের কেরানিগুলো, আর এককে করেছে একশো! জোচ্চোর, জোচ্চোর!

মৃগেনবাবু যেন একটু সজীব হয়ে দৃঢ়স্বরে বলেন—কিন্তু এই সব জোচ্চোরদের হাত থেকে দেবীকে বাঁচাতে হবে তো?

নন্দা—হবেই তো। তুমি কাল পরশুর মধ্যে স্টেশন ক্লাবের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে আপোষে একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল। সত্যি সত্যি যা পাওনা, তাই যেন দাবি করে।

মৃগেনবাবু—যদি তারা রাজি না হয়?

নন্দা—না রাজি হয় তো স্টেশন ক্লাবের বিরুদ্ধেই একটা মানহানির মামলা লাগিয়ে দিতে হবে। জোচ্চোরদের জব্দ করতে কি লাগে?

মৃগেনবাবু কৃতার্থভাবে বলেন—এটাও মন্দ বলনি।

নন্দা অনুযোগ করেন—আমি তো মন্দ বলি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিই যে জবুথবু ক'রে সব মন্দ ক'রে দাও।

হেসে ফেলেন মৃগেনবাবু—না, সে সব আর হবে না।

পরিশ্রান্তের মত কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকেন নন্দা দেবী, এবং আরও কিছুক্ষণ শুকতারার খোলা ফটকের দিকেও তাকিয়ে থাকেন, যেখানে সোনালি রং-এর সাটিনের উপর লাল অক্ষরে লেখা এবং সিল্কের ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড একটা ওয়েলকম ঝুলছে।

আবার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে নন্দা দেবীর।—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু দেবী গেল কোথায়? কি দরকার ছিল এসময় বাইরে যাবার?

উত্তর না দিয়ে মৃগেনবাবু টেবিলের কাগজপত্রগুলির দিকেই আর একবার দৃষ্টিপাত করেন। নন্দা দেবীও আর একটা কাগজ তুলে ধরেন, টাইপ-করা কয়েক পাতার একটা চিঠি।

নন্দা—এটা আবার কি জিনিস ?

মৃগেনবাবু—দেবীর নামে সলিসিটরের নোটিস।

নন্দা—নোটিস আবার কিসের ?

মৃগেন বাবু—মিস ভেরা মেরেডিথ নামে কোথাকার একটা বাজে মেয়ে আছে, তারই পক্ষ নিয়ে দেবীকে নোটিস দিয়েছেন সলিসিটর মিস্টার বক্সি।

নন্দা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে বলেন—ভেরা মেরেডিথ ? সেটা আবার কি জিনিস ?

মৃগেন বাবু—ধানবাদের হোটেলওয়ালি মিসেস মেরেডিথের মেয়ে।

নন্দা—কি চায় মেয়েটা ?

মৃগেনবাবু—এক লক্ষ টাকা ?

নন্দা—কিসের জন্যে ?

মৃগেনবাবু—হেন তেন কত কিসের জন্যেই তো লিখেছে। দেবী নাকি ওর শরীরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। ওর কুমারী জীবনের ওপর মেটার্নিটি চাপিয়েছে। এই অবস্থায় ওর সামাজিক সম্মান যা নষ্ট হয়েছে, তার খেসারত হিসাবে অন্তত এক লক্ষ টাকা না পেলে দেবীর বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হবে মেয়েটা।

চেঁচিয়ে ওঠেন নন্দা।—মিথ্যে, মিথ্যে! একেবারে নির্জলা মিথ্যে। আমি জানি, মহারাজপুরে কয়েকটা কটা-চোখ বাঁদরি আছে, বড়লোকের ছেলে দেখতে পেলেই গায়ে পড়ে ভাব করে, তার পরেই টাকা আদায়ের জন্যে একটা দুর্নামের ভয় দেখিয়ে অনেক কিছু করে।

মৃগেনবাবু—এখন কথা হলো, এই সবের হাত থেকে দেবীকে বাঁচাতে হবে তো ?

নন্দা দেবী পরিশ্রান্তের মত বলেন—হবে বৈকি, তুমিই একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলো, আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।

মৃগেনবাবু—আমি ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি।

উৎসাহিত হয়ে চোখ তুলে তাকান নন্দা—এরই মধ্যে কেমন ক'রে ব্যবস্থা করলে ?

মৃগেনবাবু—পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবীকে পাঠিয়েছি বক্সির কাছে, একটা কমপ্রোমাইজ ক'রে ফেলতে। দেবী নিজেই এসে টাকা দাবী করলো, অগত্যা···।

নন্দা—পঞ্চাশ হাজার ? তার কমে কমপ্রোমাইজ হবে না ?

মৃগেনবাবু—হবে বলে মনে হয় না, ওসব বড় কঠিন জীব। বরং ভালয় ভালয় যদি পঞ্চাশ হাজারের ওপর দিয়েই ব্যাপারটাকে সেরে ফেলা যায়, তাহলেই একরকম হয়ে গেল।

নন্দা—ঠিকই বলেছ। চুলোয় যাক পঞ্চাশ হাজার। অমন কত পঞ্চাশ হাজার দেবীর বাবা কুকুর পুষতে খরচ করে দেন।

হঠাৎ একটু লজ্জিত হয়ে নন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকেন মৃগেনবাবু। যেন নন্দা দেবীর এই মন্তব্যটা তিনি সমর্থন করছেন না, এবং শুনতেও লজ্জা বোধ করছেন।

নন্দা—ওকি, ওরকম করছো কেন?

মৃগেনবাবু—তোমার ও ধারণা ঠিক নয়।

নন্দা—কোন্ ধারণা?

মৃগেনবাবু—দেবীর বাবার সম্বন্ধে ধারণা।

নন্দা—ঠিক নয় কেন?

মৃগেনবাবু—দেবীর বাবা বেচারা বড় দুঃখী আর দেউলে মানুষ।

নন্দা—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এত আজে-বাজে কথা বকছো কেন?

মৃগেনবাবু—আজে-বাজে নয় বোধহয়। বক্সিই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এই কথা বলে গেল।

নন্দা—বক্সিই কি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সত্যিবাদী ধর্মপুত্তুর?

মৃগেনবাবু—তা নয়। তবে বক্সি তো বলতে গেলে দিল্লীরই লোক, সেখানেও বক্সির একটা অফিস আছে, দেবীর বাবার সঙ্গে অনেকদিন থেকে চেনা-শোনাও আছে। এই তো আজ পাঁচ দিন হলো বক্সি ফিরেছে দিল্লী থেকে। সত্যি মিথ্যে জানি না, বক্সি যা বললে আমি শুধু তাই তোমাকে বলছি।

নন্দা—কি বললে বক্সি, স্পষ্ট করে বল।

মৃগেনবাবু—বেনামিতে একটা মদের দোকান চালায় দেবীর বাবা, তা'ও বিশেষ কিছুই লাভ ওঠাতে পারে না। ভদ্রলোক খুবই দুঃখী দেউলে আর ধেরো মানুষ।

—মিথ্যে! মিথ্যে! কথাগুলি যেন নন্দার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে ফুটে উঠতে থাকে। হঠাৎ বজ্র পড়ে শুকতারার মার্বেল চূর্ণ হয়ে গেলেও বোধ হয় এমন অস্থির হতেন না নন্দা দেবী।

মৃগেনবাবু সসঙ্কোচে বলেন—হতে পারে মিথ্যে।

নন্দা চেঁচিয়ে ওঠেন—হতে পারে কেন বলছো তুমি? একেবারে মিথ্যে। দেবী যে এমন একটা অপদার্থ দেউলের পুত, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তাঁর বুকেরই ভিতরে যেন সাপের ছোবল পড়েছে, হঠাৎ যন্ত্রণায় শরীরটা মোচড়

দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নন্দা দেবী। মৃগেনবাবুর রুক্ষ একরোখা মূর্তির দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমক দিয়েই বলেন—বলো না, কখখনো এরকম ভয়ানক কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না।

বারান্দা থেকে নেমে পড়েন নন্দা দেবী, কাঁকর-ছড়ানো মাটির উপরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মৃগেনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে অনুযোগ করেন। —তুমি এরকম করলে কি আর কিছু লাভ হবে?

নন্দা—কি করছি আমি?

মৃগেনবাবু—এরকম ব্যস্ত হয়ে উঠলেই কি দেবীকে বাঁচানো যাবে?

কিছুক্ষণ প্রখর অথচ শুষ্ক চোখে তাকিয়ে নীরব হয়ে থাকেন, তারপর চেঁচিয়ে ওঠেন নন্দা—কেন বাঁচাবে? কে বাঁচাতে বলছে? কি লাভ হবে দেউলের ছেলেকে বাঁচিয়ে?

শূন্য দৃষ্টি তুলে মৃগেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত প্রশ্ন করেন নন্দা দেবী, এবং মৃগেনবাবুই চমকে ওঠেন। নন্দার চোখের তারা দুটি যেন নিশ্চল হয়ে গিয়েছে, কানের দুলের হিরা দুটিও। কোন্ দিকে তাকিয়ে আছেন এবং কি দেখছেন বোঝা যায় না। মৃগেনবাবু বিব্রতভাবে ডাকেন—শুনছো?

উত্তর দেন না নন্দা, বোধহয় শুনতে পাননি। হঠাৎ বজ্রপাতের একটা শব্দ যেন তাঁকে ক্ষণিকের মত বধির ক'রে দিয়েছে, কিংবা পৃথিবীটাই সাড়াশব্দ হারিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

মৃগেনবাবু আবার ডাকেন—এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, চল বসবে।

আস্তে আস্তে, যেন নিজেরই একটা মৃতদেহকে কোনমত হাঁটিয়ে নিয়ে আবার অফিসঘরের বারান্দার উপরে উঠে একটা চেয়ারে বসে পড়েন নন্দা দেবী। রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে কপালের উপর স্পঞ্জ করতে থাকেন এবং যেন আনমনাভাবেই বলে ওঠেন।—এমন ভুল কি ক'রে হলো?

মৃগেনবাবু—কিসের ভুল?

নন্দা—একটিবারও সন্দেহ হলো না, একবার একটু খোঁজ নিয়ে জানতেও ভুলে গেলাম, লোকটার সত্যিই কিছু আছে কি নেই।

মৃগেনবাবু—ওরকম এক-আধটু ভুল হয়েই থাকে। সব দিকে শত বুদ্ধি থাকলেও এক জায়গায় হঠাৎ...যাক সে সব কথা। মানুষকে কত আর অবিশ্বাস করা যায় বল?

নন্দা চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু লোকটা যে মানুষই নয়, একটা হাভাতের ছেলে। ওকে অবিশ্বাস করলেই বা কি, বিশ্বাস করলেই বা কি?

মৃগেনবাবু একটা যুক্তি তুলে বোধ হয় নন্দাদেবীকে শান্ত করার জন্যই বলেন—যেই হোক না, এখন যখন সে আমাদের আপন-জন হয়েই গেছে, তখন…।

কথা শেষ করতে পারলেন না মৃগেনবাবু, হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। নন্দা দেবীও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে রুমাল দিয়ে কপাল স্পঞ্জ করতে থাকেন। নবলা এসে দাঁড়িয়েছে।

বিয়ের সাজটা এখনও বদলায়নি নবলা। মেঘ রঙের শাড়িটার উপর সোনালি জরির বিদ্যুৎ আঁকা। ঠিক ঘোমটা তো হতে পারে না, ছোট একটি ঘোমটার আভাস দিয়ে আঁচলটা এখনও নববধূত্বের সাক্ষীর মত খোঁপার সঙ্গে সোনার পিন দিয়ে আঁটা রয়েছে।

চেয়ারে বসেই হেসে ফেলে নবলা—কি করছো তোমরা? ওদিকে বাবুর্চি যে ঘুমিয়ে পড়লো!

উত্তর দিলেন না কেউ। এবং নবলার হাসি থামতেই সমস্ত শুকতারাই শব্দহীন হয়ে গেল।

মৃগেনবাবুই সবার আগে এই নিঃশব্দতাকে চমকে দিয়ে জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলেন—ওঃ।

নবলা প্রশ্ন করে।—কি হলো বাবা?

মৃগেনবাবু হাসেন—কিছু নয়, সোরাবজির কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

নবলা—কি করেছে সোরাবজি?

মৃগেনবাবু—কোত্থেকে একরকম মাটি যোগাড় করেছে, দেখতে খাঁটি সিমেণ্টের চেয়েও খাঁটি।

নবলা—তাতে কি হয়েছে?

মৃগেনবাবু—মেশাচ্ছে। এক টন সিমেণ্টে কোয়ার্টার টন মাটি। আর এই নতুন ব্র্যাণ্ডটার কি নাম দিয়েছে বল দেখি?

নবলা হাসে—আমি কি ক'রে বলবো?

মৃগেনবাবু—ওটার নাম হলো, স্পেশ্যাল সুপিরিয়র।

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে নবলা। মৃগেনবাবুও হাসেন, প্রাণ খোলা হো-হো হাসি এবং হাসি না থামিয়েই বলতে থাকেন—আরও মজার কথা কি জানিস? বিকোচ্ছে সব চেয়ে বেশি, মার্কেট গরম ক'রে তুলেছে স্পেশ্যাল সুপিরিয়র।

নন্দা দেবী হঠাৎ কপালে রুমাল চেপে বলে ওঠেন—ইস্!

নবলা চমকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করে।—কি হলো মা?

নন্দা—আর বলিস না! কেন যে মরতে এই ইটালীয়ান জর্জেটটা প'রলাম, এখন আর সইতে পারছি না। কি খসখসে রে বাবা!

যতক্ষণ খুশি হেসে নিল নবলা; উৎসবের দিনে হাসিগুলি একটু বেশি স্বচ্ছল হয় এবং মাঝে মাঝে বেশি অর্থহীনও হয়। তার পরেই একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে নবলা জিজ্ঞেসা করে। —রায় সাহেব গেলেন কোথায়?

উত্তর না পেয়ে নবলা আবার প্রশ্ন করে। —কখন্ ফিরবে, কিছু বলে যায়নি?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর শোনা গেল না। কিন্তু নবলা তবু অবিচলিতভাবেই আবার প্রশ্ন করে। —কোথায় গেছে, বলে গেছে কিছু?

মৃগেনবাবু আর নন্দা দেবী, শুকতারার বাপ আর মা, দু'জনেই চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েননি, মূর্ছাও যাননি, তবুও দু'জনেই শুকতারার মেয়েকে উত্তর দেবার একটা দুরূহ দায়িত্ব থেকে যেন নিজের নিজের জ্ঞান বুদ্ধি আর মুখরতাগুলিকে আড়াল ক'রে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন।

কি ভেবে উঠে দাঁড়ায় নবলা, মৃগেনবাবু আর নন্দা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুতীক্ষ্ণ আর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তুলে। তার পরেই দৃষ্টি পড়ে টেবিলের উপর কাগজ-পত্রগুলির দিকে।

একটা কাগজ হাতে তুলে নেয় নবলা। পড়তে থাকে, শান্ত ও অবিচলিতভাবে। শুকতারার জীবনকে অবাধ সুখের স্বর্গ ক'রে তোলার জন্য যে জাগ্রত বিগ্রহের আবির্ভাব আজ রেজিস্টারি হয়ে গেল, তারই এক একটি লীলাকাহিনী। মিস ভেরা মেরেডিথের সলিসিটর বক্সির নোটিস, আদালতের সমন, স্টেশন ক্লাবের বিল, এবং আরও কত ছোট-ছোট হুমকি, তাগিদ, দাবি এবং নোটিস! এক এক ক'রে সবই পড়া হয়ে যায়।

আবার চেয়ারের উপর বসে নবলা। শান্তভাবে বসে থাকবার চেষ্টা করতে গিয়ে উসখুস করতে থাকে, যেন কোন কাজ নেই ব'লে হাতের কাছে শুধু পিয়ানোটাকে খুঁজছে নবলা। শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে না পেরে ঝংকার দিয়ে হেসে ওঠে নবলা। —বোধ হয় বক্সির কাছেই গেছেন আমাদের রায়সাহেব।

মৃগেনবাবু উত্তর দেন। —হ্যাঁ।

নবলা—কেন?

মৃগেনবাবু—কমপ্রোমাইজ করতে।

নবলা—কি ক'রে কমপ্রোমাইজ হবে?

মৃগেনবাবু—পঞ্চাশ হাজারে, না হয় বড় জোর আর দশ হাজার লাগবে।

নবলা—মাত্র ?

মৃগেনবাবু হাসেন—হ্যাঁ, মাত্রই তো, তা ছাড়া আর কি ?

নন্দা দেবী এইবার মুখ ঘুরিয়ে একটা ফাঁকা হাসির ধমক দিতে গিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমরা আর হাসিয়ো না আমাকে, দোহাই তোমাদের।

তারপরেই নবলার দিকে তাকিয়ে নন্দা বলেন—রায়সাহেবটি হলো আস্ত একটি ভিক্ষুকসাহেব। আর তার বাপটি হলো আস্ত একটা হাভাতে দেউলে এঁটোখেগো হতভাগা।

নবলা হাসি থামাতে পারে না। —তুমি এসব কি বলছো মা ?

নন্দা—বলছি সত্যি কথা। দিল্লীতে দেবীর বাবার একটা মদের দোকান আছে, এই মাত্র। তা'ও যা লাভ হয় তাতে পেটপুরে একটা বেড়ালের খোরাক বড় জোর হতে পারে। বক্সি এই সংবাদটি জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

নবলা—সিমলাতে আর মুসৌরিতে ওদের কয়েকটা বাড়ি তো আছে।

নন্দা—তোর মাথা আছে !

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খসখসে জর্জেটের যন্ত্রণায় আর একবার ছটফট ক'রে ওঠেন নন্দা দেবী, রুমাল দিয়ে জোরে জোরে কপাল স্পঞ্জ করেন এবং আক্ষেপ চাপতে গিয়ে একটা আর্তনাদ ক'রে ওঠেন।—গেল, আমার পঞ্চাশ হাজার টাকাই একেবারে জলে গেল।

নবলা সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে—আমার যে স্বামিটাই জলে গেল।

হাসির শব্দ থামলো, কিন্তু চোখ দুটোকে এরকম অদ্ভুতভাবে হাসিয়ে প্রখর ক'রে এবং নিষ্পলক ক'রে বেশিক্ষণ রাখতে পারলো না নবলা। মাথা নীচু ক'রে টেবিলের চকচকে পালিশের দিকে তাকিয়ে থাকে নবলা। দেখতে পায়, উৎসব-পুলকিত এক তরুণীর ঢলঢল প্রতিচ্ছবির মুখটা তারই দিকে তাকিয়ে আছে, যদিও প্রতিচ্ছবির চোখ দুটো দেখা যায় না।

নন্দা দেবীও বসেছিলেন, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে। এই নীরবতার মধ্যে শুধু মৃগেন বাবুই তাঁর স্বভাবশান্ত কণ্ঠস্বরে কথা পাড়লেন নতুন ক'রে। —তোমরা এত গেল গেল করছো কেন ? দেবী তো ফিরে আসছেই, একটু দেরী হচ্ছে, এই যা।

নন্দা মুখ ফিরিয়ে ভ্রূকুটি করেন—এলেই বা কি হবে ? কে কথা বলবে ওর সঙ্গে ?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নন্দা দেবী, যেন একটা বিভীষিকার পদধ্বনি শুনতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। মৃগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে তীব্রস্বরে অনুযোগ করেন। —না, তুমি আর আস্কারা দিতে পারবে না। চোখের ওপর একটা ভিক্ষুক

এসে শুকতারাকে লুটেপুটে খাবে, আমি এসব সহ্য করতে পারবো না। আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি তোমাকে।

মৃগেনবাবু বিব্রতভাবে বলেন—আস্কারা দেবার কথা নয়। আসল কথা হলো, দেবী আসবার পর যা হোক একটা……।

নন্দা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেন—দেবী আসবে কেন?

মৃগেনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে যেন শক্ত দু'চোয়াল দিয়ে পিষে পিষে কথা বলেন। —না এসে তো পারে না।

নন্দা চিৎকার ক'রে ওঠেন। —না, আসতে দেওয়া হবে না।……বনমালী, বনমালী!

মৃগেনবাবু শিথিলভাবে দু'হাত তুলে আপত্তি করার ভঙ্গীতে বলেন—কি বলতে চাইছো তুমি?

নন্দা—গেট বন্ধ ক'রে দিতে হবে।

মৃগেনবাবু—কি হবে গেট বন্ধ করে?

নন্দা—লোকটা যেন এখানে আর ঢুকতে না পারে।

মৃগেনবাবু হেসে ফেলেন—বন্ধ গেট ডিঙিয়েও তো ঢুকতে পারে।

চোখের উপর রুমাল চাপা দে'ন নন্দা দেবী—ছি ছি ছি, কি ভয়ানক কাপুরুষের কথা বলছো তুমি? তুমি থাকতে একটা বাইরের লোক এসে শুকতারার গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকবে, একথা তোমার মুখেও শুনতে হলো!

মৃগেনবাবু সান্ত্বনার সুরে বলল—এরকম অবুঝ হলে চলে না। দেবী এখানে না এসে যাবে কোথায়?

নন্দা—জেলে, হাজতে, নর্দমায়, নরকে, যেখানে দু'দিন পরে ওকে যেতেই হবে সেখানে চলে যাক।

মৃগেনবাবু—যেখানেই যাক, ফিরে আবার এখানেই আসতে হবে তো। এ জায়গা ছাড়া ওর আর জায়গা কোথায়? আমরা ছাড়া ওর আর আপনজনই বা কে আছে?

নন্দা আবার চেঁচিয়ে ওঠেন। —এত বিশ্রী আর যা-তা কথা আর বলো না। দোহাই তোমার। আগে গেট বন্ধ কর।

মৃগেনবাবু অবিচলিতভাবে বলেন। —তুমি আগে বসো।

অবসন্নের মত চেয়ারের উপর আবার বসে পড়লেন নন্দা দেবী। কিন্তু আর একটা চেয়ার থেকে নবলা উঠে দাঁড়ায় এবং চেঁচিয়ে ড'ক দেয়। —বনমালী।

মৃগেনবাবু প্রশ্ন করেন—তুইও কি গেট বন্ধ করতে বলছিস?

নবলা হেসে ফেলে—আমি কিছুই বলছি না। গেট বন্ধ করলেই বা আমার কি, আর খোলা থাকলেই বা আমার কি?

মৃগেনবাবু—তবে বনমালীকে ডাকছিস কেন?

উত্তর দিতে পারে না নবলা, কারণ সে নিজেই জানে না, বনমালীকে কেন ডেকে ফেলেছে। একটা উদ্দেশ্যহীন ডাক, অথবা একটা অলীক আর্তনাদ, কিংবা একটা নিরর্থক হাস্যোচ্ছ্বাস, সবই হতে পারে।

মৃগেনবাবু বলেন—তুই ব'স।

বসে পড়ে নবলা। শান্ত হতে থাকে রাতের শুকতারার বাতাস।

দেবী আসবে কি আসবে না, কোন ঠিক নেই; সত্যিই এখন মহারাজপুরের চতুঃসীমার মধ্যে দেবী আছে কি নেই, তাও তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গেট বন্ধ করা হবে কি হবে না, ঠিক করা যাচ্ছে না। নিয়মের সংসার থেকে পলাতক আসামীর মত এই শুকতারার বেপরোয়া সুখগুলিকে একটা অস্পষ্ট ভবিতব্য এসে এতদিনে যেন আটক ক'রে ধরেছে। পালিয়ে যাবার পথ নেই, প্রতিরোধ করার শক্তি নেই, আত্মসমর্পণ করতেও বুক কেঁপে ওঠে। শুধু চুপ ক'রে বসে থাকে শুকতারার বাপ মা আর মেয়ে। আলো নেভে না, বনমালীও সাড়া দিয়ে ছুটে আসে না। উজ্জ্বল অথচ নিস্তব্ধ শুকতারা।

শুকতারার ফটক পার হয়ে চলে যেতে পেরেছে শুধু বিশবছরের চাকর বনমালী, ফিরে আর বোধ হয় আসবেও না কোনদিন। ফটকের দু'পাশে দু'টি স্তম্ভের দুই গম্বুজের উপর বড় বড় ঘষা কাচের গোলকের ভিতর যে আলো জ্বলে, সে আলোকের দিকে আর ফিরেও তাকায়নি বনমালী। শুধু তার সম্মুখ পথের উপর নিজের ছায়াটার দিকে দৃষ্টি রেখে সোজা চলে গিয়েছে, ফুরিয়ে দিয়েছে তার চাকরির মেয়াদ।

রাতটা মাত্র আরম্ভ হয়েছে, এবং শুকতারার দুঃসহ আলোক থেকে যেন একটানা ছুটে নতুন হরভবন মিউজিয়ামের দ্বারপ্রান্তে জ্বলন্ত কর্পূরের শান্তরশ্মির সান্নিধ্যে, এসে শান্ত হয়ে বসেছিল বনমালী। কুশলও দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই, একেবারে শান্ত হয়ে। যা জানতে চেয়েছিল কুশল এবং জানবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল, তা জানা হয়ে গিয়েছে।

অনেক কথাই বলেছে বনমালী, এবং কুশলও শুনেছে। তার মধ্যে সব শেষের কথাটাই হলো আসল কথা। শুকতারাতে একটা উৎসব শেষ হয়েছে এইমাত্র এবং নবলা তার জীবনের একটা পথও পেয়ে গিয়েছে। মিটে গিয়েছে অতীত, ছিন্ন

হয়েছে গ্রন্থি। দায় ফুরিয়ে গিয়েছে, দাবি সরে গিয়েছে। আপনা থেকেই মীমাংসা হয়ে গিয়েছে।

এখন আর কি? কুশলের পথ তো অবাধ হয়েই গেল। এখানে জলন্ত কর্পূর এখনও শেষ হয়নি, আর সেখানে স্বরূপাও নিশ্চয় এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েনি। আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে এই সামান্য দূরত্বটুকু অনায়াসে পার হয়ে, স্বরূপাকে হাত ধরে এখনি এই প্রতিষ্ঠার উৎসবের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারা যায়। আজই তো তাকে নিয়ে আসবার কথা। আজই তো রূপতত্ত্বের শেষ অধ্যায় শেষ ক'রে উপসংহার লেখবার কথা। আজই তো কুশলের মনের সেই পুরনো লোভী কল্পনাটা চুপি চুপি সারাদিন একটা আশা পোষণ করেছে। হরভবনের গঙ্গা আর ফুলবাড়ির মেয়ে স্বরূপার চোখ, দুই মূর্তিকে পাশাপাশি রেখে আজই তো কুশলের দেখবার কথা, ঐ দুই মূর্তির চোখের হাসিতে কোন মিল আছে কি না।

চলে গেল বনমালী। ঘুরে ফিরে মিউজিয়ামের মূর্তিগুলি দেখে নিয়ে আর কর্পূর দীপের তাপ মাথায় ছুঁইয়ে মহারাজপুরের অতি নগণ্য ও নমান্য একটা মানুষ এই প্রতিষ্ঠাদিবসের আভাটুকু যেন মনের মধ্যে ভরে নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেল।

বনমালী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন এই উৎসবের শেষ চাঞ্চল্যটুকুও চলে গেল, রইল শুধু একটা অটল নীরবতা, এবং তারই সঙ্গে যেন গাঁথা হয়ে কুশলও অচল হয়ে গেল।

শুকতারার উৎসবের কথাটাই বার বার মনে পড়ে কুশলের, যেন মানুষের সংসারের বিরুদ্ধে একটা অবজ্ঞার উৎসব। জীবনের ভুল আর অপমানগুলির গলাতেই মালা পরিয়ে দিয়েছে শুকতারার মেয়ে। দুঃখ ক'রে নয়, চোখের জল ফেলে নয়, হাসিমুখেই পিয়ানোর মধুর শব্দে তার আত্মসমর্পণের আনন্দ মন্দ্রিত ক'রে আজ এক সুখের স্বপ্নসহচরের হাত ধরেছে নবলা।

বিদ্রূপ করলো নবলা, পৃথিবীকে তো বটেই, বিশেষ করে কুশলকে! বিদ্রূপের জ্বালাটাও কুশলের গায়ে লাগছে। এভাবে নিশ্চল এবং নিঃশব্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কুশলের মনে হয়, যেন একটা জ্বালা-লাগা ও ফাটল-ধরা উত্তপ্ত মূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে আছে। বনমালীর মুখে বর্ণিত সেই কাহিনী বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

বোধ হয় নতুন বাতাসের আমোদ উপভোগ করার জন্য কামরাঙ্গা গাছের নীলকণ্ঠ বাসায় বাইরে এসে পাতার ঝোপের মধ্যে লাফালাফি করতে থাকে। যা হোক তবু একটা শব্দ উসখুস ক'রে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। শুনতে ভাল লাগে কুশলের, এবং বুঝতে পারে এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। কতগুলি সাড়াশব্দের মধ্যে গিয়ে না

পড়লে, একটু হেঁটে না বেড়ালে এবং এই রাত্রির এলোমেলো নতুন বাতাস একটু ভাল ক'রে গায়ে না লাগালে মনের ভাবনাগুলি শুকতারার মত ভয়ানক বিদঘুটে কাহিনীর গ্রাস থেকে মুক্তি পাবে না। রাত বেশি হয়নি। হয় মার্কেটের দিকে, নয় ক্রসরোডের দিকে, কিংবা পার্কের কদমগাছের কাছে জলের ফোয়ারাগুলির আশে পাশে একটু বেড়িয়ে আসা যাক, রাত গভীর হবার আগেই।

সত্যি সত্যি এগিয়ে যেতেও থাকে কুশল, ফটক পার হয়ে গিয়ে পথের উপর দাঁড়ায়। কিন্তু আর অগ্রসর হয় না, কি কথা যেন মনে পড়ে যায় কুশলের, বোধ হয় প্রতিজ্ঞার কথাটাই। ভাবতে গিয়ে পথের উপরেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ তো এভাবে সময় নষ্ট ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার কথা নয়। শুধু একটি পথেই এগিয়ে যাবার কথা। ডেকে আনতে হবে স্বরূপাকে। আর দেরি ক'রে লাভ কি?

ভাবতে গিয়েও অনেক দেরি হয়ে গেল, তবু এক পা এগিয়ে যে যেতে পারে না কুশল। কারণ, জ্বালাটা যেন এখনও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, জলে ডুব দিয়ে থাকলেও বোধ হয় ছেড়ে যাবে না।

বুকের ভিতরেই একটা ক্ষত হয়ে গিয়েছে, তারই জ্বালা। গায়ে বাতাস আর জলের ছিটে লাগালে সে জ্বালা থামবে কেন? কুশলের যত মমতা আর মঙ্গলকামনাকে ঠাট্টা ক'রে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়েছে নবলা, তারই গভীর ক্ষতের এই জ্বালা। ভাল হলো না নবলার, পথ পেল না নবলা, তারই বেদনার এই জ্বালা। আত্মহত্যা করলো একটা জীবনের রূপ, তারই জন্য আক্ষেপের এই জ্বালা। কত সুন্দর হতে পারতো নবলা, কিন্তু হলো না, তারই জন্য হতাশার জ্বালা।

চোখ মোছবার জন্য রুমালটা হাতে তুলে নিতেই হঠাৎ আতঙ্কিতের মত ছটফট ক'রে চমকে ওঠে কুশল, ঘুমন্ত পাখি যেমন হঠাৎ সাপের ছোবল খেয়ে ছটফট ক'রে জেগে ওঠে। সত্যি সত্যিই যেন ঘুমন্ত অবস্থা থেকেই হঠাৎ চোখ মেলেছে কুশল এবং এই জ্বালার রহস্য এতক্ষণে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে এই চোখের জলের অর্থ। শুকতারার সুখের মেয়ে নবলা যেন মরে যাবার আগে একটা করুণমূর্তি নিয়ে কুশলের মনের বড় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। ভাল লেগেছিল নবলাকে মনের মধ্যেই নতুন ক'রে দেখতে পেয়ে। তাই তার অন্তর্ধান অলক্ষ্য একটা সম্পর্কের বন্ধনকেই কাঁদিয়ে দিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই, নিজের কাছেই ধরা পড়ে গিয়েছে কুশল। ভুল হয়ে গিয়েছে।

বুঝতে পারেনি কখন ভুল হয়ে গিয়েছে, বুঝবার চেষ্টাও করেনি কুশল। কল্পনার

নতুন নবলাকে এক মুহূর্তের জন্যও শখের দুঃখিনী ব'লে সন্দেহ করেনি। এবং এখনও, বনমালীর কাছ থেকে শুকতারার সকল দুঃখের ভয়ংকর ইতিহাস শুনতে পেয়েও, নবলাকে ঘৃণা করতে পারছে না কুশল। নবলার উপর রাগ হয় না, ধিক্কার জাগে না। শুধু শোকাতুর মানুষের মনের মত জ্বালাগ্রস্ত হয়ে আছে কুশলের মন।

এই ভুলের সমাধান নেই, ক্ষমাও নেই বোধ হয়। মমতার ছদ্মবেশে তার সব সতর্কতার পাহারা ফাঁকি দিয়ে মনের গহন থেকে একটা ব্যাকুল আগ্রহ কি ভয়ানক কৌশলে কুশলকে পথের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েছে তার জীবনের প্রতিজ্ঞা কেড়ে নেবার জন্য। কত বড় ঠগী ঐ আত্মবিশ্বাস, কি মূর্খ ঐ আত্মশক্তি! আজ চরম পরাভব এসেছে প্রতিষ্ঠার নাম নিয়ে। শেষ তুলির টান দিয়ে জীবনের ছবিকে নিখুঁত ক'রে তুলতে আর হবে না। রঙের বাটিটাই উল্টে পড়ে গিয়েছে ছবির উপর এবং ছবিটাই কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। আর মুখ ফিরিয়ে তাকানো যাবে না ফুলবাড়ির শড়কের দিকে। মনের দাগ মেটাতে গিয়ে ক্ষত হয়ে গিয়েছে মনের মধ্যে—এই অপরাধের লজ্জা নিয়ে স্বরূপার কাছে গিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াবার কিংবা চোখ মেলে তাকাবার অধিকার নেই। স্বরূপার কাছে গিয়ে করুণাপ্রার্থীর মত মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়াবারও কোন অর্থ হয় না!

রাতের বাতাসে অনেক দূর থেকে একটা সাইরেনের স্বর অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছিল, বোধহয় বুড়াডিহি কলিয়ারিতে কোন দুর্ঘটনা হয়েছে। আনন্দসদনের ঝাউপাতার সিংহদ্বার কাঁপিয়ে এই সড়কের উপর দিয়েই প্রথমে ছুটে চলে গেল একটা অ্যাম্বুলেন্সের মোটরভ্যান, তার পরে গেল বড় বড় হোসপাইপ, লোহার মই আর দড়িদড়া নিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের একটা গাড়ি। পথের এক পাশে সরে দাঁড়ায় কুশল। তার পর ফিরে আসে ঘরের দিকে, শুনতে ভাল লাগে না এত সাড়াশব্দের উল্লাস।

হলঘরের বাইরের বারান্দার এক কোণে সেই বেতের মোড়ার উপর একটা নিঃশব্দতার মধ্যে বধিরের মত বসে থাকতেও ভাল লাগে না। ভাল লাগে না অনুপমের তৈরি আমপাতার তোরণের উপর ঐ প্রদীপটাকে দেখতে। গাছের মাথায় অন্ধকারগুলি স্থির হয়ে রয়েছে, তা'ও দেখতে একটুও ভাল লাগে না। অর্থহীন হয়ে গিয়েছে চারদিকের রূপ। হেরে গিয়েছে কুশল। প্রতিজ্ঞা হারিয়েছে, তার চেষ্টার যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে। সব চেয়ে বড় মার খেয়ে পড়ে গিয়েছে তার কঠিন আত্মবিশ্বাস, একেবারে রক্তাক্ত হয়ে। ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার আর কোন অবলম্বন নেই, মনের ভিতরে না বাইরেও না। নিজের-জোরে নামে জীবনের সেই কল্পিত শক্তিটাই বা কোথায়? নিঃশব্দের শ্মশানে বসে আজ যেন দেখতে পারছে: কুশল

দুহাত কাটা মূর্তির মত পড়ে আছে সেই উদ্ধত নিজের-জোর, শুকনো ছাইয়ের স্তূপের মত একটা জীবনের উপর। সব ভুল, সব মিথ্যা, শুধু এক পরাক্রান্ত আকস্মিকের থামকা ইচ্ছাটাই সত্য। তার করাল ভ্রূকুটি, নির্মম কৌতুক আর বীভৎস হাসিটাই সত্য। সব কল্যাণের চেষ্টা ভুল করিয়ে দেবার জন্য, সব সদিচ্ছাকে মিথ্যা ক'রে দেবার জন্য একটা কালো অভিসন্ধি পৃথিবীর সব আলোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়; মানুষের প্রাণের আশাগুলিকে চূর্ণ করে আর রূপের গায়ে কাদা ছিটিয়ে দেয়। জোড়া লাগাতে লাগাতে আর কাদা মুছতে মুছতে হয়রান হয় মানুষ। আর এই হয়রানিকেই বলে সার্থক জীবন।

উঠে দাঁড়ায় কুশল। চোখের দৃষ্টিতে একটা অস্বাভাবিক রকমের মত্ততা ফুটে ওঠে, যেন আকস্মিকের সব অভিসন্ধিকে পাল্টা বিদ্রূপ ক'রে এই হয়রানির হাজত থেকে ফেরার হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ত্রিযামা রাত্রি শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। কিন্তু এই উৎসবের আলোক জাগিয়ে রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যস্তভাবে হলঘরের ভিতরে ঢুকেই কুশল সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দেয়। পরমুহূর্তে ছুটে বের হয়ে যায় হলঘর ছেড়ে, এবং বের হতে গিয়েই একটা আঘাতে বাধা পেয়ে কপালে হাত চেপে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কৃষ্ণশিলার সেই বীরভদ্র মূর্তির একটি উদ্যত হাতের কঠোর পাথুরে অঙ্কুশে কুশলের কপালের উপর খোঁচা লেগে গিয়েছে। কিন্তু কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, তার পরেই যেন আরও দুর্দান্ত হয়ে, সিঁড়ি ধরে উপরতলায় চলে যায় কুশল। শেষ ক'রে দিতে হবে উৎসব, তাই এ-ঘর থেকে ও-ঘর ছুটাছুটি ক'রে শুধু আলো নিভিয়ে দিতে থাকে কুশল। আর কোন কাজ নেই, শুধু অন্ধকার দিয়ে এই মিথ্যা উৎসবের কপট উজ্জ্বলতা চেপে দিতে হবে, আর কালি দিয়ে লিখতে হবে এই সুসজ্জিত জঞ্জালগুলির রূপতত্ত্বের উপসংহার!

তারপর যা করতে হবে, তাও জানে কুশল। চিরকালের মত উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাবার জন্য একটা আয়োজনের নেশায় প্রমত্ত হয়ে, এঘর থেকে ওঘর শুধু আলো নিভিয়ে ছুটতে থাকে কুশল। পৃথিবীতে কতগুলি ধুকপুক ভীরু নিঃশ্বাসের যন্ত্র মাত্র হয়ে পড়ে থাকবার কোন দরকার নেই। চলে যেতে হবে চিরকালের মত, এই পায়ের চিহ্নটুকুও না রেখে।

গোঁসাইপাড়া থেকে কীর্তন শুনে মিত্রাদেবী ফিরলেন। আনন্দসদনের বাইরের বারান্দায় তখনও কর্পূর খণ্ড জ্বলছে, আর কোন আলোর চিহ্ন

ছিল না কোথাও। বারান্দার কাছে এসে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন মিত্রাদেবী।

রাতের দেবালয়ের মতই দেখাচ্ছিল আনন্দসদনকে ; শান্ত ও সুরভিত, কর্পূরশিখার ক্ষীণালোকে আভাময় হয়ে আছে হলঘরের প্রবেশদ্বার ও বারান্দা।

অম্বিকা মন্দিরের শ্বেত পাথরের সিঁড়িতে মাথা ঠেকানো অভ্যাস আছে মিত্রা দেবীর। আনন্দসদনের এই বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন তিনি। বোধ হয় মনে পড়ে গিয়েছে সেই মানুষটির কথা, এই জীবনে স্বামিরূপে দেখা দিয়ে যে মানুষটি তাঁকে সময় বুঝে সংসার থেকে আলগা হবার আনন্দটুকু বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আজ বিশ্বাস করতে পেরেছেন মিত্রাদেবী, আলগা হবার সুযোগ এসে গিয়েছে। ফুল আর পাতায় সাজানো আনন্দসদনের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, আজ যেন তাঁরই জীবনে সংসারের দায় থেকে আলগা হয়ে যাবার উৎসব। যেন শাঁখ বাজছে তাঁর মনের গভীরে। আনন্দসদনের বারান্দার সিঁড়িতে মাথা ছুঁইয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন মিত্রাদেবী।

আনন্দসদনে শুধু আনন্দ নয়, কি গভীর শান্তি এসে গিয়েছে! উঠে দাঁড়ালেন মিত্রাদেবী। এই তো তাঁর আলগা হয়ে যাবার মুহূর্ত। যারা রইল তারা থাক, শান্তিতে আর আনন্দে। মিত্রাদেবী শুধু তাদের আজ আশীর্বাদ ক'রে সরে যাবেন, এই আলো-ছায়ার জগতের মধ্যেই মনের ব্যাকুলতা দিয়ে তৈরি আলগা একটা জীবনে, যেখানে শুধু নারায়ণ আছেন আর তিনি নিজে আছেন, অন্য কেউ আর নেই।

হলঘরের ভিতরে আর ঢুকলেন না মিত্রাদেবী, কারণ হলঘরে আলো ছিল না, উৎসবের শেষে মূর্তিগুলি যেন এতক্ষণে একটু বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছে। বাগানের ছোট বাঁশের ফটকটা পার হয়ে ঘেসো মাটির সরু পথ ধরে চলে গেলেন মিত্রাদেবী এবং দাঁড়ালেন গিয়ে ভিতরের বারান্দায়। মিত্রাদেবীর কেমন ধারণা ছিল, স্বরূপা এতক্ষণে এসেছে এবং দু'জনকে একসঙ্গে তিনি আজ চোখের সামনে দেখতেও পাবেন। কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে ডাক দিলেন—কুশল।

সাড়া না পেয়ে ডাকলেন—স্বরূপা।

বারান্দার আর এক প্রান্তে গিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন—কুশল।

সাড়া না পেয়ে এসে দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে আবার ডাকলেন।—কুশল।

তবু কোন প্রত্যুত্তরের সাড়া শোনা গেল না। এবং আরও দেখলেন মিত্রাদেবী, দোতলাতে কোন আলোকের সাড়াও নেই, সব আলো নিভে গিয়েছে।

আর একটু প্রতীক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বারান্দার মেজের উপর একটা আসন পাতলেন মিত্রাদেবী। আজ ওদের দু'জনকেই একবার চোখের সামনে না দেখে পুজোর ঘরে যেতে পারছিলেন না। আসুক ওরা, যতক্ষণ না আসে একটু প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। সংসারের মায়াগুলির জন্য এই তো তাঁর শেষবারের প্রতীক্ষা।

কিন্তু আসনের উপর আর বসলেন না মিত্রাদেবী। দেখতে পেলেন, কামরাঙ্গা গাছের মাথায় আলো পড়েছে, কারণ আলো জ্বলছে তারই পাশের ছোট ঘরটার ভিতরে, যেটা আগে ছিল কুশলের থাকবার ঘর, এখন হয়েছে মিউজিয়ামের অফিস ঘর।

এগিয়ে গেলেন মিত্রাদেবী এবং বন্ধ দরজার কাছে এসে ডাক দিলেন—কুশল।

সাড়া পেতে না পেয়ে দরজার কপাটে ঠেলা দিলেন এবং কপাটও খুলে গেল। ঘরের ভিতরে ঢুকে একটু আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মিত্রাদেবী।

টেবিলের উপর একটা খাতা খুলে রেখে আনমনা হয়ে বসেছিল কুশল। মিত্রা দেবী ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু ঘটনাটাকে একবার চোখ তুলেও দেখলো না কুশল।

মিত্রাদেবী খুবই শান্ত ও কোমল কণ্ঠস্বরে ডাকেন—কুশল।

মুখ তুলে মিত্রাদেবীর দিকে তাকায় কুশল, এবং তাকিয়েই থাকে শুধু, কোন কথা বলে না, যেন নিকটের সাড়াশব্দ অনুভব করার মত বোধশক্তি মনের ভিতর এখন আর জেগে নেই, অনেক দূরের একটা অস্পষ্ট দৃশ্যের দিকে লক্ষ্যহীন ভাবে তাকিয়ে আছে।

মিত্রাদেবী বলেন—তোর কপালে কি হলো?

কুশলের অচল বোধশক্তিটা যেন একটা তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের আঘাতে চমকে ওঠে, ছটফট ক'রে ওঠে চোখের দৃষ্টিটাও। মিত্রাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রায় চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে—কি হয়েছে আমার কপালে?

মিত্রাদেবী—কেটে গেছে।

শান্তভাবেই উত্তর দেয় কুশল—ও কিছু নয়, পাথরের একটা খোঁচা লেগেছে।

মিত্রাদেবী—স্বরূপা এখানে আসেনি?

কুশল আবার টেবিলের খাতাটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত বলে—কেন আসবে? তাকে যে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠানো হয়নি।

মিত্রাদেবী হাসেন—স্বরূপাকে আবার কার্ড পাঠাতে হবে কেন?

কুশল—ঠিকই বলেছ। কার্ড পাঠালেও কিছু নয়, না পাঠালেও কিছু আসে যায় না। মোট কথা সে আসবে না।

মিত্রাদেবী বিব্রত বোধ করেন এবং তাঁর মুখের উপর একটা বেদনার ছায়াও যেন চমকে ওঠে।—আজ আবার এসব কি বলছিস তুই ?

কুশল—আজই তো সব বোঝা গেল। সব মিথ্যে, সব ভুল, সব বাজে।

মিত্রাদেবীর কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে ওঠে।—আজকের দিনে এসব কথা বলিস না কুশল, আমাকে ভালয় ভালয় আলগা হতে দে।

কুশল—আজকের দিনটার মধ্যে কি আবার মহত্ত্ব দেখলে তুমি ?

মিত্রাদেবী—আজ আবার শাঁখের শব্দ শুনছি কুশল। তুই বিশ্বাস কর আর না কর, আমার মন বলছে, আজ আমি সব মায়ার দায় থেকে আলগা হয়ে যেতে পারবো।

কুশল—যেমন অদ্ভুত তোমার মন আর মায়ার দায়, তেমনি অদ্ভুত তোমার শাঁখের শব্দ।

মিত্রাদেবী তেমনি শান্ত ও সুস্থির ভাবে দাঁড়িয়ে কুশলের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর প্রশ্ন করলেন—এসব কি বলছিস তুই ?

কুশল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—কোন প্রশ্ন ক'রো না, তা'হলে আমাকেও কিছু বলতে হবে না।

বিচলিত হন মিত্রাদেবী। আবার জিজ্ঞাসা করেন।—কি হয়েছে বল তো ?

কুশল—কিছুই হয়নি। যেখানে সবই মিথ্যা, সেখানে কিছু আবার হয় কি ক'রে ?

মিত্রাদেবী—নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

কুশল—যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। আমারই আলগা হয়ে সরে যাবার সময় হয়েছে।

মিত্রাদেবী—তার মানে ?

কুশল—তার মানে পরের ভাল করবার চেষ্টা যেমন বৃথা, নিজে ভাল হবার চেষ্টাও তেমনি অর্থহীন। কিছুতেই কিছু হয় না। চেষ্টা করতে গিয়ে শুধু কতগুলি উপদ্রব আর বিদ্রূপ সহ্য করবার কোন দরকার নেই।

তবু চমকে ওঠেন না মিত্রাদেবী, আতঙ্কিতও হন না, তেমনি শান্ত স্বরে প্রশ্ন করেন—কে তোকে বিদ্রূপ করেছে, উপদ্রবই বা করলো কে ?

কুশল উত্তর দেয়—তা জানি না। সে'ও তোমার শাঁখের মত অদ্ভুত একটি জিনিস।

এইবার চমকে ওঠেন মিত্রা দেবী। কিন্তু কোন কথা আর বলেন না। শুধু কুশলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে যান।

নতুন ক'রে আবার কলেরার আক্রমণ হয়নি, অন্য কোন শারীরিক অসুখও হয়নি কিন্তু কুশল যেন আবার সংজ্ঞা হারিয়েছে। মূর্ছিত রোগীর প্রলাপের মত কুশলের কথাগুলি। ফিরে এসে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন মিত্রাদেবী, আনন্দমদনের ছেলে আবার জীবনের আনন্দ হারিয়েছে। কে জানে কোন্ অভিমানের অসুখে ওর এত চেষ্টার জীবনটা নির্ভয় আনন্দের এত কাছাকাছি এসেও বার বার ভেঙে পড়ে। এই বার বার ভেঙে-পড়া আর অসুখে-পড়া ছেলের মায়ার জন্যই বার বার ব্যর্থ হয়েছে তাঁরও জীবনের শেষ সাধ; সংসারের দায় থেকে আলগা হবার সুযোগ পেয়েও পাননি।

বাগানের জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মিত্রাদেবীর দু'চোখের উদাস দৃষ্টি একটু বিচলিত হয়ে ওঠে। অনুভব করেন, ইচ্ছা করেই তিনি এতদিন নিজেকে ঠকিয়েছেন। সংসারের মায়াগুলিকে শান্তিতে আর আনন্দে রেখে দিয়ে তারপর আলগা হয়ে যাবেন, ভুল ক'রে এই স্বার্থপর হিসাবের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছেন তিনি। তাই বুঝি নারায়ণ তাঁকে বার বার ঘটনার মধ্যে ঠেলে দিয়ে পরীক্ষা করছেন। তাঁর মায়ার দায়গুলি সুস্থ শান্ত ও সানন্দ হয়ে ওঠে না, এবং তিনিও নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিয়ে আলগা হবার সুযোগ পাচ্ছেন না। ভুল হয়েছে, যার উপর সব ছেড়ে দিয়ে ভাবনাহীন হতে হয়, সংসারের সব মায়ার দায় তারই ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে অনেক আগেই আলগা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। দেরি হয়ে গিয়েছে, নিজেই ভুল ক'রে অনেক দেরি ক'রে দিয়েছেন। এই ভুল আজ ক্ষমা করুন নারায়ণ এবং তিনিও আর কোন ভাবনা করবেন না।

কুশল বলেছে, তা'রও আলগা হয়ে যাবার সময় হয়েছে। এর অর্থ স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারেননি মিত্রা দেবী। বোধ হয় সব ছেড়ে দিয়ে কোথাও চলে যেতে চায় কুশল। যাক, কোন বাধা আর দিতে পারবেন না মিত্রা দেবী। নিজের-ছেলে নামে অবুঝ একটা স্বার্থের সঙ্গে চিরকাল লড়াই করতে পারবেন না। সব ভাবনা থেকে আজ মুক্ত হয়ে যাবেন।

তবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন মিত্রাদেবী। নিজের ছেলের কথা নিয়ে আর ভাবনা নয়, কিন্তু কি আশ্চর্য, একটি পরের মেয়ের কথা না ভেবে পারছিলেন না।

আলগা হয়ে যাবার আগে পুরনো সংসারকে যেন শেষবারের মত ভালবেসে নিলেন মিত্রা দেবী। মনে মনেই আশীর্বাদ করলেন নিজের ছেলেকে আর পরের মেয়েকে। এবং আরও আশ্চর্য, এভাবে শুধু মনে মনে একটি পরের মেয়েকে আশীর্বাদ করতে

গিয়ে তাঁর দু'চোখের দু'টি কোণে জলের বিন্দু ফুটে ওঠে। শেষ মায়া, এবং সব চেয়ে কঠিন বাঁধনটাও বোধ হয় গলে গেল।

বারান্দা থেকে নেমে ঘাসে-ঢাকা মাটির উপর দাঁড়ালেন মিত্রা দেবী। মাথার উপর আকাশের বুক থেকে যেন একটা প্রশান্তির ধারা নেমে আসছে তাঁর সব ভাবনা ডুবিয়ে দেবার জন্য। মনে হয়, এই মুহূর্তে তিনি নিশ্চল হয়ে যাবেন। তাই তাড়াতাড়ি হেঁটে, তুলসীকুঞ্জের পাশ কাটিয়ে ঘরের দিকে চললেন। এখনও যেন পুরনো সংসারের জন্য একটা দায়িত্ব তাঁর আঁচল ধরে রয়েছে। কিছু না ব'লে ক'য়ে শুধু জোর ক'রে আঁচল ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না। তাই ঘরে ঢুকেই একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে থাকেন। পুজোর ঘরে যাবার আগে যেন তাঁর পুরনো সংসারের জন্য শেষবারের মত ব্যস্ত হয়ে নিচ্ছেন মিত্রা দেবী, এবং ভাবনা করার শেষ দায়িত্ব শেষ ক'রে দিচ্ছেন।

আজই, ফুলবাড়ির ছোট বাড়িটার জানালা দিয়ে রক্তকরবীর গায়ে সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো সবে মাত্র যখন ছড়িয়ে পড়েছে, তখন থেকেই রেখা বৌদির গাড়িটাও এখানে এসে আটকা পড়ে গিয়েছে।

রেখা বৌদি যাচ্ছিলেন আনন্দসদনে, নতুন হরভবন মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। যাবার পথে এখানেই এসেছেন আগে, কারণ স্বরূপাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। ক'দিন থেকে দেখতে পেয়েছেন রেখা বৌদি, কে জানে কি হয়েছে, যার জন্য আনন্দসদনের নাম ক'রে কোন আলোচনার মধ্যেই ঘেঁসতে চায় না স্বরূপা। তাই একটা অভিসন্ধি মনের ভিতরে গোপন রেখে আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছেন রেখা বৌদি। কোন মতে স্বরূপাকে আনন্দসদনের উৎসবের মধ্যে আজ নিয়ে গিয়ে ফেলতেই হবে, এবং সবার সামনে যা-ইচ্ছে-তাই হাসিঠাট্টার আক্রমণ চালিয়ে স্বরূপার যত বেয়াড়া জড়তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

কিন্তু রেখা বৌদির সব অভিসন্ধি ভেস্তে গিয়েছে। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত এখানেই আটকা পড়ে আছেন তিনি ও তাঁর গাড়ি, আনন্দসদনের উৎসব দেখতে যাবার সুযোগ আর পেলেন না। কারণ, ফুলবাড়ির সেই ছোট বাড়ির সংসারেও একটা ঘটনা হঠাৎ দেখা দিয়েছে।

অম্বিকা মন্দিরে আজ যেতে পারেননি রাধেশ বাবু। মাত্র বাইরের দাওয়া পর্যন্ত এগিয়েছিলেন, এবং সিঁড়ির একটা মাত্র ধাপ নেমেই বসে পড়লেন, ধড়ফড় ক'রে

উঠলো তাঁর বুকের ভিতরটা। সূর্য তখন সবে মাত্র ডুবেছে, এবং আবছায়াময় হয়ে গিয়েছে সারা ফুলবাড়ি।

স্বরূপা এসে রাধেশ বাবুকে হাত ধরে উঠিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। বিছানার উপর শুয়ে পড়েই বুকে হাত দিতে হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে ফেললেন রাধেশ বাবু।—এতদিনে নোটিস এসে গেল স্বরূপা, এখন তৈরি থাকাই ভাল।

স্বরূপা—এরকম কথা বলতে নেই বাবা। সামান্য একটু শরীর খারাপ হয়েছে, সেরে উঠেই তো আবার মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখবে।

স্বরূপার কথা শেষ হবার আগে, যেন এই কথার মায়া এড়িয়ে যাবার জন্য চোখ বন্ধ করেন রাধেশ বাবু। গভীর নিঃশ্বাসের টানে বুকটা ওঠা নামা করতে থাকে। রাধেশ বাবুর মাথার উপর জোরে পাখার বাতাস দিতে দিতে আর একটা জিনিস দেখতে পায় স্বরূপা, রাধেশবাবুর দু'চোখের কোণে দুটো জলের ফোঁটা চিকচিক করছে।

কিছুক্ষণ মাত্র। তারপরেই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন রাধেশ বাবু। স্বরূপা বলে—দুঃখ করো না বাবা।

স্বরূপার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রাধেশ বাবু, তারপর মুখ ফিরিয়ে যেন প্রদীপটাকে একবার দেখলেন, এবং খোলা জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, সন্ধ্যা-বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে রক্তকরবীর ডালপালাগুলি দুলছে। তারপর হাসি মুখে শান্তভাবে বলতে থাকেন—দুঃখ করবো কেন রে? যা কিছু দেখছি আর শুনছি সবই তো অম্বিকার আরতি।

স্বরূপাকেই যেন পাল্টা সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন রাধেশ বাবু। তারপর থেকে অনেকক্ষণ ধরে একরকম অচেতন হয়েই রইলেন। এরই মধ্যে রেখা বৌদি এসেছেন, শান্তিও এসেছে। রেখা বৌদির গাড়িও ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছে। ওষুধের প্রেসক্রিপসন লেখার পর বিমর্ষভাবে আর একটা কাগজে রোগীর সেবা সম্বন্ধে কতগুলি নির্দেশ এবং রোগীর অবস্থাটাও সংক্ষেপে লিখে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।—হার্টের অবস্থা ভাল নয়, যে-কোন সময়ে ফেল করতে পারে। আজ-কালের মধ্যে যে-কোন মুহূর্তে হতে পারে, আবার অনেক দিন ধরে এই অবস্থাই চলতে পারে, কোন ঠিক নেই। মোট কথা রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে, নড়া-চড়া একেবারেই নয়।

ছুটোছুটি ক'রে ওষুধ পত্র নিয়ে এসে রেখা বৌদির গাড়িটা বাড়ির বাইরে রক্তকরবীর পাশে হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। রাধেশ বাবু

এরই মধ্যে একবার যেন একটু সচেতন হয়েছিলেন এবং একটা ওষুধও তাঁর বুকে মালিশ ক'রে দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকেই ঘুমোচ্ছেন।

রাধেশ বাবুর মাথার কাছে পাখা হাতে বসে থাকে স্বরূপা, এবং বিছানার পাশে মেজের উপর বসে থাকেন রেখা বৌদি, তাঁর পাশে শান্তি। রাতটাও যে কখন এত নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় তিনজনের কেউই ধারণা করতে পারেনি, উঠে যেতেও পারছিল না কেউ।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেন রাধেশ বাবু এবং ওষুধগুলির দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—এসব আবার কি যোগাড় করেছিস স্বরূপা ?

স্বরূপাও হাসিমুখে উত্তর দেয়—আমি করিনি রেখা বৌদি ক'রেছেন।

রাধেশ বাবু—কেন রেখা ?

রেখা বৌদি—ডাক্তার বলেছে, আমি তো ইচ্ছে ক'রে করিনি।

রাধেশবাবু চুপ ক'রে থাকেন। ফুলবাড়ি থেকে অনেক দূরে সরকারি ট্রেজারি ঘরে তখন শান্ত্রীদের ডিউটি বদলের সময় হয়েছে, ঘণ্টা বাজছে সময়ের সঙ্কেত জানিয়ে। মহারাজপুরের রাত্রির বাতাসে ভেসে আসে পর পর ন'টা ঘণ্টার শব্দ।

রাধেশ বাবু—কত রাত হলো ?

স্বরূপা—ন'টা।

রাধেশবাবু ব্যস্ত ভাবে বলেন—তবে এবার তোমরা ওঠ সব্বাই, এভাবে আর বসে থাকতে পারবে না। রেখা মা, তুমি বাড়ি যাও। শান্তি তুই ঘরে গিয়ে গান টান কর। স্বরূপা তুইও ওঠ, ঘরের কাজ-টাজ করগে যা ?

রাধেশবাবু ব্যস্তভাবে তাড়া দিলেও ব্যস্তভাবে উঠতে পারে না কেউ। ওঠবার লক্ষণ কারও আচরণে দেখা যায় না। তিন জনেই যেন সব কাজের তাড়া ভুলে গিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত একটা প্রাণকে নীরব অনুনয়ের মত ঘিরে বসে আছে, না যেতে দেবার জন্য।

রাধেশবাবু তেমনি সহাস্য মুখে অনুরোধ ক'রে বলেন—তোরা এরকম ঘিরে বসে থাকিস না স্বরূপা, এতে আমার অসুবিধে হয়।

উঠে দাঁড়ায় সকলেই। বোধহয় রাধেশবাবুর সহাস্য অনুরোধের সম্মান রক্ষা করার জন্য তিনজনেই হাসিমুখ নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায় এবং বাইরের দাওয়ার উপর এসে দাঁড়াতেই একেবারে হাসিহীন হয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে যেন জোর ক'রে ওরা নিজেদের কোনমতে হাসিয়ে রেখেছিল, রাধেশবাবুর মুখের হাসিটাকে নির্বিঘ্ন করার জন্যই।

বাইরের দাওয়ায় অন্ধকারের ভিতরে এসে দাঁড়াতেই হাসি দিয়ে চাপা মনের বেদনাগুলি ছাড়া পায়, একটা শোকার্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে তিন জনেই দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

—আমি চলি স্বরূপদি, দরকার পড়লেই ডাক দিও আমাকে। বলতে বলতে চলে গেল শান্তি। রেখা বৌদিও যাবেন, কিন্তু যাবার আগে আজ আর কোন কথাই বলতে পারলেন না। শুধু কিছুক্ষণ স্বরূপার গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পরেই দাওয়া থেকে নেমে আস্তে আস্তে হেঁটে তাঁর গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলেন।

রেখা বৌদির গাড়ি চলে যবার পরেও কিছুক্ষণ এই বাইরের দাওয়ার অন্ধকারে চুপ ক'রে বসে থাকে স্বরূপা। মনে হয়, একটা নিস্তরঙ্গ ও শব্দহীন সমুদ্রের কিনারায় সে আজ একা বসে আছে, সব কাজের দায় থেকে ছাড়া পেয়ে। দূরে, নিকটে, অথবা আশে পাশে কেউ নেই। মা-মরা ছোট ছেলের মত অসহায় যে একটা মানুষের প্রাণ এতদিন ধরে তার সব ব্যস্ততার কোলের উপর ভার হয়ে পড়েছিল, সেও আজ চলে যাবে ব'লে বায়না ধরেছে, স্বরূপার প্রতিদিনের সব ব্যস্ততা শূন্য ক'রে দিয়ে, সব উদ্বেগ মিটিয়ে দিয়ে।

তবে আর রইল কি? পৃথিবীতে এসে যদি একটাও মানুষের প্রাণকে আগলে রাখার ভার না থাকে জীবনে, তবে আর কি নিয়ে থাকবে স্বরূপা? এ ছাড়া যে বেঁচে থাকবার আর কোন নিয়ম সে শেখেনি।

কেঁদে ফেলে স্বরূপা। জীবনের সব ব্যর্থ ইচ্ছার অভিমানগুলি যেন একসঙ্গে কেঁদে উঠেছে। সব কাজের দায় থেকে ছাড়া-পাওয়া জীবনের শূন্যতা ফুঁপিয়ে উঠেছে। একা বসে আছে, দেখবার কেউ নেই, তাই যেন নিঃসঙ্কোচে কেঁদে কেঁদে নিজেকে ক্ষয় ক'রে দেবার একটা সুযোগ পেয়েছে স্বরূপা।

জানে না স্বরূপা, এছাড়া আর কিভাবে ক্ষয় ক'রে দিতে হয় নিজেকে। শুধু মিত্রা মাসির কাছে এখনই ছুটে গিয়ে বলা যায়—আমাকেও তোমার পুজোর ঘরে ডেকে নাও মাসিমা। শূন্য হয়ে গিয়েছি, তবে আর কেন? আমাকেও আলগা হতে দাও। সকল ভাগ্যের ওপরে কিংবা ওপারে যে আছে, শুধু তার কাছে পড়ে থাকতে চাই।

শোনা যায়, গান গাইছে শান্তি। ফুলবাড়ির এই বেদনাচ্ছন্ন শুদ্ধতা ভেঙ্গে রাত্রির বাতাসে অদ্ভুত সুর ছড়িয়ে দিয়েছে। এ হরি তুয়া পথ চাই, কিন্তু জনম ভরি ঐ পন্থ নেহারি নয়ন যে অন্ধ ভেল। জীবনে যদি নাই বা এলে, মরণের আগে

একবার এস গো শ্যাম, কারণ, ওমুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি পিবইতে জিউ করে সাধ।

ফুলবাড়ির গলিতে একটা কুঠুরির নিভৃতে বসে গান গায় মহারাজপুরের মুড়িওয়ালি শান্তি, কিন্তু স্বপ্নে-শোনা গানের মতই অবাস্তব ব'লে মনে হয়। নিখিল প্রাণের এক ব্যাকুলতার রাগিনী যেন বাতাসে ভেসে চলেছে। ছুটে চলেছে সব রূপের হাসি-অশ্রু এক চিরন্তন অভিসারের পথে ব্যাকুল হয়ে, যে ব্যাকুলতায় বিরহে ও মিলনে ভেদ ঘুচে যায়, জীবনে ও মরণে কোন ছেদ থাকে না।

শান্ত হয়েই বসে থাকে স্বরূপা। শান্তির গানে যেন একটা চোখ মোছানো সান্ত্বনা আছে। ব্যাকুল হও, নিরন্তর ব্যাকুল হয়ে থাক। শান্তির গানকে ব্যাখ্যা ক'রে এই রকম একটা অর্থ বুঝতেও কোন অসুবিধা হয় না। গোঁসাইপাড়া থেকে কীর্তন শুনে বাড়ি ফিরবার পথে মিত্রামাসির মুখ থেকে শোনা কথাগুলি তো ভুলে যায়নি স্বরূপা। চিরকাল ধরে চাওয়াই তো চিরতরে পাওয়া। ব্যাকুলের জীবনে পেলাম-না বলে কোন দুঃখ থাকে না। মিত্রামাসির শেখানো কথা সেদিন অবিশ্বাস করেনি স্বরূপা, আজও করে না। সেই সব শোনা-কথার শিক্ষার জোরে আজ আরও স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে, এই ব্যাকুলতার জোরেই তো বিজয় মেসোমশাই নিজেকে খালি ক'রে দিয়ে চলে যেতে পেরেছেন, মিত্রামাসি আলগা হয়ে যেতে চাইছেন, আর বাবাও হাসিমুখে তৈরি হয়েছেন চলে যাবার জন্য, ক্ষণকালের মায়ার হাত ছেড়ে দিয়ে চিরক্ষণময়ের কাছে।

কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোন অতি-ধারণার মোহ নেই স্বরূপার মনে। বরং নিজেকেই আজ আরও বেশি স্পষ্ট ক'রে দেখতে আর চিনতে পারছে, ক্ষণকালের মায়াগুলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্যই স্বরূপা নামে একটা মেয়ের জীবন ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। মিত্রামাসির ঐ আলগা হয়ে যাবার ব্যাকুলতা, দিগ্‌বলয়ের জ্যোতিরেখার মত অতি দূরের জিনিস, ঘরের কাজের মায়ায় বাঁধা এই দু'টি মেয়েলি হাতের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ও জিনিসকে দূর থেকে প্রণাম করা যায়, কিন্তু কাছে এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই, সাহস নেই, যোগ্যতাও নেই স্বরূপার। ছুটে গিয়ে মিত্রামাসির পুজোর ঘরে ঢুকলেই বা কি লাভ হবে? পালিয়ে যাওয়াই সার হবে, আলগা হওয়া যাবে না। সেও তো একটা চাপা কান্নার জীবন, জলে ভেসে গিয়ে কূলের দিকে জল-ভরা চোখে তাকিয়ে থাকা।

শান্তির গান থামে, কিন্তু আর এক রকমের শব্দের উল্লাস ফুলবাড়ির নিঃশব্দ রাত্রির বাতাস উচ্চকিত ক'রে এগিয়ে আসতে থাকে। ফুলবাড়ির অবাস্তব বাতাস

হঠাৎ আতঙ্কে বাস্তব হয়ে ওঠে। রাতের পাহারাওয়ালা কয়েকটা মাতালকে রুলের গুঁতো দিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে, গান গাইছে মাতালেরা।

রাস্তার ওপার থেকে মেটে ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শাস্তি ডাক দিয়ে বলে —স্বরূপদি ঘরের ভেতরে গিয়ে বসো।

ঘরের ভিতর চলে যায় স্বরূপা। কাজ খোঁজে। রাধেশ বাবুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে, অঘোরে ঘুমোতে থাকেন রাধেশবাবু। হাতপাখা রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ এঘর আর ওঘর ঘুরে বেড়ায় স্বরূপা, কিন্তু আর কোন কাজ খুঁজে পায় না। তার কাজের সংসারটা হঠাৎ খুবই ছোট হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারের লেখা কাগজটা প্রদীপের সামনে তুলে নিয়ে আর একবার মন দিয়ে পড়বার চেষ্টা করে। না, কোন অস্পষ্টতা নেই, একটিও দুর্বোধ্য কথা লেখেনি ডাক্তার। কোন ঠিক নেই, যে-কোন সময়ে স্বরূপার এই উদ্বেগ-ভরা কাজের আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে।

প্রদীপের কাছ থেকে সরে যায় স্বরূপা। কপাট বন্ধ করার জন্যই বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়, এবং শান্তভাবে আবার পথের অন্ধকারের দিকে ইচ্ছা ক'রে তাকিয়ে থাকে। দেখতে ভাল লাগে চোখের সামনে এই নিশ্চিহ্নতা, আর শুনতে ভাল লাগে এই নিঃশব্দতা। এবং এতক্ষণে মনে পড়ে, এগারো বছরের কামনা দিয়ে গড়া সেই মূর্তিটার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকবার দায়ও ফুরিয়ে গিয়েছে আজ। আজ তার জীবনের সব দিক দিয়েই শূন্য হয়ে যাবার দিন। অনেকক্ষণ ধরে ভুলে থাকলেও, আর একটা ঘটনার কথা এখন আর ভুলে থাকতে পারে না স্বরূপা। ফুলবাড়ির মেয়েকে একেবারে নিষ্প্রয়োজন আর অবাস্তর ক'রে দিয়ে আজই সারাদিন ধরে আনন্দসদনের এক উৎসবের সমারোহের মধ্যে একজনের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হয়েছে।

ভালই হয়েছে। মনের সব শক্তি দিয়ে স্বরূপা আজ এই বিশ্বাসটুকু পেতে চায়, ভালই হয়েছে। সমস্ত মহারাজপুরের মধ্যে একমাত্র স্বরূপাকে বাদ দিয়ে কুশলের জীবনে উৎসব জাগতে পারে, এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে। এখনও স্বরূপার এই চোখে আর মুখে যার ওষ্ঠের উত্তাপ লেগে আছে ব'লে মনে হয়, তারই জীবনের সব আনন্দের তৃষ্ণা আজ ব্যস্ত হয়ে উঠতে পেরেছে, কিন্তু সেজন্য এই চোখমুখের কোন দরকার পড়েনি।

ঘরের দরজা বন্ধ করতে হবে। কারণ, কুশল যে আসবে এমন আশাবিরুদ্ধ কল্পনারও কোন অর্থ হয় না। এই কল্পনা দুর্বল মনের একটা লোভ মাত্র। সে আসবে না, আসতে পারে না। আসবার হ'লে এতক্ষণে নিজেই আসতো, আর ডাকবার হলে ডেকে পাঠাতো। মনে হয়, সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে

এতক্ষণে ; শ্বেত পাথরের শুকতারা এক সুন্দর আবেদনের মূর্তি ধরে কুশলের সম্মুখে এসে উৎসবের আনন্দ পূর্ণ ক'রে দিয়েছে।

জীবনের যে ইচ্ছার ইতিহাস আজ শ্রান্ত হয়ে পথের উপর বসে পড়েছে, তারই চোখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজেকে একেবারে ভিন্ন করে ফেলতে হবে। কিন্তু হাত তুলতে গিয়ে সমস্ত শরীরটাই যেন ভেঙে পড়তে চায়, এবং নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যই এই বিশ্বাসটুকু পেতে চায় স্বরূপা, ভালই হয়েছে।

আজ আর কোন কাজ নেই, শুধু আছে এই দরজা বন্ধ করার কাজ। তারই জন্য শক্তি খুঁজছে স্বরূপা। জীবনের একটা অবুঝ আকুলতার কাহিনীকে সমাপ্ত ক'রে দিতে হবে শান্তভাবে আর ভাল মনে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জয়ী হয়েছে, সুখী হয়েছে কুশল। তাই তো দরজা বন্ধ করার আগে, এই শব্দহীন সমাপ্তির লগ্নে সুখী হতে হবে স্বরূপাকে। এই তো ছিল স্বরূপার অনেক মনের জোরে লালিত একটা সংকল্পের কথা।

কপাটের কাঠে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা, এত বড় সাধের সংকল্পটা যেন সব গর্ব হারিয়ে আজ মাথা ঠুকে বলতে চায়—পারলাম না। ফুলবাড়ির একটি তেইশ বছর বয়সের মেয়ে আজ তার এগারো বছরের ব্যাকুলতাকে জীবন থেকে বিদায় ক'রে দেবার আগে শুধু কেঁদে ফেলতে চায়—পারলাম না সুখী হতে. কিন্তু তুমি সুখী হও।

কপাটের উপর এইভাবে মাথার ভার সঁপে দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল স্বরূপা, তা সে জানে না। শুধু অনুভব করে, ধীরে ধীরে এই নিঃশব্দতার মধ্যে যেন তার সারা জীবনের আকুলতার লয় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠে।

—দিদি!

একটা কণ্ঠস্বর, মানুষেরই সংসারের একটা ডাক। শূন্য হয়ে যাবার এই নিস্তব্ধ ও বেদনাক্রান্ত মুহূর্তগুলিকে চমকে দিয়ে দাওয়ার উপর উঠে আসে একটা লোহা-পেটানো মূর্তি। স্বরূপার হাতের কাছে একটা চিঠি এগিয়ে দেয় বৈজু।

—সব দায় থেকে আমি আজ সরে গেলাম স্বরূপা। যা করবেন নারায়ণ, আমার আর কিছু করবার নেই। কুশলের আজ আবার কি যেন হয়েছে, ঠিক বুঝলাম না। বোধ হয় সব ছেড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। তোমাকে জানানো উচিত মনে করি, তাই জানালাম।—মাসিমা।

মিত্রামাসির হাতে লেখা ছোট একটা চিঠি, কতগুলি অক্ষরে সাজানো একটা সংবাদ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র একটা সংবাদই যেন বিদ্যুৎভরা ঝড়ের আবেগের মত এসে

স্বরূপার মনের ভাবনাগুলিকে এক মুহূর্তে ওলটপালট ক'রে, মৃতপ্রায় সেই ব্যাকুলতারই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আশ্চর্য না হয়ে পারে না স্বরূপা। সব ছেড়ে দিয়ে আজ কোথাও চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে কুশল, এ আবার কেমন প্রতিষ্ঠার উৎসব? আবার যেন কি হয়েছে, যা মিত্রামাসিও বুঝতে পারছেন না। ক্ষতি হয়েছে? সুখী হতে পারলো না? কেউ ভয়ানক ভাবে ঠকিয়েছে? আঘাত পেয়েছে? কে জানে কি হয়েছে, যার জন্য উৎসব ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে কুশলের, নইলে কোথাও চলে যাবার জন্য সে আজ তৈরি হবে কেন?

চিঠিটা শক্ত ক'রে মুঠোর ভিতর চেপে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা, ইটবাবুর মেয়ে স্বরূপা। বড় বেশি শক্ত হয়ে ওঠে আশৈশব শান্ত দুটি চোখের ভুরু। চেষ্টা করার ভয় আর লজ্জা থেকে চিরকাল সরে-থাকা ফুলবাড়ির যে মেয়ের চেহারা আর মনটা বড় বেশি নরম-সরম বলে কতবার ঠাট্টা করেছেন রেখা বৌদি, সে মেয়েকে এখন দেখতে পেলে আশ্চর্য হয়ে যেতেন তিনি। দাঁতে-দাঁত-চাপা কি-কঠিন প্রতিজ্ঞা আর মরণপণ জেদ নিয়ে লড়বার জন্য সে মেয়েই আজ প্রস্তুত হয়েছে।

কার সাধ্য তার ক্ষতি করে? যার সুখের জন্য ফুলবাড়ির রক্তকরবী বহু নিষ্ফল ফাল্গুন সহ্য করেছে, এবং আজও সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সে আজ সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে কোন্ দুঃখে, এবং এমন ঘটনা সহ্য করবে স্বরূপা কোন্ সুখে?

—শান্তিদি! চেঁচিয়ে ডাক দেয় স্বরূপা।

—বল স্বরূপদি। ডাক শোনা মাত্র সাড়া দিয়ে রাস্তার ওপারে মেটে ঘরের কপাটে শিকল টেনে দিয়ে শান্তি ব্যস্তভাবে এসে দাওয়ার উপর ওঠে।

—তুমি এখানে বসো শান্তিদি, আমি মাসিমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে স্বরূপা। কপালের উপর একটা কাটা দাগ, মুখটা রোদে পোড়া মানুষের মুখের মত এবং চোখ দুটো শোকার্ত মানুষের চোখের মত করুণ অথচ উদাস, কুশল বসে আছে টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে, সামনে একটা লেখার খাতা খোলা পড়ে আছে।

দুরন্ত ঝড়ে ছিটকে পড়া ফুলের মত সবেগে ঘরের ভিতর ঢোকে স্বরূপা। কুশলের কপালের ক্ষত একহাতে চেপে, কুশলের চোখের একেবারে কাছে চোখ নিয়ে প্রশ্ন করে স্বরূপা—কি হয়েছে?

নিতান্তই অতর্কিত আক্রমণ এবং প্রশ্নটাও যেন সেই বিদ্রূপের একটা ছদ্মবেশী অট্টহাস্য। যে প্রশ্নের নাগাল থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে

কুশল, সেই প্রশ্নটাই অত্যদ্ভুত হৃদয়হীনতার আনন্দে যেন এই রাত্রির সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এসেছে গুপ্তঘাতকের মত, কুশলের এই উদ্দেশ্যহীন হয়ে সরে যাবার চেষ্টাটুকুর পিঠে ছুরি বসাবার জন্য।

স্বরূপার হাতটাকে একটি সবল অথচ মৃদু টানে কপালের উপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয় কুশল। কিন্তু তার জন্য ফুলবাড়ির মেয়ের চোখে এক বিন্দু অভিমানের বেদনা ফুটে ওঠে না। দু'চোখের শান্ত দৃষ্টি দিয়ে কুশলের আচরণে এই কঠিন নূতনতাটুকু লক্ষ্য করে স্বরূপা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কুশল এবং সরে গিয়ে জানালার কাছে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চল হয়ে থাকে না স্বরূপাও, বরং অক্লেশে এগিয়ে এসে কুশলের চোখের সামনে চোখ তুলে দাঁড়ায়। তেমনই স্পষ্ট ও অবিচলিত স্বরে আবার প্রশ্ন করে—কি হয়েছে, বল।

একটা ভ্রূকুঞ্চিত বিরক্তির ভাব জেগে ওঠে কুশলের মুখের উপর। না ডাকতেও আসে, সরিয়ে দিলেও সরে যায় না, কোন অপমান গায়ে মাখে না—কোথা থেকে অদ্ভুত একটা বেহায়াপনা দিয়ে চোখ-মুখ কঠিন ক'রে কুশলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে স্বরূপা। ফুলবাড়ির গলির ধারে নগণ্য একটা বাড়ির মেয়ে, যে-বাড়ির চালা ভাঙা, দেয়ালগুলি মাটির, আর কপাটের কাঠগুলিতেও ফাটল ধরে গিয়েছে, সেই বাড়ির মেয়ে। মুড়ি-ভাজা আগুনের আঁচ সহ্য ক'রে যার দিন চলে, সেই নিতান্ত গতর-খাটা একটা মেয়ে। কিন্তু কোন্ সাহসে আর কিসের জোরে আজ এত শক্ত হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে? কুশলের তো সবই শূন্য হয়ে আর ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওর কি আছে?

কুশল বলে—তুমি এখন যেতে পার স্বরূপা।

স্বরূপা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—না, পারি না।

বোধ হয় স্বরূপার এই বেপরোয়া ঔদ্ধত্যের রহস্যটুকু বোঝবার জন্যই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে কুশল। আশ্চর্য! বিজয়িনীর মত ভঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ফুলবাড়ির সেই মেয়ে, তার এগারো বছর ধরে পোষা একটা জেদের অহংকার নিয়ে। এই মেয়ে বোধ হয় এখনও বিশ্বাস করে যে ভালবাসার জয় হয়, ভাল ইচ্ছা সফল হয় এবং ভাল চেষ্টা ব্যর্থ হয় না। কিন্তু জানে না, ও যে আকস্মিকের হাতে অকারণে চূর্ণ হবার জন্য তৈরি একটা খেলনা মাত্র। ওর যত দুঃখ ধৈর্য আর কামনার সব সম্মান যে বিনাদোষে অনর্থক হয়ে গিয়েছে। ও'কে যে ওরই স্বপ্নভরা ঘুমের মধ্যে খুন ক'রে দিয়ে গিয়েছে এক ভয়ানক ভাগ্যঘাতক, সেই উপলব্ধি ওর নেই। থাকলে

আজ আর এই কঠিন ভঙ্গী নিয়ে, একটা মিথ্যার সঙ্গে চলাচলি করার জন্য ছুটে আসতো না।

শান্তভাবেই কুশল বলে—তুমি ভুল করছো স্বরূপা।

স্বরূপা—ভুল ভেঙে দাও। তুমিই না বলেছিলে যে, একদিন আমার ভুল ভেঙ্গে দেবে?

মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকায় কুশল। স্বরূপার কথাগুলির ভিতর থেকে একটা দুঃসহ প্রদাহ হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠে এসে যেন কুশলের চোখের উপর লেগেছে। মরবার সময় পাওনাদারের তাগিদের মতই শুনতে কী নিষ্ঠুর এই স্মরণ করিয়ে দেওয়া অতীতের অঙ্গীকার! কুশলের প্রতিজ্ঞা-হারানো জীবনের টাটকা ক্ষত খুঁচিয়ে দিয়েছে স্বরূপা।

আনন্দসদনের ফটকের বাইরে সড়কের উপর একটা রাতভিখারির বিলাপ শোনা যায়। ঘুমিয়ে পড়ার আগে ভুখ্‌খা'কে এক মুঠো ছাতু দান করার জন্য যত ভাগ্যবানের কাছে আবেদন জানিয়ে এবং বিনিময়ে অনন্ত পুণ্যের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা ক'রে চলে যাচ্ছে রাতভিখারি। বঞ্চনার ক্রীতদাস এই মানুষের জীবনের সব পরিহাস বড় সোজা ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছে ঐ নিশাচর লোভী ভিক্ষুকটা।

স্বরূপার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায় কুশল। হ্যাঁ, ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে। ভুল ভেঙ্গে না দিলে এ মেয়ের গর্ব ভাঙবে না। ও নিজেও মুক্তি পাবে না এবং কুশলের মুক্তির পথও রুদ্ধ ক'রে রাখবে। এগারো বছর ধরে ভালবাসার নিষ্ঠা আর গর্ব দিয়ে তৈরি, যেন ব্রঞ্জের চেয়েও বেশি কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরি একটা মূর্তি আজ কুশলের পরাভূত জীবনের কাছে অবিকার স্পর্ধার সুরে কৈফিয়ৎ চাইছে। এই মূর্তিকে চূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে কুশল—কি হয়েছে জান না?

—না।

—কি হতে পারে, জান?

—না।

—নবলার বিয়ে হয়ে গেছে।

—কবে?

—আজ, এই কিছুক্ষণ আগে।

—ভালই হয়েছে।

—না, ভাল হয়নি।

—কেন?

—যে অপমানের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে আমার কাছে আসতে চেয়েছিল নবলা, আজ পিয়ানো বাজিয়ে সেই অপমানকেই বরণ করেছে।

—তাহ'লে তুমি আর কি করতে পার?

—না, কিছুই পারলাম না, কিন্তু সহ্য করতে পারছি না।

—সহ্য করতে হবে, তাছাড়া আর উপায় কি বল?

—কি ক'রে সহ্য করবো?

—চেয়েছিলে নবলার ভাল হোক, চিরকাল নবলার জন্যে সেই ভাল কামনাই করবে।

—তা'তে কি লাভ?

—তা'তে নবলা রইল তোমার জীবনে।

—কল্পনার মত?

—সান্ত্বনার মত।

—এমন সান্ত্বনা পেয়েই বা কি হবে?

—তুমি সুখী হবে।

নিজের হাতের লাঠিটা যেন নিজেরই কপালের উপর পড়েছে, চিৎকার ক'রে ওঠে কুশল—আমি সুখী হ'লে তোমার কি লাভ?

স্বরূপা হেসে ফেলে—আমার একটা ইচ্ছা সত্য হলো, এই লাভ।

কুশল—কিন্তু তুমি সুখী হবে কি?

স্বরূপা হাসিমুখেই বলে—এ প্রশ্ন ক'রো না।

কুশল—জানি, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তুমি যে ব্যর্থ হয়েছ, এই সত্যটুকু স্বীকার করার সাহস নেই তোমার।

স্বরূপা—কি দেখে তোমার এমন ধারণা হলো?

কুশল—আমাকে ঘেন্না করার শক্তি পর্যন্ত তোমার নেই।

স্বরূপা—তাই তো প্রমাণ, আমি একটুও ব্যর্থ হইনি।

একেবারে স্তব্ধ হয়ে, নীরবে, দু'চোখের তারা স্থির ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল। ফুলবাড়ির মেয়ের কঠিন মূর্তি চূর্ণ হয় না, যদিও যতদূর কঠোর আঘাত দেবার ছিল, দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বরং কুশলই যেন আঘাত দিয়ে মূর্তি ভাঙতে গিয়ে বৃথা পরিশ্রমের ভারে হাঁপাতে শুরু করেছে। যেন ভাষা হারিয়ে ক্ষণিকের মত বোবা হয়ে গিয়েছে কুশল। স্বরূপার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখতে থাকে, সত্যিই ব্রজের

চেয়েও কঠিন একটা মূর্তি, একেবারে নতুন মূর্তি, এবং এই মূর্তির সঙ্গে কোনদিন কুশলের পরিচয় ছিল না।

সত্যিই পরিশ্রান্ত মানুষের মত দেহের অবসাদের ঘোরে আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে কুশল। স্বরূপা বলে—দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, তুমি বসো।

কষ্ট না হোক, অস্বস্তি যে হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই, এবং আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না ক'রে জানালার কাছ থেকে সরে এসে আবার চেয়ারের উপরে শান্তভাবে বসে কুশল। তার পরেই, হঠাৎ বেদনাকাতর রোগীর মত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—তুমি আমার কষ্ট বুঝতে পেরেছ?

স্বরূপা—পেরেছি বৈকি।

কুশল—কেমন ক'রে বুঝলে?

স্বরূপা—তোমার চোখ দেখে।

কুশল—কি দেখলে আমার চোখে?

স্বরূপা—এখন নেই, মুছে ফেলেছ।

যেমন হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছিল কুশল, তেমনি হঠাৎ চুপ ক'রে যায়, আর কোন প্রশ্ন করে না।

স্বরূপা বলে—কিসের জন্যে এবং কার জন্যে, তা'ও বলতে পারি।

চোখ নামায় কুশল, কিন্তু মুখ লুকোবার চেষ্টা করে না। কি হবে আর লুকিয়ে সে ভুলের চিহ্ন, যা মুছে ফেললেও ধরা পড়ে যায়। নিখুঁত হবার সাধ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, দাগ মেটাতে গিয়ে ক্ষত হয়ে গিয়েছে; সেই উদ্ধত আত্মবিশ্বাসের ব্যর্থতা নিজের অপরাধের জ্বালায় অস্থির হয়ে নিজেই মুখর হয়ে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে।

বাইরের পথের দিক থেকে রাতভিখারিরি বিলাপ আর শোনা যায় না, অনেক দূরে চলে গিয়েছে। কুশলের মনের ভিতরে এতক্ষণের অস্থির আর্তনাদও যেন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। পরিশ্রান্ত হ'লেও চোখে-মুখে সেই বিসদৃশ উগ্রতাটুকু আর ছিল না। বিষাক্ত ফোঁড়াকে দেহ থেকে উপড়ে ফেলার মত সেই জ্বালার ইতিহাসকে গোপনতা থেকে বাইরে টেনে এনে প্রকট ক'রে দিয়ে যেন এতক্ষণে একটু দুর্ভারমুক্ত হতে পেরেছে কুশল।

কুশল বলে—এ ভুল করতে আমি চাইনি স্বরূপা।

স্বরূপা—ভুল করেছ কিনা জানি না, তবে অন্যায় একটুও করনি।

কুশল—তুমি আমাকে মিথ্যে বোঝাবার চেষ্টা করো না।

স্বরূপা—একটুও মিথ্যে বোঝাতে চাই না তোমাকে।

কুশল—সত্যি বলছো, আমার অন্যায় হয়নি ?

স্বরূপা—অন্যায় হয়নি।

কুশল—নবলার একটা চিঠিকে বিশ্বাস করার জন্যে যার মন লোভে ভরে ওঠে আর চোখে জল দেখা দেয়, তাকে তুমি কি মনে কর স্বরূপা ?

স্বরূপা—যা'কে ভালবাসা উচিত, তাকে সে ভালবাসতে জানে। মহৎ তার মন, আর প্রাণটা মমতায় ভরা। এমন যদি না হতো তাহলে···।

কুশল—তাহ'লে কি হতো ?

স্বরূপা—তাহ'লে আমি আশ্চর্য হতাম, ভয় পেতাম, আর মনে হতো তুমি ঠিক তুমি নও।

স্বচ্ছন্দ ও প্রসন্ন স্বরে কথাগুলি বলতে পারে স্বরূপা, বলার আগে একটুও চিন্তা করতে হয় না। বোধহয় এসব প্রশ্নের বিচার অনেকদিন আগেই মনে মনে ক'রে রেখেছিল স্বরূপা, তাই উত্তরগুলি যেন মুখস্থ হয়ে আছে।

জানালার কাছ থেকে তেমনি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়ায় স্বরূপা। কুশলের লেখার খাতাটা হাতে তুলে নিয়ে শান্তভাবে পাতা উলটাতে থাকে।

স্বরূপার কথাগুলি যেন স্নিগ্ধ আশ্বাসের ধারার মত কুশলের কুণ্ঠিত মনের সব দীনতার ধুলো ধুইয়ে দিয়েছে। কথাগুলির মধ্যে যেন প্লাবনের মত একটা টান আছে, কুশলকেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তবুও যেন একটা পাথর আঁকড়ে সাবধান হয়ে থাকতে চায় কুশল। ভুল হলেও অন্যায় হয়নি, স্বরূপার মত ভাগ্যহত মেয়ের মুখে উচ্চারিত এই আশ্বাসের শক্তিই বা কতটুকু ? আকস্মিকের ভয়ানক কৌতুকের আঘাত হতে এই আশ্বাসেরও যে নিস্তার নেই। আবার নতুন ক'রে ভুল হবে, ক্ষত হবে, জ্বালা লাগবে জীবনে। এই আশ্বাসগুলিই তো পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর ছলনা। মুগ্ধ ক'রে মাতিয়ে তোলে, যুদ্ধের ঘোড়া যেমন দামামার শব্দে মেতে উঠে কামানের মুখে ছুটে যায়, কিন্তু বুঝতে পারে না যে, ওটা মরণের মুখে এগিয়ে যাবার মাতন মাত্র। যেখানে চেষ্টা করলে, ইচ্ছা করলে, ভালবাসলে আর ভাল হ'লেও কিছুই হয় না, যেখানে শুধু মানুষকে ভেঙে দেবার জন্যই একটা অকারণ পরাক্রম দিনরাত্রির মুহূর্তগুলির উপর পাহারা রেখে জেগে আছে, সেখানে আশ্বস্ত হ'য়ে থাকার অর্থ মদখেকো যক্ষ্মারোগীর মত ভুয়া প্রাণের ফুর্তিতে মাতাল হয়ে থাকা। স্বরূপা নামে ফুলবাড়ির এই মেয়ের কথাগুলি তবু বিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করা যায়না সেই ভয়ানক দৈবের অকারণ বিদ্রূপের···।

একটা কাগজ ছেঁড়ার ফর ফর শব্দে চমকে উঠে টেবিলের উপর খাতাটার দিকে তাকায় কুশল। এক টান দিয়ে কুশলের লেখার শেষ পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে স্বরূপা। মেজের উপর ছড়ানো ছেঁড়া কাগজের কুচিগুলির দিকে অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে থাকে কুশল।

"দেখতে সুন্দর হতে পারে, কিন্তু সত্য বলে কিছু নেই এই পৃথিবীর কোন রূপের মধ্যে, শুধু মিথ্যা হয়ে যাওয়াই বোধ হয় একমাত্র সত্য। কল্লোলিতকান্তি গঙ্গার চোখে ঐ প্রতীক্ষার দৃষ্টি নিতান্ত মিথ্যা, কারণ, অনন্তকালের কোন লগ্নে তার গঙ্গাধর যে কখনও আসবে এমন নিশ্চয় নেই। নাগের আলিঙ্গনে আবদ্ধ নায়িকামূর্তির চোখে ঐ উদ্ধারের আকুলতা মিথ্যা, সত্য শুধু তার আত্মসমর্পণের গোপন ইচ্ছার পুলক। ভূমিদেবীর চোখে যে দৃষ্টিকে সহাস্যসুন্দর ব'লে মনে হয়, আসলে ওটা তো একটা শক্তিহীন প্রাণের বেদনাবিমূঢ় দৃষ্টি। যে জিনিষ যা নয়, তাকে তাই দিয়ে সাজিয়ে রাখা আর সেজে থাকাই হলো এই জগতের বিচিত্র রূপতত্ত্ব। হাসিগুলি চোখের জলের মত সেজে, আর চোখের জলগুলি যত হাসির মত সেজে বসে আছে। অথচ এই রূপগুলিকেই কত চেষ্টায় ভালবাসতে আর আপন করতে চায় মানুষ, আশ্চর্য! অদ্ভুত এই চেষ্টার নেশা, সাধ ক'রে শুধু ধ্বংসলাভ করার জন্য এক ভয়ানক দৈবের বিদ্রূপ আহ্বান করা। কোন অর্থ হয় না। জীবনের সব অন্বেষণের মধ্যে চেষ্টাই হলো মিথ্যার ছলনা, সত্য শুধু পথ হারিয়ে যাওয়া।" দেখতে পায় কুশল, কালি দিয়ে লেখা রূপতত্ত্বের এই উপসংহার ছিন্নভিন্ন হয়ে, যেন সব তাৎপর্য হারিয়ে, ঘরের মেজের উপর আবর্জনার মত ছড়িয়ে রয়েছে।

কুশল বিব্রতভাবে বলে—ও কি করলে?

স্বরূপা—এত মিথ্যে কথা লিখেছ কেন?

—মিথ্যে?

—নিশ্চয়, ওর সবই মিথ্যে।

—মিথ্যে নয় এমন একটা কিছুর প্রমাণ দেখাতে পার?

—পারি।

—কি?

—আমি তোমাকে ভালবেসেছি, মিথ্যে নয়।

—এখন যা বললে, চিরকাল সেকথা বলতে পারবে?

—আমি তো প্রতিজ্ঞা ক'রে কথা বলি না কুশল।

—তার মানে?

—প্রতিজ্ঞা ক'রে সংসারের ওপর জোর দেখাতে পারি না আমি।

—কেন পার না?

—কোন অর্থ হয় না।

—তাহ'লে সার্থকটা কি?

—সার্থক হলো নির্ভর ক'রে থাকা।

—কার ওপর নির্ভর?

—তোমার আমার সব চেষ্টা প্রতিজ্ঞা আর ইচ্ছার ওপরে যার ইচ্ছা রয়েছে তার ওপর।

—তাতে লাভ?

—তাতে আশা ভেঙে গেলেও জীবন ভেঙে পড়ে না। চেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও নিজেকে ব্যর্থ মনে হয় না।

—তবে কি মনেহয়?

—মনে হয়, যা হয় সবই ভালর জন্যে হয়। ভাল করার দায় রয়েছে যার ওপর, তারই ইচ্ছের জয় হয়ে চলেছে।

—ভাল কাজের ইচ্ছে আর চেষ্টা ব্যর্থ হলেও ভালই হয়, এর চেয়ে বেশি অর্থহীন কথা আর কিছু হতে পারে না স্বরূপা।

—কি ভাল আর কি মন্দ, সেটা তোমার আমার পক্ষে একেবারে নির্ভুল ভাবে বুঝে উঠবার শক্তি নেই কুশল। তাই নিজের ভাল ব্যর্থ হলেই ভাবি, বুঝি সংসারের ভাল ব্যর্থ হলো।

—তা'হলে কোন ভাল ইচ্ছে না করা আর কোন কিছু ভালর জন্যে চেষ্টা না করাই সব চেয়ে ভাল কাজ।

—সব চেয়ে খারাপ কাজ।

—তবে কিসের জোরে মানুষ চেষ্টা করবে বল?

—নির্ভরের জোরে, সব ভালর দায় সবার ওপরের জোরটির ওপর ছেড়ে দিয়ে।

—সব চেয়ে বড় বিদ্রূপের ওপর?

—সব চেয়ে বড় মমতার ওপর।

—অসহায়ের মত?

—আপনজনের মত।

—একি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

—সম্ভব কিনা, তা কি আমার মত মূর্খ তোমাকে আজ বুঝিয়ে দেবে? আনন্দ-সদনের ছেলে কি দেখেনি সে মানুষকে?

—কার কথা বলছো স্বরূপা?

—আনন্দসদনের বিজয় ইঞ্জিনিয়ারকে মনে পড়ে না?

চুপ ক'রে থাকে কুশল। কোন উত্তর দেয় না। আনন্দসদনের এই ঘরেরই ভিতরে একটি বছর আগেও বিজয় ইঞ্জিনিয়ার নামে যে জীবন্ত বিস্ময় ঘুরে বেড়াতো, তাকে কুশলের আজ মনে পড়ে। শুধু আজ কেন, অনেকবারই তো মনে পড়েছে। মৃত্যুকেও বন্ধুর মত হাত ধরে আনন্দ ক'রে চলে যেতে পারে, সেই নির্ভয় নির্বিকার ও সারা জীবন সোজা-হয়ে-চলা একটি উদাত্ত জীবনের কথা মনে পড়ে বৈকি।

স্বরূপা—তুমি জান কুশল, আমি কার কাছ থেকে শেখা কথা আজ কা'কে বলছি। আমার মুখের কথা বুঝতে বলছি না তোমাকে। তোমার স্বচক্ষে দেখা সেই মানুষটিকে, তুমি যাঁর ছেলে তাঁকেই আজ বুঝতে চেষ্টা কর, তা'হলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

মিথ্যা বলেনি স্বরূপা। বিজয় ইঞ্জিনিয়ার নামে আনন্দসদনের বিস্ময়কে শুধু এক অসাধারণ বিস্ময় বলে জেনেছে কুশল, কিন্তু বুঝতে ভুলে গিয়েছে। পাথর নয়, ছায়া নয়, অপার্থিব কিছু নয়, রক্তমাংস দিয়ে তৈরি একটি মানুষেরই যে-মূর্তিকে এই বাড়ির বারান্দায় ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে থাকতে দেখেছে কুশল, তারই জীবনের উদাত্ত রূপের তত্ত্ব-সন্ধান নিয়ে আর রিসার্চ ক'রে আবিষ্কারের কথা কোন দিনও যে মনে পড়েনি।

তুলসীর মঞ্জরী ঝরিয়ে দিয়ে বাগানের দিক থেকে একটা উতলা বাতাস জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর এসে কিছুক্ষণ হুটোপুটি ক'রে চলে যায়। মনে পড়ে, বেশি দিনের কথা তো নয়, তুলসীবনের কাছে ঐ ঘাসের উপরে যেন এক বিস্ময়ের শিল্পী ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন সেদিন। কি আনন্দ ছিল তাঁর চোখে? কি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি?

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে কুশল। যেন বহু দূরের কোন দৃশ্যের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে, যেন তার নিজেরই মূর্তিকে চক্ষুদান করছে কুশল। ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে সূর্যোদয় দেখতে-পাওয়া মানুষের মুখের মত কুশলের মুখেও অদ্ভুত এক তৃপ্তির আভা। যেন নিরেট প্রাচীরের একটা জায়গায় পাথর খসে পড়ে একটু ফাঁক হয়েছে, এবং আভাসে সবেমাত্র একটু দেখতে পেয়েছে কুশল, আকাশের মতই পরম শান্ত ও প্রসন্ন এক বিরাটের হাতে সব নির্ভর ছেড়ে দিয়ে রূপময় হয়ে আছে চরাচরের জীবন।

আস্তে আস্তে কুশলের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় স্বরূপা এবং সুগভীর আবেদনের মত কোমল স্বরে বলে—বিশ্বাস কর কুশল ?

কুশল—কি বললে ?

স্বরূপা—তোমার জীবনের এমন সুন্দর প্রতিষ্ঠা দিনের সব আনন্দ সত্য হবে, শুধু বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস কর! একটা মাঙ্গলিক বাণী ধ্বনিত হয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি কুশলের সকল অনুভবের উপর যেন সঙ্গীত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হয়, উৎসবের দীপালি এতক্ষণে জ্বলে উঠলো চারদিকে, তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কুশল, জীবনের সব চেয়ে বড় দীক্ষা নেবার জন্য। তার সুশিক্ষিত মন বুদ্ধি আর অভিরুচির উপরে একটা অতি কঠিন অশিক্ষার আবরণ ছিল, ভাঙছে বুঝি সেই আবরণ। জীবনের চেষ্টাকে শক্তি দেবার মত অনেক সম্বল থেকেও শুধু আসলটাই যেন ছিল না। বিশ্বাসহীন জীবন তাই বার বার ভেঙেছে, আর্তনাদ করেছে, আর বিরাট করুণাকে বিরাট বিদ্রূপ ব'লে সন্দেহ করেছে। বিদ্রোহও করেছে, মায়ের কোলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ক্ষুব্ধ শিশু যেমন লোক হাসায়, আর সবচেয়ে বেশি হাসায় মা'কে।

—আমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছি স্বরূপা।

খুবই শান্তস্বরে এবং আস্তে আস্তে বলে কুশল। মনটা যেন গভীর শান্তির অভিষেক পেয়েছে, চোখের দৃষ্টিটা বহু ছুটোছুটি আর হয়রানির পর পথ খুঁজে পেয়েছে, এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাসের স্পন্দন, এতদিনে এবং এতক্ষণে। যাবজ্জীবন মেয়াদের বন্দী হঠাৎ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে এসে পুরনো মাঠঘাট এবং গাছপালাকেই যেমন নতুন চোখে দেখে আর বিস্মিত হয়, মহারাজপুরের এই অতি পরিচিত একটি ফাল্গুনরাত্রির রূপ হঠাৎ তেমনি নতুন হয়ে গিয়েছে কুশলের দু'টি বিস্মিত চোখের নতুন দৃষ্টির কাছে।

ঘরের ভিতরেই ধীরে ধীরে পায়চারি ক'রে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায় কুশল। ছিন্ন উপসংহারের কুচি কুচি কাগজগুলি বাতাসের একটা দমকা দাপটে সারা ঘরে আরও এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

পায়চারি থামিয়ে টেবিলের উপরেই আধ-বসা ভঙ্গীতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুশল। এবং দেখতে পায়, স্বরূপা দাঁড়িয়ে আছে আনমনা ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে। চুলগুলি উসকো খুসকো, শাড়িটা অগোছালভাবে পরা, এবং আঁচলটা আলগাভাবে কাঁধের উপর ফেলা, যেন একটা ঝড়ের মধ্যে পথ হেঁটে এসেছে স্বরূপা, বিস্রস্ত ও ক্লান্ত এক নারীর মূর্তি। চোখগুলিও ফোলা ফোলা, এবং মুখটা যেন

অনেকক্ষণ ধ'রে কিসের তাপ লেগে শুকিয়েছে। কঠিন মূর্তি তো নয়, সারাদিনের রোদে নেতিয়ে পড়া কোমলদল ফুলের মতই করুণ একটা চেহারা। দেখতে দেখতে মেঘের ছায়ার মত একটা মমতার আবেশে নিবিড় হয়ে ওঠে কুশলের চোখ। সাগ্রহে অনুরোধের সুরে বলে—তুমি এবার একটু বসো স্বরূপা।

অনুরোধের উত্তরে হেসে ফেলে স্বরূপা। একটা চেয়ার ছুঁয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু বসে না। হাসিমুখেই বলে—আর আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না।

—কোন তর্কের আর দরকার নেই স্বরূপা।

—একটি কথা শুধু জানবার দরকার আছে।

—বল।

—আজকের মত তোমার কাজ তো একরকম শেষ হয়েছে, কাল কি করবে ?

—কাল একবার যেতে হবে হরভবনের স্তূপটা দেখতে, কারণ জায়গাটার ম্যাপ নতুন ক'রে তৈরি করবার দরকার হয়েছে।

—তারপর ?

—তারপর যাব একবার শিলোড়া ঘাটের জমিদার লালাবাবুর কাছে।

—কেন ?

—বড়বড় পাথর দিয়ে ঘেরা বহু পুরনো কালের মানুষের একটা আড্ডার জায়গা এখনও রয়েছে শিলোড়া ঘাটে। ঐ জায়গাটা আদায় করতে হবে লালাবাবুর কাছ থেকে।

—কি আছে ওখানে?

—কুশের বন।

—তুমি কি করবে কুশ দিয়ে ?

—কিছুই না! আমি শুধু জায়গাটাকে এখানে ওখানে একটু খুঁড়ে দেখবো, পুরনো ইতিহাসের কোন জিনিস যদি পাওয়া যায়। তা ছাড়া, জঙ্গলের মানুষগুলির জন্য ঠিক ঐ জায়গাতেই একটা সদাব্রত করবার মতলব আছে।

—তারপর ?

—আরও কত কিছুই তো করবার আছে। হরভবন স্তূপের অন্তত একটা ট্রেঞ্চের মাটি তোলার জন্য কিছু লোক লাগাতে হবে।

—তার ব্যবস্থা হয়েছে ?

—কিছুই হয়নি। টাকা যোগাড় করা চাই, লোক যোগাড়ও করা চাই। বেচারা গঙ্গাধরকে খুঁজে বের করতে তো হবে। একটু জোর দিয়ে কাজে না লাগলে হবে কি ক'রে ?

হেসে হেসেই তার কাজের উৎসাহ আর পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করে কুশল। বর্ণনা হয়তো এখানেই থামতো না, কিন্তু স্বরূপা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এবার আমি যাই।

অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে কুশল বলে—এখুনি যাবে? আমার মিউজিয়াম দেখবে না স্বরূপা?

উত্তর দিতে পারে না স্বরূপা। মাথা হেঁট ক'রে, বোধ হয় মুখ আড়াল করবার জন্যই ঘরের মেজের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। এত হঠাৎ একথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না স্বরূপা। আজকের সমস্ত ঘটনার দ্বন্দ্ব-তর্কের অবসানের পর, এই সুন্দর ও শান্ত উপসংহারের মধ্যে এই অনুরোধ যে একেবারেই অবান্তর। বুঝতে পারে স্বরূপা, আর বেশিক্ষণ এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্য তার নেই। এতক্ষণের ভুলে-থাকা ক্লান্তিটা এববার যেন সুযোগ পেয়ে বুকের পুরনো ব্যাধির মত ধীরে ধীরে বেদনা ছড়াতে আরম্ভ করেছে। অভিনয়ের ভাড়াটে নটীর মত ঘরোয়া শোকতাপ সব চেপে রেখে রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আর বেশি লাস্য সৃষ্টি করবার মত শক্তি তার নেই। আর একমুহূর্ত দেরি না ক'রে সরে যাওয়াই ভাল, নইলে চোখ দুটো ঠেলে সত্যিকারের অশ্রু হঠাৎ বিদ্রোহ ক'রে উঠতে পারে, এবং আনন্দসদনের এই উৎসবের হাস্যময় উপসংহারের ক্ষতিও ক'রে দিতে পারে।

ওভাবে কুশলকে হঠাৎ ভাবিয়ে দিয়ে চলে গেলে ক্ষতি হবে ব'লে ভয় হয়, আনন্দসদনের ছেলের মুখের এই হাসিটুকু আবার নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তাই চলে যেতে পারে না স্বরূপা। এই সুন্দর রঙ্গমঞ্চের উপর অদ্ভুত এক মায়ার আবেগে তার অভিনয়ের শেষটুকুও নিখুঁতভাবে শেষ ক'রে দেবার জন্য দেহমনের সব শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হয় স্বরূপা। মুখ না তুলেই শান্তভাবে বলে—হ্যাঁ দেখবো।

—এস! উৎসাহে চঞ্চল হয়ে ঘরের বাইরে এসে হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় কুশল। সুইচ টিপে আলো জ্বালে, এবং ছেলেমানুষ যেমন উৎফুল্ল স্বরে খেলার সাথিকে কাছে ডাকে, তেমনি স্বরে ডাক দেয় কুশল—এস স্বরূপা, যে মূর্তিটা তোমাকে সব চেয়ে আগে দেখাবো ভেবেছি, তাকে দেখবে এস।

হলঘরের ঠিক মাঝখানে, কাঠের ফ্রেমের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক স্মিতচক্ষু দেবিকা মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ায় কুশল। স্বরূপা কাছে আসতেই বলে—দেখ স্বরূপা, এই হলো গঙ্গা।

মুগ্ধের মত দু'চোখে অপলক দৃষ্টি নিয়ে এই রূপাম্বিকা দেবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে স্বরূপা। তার চেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়ে কুশল তাকিয়ে থাকে স্বরূপার

মুখের দিকে। রূপসন্ধানী শিল্পীর কৌতূহল আজ ধন্য হবার সুযোগ পেয়েছে। হরভবনের গঙ্গা আর ফুলবাড়ির মেয়ের মধ্যে চোখের হাসির মিল আছে কি না, তুলনা ক'রে দেখবার সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি দেখা দিয়েছে এতদিনে, কুশলেরই বহু যত্ন দিয়ে সাজানো মূর্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার দিনে।

কিন্তু ভুল ক'রে ফেলে অভিনয়ের নায়িকা। দেখতে পায় কুশল, গঙ্গার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা স্বরূপার হাসিভরা দুই চোখ জলে ভরে গিয়েছে। ব্রজের গঙ্গা আর ফুলবাড়ির মেয়ের মধ্যে চোখের হাসির মিল আছে কি না, জানা গেল না। তুলনা ক'রে দেখবার সুযোগ পাওয়া গেল না। কোথা থেকে একটা বাঁধ-ভাঙা প্লাবন এসে সে সুযোগ ডুবিয়ে দিয়েছে।

কুশলের মুগ্ধ চোখের উল্লাস হঠাৎ বেদনার্ত হয়ে যেন মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে। মাথা হেঁট করে কুশল। রূপসন্ধানী শিল্পীর সব কৌতূহলের চাঞ্চল্য একটি আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে, এক হাতে কপালটা চেপে, বেলেপাথরের কালভৈরবের কর্কশ হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকে কুশল। একটা জোনাকি দপ দপ ক'রে পাখা নাচিয়ে জ্বলতে থাকে কালভৈরবের হাতের উপর।

তবে কি শুধু কতগুলি সুন্দর কথার আশ্বাস দিয়ে কুশলের এই প্রতিষ্ঠার উৎসবকে ভেঙে পড়ার বিষাদ থেকে উদ্ধার ক'রে, মাত্র একটু হাসিয়ে দিয়ে চলে যাবার জন্যই এসেছে স্বরূপা? জীবনের আশ্বাস দিয়ে সমর্থন করতে পারছে না এই উৎসব? মনে হয়, কি যেন একটা প্রতিবাদ লুকিয়ে রেখেছিল স্বরূপা ঐ চোখের মধ্যে, যা নিজের বেদনার তাপে এইবার গলে গিয়ে ওর চোখের কালোতারা ডুবিয়ে দিয়েছে।

স্বরূপার মুখের দিকে না তাকাতে পারলেও চুপ ক'রে থাকতে পারে না কুশল।—তোমার চোখে এই ভুল সাজে না স্বরূপা।

চমকে ওঠে স্বরূপা, চোখ দুটো আড়াল করার জন্যই মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দরজার দিকে তাকায়। সত্যিই তো, এই ভুল করবার জন্য সে আজ এখানে আসেনি। হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেয়ে, সাবধান হবার জন্যই সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা।

কুশল—আমার সব ভুল তুমি বুঝতে পেরেছ, কিন্তু আমাকে বুঝতে তুমি ভুল করো না।

স্বরূপা শান্তভাবে বলে—তুমি কিছু মনে ক'রো না।···আমি যাই এবার।

—স্বরূপা। ডাক দিয়েই মুখ ফিরিয়ে স্বরূপার দিকে তাকায় কুশল এবং দেখতে পায়, যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে বাইরের দরজার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে স্বরূপা। কুশল বলে—যাবার আগে আজ একটা কথা তোমাকে বিশ্বাস ক'রে যেতে হবে স্বরূপা।

স্বরূপা—বল, কি কথা।

কুশল—বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

স্বরূপা—এত বড় বিশ্বাসের বোঝা আমার উপর চাপিও না, সইতে পারবো না।

কুশল—কেন স্বরূপা?

স্বরূপা—আমি দেবী নই।

কুশল—আমিও তো দেবতা নই, সে কথা তুমিই সব চেয়ে ভাল ক'রে জান।

স্বরূপা—আমার কাছে তো দেবতার মতই। তোমার পায়ে হাত দেবার সাহস আমার নিশ্চয় আছে, কিন্তু হাত ধরবার সাহস আমার নেই।

মুখ ফিরিয়ে মাথা হেঁট ক'রে কর্কশ পাষাণে তৈরি কালভৈরবের হাতটার দিকেই আবার তাকায় কুশল। গাছ তার ছায়াকে অস্বীকার করছে, শুনলে যেমন অদ্ভুত মনে হয়, তেমনি অদ্ভুত স্বরূপার কথাগুলি। অস্বীকার করেছে স্বরূপা, তার এতদিনের ইচ্ছার ইতিহাসকেই অস্বীকার ক'রে বলতে পেরেছে—হাত ধরবার সাহস নেই! কুশলের জীবনকে এই রঙ্গমঞ্চে একলা রেখে একটা নির্মম অন্তর্ধানের ঘটনা দিয়েই সব দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসা ক'রে দিতে চাইছে স্বরূপা। সমাপ্ত হয়ে আসছে নাটক।

মনে হয়, পরম আকস্মিক আবার তার ইচ্ছার বজ্র হেনেছে, ভালবাসার জগতে কুশলের শেষ আশ্রয়টুকু চূর্ণ করার জন্য। কিন্তু না, আর নয়; আজ আর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না কুশল, কোন বিদ্রোহের স্পৃহাও জাগে না। ভালই হয়েছে। নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে অবিচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে কুশল, যেন মাথা পেতে তার জীবনের উপর এই রূঢ়তম আঘাতকে আজ আশীর্বাদী ফুলের মত বরণ ক'রে নেবার জন্য শান্ত মনে সে প্রস্তুত হয়েছে।

ক্ষীণ গুঞ্জন তুলে কয়েকটা কাঁচপোকা পাথুরে কালভৈরবের মাথার চারদিকে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। কুশল বলে—জোর করছি না স্বরূপা, তোমার ওপর কোন দাবি করছি না, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝে যেও না।

উত্তর দেয় না স্বরূপা। রাত্রির বাতাসে বাগানের ঝাউগুলি শুধু জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, আর কোন শব্দ শোনা যায় না।

হেঁট মুখ না তুলে, কালভৈরবের কর্কশ হাতটার দিকে তেমনি তাকিয়ে থেকে কুশল বলে—আমাকে দেবতা ব'লে অপবাদ দিও না স্বরূপা। আমার জীবনের সব ঘৃণা সন্দেহ দস্যুতা আর ভুল দিয়ে তোমাকেই ভালবেসেছি, বিশ্বাস কর।

তবুও উত্তর দেয় না স্বরূপা। হলঘরের দরজার উপর আমপাতার ঝালরগুলিই শুধু শব্দ ক'রে দুলতে থাকে।

কুশল—আমার ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকে আটকে রাখতে চাই না স্বরূপা। কিন্তু তুমি শুধু আমার এই একটি কথা বিশ্বাস ক'রে তারপর চোখ মুছে চলে যাও।

কোন সাড়া শোনা যায় না। মহারাজপুরের রাত্রিটাই যেন সব শব্দ হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কুশল—বিশ্বাস না কর, ক্ষমা ক'রে যাও।

চারদিকের বাতাস যেন বধির হয়ে গিয়েছে, কোন শব্দ বাজে না; একটা উতলা নিশ্বাস চাপতে গিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে কুশল, মুখ তুলে দরজার দিকে তাকায়। কিন্তু আর কিছুই বলবার দরকার হলো না, সে সুযোগও ছিল না। চলে গিয়েছে স্বরূপা, কখন চলে গিয়েছে তাও বুঝতে পারেনি কুশল।

হলঘরের বাইরের বারান্দায় এসে কুশল ডাকে—স্বরূপা। কর্পূরদীপে তখন আর কোন আলোর শিখা ছিল না। শুধু আলপনার মত কোমল একটা ধোঁয়ার রেখা বাতাসের আলোড়নে ছটফট ক'রে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করছিল।

বারান্দা থেকে নেমে, আরও এগিয়ে ফটকের কাছে এসে নিঃশব্দ মহারাজপুরের জনহীন পথের আলো-ছায়ার দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় কুশল—স্বরূপা।

সাড়া দেয় না জনহীন পথ, স্বরূপা সত্যিই চলে গিয়েছে।

কিন্তু, পর পর তিনটে ল্যাম্পপোস্ট পার হয়ে, তার পরেই তো ফুলবাড়ির সড়ক। দূর দুর্গম নয়, দুরতিক্রম্য নয়, খুবই নিকটে। সহজে ও স্বচ্ছন্দে চলে যাবার মত একটুখানি পথ। জোর করবার নয়, দাবি করবার নয়, শুধু ক্ষমা চাইবার পথ। কোন আশা নিয়ে নয়, ব্যর্থতার ভয় নিয়ে নয়, সফলতার লোভ নিয়ে নয়, সব দাবি দাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুধু জানিয়ে দিয়ে আসা—বিশ্বাস না কর; ক্ষমা কর! না ডাকতে যে বার বার এসেছে, অনেক ভুল ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে, বীরভদ্রের কঠিন পাথুরে হাতের আঘাতে বিক্ষত এই কপালেই হাত বুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে, অবিশ্বাসের ধুলো ধুয়ে মুছে দিয়েছে স্রোতোধারার মত, তারই কাছে গিয়ে শুধু বলে দিয়ে আসা—তুমিই তো গঙ্গা।

ফটক বন্ধ ক'রে ধীরে ধীরে ফুলবাড়ির জনহীন পথ ধরে এগিয়ে যায় কুশল।

ত্রিযামা রাত্রি শেষ হতে আর বড় বেশি দেরি নেই। ক্ষীণ চাঁদের আলো আর হালকা কুয়াশা মহারাজপুরের সুষুপ্ত শান্তির উপর শেষ স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে! ফুলবাড়ির রক্তকরবী তখন ঘুমের আবেশে নিঝুম হয়ে গেলেও ফুলবাড়ির মেয়ের চোখ ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে অশান্ত এক জ্বালার সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করতে থাকে।

—স্বরূপা।

ডাক শুনে চমকে ওঠে স্বরূপা। কে ডাকে? পথহারা কোন প্রতিধ্বনি নয়; এ যে তারই গলার স্বরের ডাক, এই তো কিছুক্ষণ আগে যার মুখের ভাষাকে আর ভালবাসার ঘোষণাকে স্বরূপা তার মনের সব জোর নিয়ে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। সে বিশ্বাস নেবার জন্য স্বরূপার প্রাণ যতই লুব্ধ হয়ে উঠুক না কেন, স্বরূপার মন সেই বিশ্বাস নিতে সাহস পায়নি। তাই স্বরূপার বিস্ময়টাই যেন হঠাৎ বিশ্বাসের ভয়ে চমকে উঠেছে। আনন্দসদনের ছেলে কি সত্যিই ফুলবাড়ির এই ঘরের ঐ দরজার ওপারে বন্ধ কপাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে? এও কি সম্ভব? হঠাৎ চমকে-ওঠা মনের বিস্ময় আর বুকের ভিতর ছন্নছাড়া নিঃশ্বাসের দাপাদাপি সহ্য করবার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বরূপা।

—স্বরূপা!

তারই ডাক। কোন সন্দেহ নেই! অসম্ভই সম্ভব হয়েছে। ফুলবাড়ির বড় শান্ত স্বভাবের সেই মেয়েরই লাজুক হাত দুটোতে যেন ক্ষেপা ঝড়ের পাগলামি এসে লুটিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে নয়, চুপি চুপি নয়, এক বিন্দুও কুণ্ঠা নিয়ে নয়, যেন হঠাৎ এক দুরন্ত উৎসাহে একেবারে নিলাজ হয়ে হাতের এক ঠেলায় দরজার বন্ধ কপাটের খিল খুলে দেয় স্বরূপা। খিলের শব্দ আছাড় দিয়ে এবং কপাটের শব্দ ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে। স্বরূপা যেন আজ ইচ্ছা ক'রে তার জীবনের সেই মেয়েলি ভীরুতাটাকেই চূর্ণ করে দিতে চাইছে। ঘুম ভেঙ্গে যাক পৃথিবীর, গোপনে কপাট খোলার এই শব্দ শুনুক পৃথিবী। ধরা পড়ে যাক স্বরূপা।

কুশলের মুখ থেকে কোন কথা শোনবার জন্য নয়; শুধু কুশলের মুখটাকেই দেখবার জন্য দু'চোখ অপলক ক'রে তাকিয়ে থাকে স্বরূপা। তার পরেই বলে—ভেতরে এস।

বোধ হয় শুনতে পায়নি, কিংবা শুনলেও বুঝতে পারেনি কুশল। কুশল বলে—যদি সত্যিই বিশ্বাস না করতে পার, তবে…।

—কিসের বিশ্বাস?

—আমি তোমাকে ভালবাসি, একথা যদি বিশ্বাস না করতে পার, তবে অন্তত আমাকে ক্ষমা ক'রে, আমার সব ভুল ভুলে গিয়ে…।

কথা শেষ করতে পারে না কুশল। কুশলের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে স্বরূপা।
—আজ বিশ্বাস করি কুশল।

কেন? এরই মধ্যে নতুন ক'রে কিসের প্রমাণ পেয়ে সেই কথাটিকেই বিশ্বাস

করতে পারছে স্বরূপা, যে-কথাকে মাত্র কয়েক মিনিট আগে আনন্দসদনের ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি ?

কুশল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—কেন বিশ্বাস করছো স্বরূপা ?

দীর্ঘকালের বাধার পাথর হঠাৎ সরে গেলে নীরব নির্ঝর যেমন বেশি মুখর হয়ে ওঠে তার আবেগ-মুক্তির নতুন পুলকে, স্বরূপাও যেন তেমনি অবাধ আবেগে মুখর হয়ে এই প্রশ্নেরও উত্তর অনায়াসে শুনিয়ে দিতে পারে, যদিও বলতে গিয়ে ছলছল করে স্বরূপার চোখ।—আজ তুমি নিজের থেকেই এসেছ। আমি ডাকিনি তবু এসেছ। আসবে বলে আশা করিনি, তবু এসেছ। বড় রাগ ছিল, তুমি নিজের থেকে আস না কেন ? বড় সন্দেহ ছিল, যদি ভালবাসে তবে আসতে পারে না কেন ? পাথুরে দেবতাদের সঙ্গে মিশে মিশে হয় পাথর নয় দেবতা হয়ে গিয়েছিল আনন্দসদনের ছেলে, নইলে ফুলবাড়ির মেয়ের এই একটা ছোট্ট অভিমানকেও এতদিন বুঝতে পারেনি কেন ?

স্বরূপা যেন তার সারা শরীরটাকেই একেবারে অলস ক'রে একটা অসহায় ভারের মত কুশলের হাতে ধরিয়ে দিতে চায়। স্বরূপার হাত ধরে কুশল।

কুশল বলে—আমি নিজের থেকেই এসেছি, শুধু এই জন্যই কি ?

স্বরূপা—কি ?

স্বরূপাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কুশল বলে আমাকে আর আমার ভালবাসাকে বিশ্বাস করলে, আর আমার হাতে ধরা দিলে, সে কি শুধু আমি আজ নিজের থেকে তোমার কাছে এসেছি বলে ?

স্বরূপার চোখের তারায় অদ্ভুত এক হাসিভরা হর্ষের বিদ্যুৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে। —তুমি কথা দিয়েছিলে, আমার কাছে নিজেই আসবে। বড় লোভ করেছিলাম আমি, যেন একদিন তুমি নিজের থেকেই আস। কিন্তু তোমার কথা আর আমার লোভ হেরে গিয়েছে কুশল, তুমি আসতে পারনি। তোমার আমার সব চেষ্টার ওপর যার ইচ্ছার জয় হবে চিরকাল, তারই ইচ্ছার দান হয়ে তুমি আজ এসেছ, না হলে আসতে পারতে না।

স্বরূপা।—মৃদুস্বরে ডাকলেও কুশলের গলার স্বরে যেন এক ভরাট নদীর গভীর জলের কলস্বর বাজে।

স্বরূপাও যেন তার আগল-খোলা মনের আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে— বিনা কারণে যাকে ভাল লেগেছিল, না বুঝে যাকে ভালবেসে ছিলাম, আর সব বুঝেও যাকে এগারো বছর ধরে খুঁজেছি, তুমিই তো সেই! বিশ্বাস করি

কুশল, ফুলবাড়ির মেয়েকে ভালবেসেছ তুমি। আমি ব্রহ্ম নই, গঙ্গাও নই; কিন্তু তুমিই তো আমার……।

ফুলবাড়ির এক জীর্ণকায় গৃহের নিভৃতে শান্ত আলো-ছায়ার সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে যেন একটা চরম মীমাংসা ফুলডোর হাতে নিয়ে দু'টি দাবিহীন মানুষের প্রাণকে একসঙ্গে পাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল, পাওয়া মাত্র বেঁধে দিয়েছে; সব চেষ্টা-অচেষ্টা আর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে থেকে একটা ঘটনা এসে যেন এক মুহূর্তের লীলায় দু'টি ভালবাসার বিপুল দ্বন্দ্বের সমাধান ক'রে দিয়েছে।

ত্রিযামা রাত্রি শেষ হয়ে আসে। কামরাঙা গাছের পাতার ঝোপে উসখুস করে ঘুম-ভাঙ্গা নীলকণ্ঠ। লেখা থামিয়ে টেবিলের কাছ থেকে উঠে এসে জানালার কাছে দাঁড়ায় কুশল।

বিশ্বাসে আত্মহারা ফুলবাড়ির মেয়ের দেহভার কুশলের এই যে দুটি হাতের উপর নির্ভর লাভ ক'রে একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে, সেই দুটি হাত দিয়েই জানালার গরাদ ধরে দেখতে থাকে কুশল—পশ্চিমে বাষ্পের আবরণে ঢাকা ধূলপাহাড়ের নিথর শিলাতরঙ্গ থেকে সুরু ক'রে পুবের দিক্‌প্রান্তে দামোদরের উৎক্ষিপ্ত কুয়াশার স্তবক পর্যন্ত, নিখিল প্রাণের রূপ যেন তৃষিত শিশুর মত ঘুমের মধ্যেই কার বুক থেকে ঝরে পড়া করুণার ধারা পান ক'রে সুন্দর হয়ে উঠছে।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কুশল। অনন্দসদনের বারান্দাতেই একটা শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে শোনা যায়। খট্ খট্, খট্ খট্, পাঠকজীর খড়মের শব্দ। বোধ হয় তুলসী সরোবরে স্নান করতে চললেন পাঠকজী।

এখনও তারাগুলি মুছে যায়নি, পার্কের কদম গাছে পাখি ডেকে ওঠেনি। কিন্তু মনে হয়, সবার আগে মহারাজপুরের আত্মা যেন জেগে উঠেছে নির্ভয় আনন্দে, তারই আবির্ভাবের সাড়া ধ্বনিত হয়েছে ঘুম-ভাঙা একটি মানুষের পায়ের শব্দে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে আবার টেবিলের কাছে বসে কুশল। আবার কলম হাতে তুলে নেয়। মহারাজপুরের এই কর্পূরবাসিত রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলোক ঝলক দিয়ে উঠবার আগেই রূপতত্ত্বের উপসংহার লিখে শেষ করতে থাকে কুশল।

"কল্লোলিতকান্তি গঙ্গার দু'টি অপলক চোখের হাসিকে অনেকে প্রথমে দেখে ভুল বুঝতে পারে, কারণ অনেকেই এই মূর্তির আসল ইতিহাসটুকুই জানে না। এমনিতে দেখে ধারণা হয়, ব্রহ্মের এই গঙ্গামূর্তি যেন কারও প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে তাকিয়ে

আছে দূরান্তরের পথের দিকে। যেন কেউ আসছে, একদিন না একদিন আসবে, তারই প্রতীক্ষা। কিন্তু সে-আকুলতায় ও-রকম হাসি থাকতে পারে না। কপোল ও চিবুকের গঠনভঙ্গীর মধ্যেও তাহ'লে একটু বেদনা না থেকে পারতো না। চৌধুরি সাহেবের ধারণাই নির্ভুল ব'লে মনে হয়। ব্রঞ্জের গঙ্গা হলো যুগলমূর্তির একটি পাশেই ছিল গঙ্গাধর এবং তারই বামবাহুর উপর গ্রীবাভার স'পে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গা।

"গঙ্গার চোখের হাসি হলো পরম নির্ভরতায় প্রসন্ন রূপের হাসি। আমি একা নই, তুমি আছ আমার পাশেই, তুমি সুখী হলে আমি সুখী, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, এই অবিচল বিশ্বাসে ভরা প্রাণের হাসি।"